অবতরণিকা

মহাভারত পুরাণ বা পুরাবৃত্ত এবং রামায়ণ একটি নিটোল মহাকাব্য, তার মধ্যে পুরোনো দিনের ইতিকথা নিহিত নেই, এমন এক ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সন্ধান শুরু করেছিলাম মহাভারতের পাতায়। এ সবই বিক্ষিপ্ত মহাজনোক্তির প্রভাব।

ফলে 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' এবং 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বই দুটির রচনা শেষ করি প্রথমেই। 'হরিবংশ' অবলম্বনে তার পরে হাত দিতে হয়, 'যদুবংশ/ব্রজপর্ব' রচনায়। কেননা মহাভারতের কথা দীর্ঘায়িত হয়েছে 'হরিবংশ' পুরাণে। 'হরিবংশ' যেন মহাভারতের 'ডিউ পার্ট'। মহাভারতে ভারত-যুদ্ধের রূপকার বাসুদেব কৃষ্ণের পূর্বজীবনেতিহাস অলিখিত ছিল। বিজয়ী আর্য সম্প্রসারণবাদীরা সেই ফাঁক পূরণ করেন 'হরিবংশ' ও 'বিষ্ণুপুরাণে'। ভারতযুদ্ধের পূর্বানুবন্ধ সন্ধানে আমাকেও তাই লিখতে হয়েছিল বাসুদেব কৃষ্ণের রাজনৈতিক উন্মেষকালীন জীবনোপন্যাস, যদুবংশ/ব্রজপর্ব বইটি। যদুদের ইতিহাস ভারতযুদ্ধের পরেও পল্লবিত হয়েছিল মথুরা দ্বারকায়। যদুবংশ ধ্বংসকথা সম্পূর্ণ করার জন্য তৈরী করছিলাম যদুবংশের ২য় খণ্ড, 'মথুরা দ্বারকা' পর্ব। কিন্তু মাঝপথে সে কাজ বন্ধ রাখতে হ'লো। কেননা, ভারততাত্ত্বিক রচনাবলী এবং বিভিন্ন পুরাণের পাঠসূত্রে এই সময় নজরে আসে কয়েকটি ক্ষীণ অথচ মূল্যবান সূত্র। তখন মনে হয়, প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান যেখান থেকে শুরু করা উচিত ছিল, সেখান থেকে শুরু হয়নি। 'রামায়ণ' নিছক কাব্যকথা এই ভ্রান্ত ধারণা আমাকে দিয়ে ভারতকথা আরম্ভ করিয়েছে মহাভারত পর্ব থেকে, যদিও ভারতযুদ্ধ জয়ের আগেই আর্য আগ্রাসন হিমালয় থেকে অবতরণ ক'রে প্রথম তার অভিযান শুরু করে বনকাননাচ্ছন্ন দক্ষিণাপথে। কথারম্ভ হওয়া উচিত ছিল তাই রামায়ণী ইতিবৃত্ত ধরে।

সাময়িকভাবে এজন্যই সরিয়ে রাখলাম বাসুদেব জীবনচরিতের শেষ দু'খণ্ডের রচনা। হাতে নিলাম বাল্মীকির রামায়ণ। চোখ ফেরালাম, আরও কয়েক পুরুষ অতীতের ঘটনায়।

বস্তুত চমৎকার ঘটনা-পরম্পরাক্রমে দক্ষিণাপথে আর্য বিজয়াভিযানের ইতিবৃত্ত ছবির মতো সাজিয়ে রেখে গেছেন আদিকবি বাল্মীকি। মহাকাব্যের অঙ্গ থেকে রূপক রূপকথার অলঙ্কারগুলি সাবধানে খুলে নিয়ে পরবর্তী কথক ঠাকুরদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত অপকৃষ্ট অংশগুলি বাদ দিলেই রামায়ণিক বিবরণীটি সুস্পষ্ট একটি পুরাবৃত্তের রূপ নেয়। এজন্য অবশ্য ঘটনাবলীর যথোচিত বিশ্লেষণ দরকার। অসুবিধা কিছু যে নেই, এমন নয়। মহাভারত প্রসঙ্গে ঢের গবেষণা কাজ হয়েছে, তুলনায়

রামায়ণ প্রসঙ্গ অতি সামান্যই আলোচিত। মহাভারত আলোচনায় তাত্ত্বিক সমর্থন যত বেশি মেলে, রামায়ণকথা বলতে বসলে তেমন অজস্র তাত্ত্বিক আলোচনাসূত্র পাই না। অনুসন্ধান মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় মূল গ্রন্থ ও প্রাসঙ্গিক পৌরাণিক তথ্যাদির অনুসরণে। সেভাবেই এখানে পাঠানুক্রম সাজিয়েছি।

বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে জানা যায়, 'রামায়ণ' কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, উৎকৃষ্ট কাব্য হলেও, চরিত্রগতভাবে এটি কেবলমাত্র মহাকাব্যও নয়। নয় তা আর্য-অনার্য সংঘাতেরও কোনো কাহিনী। সীতা-উদ্ধার অপেক্ষা কৌশলে এক ছদ্মবেশিনী সীতাকে রাবণালয়ে প্রেরণই ছিল রামায়ণিক ঘটনাবর্তে অন্যতম একটি চমক, আর তাই, রামায়ণ কোনো অবলা সীতা উদ্ধারের কাহিনীও নয়।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাবণের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার বংশে বিশ্রবা মুনির ঔরসে। তিনিও ছিলেন আর্য। মিথ্যা অপপ্রচারে রাবণ দশমুণ্ডধারী পাপিষ্ঠ। ওদিকে বাল্মীকি রামায়ণে তিনি সুপুরুষ, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, দ্বিহস্ত, একমুণ্ড এক দিগ্বিজয়ী রাজন। শৈব হওয়ার অপরাধে ব্রহ্মাবাদী বর্ণাশ্রমধর্মী জাতিভেদপ্রধান সমাজসংস্থাপক আর্য সমাজে রাবণ হন ব্রাত্য। রাম-রাবণের সংঘর্ষ কাজেকাজেই আর্য বনাম আর্যগোষ্ঠীরই বিবাদসম্ভূত।

ধর্মাধর্মের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত রামকথায় প্রতিভাসিত হয়েছে যে আশ্চর্য পুরাবৃত্ত, সেটি যেমন রাবণের তেমনিই আবার রামচন্দ্রেরও করুণ পরিণতির ধারাবাহিক প্রতিবেদন। আর্য দেববাহিনী এবং ব্রহ্মাবাদী ব্রাহ্মণদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা তদানীন্তন ভারতবর্ষে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর এক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করেছিল, উত্তরকাণ্ড সহ বাল্মীকি রামায়ণে তারই পর্বানুক্রমিক চিত্রণ অনুসন্ধিৎসু পাঠককে অভিভূত করে।

রামায়ণ সম্পর্কিত বিভ্রান্তির মূলে আছে, রামস্তুতিমূলক বাজারচালু রামচরিতগুলি,—সাধারণো সেই নবরূপায়িত কল্পিত কাহিনামালাই 'রামায়ণ' নামে প্রচলিত, কিন্তু সেগুলির কোনোটিই প্রকৃত রামকথা নয়, প্রাচীন পুরাবৃত্তের অপহ্নব ঘটিয়ে এই স্তবকুসুমাঞ্জলি বিরচিত। সুতরাং ঐ সব গ্রন্থে ইতিহাস অবলুপ্ত হয়েছে উপন্যাসের কথা-আবর্জনার তলায়।

রামচন্দ্রের জীবনাবসানের কয়েক সহস্রাব্দ পরে গ্রন্থিত হয় বাল্মীকি রামায়ণ। আবার সেই আদি মহাকাব্য বিরচিত হওয়ারও কয়েক শতক পরে হয়েছিল রামচন্দ্রের অবতারি প্রতিষ্ঠা। তৎপরবর্তী আমলে যথেচ্ছ ভক্তিমূলক প্রক্ষিপ্ত রচনার দ্বারা সম্ভবত মূল রামকথায়ও বিকৃতি ঘটতে শুরু করে। যে আগ্রাসী ব্রাহ্মণরা ক্ষমতালালসায় অযোধ্যাকে শ্মশান বানিয়ে দীর্ঘকাল রামের পিতৃরাজ্যকে জনশূন্য করে রাখেন, সেই ব্রাহ্মণনেতৃত্বেরই পাহারাদার দুর্বুদ্ধিজীবী মতলবী ব্রাহ্মণ কথকরা পুনরায় রামকে ভগবান বানিয়ে এককালে ব্রাহ্মণ্য শোষণের বনিয়াদটি পাকাপোক্ত ক'রে নেন।

ভাগবতের মধ্যে পৌরাণিক কালের ইতিহাসপুরুষ বহুজন-হত্যার পাপপঙ্কলিপ্ত অন্যায় অধর্মাচারী আয়ুধধারী এক যাদব রাজনৈতিক বাসুদেব কৃষ্ণ যেমন বংশীধারী চিরকিশোর পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূরতি ধারণ করে আবির্ভূত হন ও মহান পরমেশ্বরের আসনটির দখল নিয়ে বসেন, এবং ভাগবতকথা মানুষী কদর্যতার গুণগাথায় পরিণত হয়; উত্তরকাণ্ড সহ বাল্মীকি রামায়ণ অপঠিত রেখে পরবর্তী নয়া রামচরিতামৃত পাঠ করলে তেমনি এক লোভ-লালসাজর্জর আজীবন ব্রাহ্মণ-দাসত্বকারী ক্ষত্রিয় রাজপুত্র রামচন্দ্রকেও জাঁকিয়ে ব'সতে দেখা যায় পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের পবিত্র আসনে। মতলবী পুরোহিত সমাজ এভাবেই পরমেশ্বরের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে আপন স্বার্থসাধক গোষ্ঠীনেতার লড়াকু মূর্তি তদুপরি আরোপ ক'রে। ফলে মানুষের পরমেশ্বর হয়ে বসেছেন প্রবঞ্চক মানুষী শাসনকর্তারা। রাজা ও জায়গীরদাররা হয়েছেন মানুষের ভগবান যার ভীষণ পরিণতি যুগযুগব্যাপী হিংসা, ধর্মযুদ্ধ, জাতি ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি। হীনজাতি, উচ্চজাতি ভেদের দ্বারা শোষকস্বার্থ পূরণের অভিপ্রায়কে মতলবীরা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে প্রচার করে গেছেন পৌরাণিক রচনারীতির কৌশলী পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে।

এই সমস্ত বিভ্রান্তির অবসান হ'তে পারে একমাত্র আদি গ্রন্থাদির সঠিক পাঠ গ্রহণ করলে।

ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য স্বর্গনরক, দেবতা ও পরমেশ্বর, অবতার ও গুরুব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দাবলীর প্রকৃত নেপথ্য রহস্যভেদ করার উদ্দেশ্যেই আমার ক্রমান্বয় অনুসন্ধান। মহাভারত আলোচনা দিয়ে তার সূত্রপাত এবং রামায়ণ কথার মধ্যে তার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছি। সম্ভাব্য কোনো প্রশ্নই অনালোচিত রাখি নি। প্রতি পর্বে প্রত্যেকটি অলৌকিক ঘটনার রহস্যোন্মোচন করেছি ঘটনাবলীর পারম্পর্য বিচার ক'রে।

ফলত প্রজাপতি ব্রহ্মার পরিচয় সন্ধানে জানা গেছে, তিনি পরবৈদিক কালের এক ব্রাহ্মণ রাজনৈতিক মাত্র। আবির্ভাব আরব সাগরে, বসবাস গাড়োয়াল হিমালয়ের গন্ধমাদন পার্বত্য এলাকায়। তিনিই লঙ্কাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী, তাঁরই ব্রহ্মাপদাধিকারধারী উত্তরসাধক ভারতযুদ্ধের রূপকার। সীতা নাম্নী দুই বিভিন্ন নারীর কথা জানা গেছে রামায়ণ ও পুরাণ পাঠে। এই দুই সীতাই সমতল ভারতে দেবজনের নারী গুপ্তচর রূপে গন্ধমাদন পর্বত থেকে প্রেরিতা হন। রাম ও কৃষ্ণের জন্মরহস্য ঘেঁটে জানা যায়, এঁরা দুই যুগে দুই বিষ্ণুপদবিধারী দেবতার ঔরসে মানবীগর্ভে জাত মানবসন্তান। আরও জানা যায়, রামায়ণিক ঘটনাবর্তে ব্রাহ্মণ্যচাতুর্য যাঁকে পাপিষ্ঠা কুলনাশিনী বলে প্রচার করেছিল, সেই ব্রাহ্মণ নেতারাই কৈকেয়ীর নির্দোষিতার প্রমাণ নিজেরাই রেখে গেছেন রামায়ণের তথ্যসূত্রে। অগস্ত্য ভরদ্বাজ প্রমুখ মুনিদের আশ্রমকে দেখলাম, এক একটি সুবিশাল সামরিক ঘাঁটির আকৃতি নিতে। বিলাসে বৈভবে ঐ আশ্রমগুলির জাঁকজমক ঐতিহাসিক

কালের নবাবী আরাম আহ্লাদকেও হার মানায়। দশরথের পুত্রবাৎসল্যের কথা অজানাই থেকে যায়, কারণ ব্রাহ্মণ্যস্বার্থে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর চরিত্র হনন করা হয়েছে।

মহাভারত রামায়ণীকথা পৃথিবীর আশ্চর্যতম রহস্য উপন্যাস অপেক্ষা আকর্ষণীয় ঘটনাবলীর সমাবেশে সমৃদ্ধ। সেই ঘটনাবলীর পাঠ আমাদের বিস্মিত বিমূঢ় এবং রুদ্ধশ্বাস ক'রে রাখে। আদি ঘটনাবলীর চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি অবিকৃত রেখে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও আলোচনা সহযোগে তার নেপথ্যে ঘটিত ও প্রমাণসম্ভব ইতিবৃত্তকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছি। জানি, এসব ঘটনা পাঠকবৃন্দ রুদ্ধশ্বাসেই পাঠ করছেন। কিন্তু তাঁদের এই তৃপ্তিতে আমার তৃপ্তি নেই। পাঠক যখন এই রচনা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরে পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত হন এবং তাঁর নিজস্ব তর্ক যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নেন, একমাত্র তখনই আমি নিজেকে পুরস্কৃত মনে করি।

আমার পূর্ববর্তী রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত পাঠককে নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, পুরাগ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রের বাইরে কোনো আলোচনায় আমি উৎসাহী নই। নিজের ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার বিশ্লেষণও আমার রচনায় কোনোরকম প্রশ্রয় পায় না। কোথাও নিজের মনোমত একটিও নোতুন কথা লিখেছি বলেও আমি দাবি করি না। নোতুন যদি কিছু থাকে তবে তা হ'ল, পুরাগ্রন্থ পাঠের যে রীতি আমি অনুসরণ করেছি, তার অভিনবত্বটুকু। বাদবাকি কাজ নিছকই আমার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। সে কাজে আমি এক নগণ্য সংকলক, সংগ্রাহক এবং গ্রন্থনাকারী শ্রমিক মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিকথার ইমারতটির গায়ে বহুযুগের বহুস্তরীয় পলেস্তারা জমেছে। আমি সেই স্থূল পলেস্তারা ছাড়িয়ে তার পাতলা ইট আর প্রস্তরকড়িগুলির গা চেঁছে আদি রূপটুকু আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি গৃহনির্মাণকারী মিস্ত্রীর মতো। ছেনি হাতুড়ির ঘা মারতে অসাবধানে ইমারতের কোথাও যদি কোনো চোট লেগে থাকে তবে সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

বাজারচালু রামায়ণ মহাভারতে পুরাবৃত্তের অপহ্নুতি এবং তার ধর্মগ্রন্থরূপ চরিত্রের প্রখ্যাতি বই দুটিকে আবহমানের শ্রদ্ধার দ্বারা মহিমান্বিত করেছে। এই শ্রদ্ধা ভারতীয় মনে বদ্ধমূল। কিন্তু সেই শ্রদ্ধার কারণ গ্রন্থ দুটির আদি রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা বই অন্য কিছু নয়। বললে নিশ্চয় অত্যুক্তি করা হবে না যে, অধিকাংশ আমরাই [কি শিক্ষিত, কিবা শিক্ষাবঞ্চিত] রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনেছি অপরের মুখে। যাঁদের মুখে শুনেছি তাঁরাও সেই গল্প হয়ত বা কারো কাছে শুনেছেন, নতুবা কোনো সহজ বাজারচালু ভক্তিমূলক রামায়ণ পাঠ করে জেনেছেন। এই জানাশোনা আর যাইহোক, সঠিক জানা নয়। এমন একপেশে ধারণার বশবর্তী চিন্তাধারা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে। এমত ধারণা লাভ করে যাঁরা বলেন, খুব জানলাম, খুব অনুপ্রাণিত হলাম ; তাঁদের প্রশ্ন

করলে জানা যায়, তাঁরা সবাই একই কথা জেনেছেন, একই ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং বিনা প্রশ্নে আপ্তবাক্য মেনে বসে আছেন।

মস্ত ফাঁকি ঠিক এইখানেই। কোনো প্রকৃত শিক্ষা একাধিক মানুষকে একই ধারণা ও প্রভাবের বশবর্তী করে না। শিক্ষা মানুষের বোধবুদ্ধি বিচিন্তাকে জাগ্রত করে আর সেই মূলধন নিয়ে মানুষ গড়ে নেয় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষের অধিকার থেকে দ্বিতীয় ভাবনা অপহরণ করে, সে শিক্ষা মানুষের অগ্রগতির সহায়ক হয় না, তার দ্বারা কূপমণ্ডুক সৃষ্টি হ'তে পারে, একটি সংস্কারমুক্ত পরিশীলিত মন তৈরী হয় না। এমন শিক্ষা, বলাই বাহুল্য, সমাজকল্যাণকামী নয়। তা নিয়ে কারো, কোনো ধর্মের কোনো লোকেরই, বড়াই করা সাজে না; সামাজিক মঙ্গলও হয় না।

ঈশ্বর যখন কাগজ কলম নিয়ে বই লেখেন না; মঠ মন্দির, গির্জা, গুরুদ্বার বসিয়ে বক্তৃতা করেন না; সভা ডেকে ব্রহ্মাজীর মতো কোনো মহামারণ যজ্ঞের পরিকল্পনাও করেন না, তখন ঈশ্বরাদিষ্ট বাণী কোন্ কেতাবে কে লিখে যেতে পারেন? কোথায় শুনবেন তিনি সেই ঈশ্বরের বাণী? এবং যদি তা না শোনা যায়, তবে সর্বমান্য ধর্মপুস্তকই বা লেখা হয় কী করে?

তাছাড়া ধর্মই বা কী? ধর্মের স্বরূপ যদি "গুহার আঁধারেই নিহিত" রয়ে গিয়ে থাকে চিরকাল [গ্রন্থমধ্যে আলোচনা দ্রষ্টব্য] তবে ধর্মপুস্তক নামে কোনো গ্রন্থেরই বা অস্তিত্ব থাকে কোথায়? এসব প্রশ্নেরও উত্থাপক এবং আলোচক ছিলেন প্রাগিতিহাসের ঋষিরাই। মতলবী পুরাণে তাঁদের বক্তব্যও গায়েব হয়ে গেছে। রীতিমত সুপরিকল্পিতভাবে ইতিহাসের অবলুপ্তির প্রয়াস প্রযত্ন চলেছে সুবিস্তৃত পৌরাণিক যুগে। এই কাজে রাজা ও পুরোহিত সমভাবে সামিল হয়ে ধর্ম, রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় রাষ্ট্রের বনিয়াদ তৈরী ক'রে গেছেন।

সেই পাকাপোক্ত সিংহাসনের পাদমূলে ব্যক্তিগত দুঃসাহস সম্বল ক'রে আমি কয়েকটি ছেনি হাতুড়ির আঘাত হেনেছি। আমার আগেও অনেকেই এমন দুর্বুদ্ধির কাজ করে গেছেন। বনিয়াদ অক্ষুণ্ণ আছে তবু যথারীতি। থাকবেও। তবে তারই মধ্যে কিছু মন তৈরী হয়ে যাবেই যাদের সামনে উন্মুক্ত হবে চিন্তার নবদিগন্ত।

আমার এই রচনাবলী তেমনই সব অনুসন্ধানীদের হাতে তুলে দিতে চাই। তাঁরা কিছু চিন্তার খোরাক পেলে সার্থক মনে করব আমার সব পরিশ্রম।

বীরেন্দ্র মিত্র

তটিনী তমসার তীরে নিবিড় নীল অরণ্যানী।

প্রত্যুষের রাঙা সূর্যরাগ আরণ্যক ঘনঘটা তখনও ভেদ করতে পারেনি। মন্দ শীতল সমীরণের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু আলোককণা সবেমাত্র ঝিরি ঝিরি ধারায় বর্ষণ শুরু করেছিল। এমন এক ব্রাহ্ম মুহূর্তে আশ্রম ছেড়ে আচমনে বার হয়েছেন মহর্ষি বাল্মীকি, সঙ্গে চলেছেন অনুগত শিষ্য ভরদ্বাজ। বিমুগ্ধ ঋষি আত্মগতভাবে উচ্চারণ করছিলেন বেদমন্ত্র। দেখছিলেন পুষ্পভারাবনত কানন-বল্লরী কী অপূর্ব আশ্লেষ হিল্লোলে আপন আনন্দে আন্দোলিত হচ্ছিল। দেখছিলেন, বিটপী বীথিকার পল্লবদল সূর্যাতপকে কত শত প্রযত্নে বরণ করছিল পরম রমণীয় বিভঙ্গে।

আর ঠিক এমনি সময় হ'ল রসভঙ্গ। ঘটল অপ্রত্যাশিত ছন্দপতন। মহর্ষির পায়ের কাছে এসে পড়ল ব্যাধশরবিদ্ধ এক বিষণ্ণ ক্রৌঞ্চ। সঙ্গে সঙ্গে বিষাদমালিন্যে খিন্ন হ'ল সেই পবিত্র স্নিগ্ধ পরিবেশ। বিচলিত ব্যথিত হলেন মহর্ষি। যিনি কবি, যিনি তাঁর কাব্য সংসারের বিধাতা, স্তব্ধ হ'ল তাঁর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ। কিন্তু আশ্চর্য, অবাক হলেন কবি। মন্ত্রের বদলে মন তাঁর আপনি রচনা করল একটি সুললিত শ্লোক :

> মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

মিথুনাসক্ত ক্রৌঞ্চযুগলের একটিকে বিচ্ছিন্ন ও নিহত হ'তে দেখে ক্ষুব্ধ কবি অভিশপ্ত করলেন তীরন্দাজ সেই নিষাদকে। বললেন,—নিষাদে! মিথুনক্রীড়ায় রত যুগল-ক্রৌঞ্চের একটিকে বধ ক'রে আজ তুই যে পাপ করলি, সেই পাপ তোর প্রতিষ্ঠাকেই বিনষ্ট করল। রে নিষাদ! আজ তুই অভিশপ্ত হলি!

গুরুর মুখে অভূতপূর্ব এক অপূর্ব শ্লোকের আবৃত্তি শুনে বিস্মিত ভরদ্বাজ ভাবছিলেন, কোন্ অন্তরতম জীবনদেবতার কৃপায় বাল্মীকি আজ এমন একটি শ্লোক রচনায় সার্থক হলেন! এক অশ্রুতপূর্ব ছন্দের সুর কার প্রসাদে ঝঙ্কৃত করল দশদিশ! কোন্ কাব্যলক্ষ্মী গুরু বাল্মীকিকে এই অযাচিত সৌভাগ্য দান ক'রে গেলেন! বস্তুত বড়ই বিচিত্র এই ঘটনা।

বাল্মীকি শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে আত্মমুগ্ধভাবে বললেন,—বৎস! এই অপূর্ব

শ্লোক গ্রথিত হোক!

ভরদ্বাজও সেকথাই ভাবছিলেন। তিনি পরম সন্তোষে গুরুর অনুগমন করতে লাগলেন তটিনী তমসার স্বচ্ছনীর লক্ষ্য করে।

এবং তদবধি বিখ্যাত হ'ল বাল্মীকিকৃত সেই শ্লোকচ্ছন্দ ও শ্লোকবদ্ধ পদটি। বাল্মীকি পরিচিত হলেন প্রথম আদি মহাকবি রূপে।

রামায়ণের প্রাক্ কথার এভাবেই শুরু।

আসলে এই কাহিনীটি বাল্মীকি-প্রবর্তিত নবীন শ্লোকচ্ছন্দ ও অপূর্ব কাব্য-রচনারই জন্মবৃত্তান্ত। এ কাহিনীর সঙ্গে বাল্মীকির অনন্যসুলভ কবিত্ব উন্মেষের কথা সংশ্লিষ্ট আছে, নেই রাম-কাহিনীর কোনো সম্পর্ক। কিন্তু রামায়ণ কথাকাব্যের মধ্যে কৌশলে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে সংযুক্ত ক'রে দিয়েছেন কোনো বুদ্ধিমান পুরাণকার, যাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহাকবি বাল্মীকির ওপরে আর্য দেবায়তনের মহামন্ত্রী ব্রহ্মার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

কাব্য সংসারে কবি স্বয়ং স্রষ্টা। তাঁকে বলা হয়েছে স্বরাজ্যের প্রজাপতি তিনি। কিন্তু দেবস্তাবক পুরাণকারের পছন্দ নয় ব্রহ্মাকে অতিক্রম ক'রে মহাকবির প্রতিষ্ঠা হোক। তাই তিনি রামায়ণকথার সঙ্গে নব ছন্দের উৎপত্তিকথাকে একত্র সংশ্লিষ্ট করে ব্রহ্মাকেই বানালেন পরম স্রষ্টা। বললেন, দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা সেই স্মরণীয় ক্ষণে বাল্মীকির আশ্রমে এসে সহাস্যে বলেছিলেন, বৎস! আমারই প্রভাবে তোমার মুখ দিয়ে ঐ শ্লোক উদ্গীত হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সংশয় রেখো না।

ব্রহ্মা যখন বলেছেন, বৎস নিঃসংশয় হও, তখন তা সত্য হোক, মিথ্যা হোক, বাস্তব বা অবাস্তব হোক, আর্য দেবায়তনের শাসনাধীন কারো পক্ষেই সেটি অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাবাদীদের আদেশ ছিল এমনই অমোঘ এবং অবশ্য পাল্য।

ব্রহ্মার এই আত্মস্তুতি প্রকৃতপক্ষে আদৌ উচ্চারিত হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ আছে। তবু বাল্মীকির মতো এতোকাল সবাই তা নির্বিচারে মেনেই এসেছিলাম, কেউ প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পরিণাম শুভ হয় না। তাই আজ বিচারে বসতে হয়েছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, মহাকবির কাব্যোন্মেষের কাহিনী ও রামকাহিনী দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। শেষেরটির সঙ্গে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদিদেবতারা পূর্বাপর যুক্ত আছেন, কিন্তু প্রথমটি বাল্মীকিজীবনে একান্তই আপনার এক নির্জন ঘটনা। সেদিনটি ছিল তাঁর কাব্যজীবনে স্মরণীয় প্রভাত। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন একমাত্র সাক্ষী শিষ্য ভরদ্বাজ।

শ্লোকটি বাল্মীকি আবৃত্তি করেছিলেন স্নান আচমনে যাওয়ার পথে। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করার পর যখন তিনি স্বরচিত শ্লোকটি নিয়ে চিন্তা করছেন ব্রহ্মার পদার্পণ ঘটেছে সেই প্রলম্ব বিরতির পরে। ব্রহ্মা যখন এলেন তখন বাল্মীকি আশ্রমপাদে শিষ্যগণের সঙ্গে তদ্বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, "উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ" অবস্থায়। ব্রহ্মা সেই বিতর্ককালেই প্রবেশ করেছেন এবং ধরে নেওয়া যায় শ্লোকচ্ছন্দের উৎপত্তি ও শ্লোকরচনা প্রসঙ্গ তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। তাছাড়া ব্রহ্মাকেও ক্রৌঞ্চবধের কাহিনীটি শুনিয়েছেন বাল্মীকি এবং প্রসঙ্গত শ্লোকোৎপত্তির কথাও নিশ্চয় আলোচিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর ব্রহ্মা নিজেকে সর্বজ্ঞ প্রমাণ করার জন্য মৃদু হাস্যে বলেছেন, ব্রহ্মন্! মচ্ছন্দাৎ এব ইয়ং সরস্বতী তে প্রবৃত্তা।

আর্য দেবায়তনপ্রধান ব্রহ্মা যখন বলছেন, আমার ইচ্ছাতেই তোমার দ্বারা এমত শ্লোকসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, তখন বাল্মীকি হেঁটমুণ্ডে ব্রহ্মার সেই আত্মস্তুতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন আপন কৃতিত্বের অস্বীকৃতি সহ্য ক'রেই। কেন না তৎকালে ব্রহ্মা সহ ব্রহ্মাবাদী দেবদ্বিজগণের বাক্য মান্য না করার ফল ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও মারাত্মক। ব্রাহ্মণ বিজেতারা বিজিত ভারতবর্ষের ওপর ফরমান জারি ক'রে বলেছিলেন, কেবলমাত্র বিশ্বাস করো, তর্ক করার দুঃসাহস প্রকাশ কোরো না, প্রশ্নহীন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণেই শ্রেয় লাভ করতে পার, অন্যথায় ভয়াবহ দুর্গতি তোমার ধ্বংস অনিবার্য ক'রে তুলবে। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য শক্তির ফরমানের সামান্যতম প্রতিবাদ যাঁরাই করেছিলেন, ঝাড়ে বংশে তাঁদের সেদিন সাফ ক'রে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সন্ত্রাস। সেই মহাবিনষ্টির ইতিহাসই যদুবংশ ধ্বংসকথা, পাণ্ডবদের রহস্যময় মৃত্যু গাড়োয়াল হিমালয়ের পথে পথে [যে স্থান দেববসতি সুবাদে স্বর্গ আখ্যায় ভূষিত], ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তীর জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দেবশিবির সপ্তর্ষিমণ্ডলে ভয়াল ভয়ঙ্কর মৃত্যু, বাসুদেব কৃষ্ণের নির্জন জীবনাবসান, লক্ষ্মণের সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন, কৃষ্ণপুত্র সাম্বের নির্বাসন।[১]

উপরের আলোচনায় এই ধারণা পরিষ্কার হয়ে আসে যে, বাল্মীকি বিরচিত ক্রৌঞ্চবধ-বিষয়ক শ্লোকটিকে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই রামায়ণের মুখবন্ধে যুক্ত করা হয়েছিল। কবি বাল্মীকির কবিত্ব উন্মেষ হয়েছে ব্রহ্মার অনুগ্রহে, এমনই একটি বিশ্বাস আমাদের ভাবলোকে প্রথম থেকেই চাপিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টা যে কত কষ্টকল্পিত,

১. লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ঘটনাবলী কত খাপছাড়া, তাও আমরা দেখলাম এবং রামকাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ক্রমশ আমাদের এই বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে। মনে রাখতে হবে, বাল্মীকি ছিলেন তৎকালে এক প্রতিষ্ঠিত কবি। আর্য পুরাণ রচনার প্রয়োজনে নারদ এবং ব্রহ্মা সেই প্রখ্যাত কবির আশ্রমে পদার্পণ ক'রে তাঁকে রামকাহিনী রচনার আদেশ দেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা কথা

ব্রহ্মাকে নিয়ে ঢের অলৌকিক গল্প তৈরী করেছেন পুরাণ কথকরা। মানুষকে তাঁরা বিশ্বাস করতে বলেছেন, ব্রহ্মাই জীব জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তিনিই মনু আদি মনুষ্যগণ, দেবদ্বিজ দানব রাক্ষস, নাগ গন্ধর্ব, বানর ভল্লুক কুক্কুর প্রমুখ পৌরাণিক জাতি ও টোটেমী প্রজাতিবর্গের আদি জন্মদাতা। কিন্তু মিথ্যা সেই পুরাকথার বিশ্লেষণে আবিষ্কার করেছি আমরা আশ্চর্য গূঢ়তত্ত্ব। দেখেছি, ব্রহ্মা নামক সে পুরুষের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে আজ থেকে মাত্র হাজার তিনেক বছর আগে, এবং তাঁর আগমনের আগেই হিমালয় নামক পৃথিবীর অর্বাচীনতম বিশাল পার্বত্যলোক সহ ভারতের সকল স্থানে বিভিন্ন জাতির প্রতিষ্ঠা ছিল। ছিলেন না কিন্তু আর্যদেবতা ব্রহ্মা বেদ উপনিষদের আমলে। তাঁর দেখা পাওয়া গেছে হাল পৌরাণিক আমলে। আর সে কারণেই তিনি কোনোরূপ স্রষ্টা পদ দাবী করতে পারেন না। আর্য উপনিবেশ গঠনকালের প্রাগামলে তিনি যদিবা প্রজাপতি অর্থাৎ আর্য উপনিবেশের প্রজাগণের প্রভু রূপে মান্য ছিলেন, ক্রমশ অপরাপর দেবতার উত্থানে তাঁকে সেই পদটিও হারাতে হয়। ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে ব্রহ্মা কেবলমাত্র অঙ্গুলীমেয় কয়েকটি স্থানে পূজা লাভের সুযোগ পান। এ হেন ব্রহ্মাকেই পুরাণকার যখন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বেশ্বর সাজিয়ে তার প্রচার শুরু করেন, তখন কাজে কাজেই আমাদের বসতে হয় বিচার-বিতর্কে, ভাঙতে হয় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, কুড়োতে হয় পরম আত্ম-সমর্পিত, তর্কে অপারঙ্গম, পাপ পুণ্য ভয় ভীত পাঠকদের অভিশাপ।

কিন্তু আমি নিরুপায়। কেননা শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ মান্য করেই পৌরাণিক মিথ্যা ভাষণের আমি প্রতিবাদী। আমার পালনীয় একমাত্র শাস্ত্রীয় নির্দেশ একটিই, তা হল :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিনির্ণয়।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

তাই কোনো গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেই অন্ধভাবে যুক্তিহীন পুরাকথা মান্য ক'রে পুণ্য লাভের সুলভ প্রয়াস আমার শ্রেয় প্রেয় নয়। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের [এক্ষেত্রে সত্যের] হানি হয় এটাই যথার্থ বলে মানি।

গ্রন্থান্তরে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি [পাদটীকা ১ দ্রঃ] আজ থেকে হাজার তিনেক বছর আগে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাগকালে ব্রহ্মা খেতাবধারী [একই পদবি নিয়ে যুগে যুগে একাধিক ব্রহ্মার আগমন ঘটেছে, ব্রহ্মা কারও বিশিষ্ট নাম নয়, পদাধিকারের নাম মাত্র] এক পুরুষ একটি উড়ন্ত হিরণ্য অণ্ডে চেপে আরব সাগরে এসে পতিত হন। পরে উপযুক্ত সময়কাল সেই ভাসমান ডিম্বমধ্যে অবস্থানের পর অনুকূল পরিবেশ স্থাপন ক'রে সবান্ধবে নেমে আসেন ভারতবর্ষের মাটিতে। সমতল ভূভাগ থেকে অতঃপর তাঁরা হিমালয়ের গন্ধমাদন [গাড়োয়াল] নামক পর্বতের বিশেষ স্থানে [কেদারবদ্রী গঙ্গোত্রী সন্নিহিত অঞ্চলে] শিবির স্থাপন করে সুরক্ষিত গড় শিবির গড়ে তোলেন। ক্রমশ পার্বত্য প্রদেশে এই দেবতারা প্রভাব প্রসারিত করতে শুরু করেন ও দখল করে নেন শিবালিক পর্বতের পাদভূমি হৃষিকেশ হরিদ্বার কনখল ভুক্ত অঞ্চলগুলি। দেবশিবির ভুক্ত কেদারবদ্রী অঞ্চলে ক্রমোত্তরণের পথগুলি দেব-অধিকৃত স্বর্গ নরক নামে খ্যাত হয়। বদ্রীনাথের নর ও নারায়ণ পর্বতের নারায়ণ অঞ্চলটি আজও স্বর্গলোক এবং নর পর্বত অঞ্চলটি মর্ত্য নামে স্থানীয় পাণ্ডাদের দ্বারা অভিহিত হয়ে আসছে। তাঁরা বলেন, অলকানন্দার পুল পার হয়ে যে পর্বতে বদ্রীনাথ মন্দির সেটিই "স্বর্গ"। বলা বাহুল্য, আজ যেমন যন্ত্রযানে চেপে ঐ স্বর্গলোকের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পর্যটকরা ও পুণ্যার্থীরা অনায়াসেই বেড়িয়ে আসতে পারেন, সেদিনও তেমনি বিভিন্ন যানপথে বিভিন্নভাবে ও বিমানে সেই পার্বত্যলোকে যাতায়াত করা যেত। দেবতাদের সংরক্ষিত সেই দেবলোক এই সব পথেই সমতল ভারতীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা বারম্বার আক্রান্ত হয়েছিল। রাবণ মহিষাসুর প্রমুখেরা দেবতাদের জয় করে অসংখ্য দেবসৈন্য বধ করে স্বর্গলোক অধিকার করেছেন এবং দেবতাদের রাজখেতাব ইন্দ্রপদ অধিকার করে বসেছেন মর্ত্যবাসী রাজারাও। মানুষ মহিষাসুরেরা বিশেষ বিশেষ সময় সেই ইন্দ্রপদ অধিকার করে দেবলোকে ইন্দ্র হয়েছেন। ইন্দ্রপদে আসীন দেবসমাজের ব্রাহ্মণরা উৎখাত হয়েছেন বহুবার। কুরুক্ষেত্র আমলে ইন্দ্র-পদাধিকারী দেবতা ছিলেন পুরন্দর বা নগর ধ্বংসকারী এক ব্রাহ্মণ। প্রত্যেক দেবনেতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগত পরিচয় বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি, 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বইটিতে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তিতে বিরত রইলাম। ব্রহ্মার পার্থিব স্বরূপটিও সেখানেই জ্ঞাতব্য।

এখানে বলি, ব্রহ্মা কোনো দিব্য অলৌকিক অপার্থিব পদার্থ ছিলেন না। ছিলেন উচ্চতম পদাধিকারী অন্যতম এক নরাকার দেবনেতা মাত্র। তাই তাঁর ভাবমূর্তি রচনাকল্পে কষ্টকল্পিত ও স্বেচ্ছা-আয়োজিত পুরাণ-প্রয়াস যেমনই ঘটে থাক, বিনা প্রশ্নে তা আমাদের অবশ্যমান্য নয়। সুতরাং আমরা বুঝলাম, যে রীতিতে ফন্দিবাজ আশ্রমাধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন আধুনিক সাধুবাবারা ভক্তবৃন্দকে ধর্ম-শরবিদ্ধ ক'রে মন্ত্রমুগ্ধ করেন এবং বলেন সবই তাঁদের অলৌকিক যোগবলে ঘটমান, ঐ বৃদ্ধ ধর্মগুরু ব্রহ্মাও তদ্রূপ স্বকীর্তি জাহির করে গেলেন।

নারদ এসেছিলেন বাল্মীকিকে রামকথা শোনাতে। বাল্মীকি তাঁর কাছে আনু-পূর্বিক রামজীবন কথা শ্রবণ করেন। বলে রাখা ভালো, এই জীবনোপাখ্যানে যেমন ছিল রাম রাজত্বের কিছু প্রকৃত সংবাদ ও ইতিহাস তেমনিই ছিল তা আর্য সন্ত্রাস-বাদীদের অত্যাচার ও হিংস্রতা-অবলোপকারী অজস্র মিথ্যাভাষণে ভারাক্রান্ত। তাই দেখি, বালকাণ্ডের প্রথম সর্গটি সত্যমিথ্যায় ভরা রামায়ণ কথার চুম্বক।

নারদ প্রতিগমন করলে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা নারদ-কথিত পুরাণ [পুরাকথা] অবলম্বন ক'রে বাল্মীকিকে একটি মহাকাব্য রচনার আদেশ দিয়ে বলেন,—হে ধীমান! নারদের কাছে যেমন শুনেছ সেইমত তুমি একটি রামজীবন কথা প্রণয়ন করো। যা শোনোনি, তাও ক্রমশ জানতে পারবে। শ্লোকবদ্ধ আকারে তুমি সেই ইতিবৃত্ত রচনা করে যশস্বী হও। বললেন, যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি। কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং।

ব্রহ্মা বিদায় নিলে মহাকবি বাল্মীকি স্থির করলেন তিনি শ্লোকচ্ছন্দেই সমগ্র রামায়ণ রচনা করবেন। কাব্যটি হবে সুন্দরভাবে শ্লোকবিন্যস্ত, সমাস সন্ধি অলংকার মণ্ডিত।

এটিই হ'ল রামায়ণের মুখবন্ধ। লক্ষণীয় এই যে, এতো কথা বলা হলেও স্পষ্টত একবারও বলা হয়নি যে, ক্রৌঞ্চ বিষয়ক শ্লোকটি রামায়ণের মুখবন্ধ। বলা হয়নি ক্রৌঞ্চ কথাটি রামকথার কোনোও রূপকচুম্বক। তবু মূলকে অস্বীকার করে অধিক-তর একটি গল্প প্রচলিত ও প্রখ্যাত হয়ে গেল। গল্পটি বলে, ঐ ক্রৌঞ্চই হ'ল রাম-সীতার মিথুন বিলাসের প্রতীক এবং নিষাদটি হলেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান কাহিনীটি পাঠের পর পাঠক স্পষ্টতই উপলব্ধি করবেন যে, ক্রৌঞ্চবধের এই শ্লোকের সঙ্গে রামকথার কোনই সংযোগ নেই। রামসীতার দাক্ষিণাত্য যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। মিথুনক্রীড়ারত রামসীতাকে রাবণ বিচ্ছিন্ন করেননি, যদি কেউ তা ক'রে থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পরিকল্পনায় সীতাহরণ-

পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে এক রহস্যময় রোমহর্ষক কাহিনী যা আমরা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এই গ্রন্থে।

বাল্মীকি ও রত্নাকর

পুরাণ মানে পুরাতন কথা। পুরাতন কথাই একটি জাতির পুরা ইতিবৃত্ত। সেই কথার মধ্যে যুগে যুগে নানান জনশ্রুতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ইতিবৃত্তের সূত্রে ইতিহাসের ধারাও সমান বহমান থাকে। নানান ভেজাল প্রক্ষেপের আস্তরণ সরিয়ে আবিষ্কার করতে হয় ইতিহাসের মূলসূত্র।

রামায়ণ নিছক কাব্য না ইতিহাস সে আলোচনা যথা সময়ে। এখানে বলতে পারি বাল্মীকি যে নিছক কোনো কল্পিত পুরুষ নন সেটা রামায়ণ কাব্যের অস্তিত্ব দ্বারাই প্রমাণিত। অর্থাৎ রামায়ণকাব্যের কবি অবশ্যই একজন ছিলেন। তিনি যেই হোন, মূল কাব্যের সেই মহান রচয়িতাকে আমরা মহাকবি বাল্মীকি নামেই জেনে আসছি। যদি রামায়ণ কাব্যটি নিরবয়ব না হয়, তবে বাল্মীকিও সশরীরেই বর্তমান ছিলেন এ বিষয়ে তর্ক নিরর্থক।

তর্কের অবকাশ ঘটে মূলের বিকৃতি ঘটলে। ইতিহাস কোনো কালেই অবশ্য অবিকৃত থাকে না। কোনো যুগেই সে যুগের অবিকৃত ইতিহাস রচিত ও প্রাপ্তব্য নয়। তা আগেও হয়নি, আজও হচ্ছে না। কারণ, যখনই যিনি অথবা যে বংশ ক্ষমতায় থাকেন, পুরাণ বা ইতিহাস তখন তাঁর অথবা সেই ক্ষমতাধীশ বংশের গুন-কীর্তনকারী মিথ্যাভাষণের বিকৃত স্তূপে পরিণত হয়। যশ-পুরস্কারলোভী বুদ্ধিজীবীরা সেই বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের আখের গোছান। ক্ষমতাধীশের শত্রুপক্ষ এবং সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রকৃত কীর্তি গায়েব হয়ে যায়, ফলে জাতীয় ইতিহাস সর্বযুগেই গদীনসীনের কীর্তিঘোষক পুরাণে পর্যবসিত থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রন্থাদির মধ্যে একটি জাতির পুরাকথার বিভিন্ন সূত্র পাওয়া যায়। প্রকৃত ঐতিহাসিক পরবর্তী কালে আলোচ্য সময়ের সকল পুঁথিপত্র দলিলদস্তাবেজ পুরাণ জনশ্রুতি খুঁটে খুঁটে নিপুণ গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন বিগত যুগের সত্য কাহিনী বা ইতিহাস।

পৌরাণিক আমলের ইতিহাস আজও রয়ে গেছে গবেষকের গ্রন্থাগারে, অনাবিষ্কৃত কোনো ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষে, বিভিন্ন প্রচলিত জনশ্রুতির মধ্যে। বাল্মীকি এবং তাঁর কাব্যাতিহাসটির আলোচনায় কাজে কাজেই আমাদের বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের

সম্মুখীন হতে হয়, যেগুলির বিশ্বাসযোগ্য সমাধান ব্যতীত পুরাকথার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। বিশেষত আমাদের বিশ্বাসে ও আবহমানের কথকতা-সূত্রে যে সব সংশ্লিষ্ট কাহিনী প্রচলিত আছে, সেইসব প্রতীতির গ্রহণ খণ্ডন ছাড়া পুরাকথা আলোচনায় অগ্রসর হওয়া বৃথা।

বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাভারত রামায়ণ পাঠ করে জেনেছি, ব্রহ্মা শ্বেতাবধারী এক আর্য নেতা পৌরাণিক আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনে যথার্থই একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্ত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত সেই পটপরিবর্তন যদি মান্য হয়, যদি কথিত রাজ্যপাট, পথ প্রান্তরের হদিস মিলে থাকে, যদি ভারত-তাত্ত্বিকরা বহু পরিশ্রমে সেসব তথ্য আহরণ কেবলমাত্র পণ্ডিতী খেলাচ্ছলে করে গিয়ে না থাকেন, তবে সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে অবশ্যই যে রাষ্ট্র নেতাদের হাত ছিল, তাঁদেরই অন্যতম কীর্তিমান এক পুরুষ ছিলেন আর্যনেতৃবর্গের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিক, ব্রহ্মা, কেননা তৎকালীয় পৌরাণিক সকল গ্রন্থাদিতে তাঁর নাম ও কীর্তির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্রহ্মাই বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে রামকথা রচনার আদেশ দেন। বাল্মীকি হন আর্য বিজেতাদের দ্বারা নিযুক্ত এক বুদ্ধিজীবী ইতিহাস প্রণেতা।

বাল্মীকিকে নিয়ে একটি গণ্ডগোল ঘটিয়ে গেছেন কিন্তু পরবর্তী এক রূপকথাকার বাল্মীকির আসল পরিচয়ে সংশয় সৃষ্টি করে। রামায়ণের কথারম্ভে সেজন্যই সেকথা আলোচ্য হয়ে ওঠে।

আমরা আশৈশব শুনে আসছি কথাটা। শুনেছি, রাম না হ'তেই হয়েছিল রামায়ণ কাব্যের সৃষ্টি অলৌকিক উপায়ে। সে কাব্যের স্রষ্টা জনৈক বাল্মীকি ছিলেন প্রথম জীবনে এক ঘৃণ্য ঠ্যাঙাড়ে দস্যু। নাম, রত্নাকর।

শুনেছি, বনবাদাড়ে লোক ঠেঙিয়ে পরস্বাপহরণ করে রত্নাকর তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। রত্নাকরের জীবনে তাই হঠাৎ ঘটে গেল এক দৈব ঘটনা। দস্যু হলেন মহাকবি। রচিত হ'ল জগদীশ্বরের অবতার লীলাকথা, রামায়ণ।

বলে দিতে হয় না এই আষাঢ়ে উপন্যাসটির রচয়িতার নাম। তিনি বাঙালীর ঘরে ঘরে পূজিত, কবি কৃত্তিবাস। বাঙালী পাঠক পাঠিকা কদাচিৎ বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত। অধিকাংশ আমরা যে রামকথা শুনেছি বা পড়েছি, সেটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ। রামভক্ত হনুমানের মতোই কৃত্তিবাস তুলসীদাসরা এক সামান্য ক্ষত্রিয় রাজাকে জগদীশ্বর বানাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন বহু স্তুতি ও অবিশ্বাস্য

সব গল্পকথা। রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি তৈরীর উদ্দেশ্যে কৃত্তিবাস শুধু যে উৎসকথা বাল্মীকি রামায়ণেরই বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাই নয়, তিনি স্বয়ং বাল্মীকির পরিচিতিতেই কালিমা লেপন ক'রে নির্দ্বিধায় সেই মহাকবিকে বানিয়ে গেছেন একটি ঠ্যাঙাড়ে দস্যু। কৃত্তিবাসের সাজানো গল্পকথাই আমরা মাথায় করে নিয়েছি। দস্যু রত্নাকরকে নিয়ে গল্প নাটক যাত্রার আসর সাজিয়েছি, অবিচার করেছি আমাদের আদি জাতীয় কবি ও ইতিহাসকারের প্রতি।

রত্নাকরের গল্পটি শুনেছি আমরা এই ভাবে :

ঠ্যাঙাড়ে রত্নাকর একদিন শিকারের আশায় ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সহ নারদ সেই পথে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীও হলেন রত্নাকরের হাতে। ব্রহ্মা অবশ্য স্বেচ্ছায় সেই বন্দিত্ব স্বীকার করলেন, কেননা তিনি তো রত্নাকরের কাছে এসেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে।

ব্রহ্মা বললেন, বাপু হে! আমাকে মেরে তুমি এক গুরুতর ব্রহ্মহত্যা পাপ করতে চলেছ। কিন্তু ভেবে দেখো দিকি যাদের জন্য এই পাপের বোঝা বহন করছ তুমি, তারা কি তোমার পাপের অংশভাগী হতে রাজি হবে?

একজন সামান্য দস্যুকে ভাবাবার মত একটি প্রশ্নই বটে! যাই হোক গল্প যিনি গড়েছেন ঘটনা তাঁরই ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে বাধ্য। অতএব রত্নাকর ব্রহ্মাকে বেঁধে রেখে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেন তাঁর পর্ণ কুটীরে। প্রশ্নটি শুনে দস্যুর পিতা মাতা এবং স্ত্রী একে একে সবাই বললেন, তুমি আমাদের ভরণপোষণে অঙ্গীকৃত। এ কাজ তুমি যেভাবেই কর না কেন, আমরা তার ফলভাগী হতে যাব কোন্ যুক্তিতে? তোমার পুণ্যতেই আমাদের অধিকার, পাপের বোঝা আমরা বহন করতে বাধ্য নই।

এতোবড় একটি দার্শনিক প্রশ্নের অনায়াস সমাধান হয়ে গেল কৃত্তিবাসের কবিরিচ্ছায়। দস্যু এসে কেঁদে পড়লেন ব্রহ্মার পাদপদ্মে। বললেন, প্রভু, উদ্ধার করো। ব্রহ্মা তো উদ্ধার করতেই এসেছেন। অভয় দিয়ে বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রাম নাম জপ কর তুই। যশস্বী হবি। রত্নাকর বসে গেলেন নাম জপে। কিন্তু কবি বড় সতর্ক ঠাকুর। প্রথমেই রত্নাকরের মুখ দিয়ে পবিত্র 'রাম' নাম উচ্চারিত হ'তে দিলেন না। তাঁর মনে হ'ল, এক ব্যাটা দস্যু যদি হাঁ করা মাত্র 'রাম' নাম উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে সেই নামের আর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বজায় থাকে কি ক'রে? সুতরাং খুব বুদ্ধি করে তিনি আরও একটি গল্প সাজালেন। বললেন, অত সহজেই কি জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করতে পারে একটা খুনী দস্যু। পাকা বাট

হাজার বছর জপ ক'রে তবেই তার জিভে সেই পবিত্র নামটি সড়গড় হয়েছিল। প্রথমে 'মরা' 'মরা' জপ করতে করতে ফট করে প্রস্ফুটিত বুদ্‌বুদের মতো বেরিয়ে এলো ঠ্যাঙাড়ে মুখে 'রাম' নাম। অমনি মরা হ'ল ধরা। রত্নাকর রূপান্তরিত হলেন মহর্ষি বাল্মীকিতে। শুরু করলেন মহাকাব্য রামায়ণ, যেটি জগদীশ্বরের লীলাকাহিনী। শুনে বুদ্ধিমান নেতাকুল আকুল হয়ে যুগ যুগ কাঁদলেন। নিজের ঠাকুর্দার বাপের নাম যাঁরা জানেন না, তাঁরা জগদীশ্বরের বৃদ্ধ প্রপিতামহদেরও নাম কীর্তি শুনে ভক্তিতে একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

কুক্ষণে ভক্তি নামক পদার্থটি কম থাকায় আমার প্রশ্ন, রামায়ণ রচনার জন্য কৃত্তিবাসের পরিচিত ব্রহ্মাকে অত কসরৎ করতে হ'ল কেন? নারদকে খুঁজতে হ'ল কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চুঁড়ে একজন উপযুক্ত মানুষ বনে-বাদাড়ে? বানাতে হ'ল কেন একজন দস্যুকে মহাকবি? আর্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কি প্রতিভার দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল? কৃত্তিবাস যে উৎস-গ্রন্থ বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন সেখানে তো রামায়ণ রচয়িতার সম্পূর্ণ পরিচয়ই লিখিত ছিল। তবে এই উদ্ভট ঠ্যাঙাড়ে কাহিনীর অবতারণা কিসের জন্য?

কৃত্তিবাসের মনে হয়েছিল, তৈরী এক মহাকবির পক্ষে রামায়ণ রচনার মধ্যে আর বাহাদুরী কি? বরং জগদীশ্বরের প্রসাদে যদি মূর্খ ঠ্যাঙাড়ে মহাকবিতে পরিণত হয়ে বিধাতার বিধিলিপি রচনা করেছেন বলে গল্প সাজানো যায়, তবে সেই অলৌকিক রূপকথা অলৌকিকতাগুণেই অধিকতর মাহাত্ম্য লাভ করবে। মানুষ ভাববে, বটেই তো, ষাট হাজার বছর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ না করলে কে কবে বিধাতার বিধিলিপি লিখতে পারে? এসব ব্যাপার তো ছেলেখেলা নয়।

তা না হোক, কৃত্তিবাস কিন্তু নিতান্তই ছেলেমানুষী করলেন। মূল রামায়ণ গ্রন্থটি বর্তমান থাকায় কৃত্তিবাস রচিত উপন্যাসটি বিদ্বান গবেষক মহলে গ্রাহ্য হ'ল না। খোঁজ শুরু হ'ল বাল্মীকির প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানালেন, চ্যবন ঋষির মতো বাল্মীকিও ছিলেন ভৃগু বংশজাত। সম্ভবত তিনি চ্যবনেরই উত্তরসূরী।[১]

১. "Valmiki was a descendant of sage Bhrigu like Cyavana and it was not unlikely he was a descendant of Cyavana."—'The Ramayana: Its Character, Hist., Expansion & exodus'—Dr. S. K. Chatterjee.

পৌরাণিক তথ্য, বাল্মীকি ছিলেন স্বয়ং দেবনেতা বরুণের ঔরসজাত সন্তান। তিনি রাজা দশরথের সমসাময়িক ভৃগুবংশীয় আর্য ব্রাহ্মণ। তাঁর কবিখ্যাতিও সম্প্রচারিত ছিল। সেই খ্যাতি শুনেই ব্রহ্মা স্বয়ং আসেন তাঁকে রামায়ণ রচনার ভার অর্পণ করতে।

রামায়ণটি আর্য সাম্রাজ্যবাদীদের দাক্ষিণাত্যে ও সাগরপারে দক্ষিণী দ্বীপ লঙ্কা বিজয়ের কাব্যাকার ইতিকথা। এর সঙ্গে বিধাতার জন্মকীর্তির কোনো সম্পর্ক নেই। তবে পৌরাণিক আমলে রাজা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়কে জগৎ স্রষ্টার সমকক্ষ ক'রে তোলা হ'ত। সকল পুরাণ সেভাবেই রচিত। সেই রীতিতে ইতিকথার সঙ্গে রূপকথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রামকাহিনী-কথকরা পরবর্তী কালে রাজা রামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার এবং কালক্রমে স্বয়ং ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলোচনাসূত্রে আমরা আরও জানতে পারব অবতার পদে রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় ঢের পরবর্তী আমলে যখন রাম বা রামরাজত্বের চিহ্নমাত্রও কোথাও অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং কৃত্তিবাসের গল্পটি নিছকই গল্পকথা। তাছাড়া রামচন্দ্রের আগে নয়, অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রের অভিষেকের পরেই রামায়ণ কাব্য লিখিত হয়। বাল্মীকি রামায়ণেই এই স্বীকৃতি আছে :

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥

মূল রামায়ণ লিখিত হয়েছিল চব্বিশ হাজার শ্লোকে। কাব্যটি বিভক্ত ছিল পাঁচশ সর্গে ও ছটি কাণ্ডে। বলা হয়েছে, পরে মূলের সঙ্গে উত্তর কাণ্ডটি সংযুক্ত হয় :

চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষটকাণ্ডানি তথোত্তরম্॥

দেখা যাচ্ছে, বাল্মীকি প্রথমাবধিই ছিলেন কবি-প্রতিভাধর ব্যক্তি। রামায়ণ রচনার সময় তিনি একটি সুললিত নব ছন্দের প্রবর্তন করেন। তাঁর সেই কাব্যোন্মেষের ক্ষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে ক্রৌঞ্চবধের ঘটনায়, কেননা সেই ঘটনাটি তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিলে তাঁর মধ্যে নবছন্দের সুরমূর্ছনা উৎসারিত হয়। ক্রৌঞ্চকাহিনীটিকে পরবর্তী কথকরা ইচ্ছেমত গল্প গড়ে রাম-রাবণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে যেমন যুক্ত করেন তেমনই অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ ক'রে কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকিকে বানিয়ে দেন দস্যু রত্নাকর। এ সবের পেছনে ছিল একটিইমাত্র উদ্দেশ্য। তা হ'ল, রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি গড়া।

কিন্তু কৃত্তিবাস এমন দুঃসাহস কোন্ সূত্রে অর্জন করলেন এ প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক।

উত্তরে মনগড়া কিছু বলব না। স্মরণ করব বাল্মীকি সম্পর্কে পুরাণকারদের কিছু অপকীর্তি। আচার্য স্বনীতিকুমার গবেষণাসূত্রে দেখেছেন, স্কন্দ পুরাণ মতে বাল্মীকির শৈশব ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছিল অরণ্যবাসী অনার্য 'কিরাত' সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁকে কালক্রমে আর্য শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ হতে হয়। বলাই বাহুল্য, স্কন্দ পুরাণ ঢের পরবর্তী রচনা এবং বাল্মীকির এই গল্পটি কাজে কাজেই পরবর্তী প্রক্ষেপ মাত্র।[২]

আচার্য আরও লিখেছেন: আদি পুরাণে বাল্মীকি কেবলমাত্র ঋষিরূপেই পরিচিত। তাঁর 'রত্নাকর' নাম অথবা নারদের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর রূপান্তরের কাহিনীটি পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত গল্পমাত্র।[৩]

অবশ্য ভক্ত কবি কৃত্তিবাসকে লৈখিক স্বাধীনতা গ্রহণের জন্য ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না, কারণ তিনি একের বেশিবার স্বীকার করেছেন যে সবকথা তিনি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেননি, তাঁর কাহিনীর উৎস উৎসারিত হয়েছে বিভিন্ন রামকথা রচয়িতাদের গ্রন্থাদি থেকে। একটি উদ্ধৃতি:

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি বচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥

কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি

বাল্মীকি রামায়ণে পুরাকথার আদিসূত্র যতদূর বিশ্বাসযোগ্য, কৃত্তিবাসের পল্লব-গ্রাহিতা কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার কথঞ্চিৎও রক্ষা করতে পারেনি। পারা সম্ভবও

২. "Valmiki…was declared (as in the Skanda Puranam) that he passed his early years—his childhood and youth—among *Kiratas* or forest dwelling primitive non-Aryans, and so he had missed acquiring Aryan Culture and ways to which he was born. He had to be converted to Brahman ways. All these are late stories."—Ibid.

৩. "Valmiki was known in earlier literature only by his name, as a *Risi*. The story of his having been a *Bhrigu* and by name, *Ratnakara*, his conversion by the Divine Sage *Narada*… would all appear to be later additions."—*Ibid*.

নয়। যেখান থেকে যে গল্প যতটুকু গ্রহণ করলে রাম ও রামানুগত সম্প্রদায়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল অলৌকিকতা লাভ করতে পারে বলে কবি মনে করেছেন, ঠিক ততখানিই তিনি তাঁর কাব্যকথার উপজীব্য রূপে বেছে নিয়েছিলেন। বাল্মীকি প্রণীত ইতিকথা এভাবেই ভক্তিমূলক রামাবতার সৃজনকারী কাব্য পুরাণে রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছিল। এসব কাণ্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রামায়ণের সাধারণ চরিত্র। রামকথাকে তার পুরাতনী প্রেক্ষাপটে রেখে যিনি রামায়ণ জানতে ইচ্ছুক, কৃত্তিবাসী রামায়ণগুলির প্রভাব থেকে প্রথমেই তাঁর ভাবমুক্তি প্রয়োজন। অন্যথা রামকথার ইতিকথা তাঁর অজানাই থেকে যাবে।

কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহিতা এবং প্রক্ষিপ্ত রচনার বাহুল্যের জন্যই যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপ্রামাণিকতা-দোষ-দুষ্ট তাই নয়, স্বয়ং কৃত্তিবাসের অস্তিত্ব নিয়েও সন্দেহের পূর্ণ নিরসন এখনও হয়নি! কৃত্তিবাসী রামায়ণকে আজ আমরা যেভাবে পাই কৃত্তিবাস নামীয় কোনো বিশিষ্ট একজন কবি যে সেভাবেই সে পুঁথি তাঁর গুণ-গ্রাহীদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, গবেষণাসূত্রে তেমন প্রমাণ মেলেনি। বিভিন্ন পণ্ডিতের ধারণা, বাংলা পদ্যে রচিত বাজার প্রচলিত যে রামায়ণগুলি কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত, সেগুলির একটি ছত্রও কৃত্তিবাসের নিজের রচনা নয়। চেষ্টা হয়েছিল প্রক্ষেপারণ্য থেকে কৃত্তিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ একাজে নিযুক্ত করেছিলেন ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। বিশেষ বিবাচনের পর অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড অংশ পরিষদ প্রকাশও করেন, কিন্তু সে দুটির প্রামাণিকতাও স্বীকৃতি লাভ করেনি পণ্ডিত মহলে।

ওদিকে কিন্তু বাল্মীকির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অনেকাংশেই নিরসন হয়ে আসছে। কিন্তু "গবেষণার ফলে স্বয়ং কবির [কৃত্তিবাসের] অস্তিত্ব সম্বন্ধে [আজও] সন্দেহ জাগ্রত হয়ে থাকে।[১]"

একথা ঠিকই যে মূল বাল্মীকি রামায়ণেও প্রক্ষিপ্ত রচনাংশের অভাব নেই। অনেকের মতে বাল ও উত্তরকাণ্ড দুটিই প্রক্ষিপ্ত। তত্রাচ বাল্মীকি রামায়ণে বাস্তব তথ্যবাহুল্য এবং ইতিহাসের ধারা সহজেই লক্ষণীয় এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছাই করাও সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ।

রামাবতার সৃষ্টির প্রয়াস বাল্মীকি পরবর্তী রামায়ণগুলির মধ্যেই প্রকট হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা মাত্র। রামাবতার প্রসঙ্গে এ আলোচনা

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা / ভূদেব চৌধুরী।

পুনরুত্থাপিত হবে। এখানে বলে রাখতে চাই, কৃত্তিবাস তুলসীদাসদের নামীয় ভক্তিমূলক রামগীতি যথার্থ রামায়ণ নয় এবং সেজন্যই আমাদেরও প্রয়োজন নেই সেসব রসামৃত পানের। আমরা পুরাণেতিহাসের সন্ধানে রামকথার মধ্যে প্রবেশে প্রয়াসী। সে চেষ্টা বাল্মীকি যুগে ফিরে গিয়েই করতে হবে। সেখানেই তার সোনার কাঠি লুকিয়ে আছে আশ্চর্য অলঙ্কৃত কথাকাব্যাগারে।

হোমার ও বাল্মীকি

কোনো জাতির জীবনে বিশেষ সময়কালের উত্থান পতনের কাহিনী পরিবেশনার দায়িত্ব খৃষ্টীয় শতকের আগে যে সব বুদ্ধিজীবী পুরাকথাকারদের ওপর অর্পিত ছিল, তাঁরা কোনো একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, কোনো একজন রাজা অথবা রাজা-বানানোর-রাজা [কিং মেকার] দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে সেই ইতিহাস রচনা করতেন কাব্যাকারে ছন্দবদ্ধ শ্লোক পদ সৃষ্টি ক'রে। দেশে দেশে সমকালীন ও তৎপূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস অতঃপর গেয়ে বেড়াতেন চারণ কবিরা। গাওনা ক'রে ইতিহাস শোনানোর প্রয়োজনেই ইতিকথাকে সুরে ছন্দে বাঁধতে হ'ত। কথকতার জন্য রচনা করতে হ'ত সাধারণ্যে তৃপ্তিদায়ক কিছু ঘটনা ও কাহিনী যে অনুপুঙ্খ রচনার ফলে মূলকথায় প্রবেশ করত প্রক্ষিপ্ত কথকতা এবং সেগুলি প্রায়শই হ'ত মূল থেকে সংস্রবহীন কিছু গল্পগাছা। সেসব গল্প ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে ক্রমশই স্ফীতি লাভ করতে করতে ইতিহাসটুকুকেই আবৃত ক'রে ফেলত ধ্বংসস্তূপের ওপর মাটির আস্তরণ বিন্যাসের মতোই।

এই রীতি মহাকাব্য ও পুরাণ ইতিহাসকে কালক্রমে গ্রাস ক'রে ইতিকথার রূপ পাল্টে দিয়ে পরিণত করত সেই কথাকাব্যকে অলৌকিক রূপকথায়। ইতিহাস গেয়ে বেড়ানোর এই রীতি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, প্রচলিত ছিল পৃথিবীর অন্যত্রও।

মহাভারত গাওয়া হয়েছিল রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞ বা সভাস্থলে। যজ্ঞ বলতে সেকালে রাজা দেবতা ব্রাহ্মণ রাজনীতিক মুনি ঋষিদের সভা বোঝাত। এভাবেই রামায়ণ গীত হয় অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজসভায়। অনুরূপ পৃথিবীখ্যাত মহাকাব্য হোমারের ইলিয়াড এবং ওডিসি।

ইলিয়াড ওডিসির উপজীব্যও রাজকাহিনী, তাও যুদ্ধকেন্দ্রিক। কুরুক্ষেত্র এবং লঙ্কা অধিকারের যুদ্ধকাণ্ডে যেমন হিমালয়ে বসবাসকারী দেবতারাই নাটের গুরু;

হোমারের মহাকাব্যে তেমনি মহাযুদ্ধের নেপথ্য পরিচালকরাও দেবতা। তাঁদের স্বর্গলোক ছিল অলিম্পাস পর্বতে। মহাকাব্য পুরাণবর্ণিত ঐসব দেবতারা সকলেই ছিলেন রক্তমাংসের নরাকার মানুষ। বাস করতেন এই পৃথিবীর পর্বতে পর্বতে। দেবতাদের সেই সব গড়দুর্গ প্রাসাদ প্রাকার সমাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলগুলির নাম হয়েছিল স্বর্গ এবং যে অঞ্চল স্বর্গ রাজ্যের বহির্ভূত সেগুলি অভিহিত হ'ত পৃথিবী, মর্ত্যলোক, পাতাল, রসাতল নামে।

মহাভারতে দেখি, যুদ্ধকালীন অবস্থায় এবং পরবর্তী রাজ্য সংস্থাপন কালে দেববাস-ধন্য হিমালয়ের নিতান্ত একটি ক্ষুদ্র অংশ [গাড়োয়াল হিমালয়] স্বর্গ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ্য প্রতিপত্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং বিন্যাস মোটামুটি করায়ত্ত হ'ল, তখন ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রভু দেবতারা স্বর্গের ধারণা পাল্টে দিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণ পাঠে জানা যায়, পাহাড় পর্বত থেকে অকস্মাৎ বিদায় নিলেন কতিপয় দেবনেতা। বিদায়কালে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কিছু পৃথ্বীপুত্রকে এবং তখনই তাঁরা ঘোষণা করলেন, পর্বত পৃথিবীর স্বর্গ বা ভৌম স্বর্গ। আসল স্বর্গ আছে নক্ষত্রলোকের কোনোও অজ্ঞাত স্থানে যেখানে প্রস্থান করলেন দেবনেতারা।

মহাভারতে এই ঘটনা সুস্পষ্ট লিখিত আছে। দেবতারা তাঁদের উড়ন্ত রথে তুলে নিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির যখন জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উত্তর হ'ল, স্বর্গে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, স্বর্গ তো হিমালয়ে তবে আবার কোন্ স্বর্গে এই যাত্রা, তিনি চান না পৃথ্বীলোক ছেড়ে অন্যতর কোনো স্বর্গলোকে যেতে। তখন দেবতারা বললেন, হিমালয়ের দেব-অধিকৃত অঞ্চলটি পৃথিবীর স্বর্গ, আসল স্বর্গলোক নয়। "ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্মিণামালয়া মুনে"।[১] জোর করেই প্রথম পাণ্ডবকে তুলে নিয়ে গেলেন কতিপয় দেবনেতা অনির্দেশের দেশে। এবং যুধিষ্ঠির সেখান থেকে আর কোনো দিনই প্রত্যাবর্তন করলেন না। তাঁর সেই মহাপ্রস্থানের পথই আসল অনির্দিষ্ট স্বর্গলোকের পথ। এভাবে পৃথিবীর অন্যত্রও দেবতারা কোনো অজ্ঞাত স্বর্গলোকে তুলে নিয়ে গেছেন বিভিন্ন পুরাণখ্যাত পয়গম্বরদের।[২] দেবতাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রাধান্য তখন হস্তান্তরিত হয়েছে দেবনিযুক্ত পুরোহিত প্রতিনিধি এবং রাজপ্রতিনিধির হাতে।

১. বিষ্ণুপুরাণম্।

২. লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' এবং 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

এসব ঘটনা সর্বত্রই ঘটেছিল পৌরাণিক আমলে। সুতরাং পুরাণে দেবতাদের কীর্তিও এক বিশেষ যুগে প্রাধান্য পেয়েছে। মহাকাব্যও পুরাকথা এবং সে অর্থে মহাপুরাণ। যুদ্ধ, রাজনীতি, দেবতা দেবরোষ স্বর্গ নরক পাতাল ইত্যাদি যেমন মহাভারত রামায়ণে তেমনিই ইলিয়াড ওডিসিতে মুখ্য আলোচ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। হোমারের কাব্যেও ইন্দ্র বিশ্বকর্মা সদৃশ দেবতারা ছিলেন। দেবতাদের উড়ন্ত বিমান, বর্ম আগ্নেয় অস্ত্রাদির উল্লেখ আছে সেখানেও। আছে দৈত্য রাক্ষস, রাক্ষসী আদি জাতির প্রসঙ্গ। সেখানে দেবপুত্র, ঐন্দ্রজালিক যাদুবিদ্যা এমন কি একটি লাইফ বেল্টের ও স্বয়ংক্রিয় রথ ও রোবটের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। একটি গল্পটি জানায়, ক্যাডামাসকন্যা ইনো, যিনি মানবী থেকে স্বর্গের দেবী পদে উন্নীত হয়েছিলেন, তিনি ভাগ্যবিড়ম্বিত ওডিসিয়াসকে সমুদ্রঝড়ের কবল থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তির জন্য একটি মায়াময় বস্ত্রখণ্ড দেন। বস্ত্রখণ্ডটি ওডিসিয়াসকে কোমরে বেঁধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বাঁচাতে বলেন। বলেন, ঐ মায়াময় বস্তুটির সাহায্যে তিনি জলে ভেসে ভেসে সমুদ্রকূলে গিয়ে পৌছাতে পারবেন। কূলে উঠে বস্তুটি তাঁকে সমুদ্র-বক্ষেই ফেলে দিতে হবে। এ ধরনের একটি বস্তু আমাদের আধুনিক সম্পদের মধ্যে খোঁজ করলে 'লাইফ বেল্টে'র কথাই মনে পড়ে।[৩]

তৎকালীয় পুরাণ রচনার রীতি হোমার বাল্মীকিতে একই রচনাশৈলী অনুসরণ করেছে। অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়কে মহাকবিদ্বয় অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছন্ন করে নিবেদন করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই দেবতারা মনুষ্যাকার জীব। পৃথ্বী মানব মানবীর সঙ্গে দেবতাদের খাওয়া বসা, সভা কূটমন্ত্রণা, ঈর্ষাদ্বন্দ্ব যুদ্ধ এবং যৌন সংসর্গের কথা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, পৃথিবীর অন্যান্য পুরাণ এবং হোমারের কাব্যে পাওয়া যায়। ফলত দেবতাদের অপার্থিব অলৌকিকতা যে কেবলমাত্র তৎকালীন রচনারীতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক মনে হয়।

পৃথিবীর আদি পুরাণে দেবতা রাজা ও পয়গম্বরের কথা যেমন সর্বত্র, দেববাসভূমি স্বর্গলোকও তেমনি পর্বতে পর্বতে। হিমালয় ও অলিম্পাস পৃথ্বীখ্যাত মহাকাব্যগুলির সুবাদে বিখ্যাত। অন্যান্য জাতির পুরাণও তাদের স্বর্গ নির্দিষ্ট করেছে বিভিন্ন পর্বতে। যেমন চৈনিক দেবতার স্বর্গভূমি ছিল কুনলুন পর্বত, হিব্রু দেবতা লর্ড গর্ড পয়গম্বরের সঙ্গে কথা বলতেন তাঁর দেব-আবাস সিনয় পর্বত থেকে, জাপ স্বর্গভূমি ফুজি পর্বত-মালায়। ইণ্ডীয়দের বিশ্বাস, দেবতারা থাকতেন সাস্তা পর্বতে। এ ভাবেই পৌরাণিক

৩. ওডিসি / ক্যালিপসো / ৫ম পর্ব / বঙ্গানুবাদ প্রকাশক, তুলি-কলম

আমলে পর্বতে পর্বতে দেবশিবির স্থাপিত হয়েছিল যেখান থেকে দেবতারা পরিচালনা করতেন তাঁদের অনুগত মানবগোষ্ঠিকে। আক্রমণ করতেন বিরোধীদের। সেই দেবতারাই রামায়ণে, ইলিয়াড ওডিসিতে সকল যুদ্ধের নেপথ্য নায়ক। একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম, হোমারে দেবীদের বেশ প্রাধান্য আছে যা নেই রামায়ণে।

বাল্মীকি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনার অপ্রতুলতা নেই, হোমারের মহাকাব্য দুটিও তেমনি বিভিন্ন চারণকবির রচনার সমাহারে বর্ধিত কলেবর লাভ করেছে বলে গবেষকদের ধারণা।

বাল্মীকি ও হোমার সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষ বিতর্কটি হল, বাল্মীকি রামায়ণ হোমারের মহাকাব্য দ্বারা প্রভাবিত। বিদেশী আলোচকরা ইংরেজ আমলে ব্রিটিশের প্রজা ভারতবাসীর নিজস্ব সম্পদ সহজে স্বীকার করতে পারতেন না। তাঁরা বাসুদেব কৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যেও খৃষ্ট-কাহিনীর প্রভাব খুঁজেছেন একই মনোভাব থেকে। ফলত কিছু ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক প্রভু মহাজনদের মাতব্বর মেনে ভারততত্ত্ব আলোচনার প্রথম যুগে বিদেশী সমালোচকদের ঐসব সিদ্ধান্ত মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিকরা এসব তর্ক অস্বীকার ক'রে ভিন্ন যুক্তি প্রমাণ করতে সার্থক হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, হোমারের কাল খৃষ্টপূর্ব নবম শতকের মাঝামাঝি গণ্য হয়েছে, যখন বাল্মীকিকে স্থাপন করা যাচ্ছে তারও আগে, ১৬০০ থেকে ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। অবশ্য সুনীতিবাবুর মতে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ রচনা শেষ করেন খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের মাঝামাঝি।[৪]

যাইহোক দুই কবির সময়কালের হিসেব নিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজনই নেই। বাল্মীকি রামায়ণে হোমারের প্রভাব সন্ধান শুধুই যে পণ্ডশ্রম, দুই কবির মহাকাব্য পাঠেই তা পরিষ্কার ধরা পড়ে। হোমারের কাব্যে ট্রয় নগরী ধ্বংসের মূল কারণ সুন্দরী হেলেন। রামায়ণে লঙ্কা অধিকারের পরিকল্পনা দেবতাদের সভায় সাব্যস্ত। পরিকল্পনাকারী ছিলেন স্বয়ং দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা। সীতা সেখানে উপলক্ষ মাত্র। সীতাকেও কৌশলে ব্রহ্মাই পাঠান রাবণালয়ে। উদ্দেশ্য ছিল, সেই সুদক্ষ নারী গুপ্তচরের দ্বারা রাবণের অন্তঃপুরে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য, বহুলাংশে সীতা ওরফে দেবতাদের নারী গুপ্তচর বেদবতী সেই ষড়যন্ত্রী পরিকল্পনাটি সফল করে তোলেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে রামকাহিনী বিশ্লেষণ পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য

৪। "Valmiki···completed the *Ram* Story to a time after the middle of 7th century B.C."—The Ramayana : Its character, Hist., Expansion & Exodus / Dr. Suniti Kumar Chatterjee.

রামায়ণী তথ্যের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছে। এখানে বলে রাখি, রামায়ণে হোমারের মহাকাব্যের প্রভাব সন্ধান কষ্টকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইতিহাসের ধারায় রামায়ণ

বাল্মীকি রামায়ণ প্রসঙ্গে শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন, "রামায়ণ হচ্ছে প্রত্যক্ষতঃ কবিকল্পনার সৃষ্টি, তৎকাল প্রচলিত কাহিনী ও জনশ্রুতিকে সংকলন করার কোনো প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় এই গ্রন্থ রচনার মূলে নেই। বরং কবি সচেতন ভাবেই প্রচলিত কাহিনীকে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজনে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। যে কাহিনী অবলম্বন করে রামায়ণ কাব্য রচিত সে কাহিনী অবশ্য কবিকল্পনা নয়। সে কাহিনীটি যে জনসমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ এই যে, মহাভারতে সংকলিত উপাখ্যানসমূহের মধ্যে রামোপাখ্যান অন্যতম। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যেও রামকাহিনী পাওয়া যায়।"

শ্রী সেনের বক্তব্যে এটাই বোঝা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন ইতিহাসের যথার্থ অনুসরণ না হলেও তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের ওপরেই রচিত, রামায়ণও তেমনি অনেকাংশে ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্য। ইতিহাস-ভিত্তিক কাহিনী রামায়ণের উপজীব্য এবং সেখানে মূল কাহিনীর মধ্যে অনুপুঙ্খ ও প্রক্ষেপের আকারে বেশ কিছু কল্পিত কাহিনী ও ঘটনার সন্নিবেশ সহজ পথেই কাব্যমধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। অনুসন্ধানার মুখ্য কাজ তাই হবে মূল কাহিনী থেকে সেই অনুপ্রবেশকারী ঘটনাবলীর বাছাই ও পুনর্বিন্যাসকরণ। এ কাজ যতদূর সাফল্য লাভ করবে লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারও সেই পরিমাণেই সম্ভব হবে।

কিন্তু যদি ডঃ সুকুমার সেনের মতো শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজনের উক্তি সামনে রেখে আগেই একথা আমরা মেনে নিই যে, "যাঁরা রামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করেন, তারা রাবণকেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু দশগ্রীব বিংশতিভুজ জীবকে হাইড্রা (Hydra) মনে করতে বাধা নেই, মানুষ মনে করতে বাধা আছে।[১]"—তাহলে রামায়ণের গর্ভস্থ লুপ্ত ইতিহাস সন্ধানের পণ্ডশ্রমে অগ্রসর হওয়ার আর প্রয়োজনই থাকে না।

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের 'দশ মাথা বিশ ভুজ' চেহারাটি অবশ্য কোথাও কোনো

১। রাম কথার প্রাক্-ইতিহাস/প্রস্তাবনা অংশ।

রামায়ণী চরিত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নয়। বাল্মীকি রামায়ণে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়াও হয়নি। একথা সম্ভবত ঢুকে পড়েছে পরবর্তী প্রক্ষেপের ফলে যখন রামকাহিনীর ওপর অলৌকিক রূপকথা আরোপ করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। রাবণস্কন্ধে দশমুণ্ড কেউ দর্শন করেননি। রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনার সময় কোনো ব্রাহ্মণ কবি রাবণকে বিকটাকার রূপে চিত্রিত করার মানসে এই অবিশ্বাস্য গল্পটি টুক করে কাব্যের আধারে গেঁথে দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর রাবণের শোকার্তা ভার্যারা তাঁর একক সুশ্রী মুখমণ্ডল ক্রোড়ে নিয়ে বিলাপ করেছেন। হনুমান সর্বসুলক্ষণযুক্ত সুপুরুষ রাবণকেই দর্শন করে মুগ্ধ হন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে দেখে রামচন্দ্রও মুগ্ধ হয়ে মনে মনে বলেছেন, "উঁহার যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এইরূপ নহে।" রাবণ নিহত হলে নিপুণ অভিনেতা বিভীষণ বলেছেন, "বীর! মহামূল্য শয্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট **বাহুযুগল** প্রসারণপূর্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার উজ্জ্বল **রত্নকিরীট** লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" মন্দোদরীর বিষণ্ণ বিলাপোক্তি আমাদের জানিয়েছে, রাবণের মুখ ছিল, "উজ্জ্বলতায় সূর্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য, ইহার **ভ্রূযুগল, উন্নত নাসা** ও ত্বক সুন্দর, ইহা **রত্নকিরীট** ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল,…**নেত্রযুগল** চঞ্চল হইলে ইহার যারপরনাই শ্রী হইত।[২]"

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ সুশ্রী, সুপুরুষ, দ্বিভুজ। তাঁর একটিই রত্নকিরীট শোভিত মস্তক, ভ্রূযুগল, নেত্রযুগল এবং একমাত্র উন্নত নাসিকা প্রশংসিত হয়েছে। সুতরাং এরপরে রামায়ণে কোনো 'হাইড্রা' রূপী রাবণকে সন্ধান করে রামায়ণ কাব্যকে নিছক কল্পকাহিনীকাব্যের গোষ্ঠীতে চালান করে দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং বলি, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আষাঢ়ে গল্পকে যুক্তি হিসেবে উত্থাপন করে রামায়ণের ঐতিহাসিক উপাদানগুলির প্রতি অবহেলা করলে অজস্র কল্পগল্পের অস্তিত্বসমৃদ্ধ মহাভারতকেও ঐতিহাসিক উপাদান সমৃদ্ধ পুরাণরূপে গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আজ কিন্তু পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবসান হতে চলেছে। মহাভারত বর্ণিত রাজ্যগুলির অবস্থান, তার পথপরিচয়, তৎসমকালীন ভারতবর্ষীয় মানচিত্রে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। কৃষ্ণ সহ রাজন্যবর্গের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে অবিশ্বাসের কারণ কদাচ উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

২। যুদ্ধকাণ্ড/বা, রা/ভারবি সং।

দেবতাদের অস্তিত্ব এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নেপথ্য পরিচালক রূপে তাঁদের কূটচক্রান্তের ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক কর্মকাণ্ড বহু বিশ্বাসযোগ্য পৌরাণিক তথ্যাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি আমার পূর্বপ্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে। আমাদের সৌভাগ্য ডঃ সুকুমার সেনও তাঁর প্রাগুক্ত পুস্তিকাটিতে মহাভারতকে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন নির্দ্বিধায়। যে যুক্তিতে তিনি রাবণকে 'হাইড্রা' হিসেবে পরিত্যাজ্য মনে করেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপে বর্ণিত অলৌকিক বিশ্বরূপ প্রদর্শনকারী, গোবর্ধনধারক এবং নানা অদ্ভুতকর্মকারী রূপে প্রচারিত বাসুদেব কৃষ্ণকে সে ধরনের কোনো যুক্তি প্রয়োগ করে রূপকথার নায়ক হিসেবে পরিত্যাগ করেননি। রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের চারিত্রিক তফাৎ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "রামায়ণ হল 'কাব্য', কবির সৃষ্ট রচনা। আর মহাভারত হল 'ইতিহাস', লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত জনশ্রুতি। মহাভারত পুরাণেরই সহোদর। একদা উভয়ে একত্র ছিল 'ইতিহাস-পুরাণ'—অর্থাৎ 'এই তো ছিল পুরানো (কাহিনী)'। পরে তা ইতিহাস ও পুরাণ নামে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে।···মহাভারত ইতিহাস বটে, তবে আমাদের ব্যবহৃত এখনকার অর্থে নয়। আগে শব্দটির মানে ছিল পুরানো গল্প।"

তা তো বটেই। সেকালের ইতিহাস আর একালের ইতিহাস রচনায় প্রকরণগত প্রভেদ থাকাই তো স্বাভাবিক। সেকালে বিজিত জাতির সকল কীর্তিকে মসীলিপ্ত করে, নির্বিচারে ধ্বংস করে সে জাতির সর্বস্ব অধিগ্রহণ করে তাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেই বিজেতা পক্ষ খুশি থাকতেন না, বিজিত পক্ষের প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্বেষ-বশত ভারতীয় পুরাকাহিনীতে হৃতসর্বস্ব সেই মানুষগুলিকে মানবেতর প্রাণী হিসেবে প্রচার করা হত, অপহরণ করা হত তাদের যাবতীয় মানবিক অধিকার এবং শারীরিক চিহ্ন সকল। পুরাকথায় তারা আর মানবজাতি হিসেবেও উল্লিখিত হতেন না। অন্যদিকে বিজয়ী পক্ষ আপন ভাবমূর্তিকে মহিমান্বিত করার জন্য পুরাবৃত্তে সাজিয়ে দিতেন নানান আষাঢ়ে গল্প। আপন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে আলৌকিক ক্ষমতাবান ঈশ্বর এবং দেবতায় উন্নীত করে এমন গল্প ফাঁদতেন যার ফলে ইতিহাস পরিণতি লাভ করত রূপকথায়। সে রূপকথায় মানুষ, নর, বানর (অর্ধনর), নররাক্ষস এবং দেবতা প্রভৃতি জাতিতে বিশ্লিষ্ট হত। সে কাহিনী তমসাচ্ছন্ন মানবসমাজের মধ্যে কথকতাসূত্রে প্রচার করার ফলেও ইতিবৃত্ত লোকপরম্পরাগত জনশ্রুতির আকারে বংশপরম্পরায় অধিকতর বিকৃতির দ্বারা তার ইতিবৃত্ত-রূপ সত্যকে ক্রমশ লুপ্ত করে ফেলত। কথা-আবর্জনার স্তূপে কবরস্থ হত প্রকৃত

ঘটনাবলী। এভাবে বিজয়ী জাতির বুদ্ধিজীবীরা বিজয়ী জাতির স্বার্থসাধক ইতিহাস সৃষ্টি করতেন। সে ইতিহাস গীত হত ছন্দবদ্ধ কাব্যাকারে। ইতিহাসকে তার আদিপর্বে কাব্যাকারেই পেয়েছি আমরা। এই যুক্তিতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ভারতবর্ষের আদিকাব্য দুটিই আর্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিবৃত্ত। পুরা-ইতিবৃত্তের পূর্বালোচিত লক্ষণগুলি দুই কাব্যের মধ্যেই বর্তমান।

রামায়ণ-বর্ণিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক অস্তিত্বের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ভারতের পথে পথে এবং বিভিন্ন রাজ্যে। রাম ভ্রাতাদের নামানুসারে এককালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপনার পর নতুন নামকরণ করা হয়েছিল।

একটি বহুল প্রচারিত তথ্য এই যে, সুরসেনাধিপতি লবণকে বধ করে শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী স্থাপন করেন। শত্রুঘ্ন-পুত্র সুবাহু এই রাজ্যের শাসক হয়েছিলেন। পরে সুবাহুর উত্তরাধিকারীদের পরাজিত করে সাত্বতরা আবার সুরসেন অধিকার করে নেন।

রামচন্দ্রের দুই পুত্র লব ও কুশ যথাক্রমে লবপুর এবং কুশপুর নামে পাঞ্জাবের লাহোর ও কসৌর অঞ্চলের দুটি রাজ্যে অভিষিক্ত হন। প্রচলিত কিংবদন্তীতে এই রাজ্য স্থাপনের ঘটনা সমর্থিত হয়েছে।

কুশ বিন্ধ্যপর্বতেও কুশাবতী নামে রাজ্য স্থাপন করেন।

ভরত-পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর। তক্ষের নামানুসারে তক্ষশীলা এবং পুষ্করের নামে পুষ্কলাবতী নগরী দুটির পত্তন হয়।

লক্ষ্মণ-পুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু হিমালয় সংলগ্ন কারুপথ এবং মল্লদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রাজা ভগীরথ গঙ্গার পূর্ব দিকে কোশল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরের ইতিহাসও পুরাণকথায় লিপিবদ্ধ আছে। ভগীরথের ৪র্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন অম্বরীশ। তারপর রাজা হলেন সিন্ধুদ্বীপ। সিন্ধুদ্বীপের ছেলে ঋতুপর্ণ ছিলেন নিষাদাধিপতি নলের মিত্র। দিলীপ খট্টাঙ্গের আমলে কোশল ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। দিলীপেরই উত্তরাধিকারী রঘু, অজ এবং রাজা দশরথ।

দশরথের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের ইতিহাসও পৌরাণিক তথ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে দেখা যায়। দশরথের সমসাময়িক অপর আর্য-জনপদ-পতি ছিলেন সীরধ্বজ জনক (২৩)। তিনি ইক্ষ্বাকু বংশের উত্তরাধিকারী। তাঁরই পালিত কন্যা সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। 'জনক' নামটি ইক্ষ্বাকু নৃপতিদের রাজ উপাধিতে পরিণত হয়। জনক বংশ ইক্ষ্বাকু বংশেরই শাখা। বিষ্ণু পুরাণ মতে এই বংশে ৫৬ জন

এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা রাজত্ব করেন।

সীরধ্বজ জনকের পূর্ববর্তী ইতিহাস বলে, রাজা ভগীরথের পর গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্য-প্রতাপ সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিমি মাথব। নিমিই প্রথম আর্য নৃপতি যিনি সদানীরা বা গন্দক নদী অতিক্রম করে পূর্ব-ভারতে আর্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। মাথব এবং তাঁর পুরোহিত গোতম যে জমি কর্ষণ শুরু করেন তারই নাম হয় বিদেহ। নিমির উত্তরাধিকারী মিথি জনকই মিথিলার প্রতিষ্ঠাতা। মিথিলা ছিল বিদেহ রাজ্যের রাজধানী।

দশরথের সমকালে বিদেহ রাজ্যের রাজা ছিলেন, সীরধ্বজ জনক। তাঁরই পালিত কন্যা সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সীরধ্বজের আপন ঔরসজাত কন্যা উর্মিলার পাণিগ্রহণ করেন লক্ষ্মণ।

দশরথের সমসাময়িক অন্যান্য রাজা ও রাজত্বের কয়েকটি ছিল এই রকম :—

রাজা সুমতি > রাজ্য বৈশালী

রাজা লোমপাদ > রাজ্য অঙ্গ

রাজা মধু > রাজ্য সুরসেন

রাজা অনভ [কৈকেয়ীর পিতা] > রাজ্য কেকয় [পাঞ্জাব]

রাজা ভানুমন্ত [কৌশল্যার পিতা] > রাজ্য মহাকোশল [মধ্যপ্রদেশ]

রাজা বালি > রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা

রাজা কুবের > রাজ্য অলকা [হিমালয়] *

রামায়ণ উত্তর খণ্ডবাসী ও দক্ষিণী আর্য গোষ্ঠীর-মধ্যে সংঘাতের ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর রচিত উত্তরদেশীয় আর্যদের বিজয় গাথা। রামায়ণে রামচন্দ্র কেন্দ্রীয় এবং মুখ্য চরিত্র। কাব্যটিতে রাম জীবন কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কবি বাল্মীকি রামচরিত রচনার জন্য আদেশ পেয়েছিলেন দেবগুরু ব্রহ্মার কাছে। তত্রাচ যেহেতু রামচন্দ্র ছিলেন আর্য রাজকুমার এবং তিনি আর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দেবতাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে দক্ষিণাপথে আর্য অভিযানটি পরিচালনা করেন, সেজন্য রামচরিত কেবলমাত্র একটি চরিতকাব্য হিসেবেই লিখিত হয়নি, এই

* তারকা চিহ্নিত উল্লিখিত বিবরণ আরও বিস্তারিত জানতে দ্রঃ **India in the Vedic Age/P. L. Bhargava** ।। এবং **Hindu Civilization (1)/R. K. Mukherjee.**

কাব্যের পটভূমিটি ঐতিহাসিক হওয়ায়, রামায়ণ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিতকথা হয়েছে। ফলত এ কাব্য ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যকৃতি হিসেবেই আলোচ্য এবং এ কাব্যের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি বিচার ও বিবেচনার দ্বারা তার মধ্য থেকে ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাসও অনুসন্ধানযোগ্য।[৩] অন্যদিকে উত্তরাখণ্ডে আংশিক আর্যিকরণের পরবর্তী অবস্থায় একই আর্য জাতির দুইটি বিবদমান গোষ্ঠী, সুর ও অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সংগ্রামের এবং বহু যুগব্যাপী সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত।[৪]

মূল বাল্মীকি রামায়ণ একক কবির রচনা। সেখানে প্রক্ষিপ্ত অংশের ভাগ কম। মূল কাহিনী থেকে ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছাই করার কাজও সহজতর। তবে রামকথার মূল কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত অংশের দ্বারা শতধা বিকৃতরূপ গ্রহণ না করলেও, বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি ও অঞ্চলভেদে রাম কাহিনীকে যথেচ্ছ ভাবে রূপান্তরিত করে উপস্থাপিত করার প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রচেষ্টা অবশ্য অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ব্যাপার। এ ধরনের স্বতন্ত্র রামকথা রচনার ফলে মূল বাল্মীকি রামায়ণ বহুলাংশে অবিকৃত থাকার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের পক্ষেও সে কাহিনী অনুসরণের সুবিধা হয়েছে অনেক।

উপরিলিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে, মনে হয়, রামায়ণের মধ্যে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে উপহসিত হওয়ার কারণ ঘটবে না। সাধারণত পুরাকথা

৩। "The theme of the Ramayana is in essence that of the conflict between Rama and Ravana, who may be taken to be the representatives and embodiments respectively of the Aryan and non-Aryan civilization······The Ramayana thus ultimately tells of the extension of Aryan civilization to the south as far as Lanka or Ceylon"—Hindu Civilization/part 1/Dr. Radha Kumud Mookerji/Bharatiya Vidya Bhavan.

৪। "The theme of the Mahabharata is also a conflict, not between the Aryan and non-Aryan, but among the Aryan peoples themselves, and involving not a part but the whole of India. ······The Kurukshetra war of the Mahabharata affected all the Aryan kings of India who ranged themselves on both sides. Kuru or Pandava"—ibid.

ব্যাখ্যায় পণ্ডিতরা একই পুরাণ ও মহাকাব্যের বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে ঐতিহাসিক এবং বিশিষ্ট কতিপয় চরিত্রকে রূপকাত্মক অনৈতিহাসিক কবিসৃষ্ট চরিত্র বলে উল্লেখ করেন। এতে ব্যাখ্যাকার অনেক জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পান বটে, তবে তা আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের সহায়ক না হয়ে সমগ্র বিষয়টিকে তার পূর্বাবস্থা অপেক্ষা জটিলতা দান করে। ফলত সাধারণ জিজ্ঞাসু যে তিমিরে ছিলেন, পণ্ডিতী ব্যাখ্যার পর তিনি তদপেক্ষা রহস্যের অন্তরালে নিমজ্জিত হন। উদাহরণ স্বরূপ 'ভারবি' প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রস্তাবনা অংশ থেকে প্রবোধচন্দ্র সেনের দু-একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

তিনি তাঁর ভূমিকায় লিখছেন, "কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনা হিসাবে ঐতিহাসিক সত্য কি না তার কোনো প্রমাণ নেই, সম্ভবতঃ সত্য নয়। তবে শান্তনু ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন কৃষ্ণ পরীক্ষিত জনমেজয় প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এদের পারম্পরিক সম্পর্ক ও পৌর্বাপর্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।"[৫]

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের এই সকল উক্তি সাধারণের মনে দারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ধৃতরাষ্ট্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলে কর্ণ দুর্যোধন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে সেই ইতিহাসের পরিমণ্ডল থেকে বাদ দেওয়া যায় কেমন করে? গোটা মহাভারত জুড়ে যে কিছু ঘটনার আবর্ত মহাভারতকথাকে তার মহা পরিণতির দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে, সেই ঘটনাবলী মুখ্যত সৃষ্ট হয়েছে দুর্যোধন ও কর্ণের যুগ্ম কীর্তিকলাপে। কর্ণ দুর্যোধন ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ভূমিকাই নেই ঐ মহাপুরাণে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভিন্ন কৃষ্ণার্জুনই বা কোন্ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ও যুদ্ধের প্রাক্কালে নিহত অনেক রাজন্যবর্গই ঐতিহাসিক ব্যক্তির মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ঘটনা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। এককে বাদ দিলে মহাভারতের এক একটি স্তম্ভ ভেঙে পড়ে, যার ফলে মহাভারতের মূল আখ্যানের ইমারতটিও আর অক্ষত থাকে না। মহাভারতের দ্রৌপদী এবং রামায়ণের সীতাকেও অনুরূপ ভাবে ঘটানাবলীর ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। কর্ণ-দুর্যোধন যে এককালে ভারতের এক গরিষ্ঠ সংখ্যক রাজা ও প্রজাকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন তার প্রমাণ আজও রয়ে গেছে বর্তমান গাড়োয়াল হিমালয়ের তমসা তটবর্তী অঞ্চলে। সে অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এই দুই মহাপুরুষ আজও দেবতারূপে পূজিত

৫। বা. রা / ভূমিকা অংশ / ভারবি সং

হচ্ছেন। আছে তাঁদের একাধিক মন্দির ও মূর্তি।[৬] কংসের মন্দির আছে গাড়োয়াল হিমালয়ের শ্রীনগরে, পবিত্র ভাগীরথী তীরে। জনশ্রুতিই পাণ্ডবদের জন্মস্থান চিহ্নিত করেছে বদ্রীনাথের পথে পাণ্ডুকেশ্বরের পার্বত্য প্রদেশে। সেখানেই দেবতা ইন্দ্র, ধর্ম, পবন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম। একান্ত পার্থিব উপায়ে দেবতাদের সঙ্গে যৌন মিলনের ফলে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভসঞ্চার হয়। পাণ্ডব জন্মের বিস্তারিত কাহিনী মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করে আমরা তা পাঠকের জ্ঞাতার্থে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছি।[৭]

রামায়ণ মহাভারতের বিষয়কে অনৈতিহাসিক কল্পগল্পের কোঠায় ঠেলে রাখতে হাজার হাজার বছর আমরা যত রকম কসরৎ করেছি, সেই পরিশ্রমের কিছু অংশ তৎকালীয় ইতিহাস-সন্ধানে ব্যয় করলে, ইতিহাস সন্ধানীর কাজ অনেক এগিয়ে থাকতে পারত।

পুরাণের পাতা থেকে ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করে আমাদের পণ্ডিতদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে গেছেন য়ুরোপীয় ভারততাত্ত্বিকরা। ভারততাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁদেরই অথরিটি মানতে হয় আজও। আমরা, তত্রাচ, রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থের পুঁথি-তালিকায় আবদ্ধ রেখেই অধিকতর সুখী। ধর্মগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা স্বীকৃতি লাভ করলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন একটি ধারণা পণ্ডিত অ-পণ্ডিত সকলের মনেই চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করে আছে।

এ ধরনের দুর্ভাবনা এককালে খৃষ্টান সমাজেও ছিল। কিন্তু চিন্তা ও কাজে থেমে থাকে না য়ুরোপ। তাই বাইবেলীয় নগরী উদ্ধারে য়ুরোপীয় খ্রীষ্টানরা পশ্চাদপদ হননি। সত্যানুসন্ধান যেন তাঁদেরই জন্মগত অধিকার। নোতুন কথা ও কাজ ঐ য়ুরোপের মাটিতেই সর্বাগ্রে প্রশ্রয় পায়। ভারতীয় কেউ নোতুন কথা বললে প্রথম স্বীকৃতি জোটে তাঁর বিদেশ থেকেই।

হোমার কাব্যে বর্ণিত যে ট্রয় নগরীকে একদিন রূপকথার রাজত্ব বলেই মনে করা হত। হাইনরিথ শ্লিম্যান মাটি খুঁড়ে সেই ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

৬। গাড়োয়াল হিমালয়ের উত্তরকাশী অঞ্চলেও দুর্যোধনকর্ণপূজক এবং পাণ্ডবপূজক, পরস্পরের বৈরী এই দুই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে যাঁদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ।

৭। লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' (২য় সং) দ্রষ্টব্য।

করে প্রমাণ করেছেন, হাজার বছরের ধারণাটি ছিল কত ভুল। লোকে ভাবত, মহাকবি হোমার শুধু গল্প গড়ে গেছেন। ট্রয় নগরী আবিষ্কারের পর পণ্ডিতরা ভাবতে শুরু করলেন, ট্রয় থেকে থাকলে হেক্টর, আকিলিসরাও নিশ্চয় ছিলেন। তখন ইলিয়াড ওডিসির কাহিনীমালার মধ্যে ইতিহাসের উপাদান খোঁজার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল জোরদার ভাবে।

প্লেটোর আটলান্টিস নিয়ে অদ্যাবধি বিতর্ক বহমান। কিন্তু ১৯৬৮ নাগাদ বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় কিছু ডুবো শহরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হলে ফের আটলান্টিস কেন্দ্রিক নোতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়। এ চিন্তা আটক হয়ে ছিল পবিত্র বাইবেলের শাশ্বত বাণীর চাপে। মধ্যযুগে আটলান্টিসের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হত না খ্রীষ্টান সমাজে। আটলান্টিসকে মানতে হলে যে মিথ্যে হয়ে যায় ইহুদি ধর্মপুস্তকের জেনেসিসের ভাগবত-বাণী। জেনেসিস মতে পৃথিবীর জন্ম খৃষ্টজন্মের মাত্র ৫৫০৮ বছর আগে। অথচ প্লেটোর বিবরণীতে প্রকাশ, আটলান্টিস নামীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল খৃষ্টপূর্ব নয় হাজার বছর আগে। কী সর্বনাশ, ভগবানোবাচ সন তারিখ নিয়েই যে গোলমাল! অতএব কল্পগল্পের পুঁথিঘরে বিসর্জিত হয়েছিল আটলান্টিসকেন্দ্রিক চিন্তা।

বিজ্ঞান অবশ্য থেমে থাকেনি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে, ঠাণ্ডা পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল চারশ কোটি বছর আগে। এই তথ্য বাইবেলীয় হিসাবকে নগণ্য ও নস্যাৎ করে দেয়। শ্লিম্যান-পৌত্র ডঃ পল শ্লিম্যান বিশ্বাস করতেন আটলান্টিসের অস্তিত্বে। ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত একটি ব্রোঞ্জের তৈরী আধারে এক অদ্ভুত খোদাই কাজ তাঁর বিশ্বাসের পক্ষে একটি পরোক্ষ প্রমাণও হাজির করে। পাত্রের গায়ে আটলান্টিসের রাজা ক্রোনস-এর পরিচয় খোদিত আছে। ডঃ শ্লিম্যানের পৌত্র পল শ্লিম্যান আটলান্টিসের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, এরপর স্বয়ং ডঃ পল শ্লিম্যানই রহস্যময় ভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলেন। তাঁকে আর কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া গেল না। পৃথিবীতে যারা প্রথাবদ্ধ চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁদের অনেককেই আমরা হারিয়েছি। হয় কেউ বিরুদ্ধবাদীদের বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, নয় খুন হয়ে গেছেন, আবার কেউ কেউ অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন, যার পেছনেও স্বভাবতই বিরুদ্ধবাদীদের সক্রিয় চক্রান্ত আছে বলে মনে করা হয়।

সাগরবক্ষ থেকে এখনো কত অজানা লুপ্ত শহর আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই তো সেদিনের কথা। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে ছোট্ট বামিনি দ্বীপের সন্নিকটে কয়েকশ মিটার লম্বা একটি প্রস্তর প্রাকার আবিষ্কার

করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডঃ জে ম্যানসন ভ্যালেনটাইন। অতল জলের নিচে নেমে ডঃ ভ্যালেনটাইন সংবাদ নিয়ে এলেন একটি ডুবো বন্দরের। পুনরায় শুরু হয়ে গেল আটলান্টিস-ভাবনা। কেউ কেউ এইসঙ্গে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল রহস্য এবং ভিন্‌গ্রহের নভশ্চরীদের কীর্তিকলাপের প্রসঙ্গটিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে বসলেন।[৮]

মাটি খুঁড়ে, পাতালে প্রবেশ করে, সমুদ্রের নিচে ডুব দিয়ে, ফসিল ঘেঁটে বিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর বুকে হারিয়ে যাওয়া কত-না-কত লুপ্ত ঐতিহাসিক বস্তু ক্রমান্বয়ে উদ্ধার করে চলেছেন আর এই সব উদ্ধার কাজে তাঁদের পথ-নির্দেশ করেছে পূর্বপিতাদের রেখে যাওয়া কাব্য গল্প উপকথা জনশ্রুতি ও পুরাণ। একটি চাক্ষুষ প্রমাণ আবিষ্কৃত না-হওয়া পর্যন্ত পৌরাণিক কথা-কাহিনীগুলি সাবধানী আমরা তবুও কল্পগল্পের স্তরেই ফেলে রাখি, যদিও কেবলমাত্র পুরাণ মহাকাব্যের পুঁথি নিয়ে গবেষণা করেও ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের তথ্য ও সূত্র পেয়ে যান। যাঁরা সেই তথ্যাদির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেন, ভালো করে বিচার করে দেখো, পৌরাণিক বিবরণে ইতিহাসই লিপিবদ্ধ আছে, পুরাতাত্ত্বিক সেই গবেষণালব্ধ বিষয়কে অমনি আমরা সযত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের বিষয় করে দূরে সরিয়ে রাখি। পুরাণভুক নিজেরা, 'জানি কিন্তু শুনব না', গোঁ ধরে পৌরাণিক কাহিনীকে ভগবানের বাণী রূপে জিইয়ে রাখতে ভালোবাসি। মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পা আবিষ্কারের পরেও রামায়ণ মহাভারতের আধারে রক্ষিত পরস্পর বৈরী আর্য সংঘাতের ইতিকথাকে ধর্মাধর্মের ভাগবত ক্রিয়াকাণ্ড ভেবে খুশি রাখি নিজেদের। ইতিহাসকে অবহেলা করে 'মিথ' বা পৌরাণিক অবাস্তব কাহিনীনিচয় আমাদের বুদ্ধিচিন্তায় লালিত হতে থাকে। আর সেটাই হয়ে ওঠে লুপ্ত ইতিহাসের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। লুপ্ত ইতিহাস আবিষ্কারের পাশাপাশি 'মিথ' তার নিজস্ব দাপটে টিকে থাকে একদল মিথ-প্রিয় লেখকের এবং একদল প্রথাপ্রিয় সমাজপতির পৃষ্ঠপোষণায়।

রাজা রামমোহন রায় মিথ-প্রিয়তার মধ্যে ব্যবসায়িক লাভের ও লোভের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে তাই যথার্থই বলেছেন, "সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম ও ব্রতযাত্রা মহোৎসব আছে। সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি। অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্বদা বাহুল্যমতে করিয়া আসিতেছেন।

৮। লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থ দ্রঃ।

…আপনার উপাসনার ঈশ্বর আত্মবৎ সেবা পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে।"[৯]

মিথ পুরাণে বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখার এটাই বাস্তব উদ্দেশ্য। মিথ পুরাণ তার রূপকালঙ্কারে আবৃত যথাযথ অবস্থায় আমাদের মনে অলৌকিক অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করে এবং পুরোহিত-প্রধান এক দৈবনির্ধারিত ভাগ্যনির্ভর জীবনবন্ধনে আমাদের আবদ্ধ ক'রে মানুষকে সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়। তা সংস্কারাচ্ছন্ন দেব-পুরোহিতদের পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করারও নির্দেশ দেয়। পুরোহিততন্ত্রী সমাজব্যবস্থা তাই এই মিথ-প্রভাবকে আবহমান টিকিয়ে রেখে নিজেদের জন্য একটি শোষণভিত্তিক পরশ্রমভোজী ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে চায়।

নবযুগের দিশারী রাজা রামমোহন রায় এই ব্যাপারটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এমন এক যুগে যখন পৃথিবী, বিশেষত ভারতবর্ষের মানুষ, আরও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। সেজন্যই তাঁদের সকল অধ্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে। পারেনি তা কোনো স্থায়ী চৈতন্যের জন্ম দিতে পুরাণভুক সরল বিশ্বাসী-দের মনে। অন্যদিকে সমাজপতি এবং তাঁদের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা সমান্তরালভাবে মানুষকে অন্ধকারেই আচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। আজও তাঁরা একই কাজ করে যাচ্ছেন একান্তভাবে আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

পণ্ডিতরা যখন বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন নানা পুরাতত্ত্ব ঘেঁটে[১০], তখনও বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিক-তাকে মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, যাত্রাগানের গায়ক গায়িকা ও বুদ্ধিজীবীদের চেষ্টার অন্ত নেই। এই কাজের পেছনে খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। ওঁরা মানুষের মস্তকমুণ্ডন করিয়ে মানুষকে এক যুদ্ধোন্মাদ রাজনৈতিক নেতার চির-পদাশ্রিত করতে উন্মুখ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চক্রান্তকারী বাসুদেব কৃষ্ণকে তাঁরা ঈশ্বরাবতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে ধরে রাখতে নিত্যনূতন নবতর উপায় উদ্ভাবন করে চলেছেন। ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের কাজের খবর হয় এঁরা রাখেন না, নয়, রাখলেও ইচ্ছাকৃতভাবে সেসব কথা সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়ার জন্যই নিজেদের ব্যবসায়িক আয়োজন সাজিয়ে ধরেন প্রচুর উচ্চকিত এবং খরচসাপেক্ষ বিজ্ঞাপনের দ্বারা। তৈরী করেন সর্বাধুনিক মঠ মন্দির। এঁদের প্রভাবে লুপ্ত ইতিহাস সন্ধানের কাজ গবেষকের পুঁথিঘরেই আবদ্ধ হয়ে থকে।

৯। উপনিষদ, রামমোহন রায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলি-৬।

১০। লেখকের যদুবংশ পর্যায়ের রচনাবলী দ্রঃ।

ভারতবর্ষে ও আধুনিক ভারতে পুরাবস্তুর সন্ধানে খোঁড়াখুঁড়ি ও অনুসন্ধানের কাজ প্রায় কিছুই এগোয়নি। তবু হঠাৎ হঠাৎ এমন কিছু তথ্য প্রমাণ ঐতিহাসিকদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে যার দ্বারা আজ আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে অনৈতিহাসিক বলা সহজ হচ্ছে না।

পরমেশ্বর রাধাসমন্বিত ভাবের কৃষ্ণরাধাকে আয়ুধধারী যুদ্ধোন্মাদ বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে একাকারে মিশিয়ে দেওয়া হলে সেটা মিশ্রণকারীরই অজ্ঞতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে লোক ঠকানোর ব্যবসাও অধিককাল চলবে না, এটাও যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়েই আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যায়। ঠিকমত খোঁজ শুরু হলে, মহাভারত কেন, রামায়ণের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠাও নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

ডঃ এস. আর. রাও-এর নেতৃত্বে ন্যাশানাল ইনটিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি বা এন. আই. ও বেট দ্বারকা অঞ্চলসন্নিহিত সমুদ্রবক্ষে তিন বছর অনুসন্ধান চালিয়ে উদ্ধার করেছেন উল্লেখ্য পরিমাণ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। অনুসন্ধানীরা সমুদ্রবক্ষে আবিষ্কার করেছেন তলিয়ে-যাওয়া একটি শহরের নিদর্শন। পুরাতাত্ত্বিকদের ধারণা, প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ-চতুর্দশ শতকের বস্তুসম্ভার ও ধ্বংসাবশেষ। ডঃ রাও বলেন, আরও গভীরতর অনুসন্ধানে বহু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব।[১১]

ডঃ রাও-এর নেতৃত্বে দ্বারকা অঞ্চলে খননকার্য চালানো হলে যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তার দ্বারা মহাভারতবর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যতা বেশ কিছু পরিমাণে প্রমাণ করা অসম্ভব নয় বলে ডঃ রাও যে মন্তব্য করেন, আমাদের পুরাণভুক পণ্ডিত অপণ্ডিত সমাজে তাই নিয়ে সামান্যই আলোড়ন আলোচনা হতে দেখা যায়। পশ্চিমদেশে এধরনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সে বিষয়ে শয়ে শয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। নতুন আলোর ঝলকে চঞ্চল হয়ে ওঠেন শিক্ষিত সাধারণেও। এখানেই ওদেশের সঙ্গে এদেশের মৌল তফাৎ। ওঁদের আমরা জড়োপাসক বলে আত্মশ্লাঘা লাভ করি কেবলমাত্র নিজেদের ভাবনাচিন্তার জড়তাকে আড়াল করার জন্যই।

সুদূর অতীতে কুরুক্ষেত্রে নিহত সৈনিকের কঙ্কাল সম্পর্কে জুয়ান চোয়েং তাঁর পরিব্রাজকের প্রতিবেদনে যে তথ্য রেখে গেছেন, ডঃ ভি. সি. পাণ্ডে সেইসব নজির তথ্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এগুলিকেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করা যেতে পারে। পণ্ডিতরা বহু পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার দ্বারা পুরন্দর ইন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পৌরাণিক তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করে রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত রাজা রাজ্য এবং স্থানগুলির নাম-

পরিচিতি এবং তাদের পৌরাণিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও গবেষকরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তবু এদেশ দেবতাকে ঈশ্বরের গদী এবং ইতিবৃত্তকে মিথের শ্রেণী থেকে বিচ্যুত করতে নারাজ। এই পুরা ইতিবৃত্তের গায়ে চিরায়ত সাহিত্য অভিধার একটি মর্যাদাপূর্ণ তকমা এঁটে দিয়ে তাকে গ্রন্থাগারের তাকে তুলে রেখে বুদ্ধিজীবীরাও পরিতৃপ্ত ! ফলে মিথ পুরাণ নিয়ে যাঁরা ব্যবসায় জমিয়ে রাখতে চান, লাভটা অব্যাহত রয়ে যায় তাঁদেরই ; সাধারণ মানুষ কুসংস্কারের আঁধার থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকধারার স্নান করার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই থেকে যান।

গবেষকরা রামায়ণী যুগের নিখুঁত মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা কর্মের ফলে সীতার পালক পিতা জনক রাজার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা মিলেছে। রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য অভিযানের পথ-পরিচয় বর্ণিত হয়েছে গবেষকের বিবরণে। হারিয়ে গেছে শুধু রাবণ রাজ্য লঙ্কা।

মিথ পুরাণ

বলছিলাম, পুরাণের ইতিহাস অংশকে অবহেলা করে মিথের বিভ্রান্তি বজায় রাখার চেষ্টাতে ভারতবর্ষ আবহমানকাল সমধিক আগ্রহী। ফলে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ কেবলমাত্র কতিপয় বিজ্ঞানী মনোভাবাপন্ন গবেষকের গবেষণাগারে আটক পড়ে থাকে, সাধারণ্যে এবং মিথ-প্রিয় বুদ্ধিজীবী সমাজে তার আদর হয় না, প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ ভাবে পুরাণকথা প্রচারিত হলে পুরাপিতাদের উদ্দেশ্যও নিষ্ফল করে দেওয়া হয়। পুরাণকারগণ পুরাণের দুই-পঞ্চমাংশে খাঁটি ইতিহাস প্রচার করে গেছেন অতীতের ঘটনাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে।

পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ ব্যাখ্যা করে পুরাণকার বলছেন,

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশ্যানুচরিতং চেতি পুরাণাং পঞ্চলক্ষণম্ ॥"[১]

সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রতিসৃষ্টি বা প্রলয় এবং মন্বন্তর, এগুলি মিথের লক্ষণ বিশিষ্ট। আর পঞ্চমাংশে যথার্থ ইতিহাস, রাজবংশানুচরিত পুরাণকে

১১। পি. টি. আই সংবাদ / ২৭. ২. ৮৫. / স্টেটসম্যান।

১। বায়ুপুরাণম্।

আধুনিক ইতিহাসেরই পর্যায়ভুক্ত করেছে। পুরাণ ও দুই আদি মহাকাব্যকে পুরা-পিতারা ইতিহাস হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। তবে সেই ইতিহাস রচনার রীতি ছিল বিচিত্র। ইতিহাস অংশেও মিথের অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুপ্রবেশ হয়ত মূল পুরাণ বা মহাকাব্যে হয়নি, পরবর্তী কবি ও পুরাণকাররা যথেচ্ছ প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্বিচারে পুরাণমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ায় বিভ্রান্তির পরিমণ্ডলটি ক্রমশ গ্রাস করে ফেলেছে খাঁটি ইতিহাসকে। তত্রাচ পুরাণ ও আদি মহাকাব্য দুটি থেকে সেই ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। বিদেশী পুরাতাত্ত্বিকগণ এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং সেই মহাজন নির্দেশিত পথে গবেষণার ধারা নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আধুনিক স্বদেশী বিদ্বানরা। তাই, "পুরাণার্থ বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে পুরাণ প্রকৃত হিস্ট্রি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্ত…"।[২]

রামায়ণ মহাভারতের কলেবর কেবলমাত্র পরবর্তী প্রক্ষেপের ফলেই পরিবর্ধিত হয়নি, বর্ণিত ঘটনাবলীর পূর্ববর্তী ইতিহাস, যা জনশ্রুতির আকারে প্রচলিত ছিল সেই সময়, তাও ঐ দুই মহাকাব্যে জায়গা করে নিয়েছে। রামায়ণের গল্পাংশ এভাবে পূর্ববর্তী জনশ্রুতি ও পরবর্তী প্রক্ষেপের দ্বারা এমন ওতপ্রোত মিশে আছে যা মূল আখ্যানের স্বাতন্ত্র্যও বহুলাংশে আবৃত করে রাখে। রামায়ণ রচিত হওয়ার আগেই রামোপাখ্যান প্রচলিত ছিল। অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণে সে গল্প যেমনভাবে সাজানো ঠিক তেমনটি নয়, শাখাপ্রশাখায় তো বটেই, মূলেও প্রভেদ ছিল বিস্তর।[৩]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটি পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[৪]

এইখানে ছোট করে বলে রাখি, রাম রাবণের যুদ্ধটি যদি আদৌ ঘটে থাকে, তাহলে কিন্তু রাম না হতেই রামায়ণ, অর্থাৎ রামের জীবনব্যাপী কার্যক্রমের একটি ছক দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার সভায় আগেই লিখিত হয়েছিল। যথাস্থানে সে আলোচনায়

২। পুরাণ প্রবেশ / গিরীন্দ্রশেখর বসু।

৩। জিজ্ঞাসু পাঠক এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের পুস্তিকাটি অবশ্যই পাঠ করবেন। 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' প্রকাশ করেছেন 'জিজ্ঞাসা', কলকাতা-৯ ও ২৯।

৪। সাহিত্য সৃষ্টি / সাহিত্য।

বসব আমরা। এখানে বলি, রবীন্দ্র-বক্তব্যে এটাই পরিস্ফুট হয়েছে যে, রাম যে যুগের রাজা, রামায়ণ তার ঢের পরে রচিত। কেননা, রামকথা আগেই প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি রামায়ণও বলে, দাক্ষিণাত্যে আর্যপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে, বাল্মীকি রামায়ণটি তাঁর রাজসভায় গাওয়া হয়।

ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, রামকথা দেশবিদেশের জনশ্রুতিমধ্যে নানান ভাবে সম্প্রচারিত হয়। ডঃ সেন উদ্ধৃত সেই কাহিনীগুলির চুম্বক পাঠ করে মনে হয়, রামচন্দ্র সে যুগে বস্তুত এমনই একটি অসাধারণ কোনো কাজ করেছিলেন, যেজন্য তাঁর খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

লিখিত গ্রন্থের অভাবে স্থানে স্থানে ভ্রাম্যমাণ কথকদের দ্বারা মূল কাহিনী রূপান্তরিত হয়েছে এবং কোথাও বা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃতির মধ্য দিয়ে রামকাহিনী এক এক পুরাণে এক এক কাহিনীর অবতারণা করেছে। এই কাহিনীমালায় কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ও সীতার উল্লেখ সর্বত্রই পাওয়া যায়। এর থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি না যে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল এবং তাঁদের দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কর্তব্য পালিত হয়েছিল বলেই তাঁদের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেছল দেশে দেশে? অবশ্য তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন বিকৃত গুজব প্রচলিত থাকতেই পারে। এমন গুজব ঐতিহাসিক কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়েও তৈরী হয়। সে যুগে তো, পণ্ডিতদের ধারণা, পুরাণাদি অলিখিত আকারে মুখে মুখেই রটনা হত। তাই গুজব রটনার সুযোগ এবং কারণও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

এ বিষয়ে আমার মনে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর্য অনার্য সভ্যতার যে পরিচয় পুরাণ মহাকাব্যে পাওয়া যায়, তাতে এ কথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না যে, একটি সুসভ্য জাতির কোনো লিখিত ভাষা বা লিপি ছিল না! মহাকাব্য দুটিতেই তাদের লিখিত রূপের কথা বলা হয়েছে। রামায়ণ লেখেন বাল্মীকি। মহাভারতের লিপিকার ছিলেন গণেশ। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সেকালে এমন সুসভ্য সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যে ধরনের সভ্যতা সমৃদ্ধ ভাষা ও লিপি ব্যতিরেকে কখনই গড়ে উঠতে পারত না। রামায়ণ মহাভারতের যুগও ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের সভ্যতার যুগ। লিখিত সমৃদ্ধ ভাষার বাহন ছাড়া ঐ ধরনের সভ্যতার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তাছাড়া মানুষ তো কমপিউটার নয়, তাদের পক্ষে চব্বিশ হাজার শ্লোক মুখস্থ রাখা ও বংশপরম্পরায় গেয়ে বেড়ানোও হ'ত উদ্ভট ব্যাপার। লিপি ছাড়া ভাষার সমৃদ্ধিই বা ঘটবে কী করে? সুতরাং লিপি ছিল এবং পুরাণাদি গ্রন্থ লিপিবদ্ধও হত। তবে আজকের মতো লক্ষ লক্ষ কপি

ছাপিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা না থেকে থাকতে পারে। আর সেজন্যই হয়ত স্মৃতিধর ও শ্রুতিধররা জনসমাজে একটি বৃহৎ কাব্য বা পুরাণের অংশবিশেষ গেয়ে বেড়াতেন। এজন্যই পুরাণ মহাকাব্য খণ্ডাকারে গল্পের সমাহার। এজন্যই সেখানে আগের কথা পরে, পরের কথা আগে ঢুকে পড়েছে। আছে প্রচুর ফ্লাশ ব্যাক। আছে অসংলগ্নতা।

এই জাতের যা-ইচ্ছে-তাই অবস্থার সুযোগে ভক্তিবাদীরা ইতিহাসের গর্ভে ইচ্ছেমত মিথের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। পুরাণ ইতিহাস। মিথ ভক্তিমিশ্রিত কাহিনী। ইতিহাস-পুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতাবান দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কথকঠাকুররা ইতিবৃত্তের সঙ্গে মিথকে ওতপ্রোত করে অভিনব কল্পপুরাণের জন্ম দিয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ে।

মিথের একটি সামান্য সংজ্ঞা খুবই চমৎকার ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন ডঃ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়: "প্রাচীনতম মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রণোদিত অলৌকিক রসের ঘটনানির্ভর কাহিনীমালার নামই মিথ"।[৫] মিথের চরিত্র বিচার করে আরও ঢের চেহারা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু বর্তমান লেখক যে অর্থে এখানে 'মিথ' শব্দটি ব্যবহার করছেন তার সংজ্ঞা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই অতি সরলীকৃত সংজ্ঞাটির দ্বারাই সহজে ব্যক্ত হতে পারে। সুতরাং 'মিথ' বলতে আমি যা নির্দেশ করতে চাই, তা ঐ সংজ্ঞাটির দ্বারাই স্পষ্ট হয়েছে।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে এ ধরনের মিথ আকছার ছড়ানো আছে। এমনটা বিশ্বের চারটি মহাকাব্যের প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়। মহাভারতে মিথের সংখ্যা আরো বেশি, ইলিয়াড এবং ওডিসির ইতিবৃত্ত অংশটিও অবিরত মিথের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাল্মীকি রামায়ণ যখন লিখিত হয় তখনও রামচন্দ্রের দৈবী প্রতিষ্ঠা হয়নি; কিন্তু রাম সীতা দেবদেবীর পর্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃত্তিবাসের রামায়ণ জন্মগ্রহণ করেছে। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণটি আদ্যন্ত মিথ লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিশিষ্ট চরিত্রটি লক্ষণীয়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণগুলিকে মিথ লক্ষণাক্রান্ত করেছে।

"আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তখন যদিচ রামের চরিতে অতি-প্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অতিপ্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদটি অধিকার

৫। বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার।

করিলেন।

তখন রামায়ণের মূল স্বরটার মধ্যে আর একটা পরিবর্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে-সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা।...এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।[৬]

ভক্তির প্রাবল্য হেতু কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্বয়ং বাল্মীকিকে দস্যু অভিধা স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

ঘটনা যখন ঐ রকম, তখন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মিথকে প্রামাণ্য করে রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা যায় না। সে হিসেবে দশগ্রীব রাবণ অথবা হলাগ্রভাগে প্রাপ্ত সীতাকেও বাদ দিতে পারি না আমরা। বাদ দেওয়া যায় না বলেই মানুষ হনুমান ও সুসভ্য বানরজাতিকে লাঙ্গুলধারী শাখামৃগরূপে আজ আর কেউ গণনা করেন না। রাক্ষস বলতেও রূপকথার নরমাংসভুক বিকটাকার প্রাণীকে বুঝি না। মিথ এবং আদি পুরাকথা রচনার বিশিষ্ট রীতিতে সৃষ্ট এই উদ্ভট কল্পগল্পগুলি ইতিহাসের সাদা সত্যকে তমসাবৃত করেছিল। তথ্যানুসন্ধানের ফলে সেই ছায়ার অপসারণ ঘটানো আজ সম্ভবপর হচ্ছে।

কালনির্দেশের বিশিষ্ট রীতি

অলৌকিকতা ও দৈবীমাহাত্ম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আদি কাব্য ও পুরাণে সময়কে যথেচ্ছভাবে টেনেটুনে লম্বা করা হয়েছিল। কাল পরিধির এই অসম্ভব রকম চক্রবৃদ্ধির ফলেও ইতিহাস মিথের রূপ ধারণ করেছে।

রামচন্দ্রকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে গ্রাহ্য করার মূলে একটি প্রতিবন্ধক দুর্ভেদ্য প্রাচারের মতই মাথা তুলে দাঁড়ায়। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণী কথা শেষ করে বলেছেন, সিংহাসনে অভিষেকের পর রামচন্দ্র ক্রমান্বয়ে দশ সহস্র বৎসর [অন্যত্র, এগার হাজার বছর] রাজত্ব করেন এবং প্রচুর দান দক্ষিণা বণ্টন করে [অবশ্যই

৬। সাহিত্যসৃষ্টি/সাহিত্য/বিশ্বভারতী॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য] দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

অদ্ভুত কথা। যে মানুষ দশ হাজার বছর রাজত্ব করেছেন, তাঁকে রূপকথার রাজা অথবা ঐশীশক্তিসম্পন্ন দেবতা বলা যেতে পারে, ইতিহাস-পুরুষ হিসেবে তাঁর আলোচনা তো অসম্ভব। প্রশ্নটি এইখানেই থেমে থাকলে রামায়ণ নিয়ে আর বিতণ্ডার প্রয়োজনই হ'ত না। কিন্তু এতো সহজে অনুসন্ধানের কাজে ইস্তফা দিলে তো পুরাকথার গুহাকন্দর থেকে পুরা ইতিহাসকে উদ্ধার করা যায় না। তাই রামায়ণের অন্যান্য ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের বয়স সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে সেগুলিকে একত্র জড়ো করে পরীক্ষা করতে হ'ল।

বাল্মীকি রামের স্বাভাবিক বয়সই উল্লেখ করেছেন রাম-বনবাস অধ্যায় পর্যন্ত। বনগমনের সময় রামের বয়স উল্লিখিত হয়েছে পঁচিশ জাগতিক বছর। তারই চোদ্দ বছর পর রামচন্দ্র অভিষিক্ত হন অযোধ্যার সিংহাসনে। এ পর্যন্ত কোনো হেঁয়ালী নেই। অকস্মাৎ প্রহেলিকার সূত্রপাত রামের সিংহাসন লাভের পর। কী এর ব্যাখ্যা ?

জৈমিনী দর্শনের একটি সূত্র এই হেঁয়ালীর ব্যাখ্যা দিতে পারে। সূত্রটি বলছে, "অহানি বাভিসংখ্যত্বাৎ"। অত্যুক্তি ও অসম্ভব উক্তির ক্ষেত্রে বছরের জায়গায় একদিন গণনা করতে হবে। সম্মানে বহুবচন প্রয়োগের মতোই চমকপ্রদ অঙ্ক। এখন এই সূত্রানুসারে রামচন্দ্রের দশ বা এগার হাজার বছর রাজত্বকালকে দশ বা এগার হাজার দিন ধরতে হয়।

দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিত শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥

এইবার বছরের জায়গায় দিনের হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, ১১০০০ দিন সমান ৩০ বছর ১ মাস ২০ দিন। অতঃপর আধুনিক অঙ্কে রামকীর্তির সময়কালে আর কোনো গোলমাল থাকে না। রামচন্দ্রের কীর্তিকাণ্ডের সময়কাল ছিল, ২৫ + ১৪ + ৩০ বছর, ১ মাস ২০ দিন অর্থাৎ ৬৯ বছর ১ মাস ২০ দিন। সোজা বাস্তব জাগতিক হিসেব।

রামায়ণে বয়স নিয়ে আরো একটি জায়গায় রূপকথা রচনার বা মিথিক আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। এক জায়গায় এক ব্রাহ্মণ কিশোরের বয়স বলা হয়েছে, পাঁচ হাজার বছর। অঙ্কটা জৈমিনী-সূত্র অনুসারে কষা হ'লে উত্তর পাই, অকালমৃত সেই ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল, ১৩ বছর ৮ মাস ১৫ দিন।[১]

১। রামায়ণের চরিতাবলী/সুখময় ভট্টাচার্য দ্রঃ।

বয়সের হিসেব সহস্রগুণ বৃদ্ধির এই অদ্ভুত মুনশীয়ানা সুতরাং যুগব্যবধানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

রামায়ণ ও মহাভারত কি সমসাময়িক ?

একটি বিশেষ সময়কাল বা ইংরেজি মতে পিরীয়ডকে যুগ বলা হয়। ইতিহাসে যুগ বলতে বিশেষ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা পর্যায়কে বুঝি, যেমন আমরা বলি, বৈদিক ঔপনিষদিক পৌরাণিক অথবা সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কিম্বা ভিক্টরীয় রোমান্টিক বা বৈষ্ণবযুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ। হিন্দু মুসলিম ব্রিটিশ যুগ ইত্যাদি রাজনৈতিক কালবিভাগে কয়েক শত বছরে এক একটি যুগবিভাগ হয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগকেও পুরা পিতারা এভাবেই ভাগ করেছিলেন। রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার পরিমাপকেই এ-ধরনের এক একটি যুগের পারস্পরিক ব্যবধান ছিল। সেই হিসেবে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যগ একটি সুস্পষ্ট কাল-ব্যবধান ছিল। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে বস্তুত আঙ্কিক ব্যবধান কতটা ছিল এবং ত্রেতা ও দ্বাপরের কোনটি আগে কোনটি পরবর্তী, বিতণ্ডা রয়ে গেছে তা নিয়েও। সাধারণ আমাদের ধারণা, রামায়ণ ও মহাভারতের দুই যুগের মধ্যে হাজার হাজার বছরের কালিক ব্যবধান ছিল এবং রামায়ণের যুগ মহাভারতের যুগের ঢের অগ্রবর্তী। এ নিয়ে কিন্তু এখনও তর্ক তোলার অবকাশ রয়ে গেছে।

প্রশ্ন হ'ল, রামায়ণ না মহাভারত, কোনটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্য? রামায়ণ ত্রেতা যুগের কাহিনী, মহাভারত দ্বাপর যুগের। মহাভারতে রামকথার উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে মহাভারতের খিলভাগ হরিবংশেও। এ পর্যন্ত রামচন্দ্র আদর্শ এক রাজপুরুষ, যিনি দক্ষিণাপথে আর্য-প্রতিপত্তি বিস্তারে সফল হন। পরবর্তী বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে তিনি সরাসরি বিষ্ণুর অবতার এবং ঈশ্বর।

"কোনো কোনো বাঙালি পণ্ডিত এখানে সংশয় তুলতে চেষ্টা করেছেন যে, এতদিন আমরা ভুল বুঝে এসেছি, 'দ্বাপর' মানে তৃতীয় যুগ নয়, দ্বিতীয় যুগ এবং 'ত্রেতা যুগ' মানে দ্বিতীয় নয় তৃতীয় যুগ। অর্থাৎ এঁরা মনে করেন 'দ্বাপর' মানে দ্বিতীয় এবং 'ত্রেতা' মানে তৃতীয়"।[১] আধুনিক ভারততাত্ত্বিকগণের মতে রামায়ণ মহাভারত-

---

১। রামকথার প্রাক্-ইতিহাস/ডঃ সুকুমার সেন।

পরবর্তীকালেরই কাব্য।[২] ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "রামায়ণ ও মহাভারত যে আকারে আমরা পেয়েছি তাতে কিন্তু রামায়ণকে প্রাচীনতম বলা যায় না"।[৩]

রামায়ণ যে আদি কাব্য একথা আমরা তবে পেলাম কোথায়? পেলাম রামায়ণে, স্বয়ং পুরাপিতা ব্রহ্মার সাক্ষ্যে। রামের রাজসভায় দেবতারা সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভৌম স্বর্গ গাড়োয়াল হিমালয়ের দেবশিবির থেকে তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অযোধ্যায় এসেও ছিলেন সদলবলে। ব্রহ্মার আদেশক্রমেই বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হয়। ব্রহ্মা বাল্মীকির আশ্রমেও সশরীরে উপস্থিত হন। মনে রাখা দরকার এই দেহবান ব্রহ্মা বহুল প্রচারিত জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি নন, এ ধরনের রটনা ব্রাহ্মণ চাতুরীমাত্র, আর সেকথার প্রমাণ রেখেছি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে। সুতরাং রাম-রাজসভায় ব্রহ্মার সশরীরে আগমন কোনো 'মিথ'ও নয়, ইতিবৃত্ত। তাই ব্রহ্মা স্বয়ং রামায়ণকে আদিকাব্যের মর্যাদা দিয়ে থাকলে সেটাও কোনো বিচিত্র অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে করার কারণ নেই। মীমাংসাযোগ্য প্রশ্নটি হ'ল রামায়ণ কী ধরনের আদি কাব্য।

রামায়ণের জাতিবিচার প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন,[৪] "রামায়ণ একজন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা বলেই স্বীকৃত।...বাল্মীকি হলেন ভারতবর্ষের আদিকবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য একথা সর্বস্বীকৃত। রামায়ণের পূর্বে এদেশে কবিত্ব ছিল না একথা মানা যায় না। ঋগ্বেদের বহু অংশে [যেমন উষাবন্দনায়] চরম কবিত্বের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে কখনও কবিতা বলে বর্ণনা করা হয় না, বৈদিক ঋষিরাও ঠিক কবি পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য নন। উপনিষদগুলিতেও স্থলে স্থলে কবিত্ব উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাও সচেতন কাব্য রচনা বলে স্বীকৃত নয়। মহাভারতের অনেক অংশ সম্ভবতঃ রামায়ণের পূর্ববর্তী এবং তাতেও অতি উঁচু দরের কাব্য আছে। কিন্তু ব্যাসদেবকে কখনও কবির আসন দেওয়া হয়নি এবং মহাভারতকেও ঠিক কাব্য বলে বর্ণনা করা যায় না। রামায়ণই যে আদিকাব্য তার অন্য প্রমাণ এই যে, এর প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে কতকগুলি সর্গে। এই সর্গবিভাগই কাব্যের মুখ্য লক্ষণ।...রামায়ণের পূর্ববর্তী

২। A Dictionary of Indian History/Dr. Bhattacharya [C. U.]

৩। উত্তরকাণ্ড/অষ্টনবতিতম সর্গ, বাল্মীকি রামায়ণ, ভারবি।

৪। ভারবি প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা দ্রঃ।

সাহিত্যে এই সর্গবিভাগ দেখা যায় না। যেমন ঋগ্বেদের বিভাগ হচ্ছে মণ্ডল এবং মণ্ডল বিভক্ত হয়েছে সূক্তে; মহাভারতের পর্বগুলির যে বিভাগ তার নাম অধ্যায়।"

প্রবোধবাবুর রচনা থেকে উপরে এই উদ্ধৃতিটি সংকলিত করার অর্থ এই নয় যে, এটি প্রবোধবাবুর নিজস্ব বক্তব্য। রামায়ণ সম্পর্কে বিদ্বানমণ্ডলীরও একই বক্তব্য। অর্থাৎ রামায়ণের আদিকাব্য অভিধা রামায়ণবর্ণিত ঘটনা ও সময়ের প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি নয়, রামায়ণ আদিকাব্য তার আপন কাব্যরূপবৈশিষ্ট্যে। রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে বিশাল যুগব্যবধানের কথা আমাদের ধারণায় বদ্ধমূল, তার মূলেও কোনো অমোঘ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত নেই। পুরা গ্রন্থে সময়ের ব্যবধান, অসম্ভব উপায়ে দীর্ঘ করার যে রীতি আলোচিত হয়েছে, মনে হয়, তারই জন্য দুই মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলীর ব্যবধানটির দৈর্ঘ্য আমাদের ভাবনায় এমন প্রসার্যমাণ হয়ে উঠেছিল।

আধুনিক মতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল ১০০০-৯০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। অনেকে এই সময়কে ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব কালের ঘটনা বলে এখনও মনে করেন। এই সময়টিই পৌরাণিক যুগ।[৫]

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাল্মীকি রামকথার কাব্যরূপটি সমাপ্ত করেন খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ঘটনাবলী তৎপূর্ববর্তী। উইণ্টারনিজ প্রমুখ গবেষকরা রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের ঘটনাবলীর প্রচীনত্ব স্বীকার করেন। সুনীতিবাবুও মনে করেন, ভাষাগত তুলনায় মহাভারতকেই পূর্ববর্তী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।[৬]

বাল্মীকি অনুষ্টুভ ছন্দের প্রবর্তক এবং একটি সমৃদ্ধ ভাষার জনক। সাহিত্যে ভাষাগত সমৃদ্ধি ঘটে পরবর্তী কালেই। বাল্মীকিকে আদিকবি বলা হয়, তিনিই প্রথম এককভাবে রামবিষয়ক জীবনকথা অনুষ্টুভ ছন্দে রচনা করেন বলে। মহাভারত কোনো একক কবির রচনা নয়। মহাভারতকে আমরা কাব্য হিসেবে নয়, ইতিহাস পুরাণ হিসেবেই উল্লেখ করি। মহাভারত পল্লবিত আকার গ্রহণ করেছে ব্যাসদেবের নামে যুগে যুগে। রামায়ণের মধ্যে ইতস্তত প্রক্ষেপ ঘটলেও বাল্মীকির মূল কাহিনীকে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করা সহজতর। পরবর্তী কালে

৫। "The original Ramayana like the original Mahabharata belongs to the Epic Age."—Early History of Hindu Civilization/ Dr. R. C. Dutt.

৬। The Ramayana : Its History Expansion & Exodus দ্রঃ।

নব নব রামায়ণ রচিত হয়েছে। তবে সেগুলি একই বাল্মীকির নামে চালিয়ে দেওয়া হয়নি। কৃত্তিবাস, তুলসীদাসরা স্বনামেই সেসব কাব্য সাধারণ্যে প্রচার করে গেছেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে এমনটি না-ঘটায় হেঁয়ালীর ও প্রক্ষেপের সৃষ্টি হয়েছে, পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও বক্তব্য সেখানে গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে অনেক বেশি।

রামায়ণ মহাভারতের সমসাময়িকতার প্রমাণ ঐ দুই মহাপুরাণের মধ্যেই নিহিত আছে। গ্রন্থান্তরে মহাভারত আলোচনার সময় ব্রহ্মার পরিকল্পনার কথা বলেছি।[৭] কুরুক্ষেত্র বা ভারতযুদ্ধটিকে আনুপূর্বিক ঘটিয়ে তোলার পেছনে ব্রহ্মার নির্দেশ ও দেবশিবিরের চক্রান্ত যে স্পষ্টতই মহাভারতের পর্বে পর্বে উল্লিখিত আছে উদ্ধার করেছি সেইসব তথ্য-নজির। দেখেছি সেখানে, আর্যাবর্তে দেবানুগত ও ব্রাহ্মণপ্রধান একটি স্থায়ী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কী চমকপ্রদ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল ব্রহ্মার সুমেরু শিবিরে। সেই পরিকল্পনার ফলেই দেবতাদের ঔরসে দেবশিবির কর্তৃক শিক্ষিতা কুন্তীর গর্ভে কর্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের জন্ম। অন্যদিকে বিষ্ণুর ঔরসে দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ ও বলরামের ভ্রূণ প্রোথিত হয়। রামায়ণেও রাম ভ্রাতাদের জন্মোতিহাসের নেপথ্যে ঘটেছে একই প্রকার দেবচাতুরী এবং ঐ সময় একই দেবতারা গাড়োয়াল হিমালয়ের দেবশিবিরে সমাসীন ছিলেন। একই ইন্দ্র বিষ্ণু শঙ্কর ও ব্রহ্মার তৎপরতা ঘটেছে। এই সময় ব্রহ্মা স্বয়ং সমতল ভারতবর্ষে ছুটে এসেছেন। মুনি ঋষিদের মধ্যেও রামায়ণ মহাভারত কালের ঘটনাবর্তে একই ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষিত হয়। যদিও ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র শঙ্কর দেবনেতাদের পদাধিকারের পদবিমাত্র, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি এই পদ অলঙ্কৃত করে পদমর্যাদাগত অভিধা লাভ করেন, তত্রাচ দুই মহাপুরাণে বর্ণিত দেবতারা যে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নন, অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই তা ধরা পড়ে। মহাভারতের অর্বাচীন প্রক্ষিপ্ত অংশে এবং হরিবংশে রামকাহিনীর উল্লেখ আছে যেমন, রামায়ণেও তেমনি কুরুক্ষেত্র সমসাময়িক রাজা ও ঋষিদের উল্লেখ অপ্রতুল নয়। নরকাসুর ঐতিহাসিক বাসুদেব কৃষ্ণের সমসাময়িক অসুর নৃপতি ছিলেন। রাজধানী ছিল তাঁর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে।[৮] এই নরকাসুরের উল্লেখ রামায়ণেও দেখতে পাই। যে ইন্দ্র প্রেরিত মাতলির রথে চেপে অর্জুন মহাকাশ ভ্রমণ অন্তে

৭। লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ।

৮। প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল আসামের গৌহাটি অঞ্চলে

বদরিকাস্থানে এসে অবতরণ করেন বলে জানতে পাই মহাভারতের পৌরাণিক তথ্যে,[৯] সেই ইন্দ্র-বিমান চালক মাতলির রথে চেপেই রামচন্দ্র যুদ্ধ করেছেন। বিষ্ণু বিমানের চালক গড়ুরেরও উল্লেখ আছে রামায়ণে।

প্রশ্ন হ'ল, বহিরাগত এবং দেব-আশ্রিত আর্য ব্রাহ্মণরা কি ভারতবর্ষে একই প্রজন্মে (জেনেরেশনের আমলে) যুগপৎ উত্তরাখণ্ড ও দক্ষিণাপথে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? যদি রামায়ণের যুগকে অগ্রবর্তী ধরা হয়, তবে আর্যরা প্রথমে দক্ষিণভারত ও পরে মহাভারতের যুগে উত্তরভারত অসুর আধিপত্য-মুক্ত করেন বলে মানতে হবে। এ প্রশ্নের উত্তর বিদ্বান পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে অনুসন্ধান করাই ভালো, আমি যথাপ্রাপ্ত রামায়ণ মহাভারতের পর্বানুক্রমিক বিশ্লেষণে ঐ দুই কাব্যের অন্তস্থ নিহিত রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনেই পরিতৃপ্ত। তবে আমার মনে হয় লঙ্কাকাণ্ড কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের ঘটনা এবং প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংসের ফলে আর্য অধিকারের চূড়ান্ত সাফল্য। লঙ্কা বিজয়ের সমকালীন ভারতবর্ষ ছিল অরণ্যময় এবং শহর নগর জনবসতিবিরল। রামভ্রাতা শত্রুঘ্ন কর্তৃক মথুরাপুরী নির্মাণের এবং শত্রুঘ্নপুত্র শূরসেন-এর নামানুসারে শূরসেন রাজ্যের নামকরণের যে তথ্য পাওয়া যায়, তার দ্বারাও রামায়ণ বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। রামায়ণ কাব্যটি হয়ত মহাভারতকথা প্রচারের পর লিখিত আকার লাভ করেছিল।

রাম না হ'তেই রামায়ণ

রামায়ণ রচিত হয়েছে রাম-সম্পর্কিত আদি জনশ্রুতির ভিত্তিতে। আবহমানের আর এক জনশ্রুতিও আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। শুনে আসছি, রাম না হ'তেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণে কিন্তু এ কথার কোনো সাক্ষ্য আমরা পাই না। তবে যা রটে তার কিছু নিশ্চয় বটে। রূপকথাও যেমন শুধু কল্পনানির্ভর হতে পারে না, তেমনিই বিনা ঘটনায় কেবলমাত্র তৈরী গুজব টিকে থাকতে পারে না যুগ-যুগান্ত কাল। অতএব এই রটনার পেছনেও কোনো একটা ঘটনা নিশ্চয় ছিল সেই আদিকালে।

বাল্মীকি রামায়ণে এ তর্কের সূত্র নেই। সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে, নারদ মুনির কাছে আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের কথা শুনে এবং ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়েই

৯। লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' দ্রঃ।

মহাকবি রামায়ণ রচনা করেন। অর্থাৎ রামের পরেই রামায়ণ। কিন্তু রামায়ণের খিলভাগ, 'উত্তরকাণ্ড' পাঠ করলে অন্যতর সূত্র মিলে যায়। একমাত্র 'উত্তরকাণ্ড' থেকেই জানা যায়, রামজন্মের আগেই গাড়োয়াল হিমালয়ের দেবশিবিরে লঙ্কা-কাণ্ডের পরিকল্পনা এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে অসুর রাক্ষস সাম্রাজ্য ধ্বংসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

গ্রন্থান্তরে মহাভারত-কাহিনী বিশ্লেষণের সময় দেখেছি, পাণ্ডবজন্মের আগেই ব্রহ্মার সভায় আর্যাবর্ত থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গকে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মা পদবিধারী দেবমন্ত্রী প্রজাপতি। বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মার পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই দেবতাদের ঔরসে ক্ষত্রিয় রমণীদের [কুন্তী, মাদ্রী, দেবকী] গর্ভে সন্তান উৎপাদনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি, কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডব এবং বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম। অর্থাৎ, ঐক্ষেত্রেও পাণ্ডবজন্মের আগেই কুরুবংশ সহ আর্যাবর্তের ক্ষমতাসীন ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের ধ্বংসের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন দেবশিবির। ঘটনাটি পৌরাণিক তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা করেছি। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, কুরু পাণ্ডব জন্মের আগেই লেখা হয়ে গেছল ভারতযুদ্ধকথা বা মহাভারতের 'জয়' অংশ। বর্তমান লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থাদি যাঁদের পড়া আছে, আমার কথা তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। এখানে সুযোগ নেই সেই মহাভারত ফিরে বলার। কোন্ কোন্ প্রতাপশালী অসুর [দেববিরোধী] রাজন্যবর্গকে নিহত করতে হবে এবং সেই নিধন পর্বের দ্বারা ধরার ভার লাঘব করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে পুরোহিতপ্রধান আর্যরাজ-তন্ত্র 'ধর্মরাজ্য', 'দেবীভাগবতে' তার একটি লম্বা ফিরিস্তি আছে।[১] এই হত্যার তালিকা প্রস্তুত হয় পাণ্ডবজন্মের আগেই। তালিকা অনুসারে বিভিন্ন কূটচক্রান্তের

১। জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্মম।
শিশুপাল স্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজ প্রতাপবান॥
রুক্মী চ বলবান কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ।
শাল্বঃ গৌভপতি ক্রুর কেশী ধেনুকবৎসকৌ॥ [৪র্থ স্কন্ধ / ১৮-অ]

পৃথ্বীপ্রতিনিধিরা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হয়ে মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিপতি শিশুপাল, কাশীরাজ রুক্মী, কংস, নরক, শাল্বঃ কেশী প্রমুখ দেববিরোধী ক্ষত্রিয় বীরপুরুষদের হত্যা করার জন্য আবেদন জানান। তাঁরা পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী, তাই মহাপাপী এবং পৃথিবীর ভার স্বরূপ বলে বর্ণিত।

দ্বারা দেবতা এবং তাঁদের আশ্রিত আর্য পুরোহিত নেতারা একে একে অসুর রাজাদের কৌশলে খতমও করেছিলেন।

যেহেতু রামায়ণ রামস্তুতিমূলক রামকাহিনী, রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজেরই তাই সেখানে যথেষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। যে বনবাসকে কেন্দ্র ক'রে লঙ্কাকাণ্ড এবং রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সেই বনবাস যাত্রারই সঙ্গত ব্যাখ্যা মূল বাল্মীকি রামায়ণে অস্পষ্ট। কাহিনী সূত্রে দেখি, রামের অভিষেকের আয়োজন খুবই গোপনে সারতে চেয়েছিলেন দশরথ; কিন্তু তাঁর মনোরথ পূর্ণ হয়নি। সর্বদোষের মূল-স্বরূপ কৈকেয়ীকে খাড়া ক'রে রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। অতবড় একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অমন অসম্ভব এক ঘটনাবর্তে গৃহীত হয়ে গেল, অথচ তাই নিয়ে প্রজাকুলে চাঞ্চল্য প্রতিবাদ প্রতিরোধের সৃষ্টি হ'ল না, বরং স্বয়ং বশিষ্ঠও যেন প্রকারান্তরে কৈকেয়ীর প্রস্তাবকেই অনুমোদন করলেন! রামচন্দ্রের মধ্যেও দেখা গেল অকস্মাৎ এক অদ্ভুত মানসিক পরিবর্তন। তিনিও যেন জোর করেই বনগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে সকলের সব উপরোধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। মনে হ'ল, নেপথ্যে কোনো একটি কূটনীতির খেলা হয়ে গেছে যে বিষয়ে রাম কৈকেয়ী দশরথ বশিষ্ঠদের কোনো ধারণা ছিল না। কোনো অমোঘ নেপথ্য নির্দেশে সেই কূটচক্রান্তের কথা অব্যক্তই থেকে গেল। রাম শুধু বললেন, জননী কৈকেয়ীকে এজন্য কেউ যেন দোষারোপ না করে। গল্পটি আপাতভাবে রূপকথার চরিত্র ধারণ করলেও জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা সমস্ত ঘটনাবলীকে অনুসরণ করে আবর্তিত হতে থাকল। আমরা মেনে নিতে পারলাম না, রামের এহেন এক অযৌক্তিক মহানুভবতার কাহিনী। বনবাসের পেছনে যে বস্তুতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এটা বনবাসের পথে পথে বারম্বার প্রমাণিত হতে থাকলে আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হতে থাকে, আর তখনই অনুসন্ধানের ইচ্ছে জাগে। রামায়ণের নেপথ্য রাজনীতির সন্ধানে পাতার পর পাতা উল্টে চলে আসি তাই 'উত্তরকাণ্ডে'।

উত্তরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে শুরু হয়েছে সেই নেপথ্য ইতিহাসের সূচনাপর্ব। এ কাহিনী রামচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন মহর্ষি অগস্ত্য।

সত্যযুগে ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে একবার রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা উপস্থিত হন। ব্রহ্মার পুত্র [বা শিষ্য?] পুলস্ত্য সেই রাজকন্যার সঙ্গে গোপন যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়েছিলেন। রাজাকেও পুলস্ত্যের এই গর্হিতকর্ম মেনে নিতে হয়। কারণ, ব্রহ্মর্ষি মানেই তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্মকর্মে একাগ্রচিত্ত তপস্বী, এমন ভ্রান্ত ধারণার জন্যই ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা নারী-ধর্ষণের

ঘটনাগুলিকেও আমরা ধার্মিক ক্রিয়াচার বলে মান্য করে এসেছি। আসলে ব্রহ্মা যেমন ছিলেন দেবতাদের রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা এক কূটনৈতিক নেতা, যুদ্ধই ছিল যাঁর ধর্মচিন্তা, দেবর্ষি ও মহর্ষিদেরও ছিল তেমনি রাজনৈতিক কর্ম। তাঁরা ছিলেন দেবতাদের দ্বারা নিযুক্ত দেবসাম্রাজ্যের রক্ষক এক একজন ফিল্ড-মার্শাল। আশ্রম বলতে আজ যা বুঝি, আর্য ঋষিদের আশ্রম সেদিন ঠিক তেমনি পর্ণকুটীর মাত্র ছিল না। অনেক আশ্রমই কূটকর্মের অফিস ছিল দেবতাদের আনুকূল্যকারী সেনানিবাস। ঋষি ছিলেন এমনই এক এক গোষ্ঠী সশস্ত্র অনুগামীদের প্রধান। সেই সব আশ্রমে আর্য স্বার্থ সংরক্ষক শাস্ত্রাদির আলোচনা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। রাজারা ভয় পেতেন আর্য মুনি ঋষিদের। ভয় পেতেন ঋষিপ্রবরদের অলৌকিক কোনো ক্ষমতার জন্য নয়, ধর্মগুরুর ভেকধারী ঐ ব্রাহ্মণ নেতারা সেদিন এক একজন ব্রাহ্মণ সেনাপতি এবং দেবশিবিরের আশ্রিত পক্ষ ছিলেন বলেই অনেক রাজা ঐ ব্রাহ্মণ নেতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেন। বাধ্য হতেন তাঁরা ক্ষমতাবান মুনিদের ইচ্ছা পূরণ করতে। মেনে নিতেন এ হেন দেব-প্রতাপে বলীয়ান ব্রাহ্মণদের সকল অন্যায় আবদার। আর এইসব কারণ ছিল বলেই রাজা তৃণবিন্দুও তাঁর ধর্ষিতা কন্যাকে পুলস্ত্যের হাতে সমর্পণ করে একটি সম্ভাব্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছলেন।[২]

যাইহোক, তৃণবিন্দুর কন্যা হবিভূর্র গর্ভে পুলস্ত্যের ঔরসে বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্রবাই রাবণ ও কুবেরের পিতা। বিশ্রবা বা পৌলস্ত্যের সঙ্গে ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনীর বিবাহ হয়। এঁদের মিলনের ফলে জন্ম লাভ করেন কুবের। কুবের মাতৃকুলের আদর্শে দেবপক্ষ অবলম্বন করে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার দ্বারা লোকপাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে বিশ্রবাপুত্র বৈশ্রবণ অথবা কুবের ইন্দ্র বরুণ ও যমের সমপর্যায়ের পদ অলঙ্কৃত ক'রে [৪র্থ লোকপাল]

২। সেকালে ঋষি-আশ্রম যে এক একটি সেনানিবাস ও অস্ত্রাগার ছিল এ প্রমাণ পুরাণ মহাভারত রামায়ণের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। দুর্বাসা ছিলেন দশ হাজার কোপনস্বভাব অনুচরের নেতা। কামধেনু অধিকার নিয়ে জমদগ্নি এবং কার্তবীর্যার্জুনের যুদ্ধকথা বিখ্যাত। জমদগ্নির আশ্রম থেকে সশস্ত্র দেবসেনারা বেরিয়ে কার্তবীর্যের সেনানী ধ্বংস করেছিল। ঋষিদের আশ্রমে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মধ্যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলেছে। আর এমন যুদ্ধবাজ মুনি ঋষি ও দেবতার ইতিবৃত্তই হ'ল পৌরাণিক কথা।

হিমালয়ে দেবরাজ্য শাসনের আংশিক দায়িত্ব লাভ করেন।[৩]

লিঙ্গ ও কূর্মপুরাণ মতে বিশ্রবার চার পত্নী। দেব ও অসুর—এই দুই সম্প্রদায়ের কন্যারই পাণিগ্রহণ করেছিলেন পৌলস্ত্য। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী বলাকা ছিলেন রাক্ষস জাতীয় মাল্যবানের কন্যা। বলাকার তিন ছেলে, ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব এবং একটি মেয়ে, মালিকা। মাল্যবানের অপর কন্যা পুষ্পোৎকটার গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে আরও তিন ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। মেয়ে কুম্ভণসী এবং ছেলেরা প্রখ্যাত রাক্ষস বীর মহোদর মহাপার্শ্ব এবং খর। বিশ্রবার চতুর্থ পত্নী কৈকসী ছিলেন সুমালী রাক্ষসের মেয়ে। কৈকসীর গর্ভেই সমধিক প্রসিদ্ধ রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও শূর্পণখার জন্ম। বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা সকলেই ছিলেন মহাবীর ও স্নেহপ্রবণ রাবণের আশ্রিত। একমাত্র দেববর্ণিনীর পুত্র কুবেরই সকলকে ত্যাগ করে দেবশিবিরের আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং সেই সূত্রে বৈমাত্রেয় ভাইবোনেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক শত্রুতায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে আর্য সম্প্রসারণবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে রাক্ষসকুল ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন রাবণভ্রাতা বিভীষণ।

কিন্তু রাম রাবণের আগেও দেবাসুর যুদ্ধের আর একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুত সংগ্রামের শুরু সেখান থেকেই। রামায়ণের নেপথ্য ঘটনা জানতে আমাদেরও তাই প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে উত্তরকাণ্ড খুলে, যে গ্রন্থ রামায়ণের ঢের পরবর্তী, যদিও তার থেকেই লঙ্কাকাণ্ডের পূর্ববর্তী অবস্থার কথা জানা যায়।

আদি সংঘর্ষ

আদি সংঘর্ষের শুরু রাক্ষসজাতির পূর্বপুরুষ বিদ্যুৎকেশের পৌত্র মাল্যবান সুমালী ও মালীর আমলে। বিদ্যুৎকেশের পুত্র সুকেশ ছিলেন অনার্য দেবতা শিব-পার্বতীর পোষ্যপুত্র। শিবের প্রসাদে সুকেশ যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তিনি শিবপ্রদত্ত উড়ন্ত আকাশযানেরও মালিক হন। সুকেশ বিবাহ করেন গন্ধর্বকন্যা দেববতীকে। দেববতী-সুকেশের তিন ছেলে, মাল্যবান, সুমালী ও মালী।

৩। দেব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত প্রশাসকরাই ছিলেন লোকপাল। পদমর্যাদায় লোকপালরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা। প্রথম শ্রেণীর নেতা ছিলেন তিন দেবপ্রধান, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্কর।

কালক্রমে এই তিন ভাই খুবই প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন এবং স্বর্গরাজ্য আক্রমণ ক'রে ও দেবানুগত ঋষিদের আশ্রমে উৎপাত সৃষ্টি ক'রে দেবগণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেন। এই তিন ভায়ের জন্য শিল্পী বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের দক্ষিণ সাগরে এক পর্বতময় দ্বীপপর্বতের ওপর রাক্ষসনগরী লঙ্কা নির্মাণ করেন। সুমালী ছিলেন রাবণের মাতামহ। সুমালীর কন্যা নিকষা বা কৈকসী ঋষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার স্ত্রী। অর্থাৎ এই সময় দেবজাতি ও রাক্ষসজাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। রাক্ষস ও দেবতারা এভাবেই পরস্পর ভাই ভাই, বিশেষত বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। যেমন বিশ্রবাপুত্র কুবের ও রাবণ।

মালী সুমালী মাল্যবানের প্রতাপে যখন দেবতারা পরাস্ত হতে লাগলেন, তখন দেবতা ও দেবানুচর ঋষিরা ছুটলেন রুদ্র বা দেবনেতা শঙ্করের কাছে। সব শুনে শঙ্কর বললেন, সুকেশের বংশধররা আমার অবধ্য। আমি এ বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তোমরা বরং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই উপায় স্থির করে দেবেন।[১]

অসুর সম্প্রদায়ের উত্থানকেই দেবতারা বলেছেন, 'ধরার ভার বৃদ্ধি' এবং অসুর নিধনের জন্য দেবসভায় যে রাজনৈতিক মন্ত্রণা হয়েছে, মহাভারতে তা-ই 'ভূভার হরণের মন্ত্রণা' নামে প্রসিদ্ধ।[২]

শিবের পরামর্শে দেবতারা অতঃপর বিষ্ণুর সভায় সমাগত হয়ে ভূভার হরণের মন্ত্রণা করলেন। বিষ্ণু বললেন, এই রাক্ষসদের সংবাদ আমি অবগত আছি। তোমরা নিশ্চিন্ত হও, রাক্ষস নিধনের ব্যবস্থা আমিই করব।

দেবসভায় রাক্ষস নিধনের পরিকল্পনা চলছে, চরমুখে সে সংবাদ পেলেন মাল্যবান। তিনি মালী সুমালী ও অন্যান্য রাক্ষস নেতাদের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন

১। পৌরাণিক তথ্যাদির সাহায্যে এ পর্যন্ত যে পুরাকথা উদ্ধার করেছি, তাতে দেখা যায়, অনার্য দেবতা শিব পশুপতি আর্য দেবায়তনের সঙ্গে সন্ধি ক'রে এক সময় আর্যদেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেন ও চুক্তিমত তখন থেকে তিনি নিজেও অসুর আধিপত্য বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হন। আর এভাবেই তিনি ঈশ্বরদের ঈশ্বর, মহেশ্বর এবং দেবতার দেবতা মহাদেব আখ্যা বা পদবিলাভ করেন। আর্য দেবায়তনে অন্যান্যরা দেবতা, একমাত্র পশুপতি শিবই মহাদেব। মহেশ্বরের সেই উত্তরণের ইতিহাস লেখকের 'দেবায়তন হিমালয়' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ।

তৎক্ষণাৎ। স্থির হ'ল, দেবতাদের বিরুদ্ধে সমরায়োজন শুরু করা হবে এবং নালিশকারী দেবতাদের খতম করা হবে দেবরাজ্য গাড়োয়াল হিমালয় অবরোধ করে। হ'লও তাই। ত্রিকূট পর্বতের সুবেল উপত্যকায় লঙ্কা নগরী। লঙ্কার দুর্গ থেকে রাক্ষস সেনারা বিভিন্ন আকাশযানে চেপে গাড়োয়াল হিমালয় অবরোধ করতে ছুটলেন। এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন স্বয়ং দলনেতা বিষ্ণু। কয়েকবার উভয় পক্ষে জয়পরাজয়ের পর রণক্ষেত্রে নিহত হলেন মালী। মালী নিহত হ'লে মাল্যবান ও সুমালী রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এলেন লঙ্কায়। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন রাজত্ব করা সম্ভব হ'ল না। পৌলস্ত্য রাক্ষসেরা অতঃপর লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে পাতাল নামক স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন [সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণে বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ দেশগুলিকে পাতাল বলা হয়েছে]।

'উত্তরকাণ্ডে' দেবাসুর যুদ্ধের এই বিবরণী থেকে আমরা আরও জানতে পারি, মালী বধের আগেও বিষ্ণু অন্যান্য অসুরপ্রধানদের বধ করেছেন, ঘটে গেছে দেবাসুর সংগ্রাম। দেবতারা অসুর নিধনের মন্ত্রণা করছেন শুনে মাল্যবান ভায়েদের বলেছিলেন, "ভ্রাতৃগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণের মৃত্যু! নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সমস্ত মহাবল মহাবীর্য বীরেরা পরাজিত হন নাই। ···বিষ্ণুর হস্তে ইহাদের মৃত্যু! ···"

এভাবেই দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে যুগ যুগ ধরে। দেবসেনাপতি বিষ্ণু দেবরাজ পদে আসীন নির্বাচিত দেবরাজরা অসুর বিতাড়ন করে ভারতবর্ষে আর্য-আধিপত্য স্থাপন করেছেন। তবু ভারতের না-আর্য অসুর সম্প্রদায়কে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। পতনের পর ফের শক্তি সঞ্চয় করে অসুর সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছে, যে জন্য পুরা পিতারা বলেছেন, অসুররা রক্তবীজের বংশধর। তাঁদের খতম করে শেষ করা যায় না। বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘস্থায়ী জমির লড়াইকে ধর্মকর্ম আখ্যা দেওয়া যায় না। কোনো বুদ্ধিমান লোকই তা স্বীকার করবেন না। তবে যে কালে বিজয়ী জাতির লেখা পুরাণই ছিল একমাত্র পাঠ্য ও শ্রাব্য সেকালে মানুষ তর্ক করতে জানত না, তর্ক করার কোনো সুযোগই তাদের দেওয়া হয়নি। সমস্ত বিরোধী পুরাণ ধ্বংস করা হয়েছিল। অশিক্ষার অন্ধকারে বিজিত মানুষকে কবরস্থ ক'রে তাদের মনে দৈবী প্রতাপের প্রহেলিকা সৃষ্টি করা হ'ত। সেই সংস্কারবশতই দেবাসুর সংগ্রাম ধর্মাধর্ম স্থাপনের ইতিকথা রূপে কীর্তিত হয়ে এসেছে যার মূলে

কোনো ঐতিহাসিক অথবা শাশ্বত সত্য নেই।

দেবতারাও যে মানুষের মতোই মরণশীল একথা পুরাণ মহাভারতে বারম্বার স্বকৃতি লাভ করেছে। রামায়ণে এই স্বীকৃতি স্বয়ং বিষ্ণুর মুখেই উচ্চারিত হ'তে শুনি। মালী নিহত হ'লে রাক্ষস সৈন্যরা নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করেছিলেন। রাক্ষস শিবিরে এই ভাঙন লক্ষ্য করে বিষ্ণু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে পলায়নপর রাক্ষস সেনা বধ করতে শুরু করলেন। এ ধরনের রণনীতি কিন্তু অনার্য জাতির মধ্যে নিন্দনীয় ছিল। আশ্রিত, শরণাগত, আত্ম-সমর্পণকারী এবং রণবিমুখ শত্রুকে না-আর্য বীরপুরুষরা বধ করতেন না। বিনা যুদ্ধে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুকে হনন করাও নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ। অন্যদিকে আর্যরা ছলে বলে কৌশলে অভীষ্ট সাধনকেই ধর্ম জ্ঞান করতেন। মাল্যবান বিষ্ণুকে নিয়মাতিক্রম ক'রে রাক্ষস সৈন্য বধ করতে দেখে বললেন, "বিষ্ণো! আমরা ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তুমি যখন নীচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ তখন প্রাচীন ক্ষাত্রধর্ম নিশ্চয় তোমার জানা নাই।..."

উত্তরে বিষ্ণু বলেছিলেন, "রাক্ষস! দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত, আমি তাঁহাদিগকে অভয়দানপূর্বক কহিয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্মূল করিব, এখানে সেই কাযেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের **প্রাণ দিয়াও** সর্বদা দেবগণের প্রিয় কার্য করা আমার কর্তব্য..."

দেবাসুর যুদ্ধের এক পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল ত্রিকূট অন্তর্গত সুবেল পর্বতের স্বর্ণলঙ্কা থেকে পরাক্রান্ত সুকেশপুত্র রাক্ষস ভ্রাতৃগণকে বিতাড়িত করে। রাক্ষসরা বিতাড়িত হলে জনশূন্য লঙ্কাপুরীতে দেবতারা চতুর্থ লোকপাল রাবণভ্রাতা কুবেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামায়ণী বিবরণ, "যখন সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুত্র পৌত্রের সহিত পাতালতলে বিচরণ করিতেছিল তৎকালে কুবের লঙ্কায় বাস করিতে-ছিলেন।"[৩]

কুবের রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই, বয়সে অনেক বড়ঃ রাবণের যখন জন্মই হয়নি, কুবের তখন লঙ্কার অধিপতি হয়েছেন। এই সময় রাক্ষসরাজ, সুমালী একদিন কুবেরকে দেবদত্ত পুষ্পক বিমানে চেপে আকাশমার্গ অতিক্রম করতে

৩। উত্তরকাণ্ড। ৮ম সর্গ। ভারবি সং॥ অনেকের ধারণা কেরল প্রভৃতি অঞ্চলই পৌরাণিক পাতাল। দক্ষিণদেশের কতকাংশে রাবণানুরাগীদের বসতি ছিল, তা রামায়ণেই উল্লিখিত আছে।

দেখলেন। দেবতাদের সহায়তায় কুবেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্পদশালী দেখে সুমালী স্থির করলেন, নিজ কন্যা পরমা সুন্দরী কৈকসীর সঙ্গে তিনি কুবের-পিতা বিশ্রবার বিবাহ দেবেন, এই বিবাহ সম্ভব হলে কৈকসীর গর্ভজাত পুত্রেরাও কুবের-তুল্য সম্পদের মালিক হতে পারবেন। মনে মনে সঙ্কল্প করে কন্যা কৈকসীকে সুমালী বললেন, "বৎসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতীত হয়। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে এতদিন কেহই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। ...কন্যাকে যে কে প্রার্থনা করিবে কিছুই বুঝা যায় না, এই-ই কষ্ট। ...তুমি এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মার বংশোদ্ভব মুনিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। তুমি স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ কর। তেজে সূর্যতুল্য[৪] কুবের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, বলিতে কি তোমার পুত্রেরাও ঐরূপ হইবে।" পিতার অনুজ্ঞাক্রমে কৈকসী নিজে গিয়ে বিশ্রবাকে স্বামীরূপে বরণ করলেন এবং বিশ্রবার ঔরসে তিন পুত্র, রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ এবং এক কন্যা, শূর্পনখার মাতৃত্ব লাভ করে তৃপ্ত হলেন। কুবের, সুতরাং, ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাবণের প্রায় মায়ের বয়সী।

খুব অল্প বয়স থেকেই রাবণ অধ্যয়ন ও তপস্যার দ্বারা নিজেকে জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যায় সমৃদ্ধ করে তোলেন। তিনি ছিলেন সদাচারী ন্যায়নিষ্ঠ এবং ভ্রাতৃ-বৎসল। রাবণমাতা কৈকসী রাবণকে কুবেরের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন প্রায়ই। ফলে রাবণও কুবেরতুল্য প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেন এবং ব্রহ্মার বর লাভ করে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন।

এক সময় রাবণের মাতামহ সুমালী রাবণকে বললেন,—লঙ্কাপুরী এক সময় রাক্ষস অর্থাৎ অসুরগণেরই স্বদেশ ছিল। দেবতা বিষ্ণু সেই লঙ্কাপুরী থেকে রাক্ষসজাতিকে উৎখাত করে লঙ্কেশ্বর রূপে কুবেরকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুবের দেবানুরক্ত। এখন রাবণ যথেষ্ট পরাক্রমশালী হয়েছেন। ইচ্ছে করলে তিনি

৪। রামায়ণ মহাভারত পুরাণে সাধারণত শৌর্যবীর্যের আদর্শ হিসেবে দেবরাজ ইন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সুমালী সূর্যতুল্য তেজের প্রশংসা করেছেন। এই ব্যতিক্রম খুবই সংগত। দেব ও অসুর দুপক্ষই ছিলেন আর্য গোষ্ঠীভুক্ত। এঁরা কালক্রমে দুই বিবদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অসুর পক্ষে নেতৃস্থানীয় দেবতা ছিলেন সূর্য। অন্য দিকে দেবপক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বিষ্ণু ও ইন্দ্র এবং পরবর্তী পর্যায়ে মহেশ্বর।

লঙ্কা পুনরুদ্ধার করে সেখানে রাক্ষসজাতিকে পুনর্বাসিত করতে পারেন। বললেন, "এই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষসবংশ উদ্ধার করিলে তুমিই ইহাদের প্রভু হইবে।"

কিন্তু রাজি হলেন না তরুণ রাক্ষসবীর রাবণ সেই প্রস্তাবে। সুমালীকে বললেন, "আর্য! ধনাধিপতি কুবের আমাদিগের গুরু, তাহার প্রতিকূলে এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে না।"

ক্ষমতাশালী নাতির ওপর সেদিন আর কোনো কথা বলার সাহস পাননি সুমালী। তাঁর বড় আশা ছিল, রাবণের বাহুবলে উদ্বাস্তু রাক্ষসরা পুনরায় তাদের পিতৃভূমি পুনর্দখল করতে পারবেন। কিন্তু সে আশা বুঝি আর ফলবতী হয় না। ভগ্ন মনে সেদিন ফিরে গেছলেন সুমালী। কিন্তু চেষ্টা ছাড়েননি।

এরপর একদিন রাবণকে একান্তে পেয়ে সুমালীর মন্ত্রী প্রহস্ত সুমালীর প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপন করে বললেন, বীর! রাজনীতিতে জ্ঞাতি বন্ধুর স্থান নেই। দেখো, অদিতি ও দিতি নামে দুই বোন ছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসাও ছিল যথেষ্ট। তাঁদের বিবাহ হয় কশ্যপ মুনির সঙ্গে। দুই বোনের সন্তানাদিও জন্ম-গ্রহণ ক'রে একই সঙ্গে বড় হ'তে থাকে। দিতির ছেলেরাই প্রথমে ক্ষমতাশালী রাজা হন, তাদের বংশধারা দৈত্য-বংশ নামে প্রখ্যাত হয়েছিল। পরে বিষ্ণু[৫] ঐ দৈত্যাধিপতিদের বধ করে তাঁদের রাজত্বে অদিতির ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। অদিতিপুত্ররা পৃথিবীতে প্রখ্যাত হন দেববংশ নামে। একই পিতার সন্তানরা এককালে এইভাবে পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ান। সুর আর অসুরের মধ্যে সেই থেকে বৈরী সম্পর্ক। সুতরাং পিতৃভূমি অধিকারের জন্য কুবেরের সঙ্গে সংগ্রাম হ'লে তুমিই প্রথম ভ্রাতৃদ্রোহ করবে এমন নয়, এই শত্রুভাব আগেই সৃষ্টি করেছেন দেবনেতা বিষ্ণু, আগেই ঘটে গেছে রক্তক্ষয়ী দেবাসুর যুদ্ধ।

প্রহস্তর কাছে দেবাসুরের পরিচয় ও ইতিহাস জেনে ন্যায় নীতি প্রসঙ্গে রাবণ পুনরায় চিন্তা শুরু করলেন। তাইতো, দেবতা দৈত্য রাক্ষস দানব কেবলমাত্র আদি শত্রুতা সূত্রেই কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। তারা ছিল একই পিতৃ-ঔরসে জাত একই পিতৃভূমির অধিকারী। আর এই বিভেদ যদি দেবনেতারাই সৃষ্টি করে থাকেন, সেটাই যদি হয়ে থাকে দেবতাদের ধর্মকর্ম, তবে

৫। বিষ্ণু কি অমর? যুগে যুগে এই বিষ্ণুর অস্তিত্ব কি অলৌকিক? না, আমরা বর্তমান গ্রন্থে এবং মৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থে পুরাণ প্রমাণ সহ দেখিয়েছি, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না, ছিল পদাধিকারের পদবী।

দৈত্যরাক্ষসরা তাদের স্বদেশ পুনরুদ্ধার করতে চাইলে সেই দাবি অন্যায় বা অধর্ম হবে কেন ?

কিন্তু প্রথমেই রাবণ কোনো রকম অশালীন প্রস্তাব পাঠাতে চাইলেন না লঙ্কাধিপতি কুবেরের কাছে। প্রহস্তকে বললেন, তুমি লঙ্কায় গিয়ে কুবেরকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বিনীতভাবে বলবে, আপনার ভাই দশগ্রীব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর বার্তা, লঙ্কাপুরী পূর্বে সুমালী প্রভৃতি মহাবল রাক্ষস-রাজগণের অধিকৃত ছিল। তাই দশগ্রীবের বিনীত প্রার্থনা, কুবের সেই লঙ্কাপুরী রাক্ষসদের প্রত্যার্পণ করুন।

না, কোনো বিবাদ হ'ল না। বিশ্রবার দুই পুত্রই যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণ। প্রহস্তের মুখে রাবণের প্রার্থনার কথা শুনে কুবের বললেন, দূত ! রাবণকে বলো, পিতা এককালে এই রাক্ষসশূন্য লঙ্কাপুরী আমার বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে এ রাজ্য রাক্ষসদের, অতএব এটি বস্তুতই রাবণের প্রাপ্য। আমি লঙ্কা রাবণকে অবশ্যই প্রত্যর্পণ করছি। সে এসে নিষ্কণ্টকে রাক্ষসগণের সঙ্গে এ রাজ্য ভোগ করুক। এই বলে কুবের পিতা বিশ্রবাকে গিয়ে বললেন, পিতঃ ! রাবণের দাবির যাথার্থ্য আমি মেনে নিয়েছি। আপনি লঙ্কাপুরী রাবণকেই দিন এবং আমার বাসস্থানও নির্দিষ্ট ক'রে দিন।

পৃথিবীতে এমন নির্বিবাদ সুসভ্য উপায়ে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা আর কেউ কোথাও করেছেন বলে আমার জানা নেই। ভায়ে ভায়ে, বিশেষত বৈমাত্র ভ্রাতৃদ্বয়ে এহেন সদ্ভাবও ইতিহাসে বিরল। কিন্তু দেবতাদের কূটকর্ম ও অদ্ভুত ধর্মনীতি এই ন্যায় সত্য ও সৌভ্রাত্রকে সেকালে ছিন্নভিন্ন করেছিল। তাই দেবজন লিখিত রামায়ণ মহাভারত পুরাণে কুবের দশাননের মধ্যে বিনাযুদ্ধে এমন এক আপোস মীমাংসার কথা আদর্শ কীর্তি হিসেবে উল্লিখিত হয়নি। দেবতারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ক্রূর ভ্রাতৃহত্যার শোণিতে রঞ্জিত করেছিলেন। তাঁরা তাই আদর্শ ধর্মকথাকে বর্ণনীয় বিষয়ের বাইরে রেখে কেবলমাত্র বৈরিতার ইতিকথাই গেয়ে বেড়িয়েছেন। আগেই নির্বিচারে অসুর সম্প্রদায়কে পাপিষ্ঠ কদাকার রাক্ষস-খোক্কস রূপে চিত্রিত করে আপন স্বার্থসাধক ইতিহাস লিখিয়েছিলেন স্বশিবিরভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে। সেজন্য তাদের গড়তে হয়েছিল অজস্র মিথ্যা গল্প, ইতিবৃত্তকে মুড়তে হয়েছিল রূপকথার চমকদার মোড়কে। পরে রামায়ণের খিলভাগ উত্তরকাণ্ডে প্রকৃত ইতিবৃত্ত সংকলিত ও প্রচারিত হয়। সেজন্যই বলি, রামায়ণ মহাভারত পাঠ শেষ পরিচ্ছেদ থেকে শুরু না করলে অপহৃত প্রকৃত তথ্যের প্রতি পাঠকের

নজর আকৃষ্ট হয় না।

তবু কিন্তু রামায়ণ কথার প্রাক্ ইতিহাস এইখানেও শুরু নয়। আরও কিছুকাল পরে তার সূত্রপাত। অতঃপর সেকথায় আসি।

রাম না হ'তেই, অর্থাৎ রামচন্দ্রের জন্মের আগেই রামায়ণ লিখিত হয়েছিল দেবতাদের সভায়, গন্ধমাদন পর্বতে। খবরটা রাবণের কাছে পাঠিয়েছিলেন দেবশিবিরভুক্ত রাবণভ্রাতা কুবের।

একদিন রাবণের রাজসভায় কুবের-প্রেরিত এক দূত এসে জানালেন, রাবণের প্রতাপবৃদ্ধিতে শঙ্কিত দেবতা ও দেবস্তাবক ঋষিরা রাবণবধের পরিকল্পনা শুরু করেছেন। কুবের রাবণকে সাবধান ক'রে বলে পাঠিয়েছেন, রাবণ যেন অতঃপর হিমালয় অভিযান থেকে ও দেবস্তাবক ঋষিদের স্বার্থহানিকর কাজ থেকে বিরত থাকেন নচেৎ দেবাসুর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কুবের তাঁর বার্তায় জানিয়েছিলেন, স্বয়ং শঙ্কর হয়েছেন কুবেরের মিত্রপক্ষ এবং শঙ্কর দেবতাদেরও রক্ষক। সুতরাং রাবণ যেন দেবতাদের বশ্যতা স্বীকার করে মৈত্রী স্থাপন করেন ও রাক্ষসদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নেন।

রাবণ কিন্তু দেবতাদের কাছে নতি স্বীকারে রাজি হননি। তিনি সম্মুখ সমরে শক্তি পরীক্ষার জন্য কুবেররাজ্য অলকাপুরী আক্রমণ করলেন। কুবের ছিলেন অলকার যক্ষগণের পালক, দেবসাম্রাজ্যের চতুর্থ লোকপাল অর্থাৎ দেবপক্ষীয় এক নেতা। সুতরাং রাবণ-কুবের সংগ্রাম বাধল হিমালয়ে এবং আবার একটি দেবাসুর যুদ্ধের সূচনা হল এভাবেই।

রাবণ কর্তৃক স্বর্গ আক্রমণ

বদ্রীনাথের পথে নন্দনকানন। গাড়োয়াল হিমালয়ে গন্ধমাদন পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত এই নন্দনকানন পর্যন্ত রাবণ আগেই এসেছেন। জয়ও করেছিলেন কুবের প্রজা যক্ষগণ রক্ষিত অপূর্ব শোভাময়ী সেই পার্বত্য কাননটি। এবার তাঁর লক্ষ্য আরও উত্তর দিকে। সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন তিনি মণিভদ্রপুরম্ বা আধুনিক মানাগ্রামের দিকে। এই মণিভদ্রপুরম্ সেকালে অলকাপুরীর অন্তর্গত ছিল। অলকাপুরী ছিল যক্ষরাজ কুবেরের পার্বত্য রাজধানী। আর মণিভদ্রপুরম্ শাসন করতেন কুবেরের আজ্ঞাবহ গন্ধর্ব মণিভদ্র। মানার বাসিন্দা আজকের আর্যদের দিকে

তাকিয়ে যেমন পৌরাণিক যক্ষ গন্ধর্বদের সৌন্দর্য ও সম্পদের পরিমাপ করা অসম্ভব, তেমনিই খোঁজ করা বৃথা গাড়োয়াল হিমালয়ের বুকে আর্য দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত সেই পৌরাণিক স্বর্গরাজ্যটি। ঐশ্বর্য, পার্থিব সম্পদ ও প্রাকৃতিক শোভায় যা ছিল সেকালে সমতল ভারতবর্ষের চোখে লোভনীয় এবং ঈর্ষণীয় সাম্রাজ্য। সম্পদশালিনী হিমালয়ের রমরমা সেযুগে সমতল ভারতের অসুর রাজন্যবর্গকে বারবার হিমালয় অভিযানে প্রলুব্ধ করেছে। অন্যদিকে হিমালয় থেকে আর্য দেববাহিনী নেমে এসেছেন আর্যাবর্ত অধিকার করতে।

বদ্রীনাথের সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার সৌন্দর্যে আজও তীর্থযাত্রীরা মুগ্ধ হন; আজ সেটি প্রকৃতি রাজ্যের স্বর্গপুরী। সেকালে ঐখানেই ছিল বিষ্ণু দেবতার প্রাসাদ আর গড় দুর্গ। সে অঞ্চল ছিল দেবসেনাদের দ্বারা সুরক্ষিত। ছিল সেখানে পার্বত্য যানবাহন, ছিল বিমানাবতরণ ক্ষেত্র। এসব তথ্য মহাভারত পুরাণ থেকে অনায়াসেই আহরণ করা যায় [লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' ও 'যদুবংশ' গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য]।

বদ্রীনাথের নিচের পাহাড়ে ধৃতরাষ্ট্র-ভ্রাতা পাণ্ডুর পার্বত্য আবাস পাণ্ডুকেশ্বর অথবা তৎসন্নিহিত গোবিন্দঘাট থেকে এখন নন্দনকাননে যাওয়া যায়। রাবণ সেদিন ঐ নন্দনকানন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কুবের সেনার দখল থেকে।

মানা গ্রামে দেব-দখলদারির চিহ্ন আজ কিছুই না থাকলেও জনশ্রুতি কাল-প্রবাহে ভেসে ভেসে সেই সব গুহা গুম্ফায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মানাবাসীদের কাছে সে কাহিনী অক্ষয় হয়ে আছে পুরাযুগের স্মারক স্মরণিকা রূপে। পরপর কয়েকটি পার্বত্য গুহা দেখিয়ে মানাবাসীরা আজও বলেন, ঐটি ছিল ব্যাসদেবের গুহা; আর ঐটি গণেশের। এখানে বসেই ব্যাস মহাভারত রচনা করেন এবং গণেশ সেই মহাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মানায় ভীম ও মুচকুন্দের নামেও গুহা আছে; অর্থাৎ মণিভদ্রপুরম্ রামায়ণ মহাভারতের স্মৃতি বহন করছে, যেমন পাণ্ডুকেশ্বর পাণ্ডবদের, বদ্রীনাথ বিষ্ণুর, কৈলাস মহেশ্বরের, সুমেরু বা বদ্রীনাথের নারায়ণ পর্বত ব্রহ্মার, নৈনিতাল বা ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রের, অলকাপুরী বৈশ্রবণ কুবের-এর। তবে মণিভদ্রপুরম্‌কে খুঁজে পাওয়া গেলেও কুবের রাজ্য অলকাপুরীকে সঠিক চিহ্নিত করার উপায় নেই। সে রাজ্য বরফাবৃত।

মানা থেকে আরও তিন কিলোমিটার উত্তরে সরস্বতী নদীর উৎস। এই সরস্বতী আর অলকানন্দার সঙ্গমস্থল কেশবপ্রয়াগ মণিভদ্রপুরমের অন্তর্ভুক্ত। সরস্বতীর ধারা ধরে এককালে তিব্বতে কৈলাসে যাওয়া যেত। বসুধারা জলপ্রপাতটিও মানা

থেকে একই দূরত্বে অবস্থিত। বসুধারা প্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে অলকাপুরী হিমবাহের চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ হিমবাহ থেকেই অলকানন্দার উৎপত্তি। পুরাণে অলকানন্দা মন্দাকিনী সরস্বতী ভাগীরথী সবই স্বর্নদী। এসেছে তারা স্বর্গ থেকে নেমে। খুবই সাধারণ ব্যাপার। আগেই বলেছি সেকালে গাড়োয়াল হিমালয়েরই নাম ছিল স্বর্গ।[১]

রাবণের পথ অবরোধ করে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন মণিভদ্রের গন্ধর্ব এবং যক্ষ সেনারা। কিন্তু মণিভদ্র এবং কুবের উভয়েই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। রাবণ কুবের রাজ্য জয় করে ব্রহ্মাপ্রদত্ত কুবেরের পুষ্পক রথটি নিয়ে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে দেবলোক। মন্ত্রণাসভা আহূত হয় ভৌম স্বর্গ হিমালয়ে। শুরু হয় রাবণবধের পরিকল্পনা। কিন্তু রাবণের অগ্রগতি কোনোভাবেই ঠেকানো গেল না। ইন্দ্র বরুণ সূর্য, একে একে সকল দেবনেতারাই পরাজিত হলেন। রাবণপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করেন, ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় রাবণ অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেন। এভাবেই দেবাসুর যুদ্ধ চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলছিল।

ইন্দ্র রাবণসেনার যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে বিষ্ণুর কাছে ছুটে গেছলেন। কিন্তু রাবণকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি তখন বিষ্ণুরও ছিল না। তিনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমি শত্রুনাশ না করিয়া কদাচ যুদ্ধ হইতে ফিরি না···(কিন্তু) এখন তাহাকে (রাবণকে) পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমাত্র নাই। দেবরাজ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অতঃপর আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইব।"

অর্থাৎ সম্যক প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধে নেমে ভগবান অপদস্থ হ'তে চাননি। রামায়ণ মহাভারত পুরাণে বিষ্ণু আদি দেবতারা পরমেশ্বরতুল্য ক্ষমতাশালী এবং যখন যে দেবতার স্তুতিকল্পে যে পুরাণ লিখিত হয়েছে, সেই পুরাণে সেই দেবতাকে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারী জগৎস্রষ্টার মর্যাদা দিয়েছেন পুরাণকারেরা। কিন্তু এই

১। নন্দনকাননে পুষ্পচয়ন করতে গিয়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন একবার কুবের সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে ভৌমস্বর্গ হিমালয়ের নিখুঁত বর্ণনা আছে ['পাথুরে স্বর্গের পথে পথে'/কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ]।

বিষ্ণুপুরাণে পরাশর মুনি বলেছেন, হিমালয়ই পৃথিবীর স্বর্গ/'ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্মিণামালয়া মুনে॥'

দেবতাদের দৌড় যে সাধারণ রাজা-রাজড়ার চেয়ে কম বই বেশি ছিল না, পৌরাণিক ইতিবৃত্তগুলিই তার প্রমাণ। বিষ্ণু রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে সাহসী হননি। জগদীশ্বর হ'লে বিষ্ণু মহারাজকে সসৈন্যে সামান্য এক মানবপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ত না। যুদ্ধ করা সর্বশক্তিমান পরমস্রষ্টার কাজও নয়। পুরাণকার নিজেই তাঁর রচনাকে বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন এইভাবে। যাইহোক, ইন্দ্র কোনো সাহায্য না পেয়ে দেবসেনাদের বর্মে শস্ত্রে সজ্জিত করে সমরাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জন করতে পাঠিয়েছিলেন। এভাবেই হিমালয়ের বুকে বহু দেবতার কঙ্কাল আজও হয়ত বরফচাপা পড়ে আছে। দেবতারা অমর, এই মিথ্যাভাষণের পক্ষে কোনো তথ্য নজির ও যুক্তি নেই।

রাবণবধের জন্য অতঃপর দেবতাদের একটি অভিনব পরিকল্পনা করতে হয়। মহাভারত পর্বে অসুররাজগণকে ধ্বংস করার জন্যও তাঁরা একই ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিলেন। এক পরাক্রান্ত শত্রুকে বিনষ্ট করার জন্য তাঁরা প্রায় এক প্রজন্মকাল প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ শত্রু যখন বৃদ্ধ ও অথর্বপ্রায় হয়েছে, তখন তাকে তাঁরা তরুণ নবীন প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রমণ করিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে পৌরাণিক কথায় যদি প্রকৃত প্রহেলিকা কিছু থাকে, তবে তা হ'ল, যুদ্ধজয়ের জন্য এমনি একটি নয়া প্রজন্মের সৃষ্টি করা।

মহাভারতপর্বে কুরুপাণ্ডবদের জন্ম ও উপযুক্ত বয়ঃক্রম লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, ধৃতরাষ্ট্র, জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালদের মতো অসুর নেতাদের উৎখাত করে আর্যাবর্তে একটি দেবজন-শাসিত বর্ণভেদপ্রধান সমাজ পত্তন করা। রামায়ণে রামভ্রাতৃগণ সৃষ্টির মৌল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতে উত্তরদেশীয় আর্যদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করা। প্রহেলিকা এই, এমনতর দীর্ঘ পরিকল্পনা ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে কি ভারতবর্ষে আর্যিকরণ সম্ভবপর ছিল না? নাকি উভয় ক্ষেত্রে ব্রহ্মার এই পরিকল্পনার বিষয়টিও মুনিতে বানানো রূপকথা! হয়ত ঘটনা ঘটেছিল যথা নিয়মেই। পরে রাম কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের দেবসত্তা প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি সাজানো ইতিবৃত্ত তৈরী হয়েছিল? পৌরাণিক কথায় যেভাবে পুরাণকারেরা মিথ্যার জোড়াতালি দিয়ে ইতিবৃত্ত গ্রন্থনা করেছিলেন, তাতে ব্রহ্মার ভূ-ভার হরণের মন্ত্রণা এবং তদনুসারে কৃষ্ণ পাণ্ডব ও রাম-লক্ষ্মণাদির জন্মকথাও বিশেষ লিখনচাতুর্যে সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত বিচারে আমাদের একটি মূল সূত্র ধরে অগ্রসর হ'তেই হবে। মনগড়া কোনো সূত্র তৈরী করে মহাগ্রন্থ দুটির পুনর্বিচারে আমরা বসব না বলে আমি আগেই অঙ্গীকার করে

নিয়েছি।

যেজন্যই হোক, রাম কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের যে দেব-ঔরসে জন্ম, একথা আমাদের মেনে নিতেই হয়। কেননা তাঁদের অন্যতর কোনো জন্মবৃত্তান্ত আমাদের জানানো হয়নি।

রাবণবধের চক্রান্ত দেবতারা করেছিলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উপস্থিতিতে। মহাভারতে ভূভার হরণ অর্থাৎ আর্যাবর্তকে নিঃক্ষত্রিয় করার পরিকল্পনা হয়েছিল সুমেরু পর্বতে [বদ্রীনাথ অঞ্চলে] ব্রহ্মার সভায়। রামায়ণের বালকাণ্ড থেকে জানা যায়, রাবণবধের চক্রান্তটি হয়েছিল দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সমবেত দেবতাদের আসরে। ব্রহ্মার সুমেরু সভায় মুনি ঋষিদের অভিযোগটি ধরিত্রীর আবেদন ব'লে প্রচারিত হয়েছিল মহাভারতে। সেখানে পুরাকথক সাংকেতিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রামায়ণে কিন্তু এ ধরনের রূপকথা সাজানো হয়নি, সোজাসুজি বলা হয়েছে, দেবতা ব্রাহ্মণ ও দেবস্তাবক ঋষিরা একযোগে রাবণের অত্যাচারের কথা বর্ণনা ক'রে ব্রহ্মাকে প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করতে অনুরোধ করেন। এই সময় সভাস্থলে দেবতা বিষ্ণুর আগমন ঘটলে দেবতারা বিষ্ণুর ওপর রাবণবধের দায়িত্ব অর্পণ করে বললেন, হে বিষ্ণু, তোমাকেই এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। ব্রহ্মা বললেন, দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ-রক্ষদের হাতে রাবণের মৃত্যু নেই। 'মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে, তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না।'

এইখানে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবশ্য একটি গল্পও গড়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাবণ ব্রহ্মার বরে দেবতা গন্ধর্বাদির অবধ্য হয়েছেন। একমাত্র মনুষ্য সন্তান ব্যতীত অপর কেউই রাবণকে নিহত করতে পারবেন না। পুরাকথায় এভাবে দৈবীমাহাত্ম্য সৃষ্টিকল্পে যথেচ্ছ কল্প-গল্প তৈরী হয়েছিল। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে আলোচনাসূত্রে আমরা বারবারই প্রমাণ পেয়েছি, ঐ গল্পগুলি দেবতাদের মাহাত্ম্য সৃষ্টির জন্যই বিশেষভাবে রচিত যার পেছনে কোনো তর্ক যুক্তি প্রমাণের বালাই নেই। এখানে তাই ব্রহ্মার বরদানের ধোঁকাটি আগে বিশ্লেষণ করে নেওয়া দরকার। নচেৎ পাঠকমনে ব্রহ্মার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়টি নানা জট-জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

রামায়ণ পাঠে আমরা জানতে পারি, তরুণ বয়সে রাবণ ব্রহ্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কুবের ও অন্যান্য দেবতাদের প্রতিও। হ'তে পারে এই সময় ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি কিছু দৈব্যাস্ত্রও লাভ করেন। কিন্তু যে ব্রহ্মা নিজ শিবিরভুক্ত দেবতাদেরই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে অপারগ হয়ে রাবণবধের

জন্য দেবতাদের সভায় ষড়যন্ত্রের অংশীদার হন, তাঁকে কোনো অলৌকিক বরদাতা-রূপে কল্পনাই করা যায় না। ব্রহ্মার বরদানের তেমন ক্ষমতা থাকলে তিনি দেবতা-দেরই বরদান করে রাবণের অবধ্য বানিয়ে দিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে রাবণ ও রাক্ষস সৈন্যরা দেবতা গন্ধর্বদের মেরেকেটে ভৌমস্বর্গ হিমালয়ে দেবতাদের শ্মশান বানাতে পারতেন না। কিন্তু ব্রহ্মার পক্ষে ততদূর শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কারণ জন্ম-মৃত্যু জাতকর্মের অধীন কোনো ব্যক্তিরই কারোকে অমর বানানোর ক্ষমতা নেই। ব্রহ্মা নিজেই যেক্ষেত্রে অমর নন, যিনি লোকস্রষ্টা নন, নন জগদীশ্বর, অথচ পুরাণকারদের দ্বারা সেভাবেই কীর্তিত, তাঁর পক্ষে রাবণকে মনুষ্য ব্যতীত অপর সকলের অবধ্য হও বলে বর দেওয়া কেমন করে সম্ভব!

সুতরাং পুরাগ্রন্থের ঘটনাবলীকে যেমন পাওয়া যাচ্ছে সেইভাবে গ্রহণ করে সেই ঘটনার সম্ভব অসম্ভব দিক বিশ্লেষণ করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে হবে। আর সেভাবে দেখলে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যে দেবতারা রাবণশত্রু, তাদেরই এক দলনেতার পক্ষে রাবণকে অমরত্বের বরদান করা যেমনি অসম্ভব ব্যাপার, লড়াকু দেহধারী কোনো দেবতার সে ধরনের বর দেওয়ার ক্ষমতাও তেমনিই অবিশ্বাস্য। তাই বর দানের গল্পটিকে মুনিতে বানানো উপন্যাস হিসেবে পরিত্যাগ করে আসল ঘটনা বিচার করে দেখাই যুক্তিযুক্ত।

আসল ঘটনা, দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে মিলিত হয়ে দেবতারা রাবণবধের পরিকল্পনা করেছিলেন। অভিনব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় দেবতারা স্থির করেন, তাঁদের হিমালয় শিবির রাবণের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ অতঃপর এড়িয়ে চলবে। যুদ্ধ সংঘর্ষকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে সমতল ভারত ভূমিতে। সমতলে রাবণকে ব্যস্ত রাখতে পারলে হিমালয়ের দেবশিবির সংঘর্ষ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। সেই সময় বরং তাঁরা নেপথ্যে থেকে সমতলের দেবানুগত রাজন্যবর্গকে গোপনে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করবেন। ঠিক একই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেবতারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালেও গ্রহণ করেছিলেন, সেকথা গ্রন্থান্তরে আলোচনা করেছি।

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রহ্মাকে সভাপতি ক'রে রাবণবধের জন্য দেবতারা যে আলোচনা চক্রে বসেছিলেন সেখানে স্থির হ'ল, বিষ্ণু দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে যথাসময়ে রাবণকে 'সমরে সংহার করবেন'।

রাম না হ'তেই রামায়ণকথা সেদিন এভাবেই লিখিত হয়েছিল, সে কথা অতএব কেবলমাত্র রটনা নয়, বাস্তব ঘটনা। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তকে ঘটনা বলার

সাহস পেয়েছি আমি মহাভারত আলোচনা সূত্রে। দেখেছি, ভূভার হরণের জন্য দেবতা ও দেবানুগত আর্য নেতাদের অংশক্রমে মানবীগর্ভে জন্মগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন ব্রহ্মা। উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতাসীন পৃথ্বীপতিদের সঙ্গে একটি মনুষ্য গোষ্ঠীকে জন্মসূত্রে বিচ্ছিন্ন করে আর্যাবর্তে পরস্পর বৈরী দেব ও অসুর সম্প্রদায় সৃষ্টি করা এবং দুই বিশ্লিষ্ট স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিয়ে দেবস্বার্থ রক্ষা করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করা দেবানুশাসিত একটি সমাজ ব্যবস্থার। এক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের চক্রান্ত হয়েছিল।

কোনো দেবতা বা ঋষির মানবীগর্ভে জন্মগ্রহণ করার প্রহেলিকাটি পরিষ্কার। প্রাকৃতিক উপায়ে সঙ্গমের দ্বারা অথবা মানবীগর্ভে দেবতা বা ঋষির ভ্রূণ প্রোথিত ক'রে সেই দেবতা ও ঋষির ঔরসে সন্তানের জন্ম দান করাকেই দেবতারা সরাসরি জন্মদাতার দ্বিতীয় জন্ম বলে প্রচার করে গেছেন। এ কথার অর্থ, দেবতার মানবী গর্ভে সরাসরি জন্মগ্রহণ নয়, তা যেমন মহাভারত প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করা গেছে রামায়ণ কথাসূত্রেও সে রহস্যের উন্মোচনে একইভাবে সফল হতে পারি আমরা। আসলে চতুর আর্যবুদ্ধিজীবীরা তাঁদের অকল্পনীয় লিখনচাতুর্যের দ্বারা এইভাবে নিতান্ত জাগতিক ঘটনাকে অলৌকিক ঐশ্বরিক মহিমা দান করে অবতারবাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

পিতৃপরিচয়

যে সামাজিক প্রথায় দেব-ঔরসে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবরা পাণ্ডুপুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামে খ্যাত, সেই একই প্রচলিত বিধানে রামচন্দ্রও দশরথ-তনয়।

সে কালে অপুত্রক রাজারা সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ রাজমহিষী স্বামী অথবা শ্বশুরালয়ের অভিভাবক শ্রেণীর দ্বারা নির্বাচিত কোনো পুরুষের ঔরসে গর্ভধারণ ক'রে যে পুত্রের জন্ম দিতেন, সন্তানোৎপাদনে অক্ষম রাজা সেই ক্ষেত্রজ পুত্রকেই তাঁর বংশধর এবং সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে সানন্দে মেনে নিতেন। সমাজেও তাঁরা রাজপুত্রেরই সম্মান লাভ করতেন এবং প্রথানুসারে ব্যাপারটি এমনই স্বাভাবিক ছিল যে এতে লজ্জা বা গোপনীয়তার কোনো অবকাশই থাকত না।

অপুত্রক কোশলাধিপতি দশরথ যখন জানলেন, তাঁর দ্বারা পুত্রোৎপাদন আর

কোনোকালেই সম্ভব নয়, তখন রাজা-রাজড়াদের সভা ডেকে ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণের আয়োজন করার জন্য মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করলেন তিনি। জানতে চাইলেন, কোন্ বিশেষ পুরুষের দ্বারা তিনি তাঁর বাঞ্ছিত পুত্র লাভ করতে পারেন।

দশরথের সারথি ও মন্ত্রী ছিলেন সুমন্ত্র। এই সুমন্ত্রের পরামর্শে দশরথ তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্রের জনক হিসাবে নির্বাচন করলেন অঙ্গদেশের[১] রাজা লোমপাদের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে। ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন খুবই ভোগী পুরুষ, যদিও রামায়ণে তিনি শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচর্যপালনকারী ঋষি হিসেবে পরিচিত। আর সেটাই স্বাভাবিক। পুরাণ মহাকাব্যে তাঁরাই শুদ্ধাচারীরূপে প্রখ্যাত যাঁরা দেবতাদের অধীনতা স্বীকার করে দেবস্বার্থ পূরণ করতেন। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের যে গল্প আমাদের বাল্মীকি শুনিয়েছেন সে গল্পটি তাঁকে কামুক বারাঙ্গনা-আসক্ত এক 'সর্বকামসপন্ন' ব্যক্তি বলেই প্রমাণ করে। এই ভদ্রলোক প্রথমে ছিলেন বনবাসী ব্রহ্মচারী। কাশ্যপপুত্র বিভাণ্ডকমুনির ঔরসে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। জন্মাবধি তিনি পিতার আশ্রমে বাস করতেন। নারীসঙ্গ কাকে বলে এতাবৎকাল তা তার অজ্ঞাতই ছিল। হঠাৎ তিনি পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে স্ত্রী সহবাসের সুখ ও আস্বাদ লাভ করলেন। একেবারে মেঘ না চাইতে জল। নারীদেহ কেমন এই অভিজ্ঞতাই যাঁর ছিল না, একদা তিনি একই সঙ্গে একাধিক নারীর আসঙ্গসুখ এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গমের সুযোগ পেলেন। ঘটনাটি বিচিত্র এবং চমকপ্রদ [বালকাণ্ড /১০ম সর্গ]

* অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিয়ে তাঁকে ঘরজামাই করার বাসনায় মন্ত্রীদের পরামর্শে একদিন বিভাণ্ডকমুনির আশ্রমে বেশ কিছু যৌনকলানিপুণা সুন্দরী বারাঙ্গনাকে প্রেরণ করেন ঋষ্যশৃঙ্গকে কামোত্তেজিত ক'রে অঙ্গদেশে ভুলিয়ে আনার জন্য। সেকালে রাজারা বিভিন্ন মতলবে বারাঙ্গনাদের সাহায্য নিতেন। এই কূটকর্মে দেবতারাও ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁরাও দেবদাসী বা স্বর্বেশ্যা মোতায়েন রাখতেন ভোগী পুরুষদের প্রলোভিত করার উদ্দেশ্যে। ইন্দ্রের সভায় এমন বহু দুখিনী রমণীকে বেশ্যাবৃত্তি করতে হয়েছে। এঁদের বলা হ'ত অপ্সরা। উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী পূর্বচিত্তি কিম্বা দণ্ডগৌরী স্বয়মপ্রভা গাপালী বরূথিনী অথবা কুম্ভযোনি প্রজগরা চিত্রলেখা বা সহা ছিলেন এমনিই স্বর্গীয় বেশ্যা। অর্জুনকে হিমালয় স্বর্গে আপ্যায়িত করার

১। আধুনিক ভাগলপুর বা মুঙ্গের জেলা

সময় এঁরা যে যৌন-উত্তেজক নৃত্যগীতাদি করেন তার আনুপূর্বিক বর্ণনা পূর্ববর্তী গ্রন্থে উদ্ধার করেছি।[২]

মহাভারত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আরও আবিষ্কার করেছি যে, এই স্বর্বেশ্যা-মণ্ডলীর মধ্যে কামনিপুণা তো বটেই, সর্বাধিক রাজনৈতিক কর্মনিপুণা এক অদ্ভুতদর্শন সুন্দরী নারীও ছিলেন। দেবতারা কুরুক্ষেত্র ও লঙ্কাকাণ্ডে সেই কৌশলী রমণীকে হিমালয় শিবির থেকে নারীগুপ্তচর হিসেবে একবার আর্যাবর্তে আর একবার লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করেন। জন্মদুখিনী সেই দেবদাসীর নাম, বেদবতী। ইনিই পাণ্ডবদের পাইকারি বধূ দ্রৌপদী, আবার এই বেদবতীকেই নারীগুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করা হয় রাবণালয়ে—ছায়া সীতার ছদ্মবেশে। সীতা প্রসঙ্গে সে আলোচনা পরে করা যাবে, এখন ফিরে যাওয়া যাক রাম জন্মের কথায়।

ঋষ্যশৃঙ্গের এক অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমাদের শোনানো হয়েছে। প্রচণ্ড খরায় যখন অঙ্গদেশে কৃষিকর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন রাজা লোমপাদ তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় যাগযজ্ঞের আয়োজন বিষয়ে পরামর্শ করেন। পুরাকালে তো বটেই, একালেও আলৌকিক ঘটনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা পূর্বপুরুষের সংস্কারবশত এবং গুরু পুরোহিত মুখে পুরাণকথা শোনার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ এড়াবার জন্য পুজো যজ্ঞের আয়োজন করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাময়িক। বিপর্যয় প্রাকৃতিক নিয়মেই অপসারিত হয়, তখন গুরু পুরোহিতেরা যাগযজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেন। একই ঘটনা লোমপাদের রাজ্যেও ঘটেছিল। বেশ কিছুকাল খরার পর প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রবল বর্ষণে রাজ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে আসে। ঘটনাবলীর এই বিবর্তনের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্গরাজ্যে পদার্পণের ঘটনার একটি কাকতালীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করে প্রচার করা হয়, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে দেবরাজ ইন্দ্র প্রবল বারিবর্ষণে স্নিগ্ধ করেন খরাদগ্ধ অঙ্গরাজ্য। ঘটনার ইতিকথা পুরাণ। মানুষ ঠকানোর জন্য সেখানে ঘটনাবলী কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির বয়ানে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে সাজিয়ে বুদ্ধিমানরা পৌরাণিক কথাকে অলৌকিক রূপকথায় পরিণত করে গেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের গল্পও তাই। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন যাঁরা তার সাক্ষী ছিলেন, তেমন কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধার করে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনি লিখিত হয়নি। দশরথ-মন্ত্রী সুমন্ত্র ঐ গল্পটি রাজাকে শুনিয়েছিলেন এবং সুমন্ত্র একথাও বলেছিলেন যে তিনি নিজেও "পুরাণে যা শ্রবণ" করেছেন সেইমতই ঋষ্যশৃঙ্গ

২। দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা / রাজকীয় সংবর্ধনা দ্রঃ।

কাহিনীটি পরিবেশন করছেন।

পুরাণ কাহিনী এবং সেখানে বর্ণিত শোনা ঘটনায় অনেক ভেজাল। আমরা তাই ঋষ্যশৃঙ্গের এই দৈব ক্ষমতার কথা সরিয়ে রেখে তৎসময়ে ঘটমান ঘটনার বিবরণীটুকুতেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। সুমন্ত্র বলেছেন, বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা রাজা লোমপাদকে বলেছিলেন, "মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে-কোনো উপায়ে হউক রাজ্য মধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার করিয়া তাহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া শান্তার বিবাহ দিন।"

ব্রাহ্মণদের এই নির্দেশে একটি প্রশ্ন বিশেষত মনে জাগে, প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করা যাক।

দেশে "অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত" একজন দৈবীক্ষমতাশালী ব্রহ্মচারীকে আনার উদ্‌যোগ স্বাভাবিক।[৩] যদি শুধু ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে আনয়নের সেটাই হ'ত উদ্দেশ্য, তবে তাঁর পদপাতে রাজ্যে প্রবল বর্ষণ হওয়ার কাহিনীটিও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই মুনিকুমারকে আনার অন্যতর মুখ্য কারণ ছিল রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া। হয়ত রাজা লোমপাদ একটি উত্তম বংশজাত জামাতা খুঁজছিলেন যাঁকে তিনি ঘরজামাই রাখতে চান। ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন ব্রহ্মচারী অর্থাৎ দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার অনুগামী মুনি বিভাণ্ডকের পুত্র এবং তিনিও ছিলেন ব্রহ্মা-অনুগামী। তাই 'বেদপারগ ব্রাহ্মণ'রা তাঁকেই রাজ-জামাতারূপে নির্বাচন করেন। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে শান্তার বিবাহ দিয়ে এঁরা অঙ্গরাজ্যকে দেবতাদের মিত্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সঙ্গে কিছু ঋষ্যশৃঙ্গের অলৌকিক ক্ষমতার গল্প বানিয়ে। ঘটনাপরম্পরায় অতঃপর জানা যায়, ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সত্যিই রাজকন্যা শান্তার বিবাহ হয়েছিল এবং লোমপাদও দেবজনভক্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি আসন লাভ করেছিলেন। আরও প্রকাশ, ঋষ্যশৃঙ্গের ভগবৎ সাধনার উৎকর্ষ যেমনই ঘটে থাক, একটি ব্যাপারে তিনি যে রীতিমত পারদর্শী হয়ে ওঠেন তার প্রমাণ অতঃপর যথেষ্টই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই শুদ্ধাচারী ভাবগতের উল্লেখযোগ্য একটিই মাত্র গুণকীর্তন বারান্বয়ে আমাদের শোনানো হয়েছে, তা হ'ল ইনি ছিলেন প্রচণ্ড যৌনক্ষমতার অধিকারী এবং বিশেষভাবে নারীমুগ্ধ রাজপুরুষ।

যখন ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মদানে সক্ষম কোনো রাজপুরুষের সন্ধান করছেন

৩। বা. রা নবম সর্গ / ভারবি সং দ্রষ্টব্য।

দশরথ তখন তাঁর পুরোহিতবর্গ ঋষ্যশৃঙ্গের ঔরসে অবধারিতভাবে পুত্রপ্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা রাজাকে জ্ঞাপন করেন। বস্তুতপক্ষে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে হ'ত বেশ ধুমধাম ও প্রচার সহযোগে। এই যজ্ঞে যাঁকে ক্ষেত্রজ পুত্রের জনক হিসেবে বরণ করা হবে তাঁর প্রজনন ক্ষমতা সম্বন্ধে তাই বিশদ বিবরণ আগেই সংগ্রহ করার দরকার হ'ত, কেননা পুরাণপাঠে জানা যায়, সে যুগে বহু বীর পুরুষ এবং রাজারাজড়া ছিলেন যৌন-অক্ষম। কেন এই দুর্ঘটনা তার অবশ্য কোনো ব্যাখ্যা নেই। হয়ত অসম্ভব অমিতাচারই ছিল অন্যতম কারণ। একথা আমরা জানতে পারি বিচিত্রবীর্য এবং পাণ্ডুর যৌন-অক্ষমতা সম্পর্কে। যাইহোক, সেজন্যও হয়ত ক্ষেত্রজ পুত্রের জনক নির্বাচন সেকালে বেশ একটি রাজকীয় কূটকর্ম ছিল। তাছাড়া এমন মানুষকেই নির্বাচন করা হ'ত যিনি নির্বাচকের মিত্রপক্ষীয়। লোমপাদ দশরথের মিত্রপক্ষ ছিলেন। তাঁদের দুই রাজ্য কোশল ও অঙ্গদেশও পিঠোপিঠি জায়গা। আর ঋষ্যশৃঙ্গের পুরুষত্বের খ্যাতি তখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সুতরাং দেবানুগত রাজা দশরথ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের ক্ষেত্রজপিতা হিসেবে ঋষ্যশৃঙ্গকে সঠিকভাবেই নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁকে স্বরাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন লোমপাদের সম্মতিক্রমে। বলা হয়েছে, ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন দেবরাজ 'ইন্দ্রের সহকারী'। রাজা দশরথও দেবানুগৃহীত রাজা। হয়ত ঋষ্যশৃঙ্গের নির্বাচনে দেবতাদেরও একান্ত পরামর্শ ছিল।

সরযূ নদীর উত্তর তীরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য বিশাল আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে আসেন মিথিলাধিপতি জনক, দশরথের শ্বশুর 'পরম ধার্মিক' কেকয়রাজ, অঙ্গাধিপতি লোমপাদ, কাশীরাজ্যের রাজা, মগধের রাজা, সিন্ধু সৌবীর ও সৌরাষ্ট্ররাজ্যের রাজন্যবর্গ এবং বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রজা। দাক্ষিণাত্য থেকেও কতিপয় রাজা আমন্ত্রিত হন, তবে তাঁদের নামোল্লেখ নেই। যাঁরা বিশিষ্ট দেবজনগোষ্ঠীর রাজপুরুষ তাঁদের নাম সযত্নে উদ্ধার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পাঠক দশরথ-শ্বশুর কেকয়রাজের উল্লেখটি স্মরণে রাখবেন। মনে রাখবেন, দশরথের শ্বশুর অর্থাৎ কৈকেয়ীর পিতাকে 'পরম ধার্মিক' বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরোহিততান্ত্রিক পুরাণাদি গ্রন্থে ধার্মিকরূপে তাঁরাই কীর্তিত, যাঁরা ছিলেন দেবানুগত অর্থাৎ দেববাহিনীর মিত্রপক্ষীয়। কৈকেয়ীর পিতাকে রামায়ণকার এখানে সেভাবেই চিহ্নিত করেছেন। তথ্যটি পরে আমাদের কাজে লাগবে।

শাস্ত্রমতে যজ্ঞভূমি নির্মাণ ও পুজোপকরণের নিখুঁত প্রতিবেদন উপস্থাপিত

করে কবি তৎকালীন একটি বীভৎস প্রথারও বর্ণনা করেছেন বালকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গে। মহাকাব্যটি যেহেতু কাব্য মাত্র নয়, এই কাব্যমধ্যে তাই পুরাঘটনার বাস্তব প্রতিবেদনও সন্নিবেশিত হয়েছে। সেকালে বোধহয় পশু-মানবী যৌনমিলনের প্রথাও প্রচলিত ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে রাজমহিষীকে পুং অশ্বের সঙ্গে সহবাস করতে হ'ত। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অনুরূপ অশ্ব-মানবী সঙ্গমের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এইভাবে :

"কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা॥
পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্ রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্মকাম্যয়া॥"

অর্থাৎ, যজ্ঞস্থলের যূপকাষ্ঠে যে অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল "কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্যা করিয়া হৃষ্টমনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্মকামনায় স্থিরচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।" [বঙ্গানুবাদ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য/ভারবি সং ১৪শ সর্গ দ্রঃ]

তারপর রজনী প্রভাতিল এবং—

"হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃক্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা॥"

অর্থাৎ, "হোতা[৪] অধ্বর্যু[৫] ও উদ্গাতৃগণ[৬] মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃক্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে অশ্বের সহিত যোজনা করিয়া দিলেন।"

৪। হোতৃ = আহবাহক। সহস্র খৃষ্ট পূর্বাব্দে একজন হোতৃ ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ ও বলিদান দুই করতেন। কালক্রমে (৮০০-৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে) তাঁদের কাজ হয় যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান জানানো। যজ্ঞস্থলে দেবতারা এসে খানাপিনা করতেন! দশরথের যজ্ঞে দেবতাদের জন্য ৩০০ পশু বলি দেওয়া হয়েছিল। হোতৃরা বেদ মন্ত্র পারগ ছিলেন।

৫। অধ্বর্যু = বলিদান ও বলির পশুর তদারকি করতেন অধ্বর্যু ব্রাহ্মণরা। অধ্বর্যু কৃতবিদ্য ছিলেন যজুর্বেদে। এই দুই শ্রেণীর পুরোহিতকে সাহায্য করার জন্য আরও হাজার ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকতেন।

৬। উদ্গাতৃ = সামবেদের আবৃত্তিকারক পুরোহিত।

অশ্বমেধের ঘোড়াকে কেন্দ্র করে সর্বসমক্ষে যে কার্যকলাপ সঙ্ঘটিত হতো সে গল্প আমার পক্ষে এইখানে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাভারত থেকে এমনই এক ঘটনার ইংরাজি অনুবাদের একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করছি বিষয়টি সম্পর্কে বিদ্বান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গে রাজ-মহিষীর সঙ্গমের দৃশ্যটি সেখানে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

"She lies down beside the dead horse, and the Adhvaryu priest covers the two with a cloth. He prays : 'In heaven be ye covered both. And may the manfully potent stallion, seed bestower, bestow the seed within.' The queen is to grasp and draw forth the sexual organ of the stallion, pressing it to her own."[৭]

অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন কোনো রাজা তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য করতেন, তেমনিই সন্তান কামনায়ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হ'ত। রাজা দশরথ এমনিই এক যজ্ঞ করেছিলেন যে যজ্ঞে তাঁর বাঞ্ছিত সন্তানের জন্মদাতা হিসেবে নির্বাচিত পুরুষ ছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। দশরথ-মন্ত্রী সুমন্ত্র বলেছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গের "ঔরসে ত্রিলোক বিখ্যাত অতুল বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন"।[৮]

প্রশ্ন হতে পারে, বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণ নেতারা বেছে বেছে ঋষ্যশৃঙ্গকেই বা মনোনীত করলেন কেন? এই মনোনয়নের নেপথ্য কারণটি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রথমাবধি দেবতাদেরই মনোনীত পাত্র ছিলেন।

লোমপাদ রাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রেরণ করার পেছনেও দেবসেবক ব্রাহ্মণবাহিনীর নির্দেশ ছিল। ঋষ্যশৃঙ্গের ইতিহাস জানাচ্ছে, লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হ'লে পুরোহিত[পুরোহিতবৃন্দ ছিলেন দেবশিবিরের আশ্রিত] শ্রেণী রাজার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তাঁর সংস্রব ত্যাগ করেন। অবস্থা প্রতিকূল বিবেচনা করে লোমপাদ ঝগড়া মিটিয়ে নেন। ব্রাহ্মণদের চুক্তি ছিল বিবাদ-অবসান ঘটাতে লোমপাদের ঘরজামাই হিসেবে গ্রহণ করতে হবে পুরোহিতসমাজ মনোনীত বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে। লোমপাদ ছিলেন অপুত্রক এবং শান্তা নাম্নী কন্যাটি ছিল

৭। Oriental Mythology (The masks of God)/Joseph Campbell.

৮। বা. রা/১ম সর্গ ভারবি সং।

তাঁর পালিত কন্যা। কথিত আছে শান্তা ছিলেন দশরথের ঔরসজাত। লোমপাদকে রাজ্যের মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণদের শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল। ফলত অঙ্গরাজ্য ব্রাহ্মণদের দখলে চলে যায়, কেননা ব্রাহ্মণ মনোনীত ঋষ্যশৃঙ্গই লোমপাদের উত্তরাধিকারী হন। দশরথ ছিলেন পুরুষানুক্রমে দেবশিবিরভুক্ত। বশিষ্ঠ প্রমুখ দশরথ-মন্ত্রীরাও তাই। সুতরাং সবকিছু বিবেচনা করে এবং অঙ্গদেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করার মানসেই যে ঋষ্যশৃঙ্গকে দশরথের ক্ষেত্রজ সন্তানের পিতৃত্বে বরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এই অনুমান অযৌক্তিক হবে না। ঋষি হিসেবে ঋষ্যশৃঙ্গ যে গুণবান পুরুষ ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। দেখা যায়, ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন স্বর্গীয় কোনো অপ্সরার গর্ভজাত, যাঁর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমের ফলে বিভাণ্ডকের ঔরসে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেও ছিলেন অত্যন্ত ভোগী পুরুষ ও বারনারীতে আসক্ত। সুতরাং গুণমান দেখে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়নি। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দশরথের জামাতা। দশরথ-কন্যা শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ক্ষেত্রজ পুত্রের পিতা হিসেবে পালক পিতার দ্বারা তাঁরই জামাতার নির্বাচনও একটি বিরল ঘটনা। তাই সন্দেহ হয়, এই নির্বাচনের পেছনেও ছিল ব্রাহ্মণ নেতাদের চক্রান্ত এবং চাপ।

কিন্তু পুরোহিতপ্রধানদের সমস্ত আয়োজন ওলটপালট হয়ে গেল ঐ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে সমাগত ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র, অন্যান্য দেবতা এবং কিছু পুরোহিত নেতৃবৃন্দের গোপন বৈঠকের পর।

বৈঠকে দেবতারা ব্রহ্মাকে একটি নতুন সমস্যার কথা বললেন এবং সমস্যা সমাধানে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। ঘটনাটি এই রকম :

"পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া…ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোনো রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই।… এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।"

ব্রহ্মা উপায় উদ্ভাবনের জন্য অসুর বিনাশে দেবনেতা বিষ্ণুর সঙ্গে 'একান্ত মনে সমাসীন হইলেন' অর্থাৎ একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন দেবশিবিরের দুই প্রধান। বৈঠকে স্থির হ'ল, ঋষ্যশৃঙ্গ নয়, বিষ্ণুই স্বয়ং দশরথ মহিষীদের গর্ভোৎপাদন করে বিষ্ণুপুত্রদের জন্ম দান করবেন। প্রাপ্ত বয়সে এই দেবপুত্ররা দেবজাতির সহায়তায় রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত করার দায়িত্ব নেবেন। কেন দেবতারা এমন একটি দূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সে প্রশ্ন আগেই আলোচনা করেছি। যুদ্ধকে সমতল ভারতে ঠেলে দিয়ে সামরিক চাতুর্যেরই পরিচয় দেন তাঁরা।

রাবণবধের জন্য চমকপ্রদ এই যুদ্ধ পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত করার আয়োজন এইভাবেই করেছিলেন হিমালয়ের দেবশিবির।

রামচন্দ্রের জন্মের আগেই দেবজনরক্ষিত রামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ-বধের এই অভিনব পরিকল্পনাই সম্ভবত 'রাম না হ'তেই রামায়ণ' প্রবাদ বাক্যটির সৃষ্টি করেছিল।

রামায়ণের রোবট রহস্য

ব্রহ্মার সভায় রাবণবধের পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লে পুত্রার্থে আয়োজিত দশরথের সব ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিলেন দেবতারা। দেবতাদের নির্দেশেই আনা হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গকে। স্থির হয়েছিল, পরম বীর্যশালী সেই মুনিবরের ঔরসে পুত্রলাভ করবেন দশরথ মহিষীরা। কিন্তু দেবতাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত হ'ল, ঋষ্যশৃঙ্গ নয়, রাজমহিষীদের গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসেই জন্ম নেবে চার ছেলে। যেহেতু সব সিদ্ধান্তই দেবতাদের, তাই কোনো বিবাদ-বিতর্কের অবকাশ ছিল না। এক বাক্যে শুরু হ'ল পুত্রেষ্টি যজ্ঞের মহোৎসব। যজ্ঞকুণ্ডে বিসর্জিত হল অজস্র ধারায় ঘি, পায়স, ফলমূল, গন্ধ-দ্রব্যাদি। সাধারণের শ্রমার্জিত মুখের অন্ন পুড়িয়ে রাজা পুরোহিত এবং দেবতাদের ইচ্ছায় প্রজ্বলিত হল যজ্ঞকুণ্ডের লেলিহান অগ্নিশিখা। দশরথের রত্নাগার শূন্য হয়ে গেল ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণার যোগান দিতে।

এই সময় যজ্ঞীয় মহোৎসবের গোলমালের মধ্যে যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিশিখার পেছনে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অদ্ভুতদর্শন মহাকায় প্রাণী, যাঁর বর্ণিত অবয়বের সঙ্গে পার্থিব মানুষের সাদৃশ্য খুঁজলে হতাশ হতে হবে। এই সচল ও সরব বস্তুটির বর্ণনা করে কবি লিখেছেন:

> ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুল্য প্রভম্।
> প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্॥[১১]
> কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
> স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজশ্মশ্রুপ্রবর মূর্ধজম্॥ ১২/১৬/বাল

অর্থাৎ, যজ্ঞকালে দশরথের যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হলেন এক মহাপ্রাণী। তিনি অতুলনীয় দীপ্তিশালী, মহাবীর্যবান, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাম্বর পরিহিত এবং রক্তবদন তাঁর কণ্ঠস্বর দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় গম্ভীর। তাঁর দেহের রোম, শ্মশ্রু এবং কেশ

সিংহকেশরতুল্য স্নিগ্ধবর্ণ।

বলাই বাহুল্য। এমন পার্থিব প্রাণী আমরা তো দেখিই নি, সম্ভবত দশরথ স্বয়ং এবং রামায়ণ কাব্যপ্রণেতাও দেখেন নি। বস্তুটি যে বস্তুত কী, এ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার জন্যই কবি লিখেছেন, বস্তুটি মহদ্ভূতং—এক মহাপ্রাণী।

যা মানব নয়, মানবেতর প্রাণীও নয়, অথচ প্রায় মানবাকৃতিবিশিষ্ট এবং যা সচল ও কথাবার্তা বলায় সক্ষম, এমন অদ্ভুত বস্তুর সঙ্গে পুরাপিতাদের বহুক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার ঘটেছে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন কাব্য পুরাণে উল্লেখ আছে।

মহাভারতে অর্জুনের যুদ্ধরথে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যার্থে দেবতারা এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় পুতুল সংস্থাপিত করেছিলেন, যেগুলির বিশেষ চরিত্রলক্ষণ বিচার ক'রে আমি তাদের আধুনিক রোবটপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেছিলাম। আলোচনায় দেখা গেছে, বস্তুতই এই সব অব্যাখ্যাত সচল বস্তু পৌরাণিক আমলের রোবট ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না [লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ]

প্রজ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডের নেপথ্য থেকে যে মহাপ্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো, সেই প্রাণীটির সঙ্গে দেবতা বা মানুষের শারীরিক সাদৃশ্য ছিল না। পুরাণবর্ণিত দেবতাদের চেহারাও মনুষ্যাকার। এই 'মহদ্ভূতং' কিন্তু দেখতে ভয়াল ভয়ঙ্কর।

রক্তমাংসের কোনো মানুষকে পুরাণকার তো কখনো এভাবে বর্ণনা করেন নি। মহাকবি বাল্মীকি রামচন্দ্র, এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রের দেহকান্তি বর্ণনার সময়ও কোনো অতিশয়োক্তির আশ্রয় নেন নি। রাবণকেও কান্তিমান সুপুরুষ রূপেই বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে বর্ণনার বিশেষত্ব, সুতরাং অকারণে ঘটে নি। কবিকে হয়ত এমনই এক বস্তুর বর্ণনা করতে হয়েছে, যে জিনিস তিনি নিজে কখনো দেখেন নি, লোকপরম্পরায় যেমন শুনেছিলেন তারই একটি কাল্পনিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ফলে মহাভূতের সঠিক চেহারা স্পষ্টতা পায় নি। বোঝা যাচ্ছে, বর্ণনায় কষ্টকল্পনা আছে। যেন চেষ্টা করে কবিকে এমন একটি মূর্তি গড়তে হচ্ছে, যে মূর্তিটিকে কেবলমাত্র ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপে তুলে ধরাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। বুঝতে পারি, যিনি তাঁকে মূর্তিটির বর্ণনা দেন তিনিও গুছিয়ে বলতে পারেন নি, কেমন ছিল তার রূপ। প্রতিবেদক কেবলমাত্র হয়ত একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা হল, এই মূর্তির সঙ্গে ছিল উজ্জ্বল আলো আর যান্ত্রিক গমগমে শব্দের সম্পর্ক। তার দেহ ছিল সুচিক্কণ এবং সেই দেহ মূর্তির নিজস্ব আলোক বিচ্ছুরিত করছিল। সচল সরব মূর্তিটির জাতিকুল বাপঠাকুর্দার কোনো পরিচয় দেওয়া হয় নি। মূর্তিটি যান্ত্রিক স্বরে দশরথকে শুধু বলেছে, প্রজাপত্যং নরং বিদ্ধি

ম্যামিহাভ্যাগতং নৃপ ॥” অর্থাৎ, মহারাজ, আমাকে প্রজাপতি ব্রহ্মাপ্রেরিত পুরুষ বলে জানবেন।

এটা কোনো পরিচয় নয়। বিশেষত এমন একটি দুর্বোধ্য বস্তুর এইটুকু পরিচিতিই যথেষ্ট নয়। শুধু জানা যাচ্ছে, ভৌম স্বর্গ গাড়োয়াল হিমালয় থেকে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা তাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যন্ত্রবৎ প্রাণীটি যে এই দূরপথ একাই অতিক্রম করে এসেছে এমন কিছু বলা হয় নি। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে আমন্ত্রিত দেবতারা এবং স্বয়ং ব্রহ্মাও ক্ষণকাল আগেই এসে গেছেন। সুতরাং ঐ মহাভূতটিকে তাঁরাও সঙ্গে করে এনে থাকতে পারেন। পুরোহিতরা দেবতাদেরই আজ্ঞাবহ। যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে দেবতাদের নির্দেশে তাঁরা তাকে লুকিয়ে রেখে থাকতে পারেন সেই অগ্নিধূমের পেছনে। পরে সকলকে চমকিত করে দেবতার অলৌকিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে সেই যন্ত্রবৎ বস্তুটিকে যজ্ঞকুণ্ডের পেছন থেকে বার করে আনা হয়। চমৎকার সাজানো এবং সুপরিকল্পিত ম্যাজিক।

মহাভূতটিকে যদি বিজ্ঞানী দেবতাদের দ্বারা নির্মিত একটি যন্ত্রমানব বা রোবট বলে ধরা যায়, তবেই তার চেহারার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার এবং চক্ষু ও ধাতব দেহাবরণে প্রতিফলিত আলোক বিচ্ছুরণের অর্থ পরিষ্কার হয়ে আসে। মহাভূতের রূপকল্পনাটি কল্পিত বিষয়মাত্র থাকে না। একটা সম্ভাব্য অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। যন্ত্রটির গহ্বর থেকে গোনাগুনতি কয়েকটি শব্দই কেবলমাত্র উচ্চারিত হয়েছিল আর সেই শব্দের আওয়াজ ছিল সুগম্ভীর। বিজ্ঞানী দেবতারা ঐ কতিপয় শব্দ রেকর্ড করে যন্ত্রের বক্তব্য তৈরী করে দিয়ে থাকতে পারেন। যান্ত্রিকভাবে সেই বাক্যনিচয় উচ্চারিত হলে শ্রোতারা বিস্মিত হয়েছিলেন মহাভূতের দুন্দুভিতুল্য কণ্ঠস্বরে। মহাপ্রাণীটি দেবতাদের দ্বারা পূর্বে রেকর্ড-করা বাক্যের বেশি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে নি। দশরথ যখন জানতে চান, আপনি তো নির্বিঘ্নে এসেছেন? বা 'অহং তে কিং করবানি', 'বলুন, আপনার কী কাজ করব?'—মহাভূত কোনো উত্তর দেন নি। নীরব থেকেছেন। শেখা বুলি ছাড়া একটা শব্দও বলার ক্ষমতাই যে তাঁর ছিল না। বলবেন কেমন করে।

মহাভূতটির এই নীরবতা, শেখানো বুলি ছাড়া অধিকতর একটিও শব্দোচ্চারণ করতে না-পারা, তার পাবকতুল্য ধাতব সুচিক্কন শরীর, লাউড স্পিকারে-ধরা কণ্ঠস্বরের মতো গম্ভীর ধাতব আওয়াজ এবং তার উপযুক্ত উপমা খুঁজে না পেয়ে কাব্যে তার 'মহাভূতং' নামকরণ তাকে একটি যন্ত্রমানব বলেই প্রতিপন্ন করছে। আমরা তার অন্যতর কোনো স্বরূপ ভাবতে পারছি না। আজকের বিজ্ঞান যন্ত্রমানব

সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং একটি যন্ত্রমানবকে ভাবতে পারি, অভিজ্ঞতায় অন্য কিছু তো ধরা পড়ে না।

ঘটনাটি এইভাবে ঘটতে পারে। যজ্ঞকুণ্ড ও সভাস্থল যখন অগ্নিধূমে সমাচ্ছন্ন, বিজ্ঞানী দেবতারা তখন যন্ত্রটিকে সেই ধূম্ররাশির পেছনে স্থাপন করেন। ধূম্ররাশি অপসৃত হলে মনে হ'ল অকস্মাৎ ঐ মহাপ্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। দর্শককে এভাবে চমৎকৃত আজকের যাদুকররাও করে থাকেন। মঞ্চের ওপর কতই আশ্চর্য কাণ্ড তাঁরা ঘটিয়ে তুলতে পারেন। মহাপ্রাণীর আবির্ভাব সে তুলনায় সামান্য ব্যাপার। লোকে তার কণ্ঠস্বর শুনলো টেপ চালু হতেই। কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেই যন্ত্রমানব স্তব্ধ হয়ে গেল। দশরথের প্রশ্নের উত্তর অশ্রুতই রইলো।

ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনার ব্যাখ্যা করেছি 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বইটিতে। ঘটনা ঘটেছিল মহাভারতের বিখ্যাত রাজা দ্রুপদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে। দ্রোণ-বিনাশ-কল্পে দেবতাদের বশ্যতা স্বীকার করে দ্রুপদ চেয়েছিলেন একটি মহাবীর্যবান পুত্র। যে পুত্র তাঁর রাজমহিষী গর্ভে ধারণ করবেন এবং যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুপদবন্ধু দ্রোণের প্রতি দ্রুপদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ঘটলো একটি অভাবনীয় ঘটনা। কোনো মন্ত্রপুতঃ পায়স তিনি পেলেন না। যজ্ঞবেদীর ধূমাগ্নির পেছন থেকে বেরিয়ে এলেন পূর্ণবয়স্ক এক যুবা-পুরুষ রথারোহণে। সর্বাঙ্গ তাঁর বর্মাবৃত, সর্বাস্ত্রে সজ্জিত দেবজাতীয় এক রাজপুরুষ। নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রুপদের প্রার্থনা পূরণ করে দেবতারা দ্রুপদপুত্র হিসেবে তাঁকেই পাঠিয়েছেন। শুধু তিনি নন, সঙ্গে পাঠানো হয়েছে পূর্ণবয়স্কা একটি যুবতীকেও, যিনি নীলকেশিনী কৃষ্ণা, মহাভারতে দ্রৌপদী এবং পাঞ্চালী নামে সুপরিচিতা। দ্রুপদ তো অবাক। তিনি এমন তৈরী ছেলেমেয়ে তো চান নি। দ্রুপদমহিষীও তাদের প্রত্যাখ্যান করে বললেন, দেবপ্রেরিত ঐ দুজনকে তিনি তাঁর পুত্রকন্যা হিসেবে মেনে নিতে পারবেন না। তিনি গর্ভধারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুরোহিত চোখ রাঙিয়ে বললেন, রাজা দ্রুপদ দেবতাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। এখন দেবতার ইচ্ছাই মান্য করতে হবে। রাজমহিষী বিনা প্রতিবাদে ঐ দুই দেবপ্রেরিত পুত্র-পুত্রীকেই আপন সন্তানরূপে মেনে নিন কেননা এদের দ্বারা দেবস্বার্থ সংরক্ষিত হবে। সুতরাং এটাই দেবাদেশ। মাথা নত করেই সে আদেশ মেনে নিতে হয়েছিল দ্রুপদকে। অথচ সাধারণে এতো কাণ্ডের কিছুই জানলো না, রটনা করা হ'ল, দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতায় দ্রুপদ সর্বগুণান্বিত পুত্রকন্যা পেয়েছেন যজ্ঞ করে।

যজ্ঞের যাদু এমনিই। এমনিই এক যাদুবলে দশরথও পেলেন দেবজন প্রেরিত একটি যন্ত্রমানবের হাত থেকে এক বাটি পায়েস। রটনা করা হ'ল, পায়েস ভক্ষণে রাজমহিষীদের পুত্রলাভ হয়েছে। অনুসন্ধানে আমরা জানতে পারব, পায়েস খেয়ে গর্ভধারণ করা যায় না। ওটাও রোবটের অবির্ভাবের মতোই একটি সাজানো ব্যাপার। উদ্দেশ্য দেবমাহাত্ম্য সৃষ্টি। কিন্তু সেকথা পরে। বলছিলাম রোবটের কথা। দেখলাম, এইভাবে যজ্ঞধূমের পেছন থেকে কৌশলে পূর্ণাবয়ব রথারূঢ় মানব-মানবী এবং যন্ত্রমানব দেবতারা বার করতে পারতেন। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে এমনই একটি ভেল্কি দেখানো হ'ল।

এখন দেখা যাক, এ ধরনের পৌরাণিক রোবটের প্রমাণ কি আরও আছে যার অস্তিত্ব আমাদের বর্তমান অনুমান সমর্থন করতে পারে। কটা নজির তুলে ধরতে পারি আমরা ?

'অর্জুনরথে রোবট' প্রসঙ্গ আগে উল্লেখ করেছি। কৌতূহলী পাঠক আমার 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' বইটি প্রসঙ্গত দেখতে পারেন আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য। এখানে মহাকবি হোমারের কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি উদারহণ উদ্ধার করছি। 'ইলিয়াড কাব্যে' আছে দেববিজ্ঞানী নির্মিত যন্ত্রমানবী রোবট রমণীর কথা। আছে স্বয়ংচালিত রোবট রথের বিবরণী।

গ্রীক দেবতাদের স্বর্গলোক (এটিও ভৌম স্বর্গ) ছিল অলিম্পাস পর্বতে। সেখানে বসে তাঁর বিজ্ঞানাগারে গ্রীক বিশ্বকর্মা খঞ্জ দেবতা হিফাসটাস টিন তামা সোনা ও রূপো গালিয়ে তৈরী করতেন সুন্দর সুন্দর সুচিত্রিত বর্ম ঢাল অস্ত্রশস্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতে যত বিভিন্ন জাতির দেবতা ছিলেন তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন লড়াইয়ের জন্য। যুদ্ধই ছিল দেবতাদের মুখ্য কর্ম ও সাধনা। দেবতার কাহিনীমাত্রই জমিজায়গির দখল, পৃথিবীর আদি বাসিন্দাদের পদানত করা এবং যুদ্ধ লড়াইয়ের ইতিহাস। এক এক গোষ্ঠীর দেবতা এক এক জাতির নেতৃত্ব অধিকার করে অপর পার্থিব জাতিকে পরাস্ত করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন সর্বদা, এঁদের স্বর্গলোকে অন্যতর ধর্মকর্ম বলে কিছু ছিল না। দেবতাদের তাই সর্বাঙ্গ বর্ম ও অস্ত্রে ঢাকা ছবিই আমরা দেখতে পাই। লড়াকু দেবীরও অভাব ছিল না। তাই বর্ম বা 'মাল্য' যেমন আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রকে বানাতে হ'ত (তিনি উত্তম 'মালাকার' বা বর্মনির্মাতা হিসেবে প্রসিদ্ধ), তেমনি অতি প্রয়োজনীয় এইসব বর্ম অস্ত্রাদি বানাতে হ'ত অন্যান্য দেবজাতিকেও।

গ্রীক দেবতা হিফাসটাস এই কাজে দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গ্রীক দেবায়তনে

স্থান পেয়েছিলেন। স্বর্গলোকে ছিল তাঁর একটি মনোরম কোয়ার্টার বা দেব-আবাস। একদিন দেবী থেটিস হিফাসটাস গৃহে পদার্পণ করে দেখলেন, বিজ্ঞানী দেবতা কুড়িটি স্বয়ংক্রিয় রথ নির্মাণে ব্যস্ত। রথগুলি বিনা অশ্বে এবং কোনো চালক ছাড়া নিজেরাই গমনাগমন করতে পারত। অর্থাৎ তাদের উপযুক্তভাবে প্রোগ্রামিং করে দিলে তারা স্বয়ং গন্তব্য স্থলে যেতে পারত। আজকের স্বয়ংক্রিয় রোবট যেমন তা পারে। ব্যাপারটি পুরাণকারের কাছে প্রহেলিকা, একালের পাঠকের কাছে সাধারণ ব্যাপার। যাই হোক, দেবী থেটিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য পাশের কর্ম-শালা থেকে খঞ্জ হিফাসটাস বেরিয়ে এলেন এক স্বর্ণ নির্মিত মায়াময় দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে। এই দাসীকে তিনিই তৈরী করেছেন। এই দাসীটিও যে একটি যন্ত্র-মানবী, আশা করি, সেকথা আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

রামায়ণ মহাভারতে এমন রোবটের অভাব নেই। প্রসঙ্গত রামায়ণ বর্ণিত 'কুম্ভকর্ণ' নামক যন্ত্রটির কথা উল্লেখযোগ্য। তবে 'কুম্ভকর্ণ' যন্ত্রটিকে রোবট না বলে একটি ট্যাঙ্ক জাতীয় যুদ্ধযান বলাই সমীচীন। কুম্ভকর্ণ স্বয়ংচালিত ছিল না। 'কুম্ভকর্ণ' যানটির চালক ছিলেন রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। সেকালে চালকের নামেই যানবাহনের নাম হ'ত। তাই কুম্ভকর্ণের নামে পরিচিত হয়েছে কুম্ভকর্ণ যানটি। ফলে যানটি অলৌকিকতা লাভ করেছে, যেমন বিষ্ণুর বিমান চালক গরুড়ের নামে বিষ্ণুবিমানের নাম হয়, গড়ুররথ। কালক্রমে মানুষ গরুড় তাঁর চালিত বিমানের কাছে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। বিমানটি অলৌকিক সচেতন পক্ষযুক্ত গড়ুর পক্ষীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও কুম্ভকর্ণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তাঁর দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধযান কুম্ভকর্ণ নামক সাঁজোয়া গাড়ির মধ্যে। তবে বাল্মীকি রামায়ণে সুস্পষ্ট ভাবে কুম্ভকর্ণকে একটি যান হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই যানের নির্মাতা ছিলেন পৌলস্ত্য নামক বিজ্ঞানী মুনি। সেকালের বহু ব্রাহ্মণ নেতাই ছিলেন বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য। এমনি এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন অগস্ত্য, যিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত করেছিলেন। পৌলস্ত্য কুম্ভকর্ণকে নির্মাণ করছেন শুনে ব্রহ্মা বলেছিলেন, লোকবিনাশের জন্যই একে নির্মাণ করা হয়েছে। যখন কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধার্থে পাঠানো হ'ল, রাম লক্ষ্মণ তার সেই বিচিত্র রূপ দর্শন করে ভীত হয়ে পড়ায় বিভীষণ তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, ভয় নেই। বানর সেনাদের জানিয়ে দিন, শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য রাবণ কুম্ভকর্ণ নামক একটি "যন্ত্র উত্তোলন করিয়াছে," বলেন, "উচ্চন্তাং বানরা সবে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রতম্।"

কুম্ভকর্ণ নামক এই যন্ত্রটিকে কাঞ্চনময় একটি ধাতব গুহায় রক্ষা করা হতো।

একবার ব্যবহারের পর বোধহয় মাস ছয়েকের জন্য যন্ত্রটিকে নিশ্চল রাখাই ছিল নিয়ম। এটি তার কারিগরী বিষয়ক নিয়ম বলেই মনে হয়। কিন্তু দেবতাদের বুদ্ধিজীবী পুরাণকাররা সকল কিছুর ওপরই দৈবী মাহাত্ম্য আরোপ করে গেছেন। পৌলস্ত্য নির্মিত এই যন্ত্রের ওপর ব্রহ্মার কোনো অধিকার না থাকলেও একটি গল্প বানিয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকত। ব্রহ্মার অতই ক্ষমতা থাকলে হিমালয়ে বসে যখন তিনি রাবণবধের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করেছেন, রাবণের এক মহাস্ত্র কুম্ভকর্ণকে তখনই অভিশপ্ত করে অচল করে দিতে পারতেন। কিন্তু বস্তুত তাঁর সে ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ব্রহ্মার ইচ্ছায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা জাগরণের গল্পটিরও ছিল না কোনো বাস্তব অস্তিত্ব। মুনিতে বানানো এমন শত কাহিনীরই পেছনে কোনো সত্য নেই। তা কল্পিতও নয়। ইচ্ছাকৃত ভাবে, সুপরিকল্পিত ভাবে সেসব দৈবী মাহাত্ম্যকথা বানানো হয়েছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণকে জাগানোর যে গল্পটি বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়, সেই গল্পেও কুম্ভকর্ণের যান্ত্রিক অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ বিভীষণের অভয়বাণী অপেক্ষাও অকাট্য। জাগরণদৃশ্যে কুম্ভকর্ণের যান্ত্রিক অবয়বটি পাঠক যেন রীতিমত চাক্ষুষ করার সুযোগ পান।

বাল্মীকি রামায়ণ জানাচ্ছে, রাবণের আদেশে নিশাচরগণ সেই গুহায় (ধাতব) গিয়ে 'পর্বতসদৃশ' 'বিকৃত দর্শন' কুম্ভকর্ণকে শায়িত (অর্থাৎ নিশ্চল) অবস্থায় দেখলেন। কুম্ভকর্ণের 'রোমরাজি উৎক্ষিপ্ত' ছিল। নাসিকা থেকে নির্গত হচ্ছিল 'আশীবিষের ন্যায় নিঃশ্বাস' এবং তার 'নাসাপুট ভয়ঙ্কর' ও 'বদন পাতালসদৃশ' ছিল।—বর্ণনাটি ব্যাখ্যা করলে আমরা এবার এই রকম একটি চিত্র পেতে পারি। অনুমান গড়া যায়:—

"পর্বতসদৃশ" শব্দের দ্বারা ধাতব আবরণযুক্ত কৈলাস পর্বতাকার একটি চেহারা বোঝানো হয়েছে। পর্বত বলতে তৎকালে সুমেরু, গন্ধমাদন, আর কৈলাসের উপমা দেওয়া হতো। কৈলাসের আকৃতি অনেকটা ডাকবাক্সের মতো। কুম্ভকর্ণ যানটি ঐরকম বেলনাকার ডাকবাক্স-সদৃশ হতে পারে। তার "উৎক্ষিপ্ত রোমরাজি" ধাতব গাত্রের উপরিস্থিত নাটবল্টুর চিত্র সাজিয়ে ধরে। কয়লার রেল এঞ্জিনে অবিরত চুল্লি জ্বলে। কুম্ভকর্ণের "পাতালসদৃশ" মুখ-গহ্বরের মধ্যে ইঞ্জিন চালু করার জন্য এমনি আগুন জ্বালানো হ'তো। তাই মুখবিবর থেকে ধূমাগ্নি নির্গত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ দর্শকের চোখ এঞ্জিনের ধূমনিঃসরণ পথ দুটি

ভয়ঙ্কর নাসাপুট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। কয়লার ধোঁয়া সাপের মতো পেঁচিয়ে বের হবে এবং তা হবে বিষবৎ এতে আর সন্দেহ কি। এবং ঘটনা তাই হলে কবির ভাষায় সেই ধোঁয়া "আশীবিষসদৃশ" আখ্যা পেতেই পারে।

জাগরিত করার সময় 'নিশাচরগণ' বিকৃত শব্দ করে কুম্ভকর্ণের 'অঙ্গবিলোড়ন' শুরু করে। কবি আরও লিখেছেন. তারা সে সময় জলদগম্ভীর স্বরে স্তবস্তুতিও করেছিল। তা, একটি যন্ত্র চালু করার সময় গোলমাল চিৎকার তো একটু হবেই, হাঁকডাক শোনা যাবে যন্ত্রবিদদের। কাব্যিক প্রকাশে পৌরাণিক গাথায় সেই গোলমালও স্তবস্তুতির মর্যাদা পেয়ে গেলে কে আপত্তি করবে। আর 'অঙ্গ-বিলোড়ন' তো অনিবার্য ব্যাপার। একটি যন্ত্র চালু করতে তার নাটবল্টু ঠিক করতে হবে। কত কত যন্ত্রে মোচড় আর আঘাত প্রয়োজন হবে তা শুধু সেই যন্ত্রবিদ্‌রাই জানতেন যাঁরা কুম্ভকর্ণ যন্ত্রটির মিস্ত্রী বা মেকানিক। কুম্ভকর্ণের শরীরে 'তীব্রগন্ধ চন্দন' লেপন করা হয়েছিল। তার অর্থ কি, যন্ত্রটিকে তৈলজাতীয় তরল পদার্থে সুচিক্কণ করা হয়? তেল মোবিলের গন্ধের তীব্রতা অনস্বীকার্য, তবে 'চন্দন' বলতে 'গ্রিজ' জাতীয় বস্তুর কথা বলা হয়ে থাকতে পারে। পরের বর্ণনায় ব্যাপারটি আরও স্পষ্টতা পেয়েছে। বলা হয়েছে, কুম্ভকর্ণের কর্ণগহ্বরে শত শত পূর্ণকুম্ভ উপুড় করে দেয় শত শত রাক্ষস। যন্ত্রের তৈলাধার পূরণের যথার্থ চিত্র। 'শত শত' আর 'বহু সংখ্যক' কথাগুলি অবশ্য পৌরাণিক সংখ্যাতত্ত্ব। হাজার বছর বলতে যেখানে হাজার দিন হয়, শত শত বলতে সেখানে পাঁচ দশ ঘড়ার বেশি মনে করার কারণ নেই। তারপর কুম্ভকর্ণ জাগরিত হলে তার "লোচনযুগল দেদীপ্যমান গ্রহযুগলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল", অর্থাৎ জ্বলে উঠল যন্ত্রযানের হেড লাইট দুটি। পরবর্তী বর্ণনায় যান্ত্রিক স্বরূপটি আরও পরিষ্কার করা হয়েছে। বলা হল, কুম্ভকর্ণ ধাবিত হলে "তাঁহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্রিত স্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হইতে লাগিল"। অর্থাৎ সাঁজোয়া গাড়িটি হেলেদুলে গারাজ থেকে বেরিয়ে আসছে। আগেই বলেছি, কয়লার ইঞ্জিন; গাড়ি চলছে; রেল ইঞ্জিন থেকে যেমন ছাই আর কয়লার গুঁড়ো ছিটকোয় এক্ষেত্রেও তাই হল। তা না হলে "অঙ্গার মিশ্রিত স্ফুলিঙ্গ"র কথা উঠবেই বা কেন?

রামায়ণে রামস্তুতি যতই থাক, লক্ষ্মণ ছিলেন অপেক্ষাকৃত স্থিতধী পুরুষ। কুম্ভকর্ণকে দেখে রাম শঙ্কিত হয়েছেন, তাঁর কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কিন্তু লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন ঐ অদ্ভুত ভয়াল 'মহাপ্রাণী'র চালচলন। তিনি রামকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, "মহারাজ, কুম্ভকর্ণের বানর ও রাক্ষস বিষয়ক ভেদজ্ঞান নাই;

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই (সে) ভক্ষণ করিতেছে।"

এ কথায় আমরা কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি না। একটি যন্ত্রযানের যার আকার যন্ত্রমানবতুল্য, তার দুটো লোহার হাত থাকতে পারে। সেই হাতদুটি দিয়ে লোহার শাঁড়াশী আঙুলে টিপে ধরে সে সামনে যাকে পাচ্ছে তুলে নিয়ে নিজের বেলনাকার শরীর গর্ভে চালান করে দিচ্ছে। সেখানে জলছে জ্বলন্ত বয়লার। নিক্ষিপ্ত শত্রু, ইলেকট্রিক চুল্লিতে যেমন শবদাহ হয়, তেমনিভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একটি যন্ত্রের পক্ষে বানর ও রাক্ষস বাছাই করে চুল্লিতে চালান করা সম্ভব নয়। সুতরাং লক্ষ্মণ ঠিকই দেখেছেন, শিকার ধরার বেলায় যন্ত্রমানব কুম্ভকর্ণ বাছবিচার করতে পারে নি। রোবট বা যন্ত্রযানের ভেদজ্ঞান আছে এটাই বরং আশ্চর্য কথা বলে শোনাতো। রাম যা বুঝতে অক্ষম, বানর সেনাধিনায়ক নীল এবং বালীপুত্র তরুণ অঙ্গদ কিন্তু তা সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। বস্তুত পক্ষে লড়াইটাও যে তাঁরাই করেছিলেন।

নীল বলেছিলেন, "সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটি যন্ত্র উচ্ছ্রুত করিয়াছে। অতএব তোমরা ভীত হইও না!" অঙ্গদ বলেছেন, "কুম্ভকর্ণ একটি মহতী বিভীষিকা মাত্র।" [বা. রা. / ভারবি প্রকাশন / যুদ্ধকাণ্ড]

ভক্তরা ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু নিরুপায় আমাকে বলতেই হবে, শৌর্যে বীর্যে বুদ্ধিমত্তায় রামচন্দ্রের চেয়ে বানর নেতারা ছিলেন অনেক বেশি উন্নত। দক্ষিণী বুদ্ধিমান জাতি আজও ভারতকে অনেক জ্ঞানীগুণী বিদ্বান ও বিজ্ঞানী উপহার দিচ্ছে। আর্যরা সেদিন দেবতাদের মদতে দক্ষিণ ভারত জয় করে আদি ভারতীয়দের বানর বলে উপহাস করেছিল। অথচ সেকালেই দক্ষিণীরা নিজেদের উন্নত জাতি হিসেবে বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণ করেছিলেন। যাইহোক, এবার কুম্ভকর্ণের তথাকথিত মনুষ্যভক্ষণ ক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাক।

রামায়ণের প্রতিবেদন, "বানরগণ কুম্ভকর্ণ কর্তৃক তদীয় পাতালসদৃশ মুখগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নাসাপুট ও কর্ণযুগল দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল।"

তাজ্জব ব্যাপার! ঘটনা যদি তাই হয়ে থাকে তবে আর ভক্ষণ কার্যটি হলো কোথায়? তাছাড়া কোনো খাদকের ক্ষেত্রে এমন ম্যাজিক হতে তো শোনা যায় না। খাদ্য কবে খাদক উদরস্থ করার পর কর্ণনাসা-রন্ধ্রপথে বার হয়ে এসেছে? এখানেও, সুতরাং কুম্ভকর্ণের যান্ত্রিক সত্তাই সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ডাকবাক্স-সদৃশ খোলটার মধ্যে যন্ত্রটি যখন নির্বিচারে উভয় পক্ষীয় সেনা ভর্তি করছিল, তখন তার অগ্নিগহ্বর থেকে আত্মরক্ষা করে কেউ কেউ যন্ত্রের বহির্দেশে ফিরে আসতে পেরেছে। এই ঘটনায় বোঝা যায়, কুম্ভকর্ণ নামক যন্ত্রটি বাস্তবিকই অতিকায় একটি

রথ বিশেষ ছিল। বানর সেনারা এই যন্ত্ররথের ওপর চড়ে হুটোপাটিও করেছে।

আরও সংবাদ, যুদ্ধক্ষেত্রে 'হস্তপদাদি-বিচ্ছিন্ন' কুম্ভকর্ণকে রক্তাক্ত, অবসন্ন, ক্লিষ্ট কিম্বা বিচলিত দেখা যায় নি। যন্ত্র ছাড়া রক্তমাংসের জীব হলে যখন তার হাত পা কাটা পড়ল তখন নিশ্চয় রক্তপাত হতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। হাত-পা কাটা কুম্ভকর্ণ কেবলমাত্র তার যান্ত্রিক মগজটির জোরে যুদ্ধক্ষেত্রে চক্রাকারে ঘুরে বেড়িয়েছে। রাম যখন তার মস্তিষ্করূপ এঞ্জিনটাকে অস্ত্রাঘাতে বিকল করে দিলেন, একমাত্র তখনই তার গতি স্তব্ধ হয়েছে, পতন অনিবার্য হয়েছে।

বিকল বিকলাঙ্গ এই যন্ত্রটিকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। রামায়ণে এ ধরনের ছোটখাটো রোবটের সন্ধান যখনই আমরা পাব, তখনই দেখব, যন্ত্র বিকল হওয়ার পর যন্ত্রমানবটিকে হয় ভূগর্ভে সমাধিস্থ করা হয়, নচেৎ ফেলে রাখা হয় জলাশয়ে।

এই সাবধানতার কারণ একমাত্র বিজ্ঞানীরাই ব্যাখ্যা করতে পারেন। আমাদের কাজ তাঁদের সামনে উদাহরণগুলি তুলে ধরা। আমি সে চেষ্টাই করেছি। রামের দাক্ষিণাত্য অভিযানের পথে আরও কয়েকটি যান্ত্রিক যান ও যন্ত্রদানবের সন্ধান আমরা পাবো এবং সেগুলি সেখানেই ব্যাখ্যা করব।

দেবপুত্রকথা

প্রজাপতি প্রেরিত ভয়ালদর্শন মহাভূতটি রাজা দশরথকে একপাত্র দিব্য পায়স প্রদান করেন। তাঁর যান্ত্রিক কণ্ঠ জানিয়েছিল, দশরথের দেবানুগত্যে প্রীত ব্রহ্মাজী ঐ পায়স রাজমহিষীদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। রাজাকে সর্বসমক্ষে বলা হ'ল, প্রেরিত দিব্য পায়স ভক্ষণ করলে রাজমহিষীরা গর্ভবতী হবেন এবং সুপুত্র লাভ করবেন।

পায়স যেহেতু দেবভূমি গাড়োয়াল হিমালয় থেকে প্রেরিত, তাই স্বাভাবিক কারণেই তাকে বলা হয়েছে 'দিব্য [বা দেবগণ প্রেরিত] পায়স'। কেবলমাত্র ঐ 'দিব্য' শব্দের জন্যই পায়সান্নটিকে অলৌকিক মন্ত্রপূত কোনো খাদ্যবস্তু ভাবার কারণ নেই। পৌরাণিক রোবটরহস্য জানার পর পরীক্ষা না করে কোনো বস্তুকেই আমরা যাদুমন্ত্রপূত বলে মানতেও আর রাজি নই।

ভক্ষিত দ্রব্যের দ্বারা অসুস্থতা নিরাময় হতে পারে, শারীরিক উন্নতি লভ্য

হয়, কিন্তু ভক্ষণ কার্যের ফলশ্রুতিতে পুত্রবতী হওয়া যায় বলে জানি না। দেবতা ও ঋষির বীর্য ভক্ষণের ফলে অথবা দেহের অংশ বিশেষে তাঁদের স্খলিত বীর্য পতনের ফলে মানবকন্যারা গর্ভবতী হয়েছেন অথবা তেমনক্ষেত্রে তাঁদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এমন কিছু অলীক ধারণা পুরাণকাররা তাঁদের সমকালীন কর্তা-ভজা সমাজে প্রচার করে গেছলেন। দেবভীত-সমাজ বিনা প্রশ্নে সেইসব আষাঢে গল্প মেনেও নিয়েছিলেন। কারণ দেবতা ও তাঁদের ভাববাদী পুরাণকারদের রচিত গল্পই ছিল ইতরজনের একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম। দ্বিতীয় কোনো শিক্ষা না-থাকার জন্য ভাগবৎ-বাণীই একমাত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রচলিত ছিল। অন্ধ অশিক্ষার মধ্যে মানুষকে এভাবে অভিভূত রেখে দেবতা ও পুরোহিত সমাজকে ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিধর রূপে প্রতিষ্ঠিত করার স্থূল চাতুরী এখনও টিকে আছে আদিম সমাজে। টিকে ছিল ধর্মগুরু-শাসিত তিব্বতে। এ ভাবেই পুরাপিতারা ইচ্ছামত গল্প গডে মানুষকে ভূত প্রেত দৈবীক্ষমতায় আস্থাবান করেন। এখনও ধর্মব্যবসায়ীরা এ খেলা খেলে যাচ্ছেন।

মহাভারত আলোচনায় দেখেছি, দেবতা ও ঋষিরা পার্থিব প্রজনন ক্রিয়ার দ্বারাই মানবীগর্ভে দেবসন্তান উৎপাদন করেছিলেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নলজাতক বা টেস্টটিউব বেবীর সৃষ্টি অথবা গর্ভ স্থানান্তরকরণের দ্বারা মানবী গর্ভে সন্তান সৃষ্টির কথাও লিখিত আছে। প্রথমটির উদাহরণ, দুর্যোধনাদি এবং দ্রোণ প্রমুখের জন্ম, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় গর্ভ স্থানান্তরের ফলে জন্মলাভ করেন বলরাম। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দেবতা মানবী সঙ্গমের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করেছেন দেবপুত্ররা। সব চেয়ে পরিচিত উদাহরণ কর্ণ ও পাণ্ডবদের জন্ম [লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ]

বিষ্ণুর ঔরসে এই ভাবেই জন্ম হয় বাসুদেব কৃষ্ণের [লেখকের 'যদুবংশ ব্রজপর্ব' গ্রন্থ দ্রঃ]।

বালকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে বলা হয়েছে, দশরথের পুত্রত্ব গ্রহণ করলেন দেবতা বিষ্ণু। যার অর্থ, বিষ্ণুর ঔরসে দশরথমহিষীরা গর্ভবতী হলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা অতঃপর দেবতাদের বললেন, এবার আপনারা বিষ্ণুর সহায়স্বরূপ কামরূপী বীরগণকে সৃষ্টি করুন!

দেবলোকে, রাবণবধের জন্য এভাবেই শুরু হ'ল দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি। ঠিক একই রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল কৃষ্ণজন্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজপুরে [যদুবংশ ব্রজপর্ব দ্রঃ]। সেখানে আভীর গোয়ালা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবপুত্রের জন্মদান

এবং দেববংশীয় তরুণ যোদ্ধাদের ব্রজপুরে আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বিষ্ণুপুত্র বাসুদেব-কৃষ্ণের রক্ষক, স্তাবক ও সহায়ক একটি বাহিনী সৃষ্টি করা এবং তাদের দ্বারা জরাসন্ধ জামাতা কংসকে মথুরার সিংহাসন থেকে উৎখাত করিয়ে অধিকৃত মথুরাকে দেবতাদের উপনিবেশে পরিণত করা।

পৃথ্বীপতিদের উৎখাত করার জন্য দেবতারা পৃথ্বীপুত্রদের সৃষ্টি করেছেন দেবগোষ্ঠীর পুরুষপুঙ্গবদের ঔরসে। এর পেছনে একটি কারণও ছিল। দেবতারা জানতেন, ভারতবর্ষের জনপ্রিয় রাজাদের সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারতীয় প্রজাদেরও তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন দেবব্রাহ্মণদের শ্রেণীভেদ-প্রধান সমাজব্যবস্থাকে সাধারণে ভালো চোখে দেখে না। তাই চতুর দেবতারা ভারতের মাটিতে এমন একটি বংশধারার সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন, জন্মসূত্রে দেবজাতির সঙ্গে আত্মীয়বন্ধনে যে বংশধারা আবদ্ধ থাকবে এবং সেই রক্তসম্পর্কের জন্যই অপরাপর আদি ভারতীয়দের চোখে বহিরাগত বিপক্ষীয়রূপে গণ্য হবে। ফলে দেবসৃষ্ট ঐ সম্প্রদায় নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদেই আদি ভারতীয়দের সঙ্গে শত্রুতায় বাধ্য হবে আর সেভাবেই পূরণ করবে তারা দেবস্বার্থ। ইংরেজিতে যাকে বলে, অ্যালিয়ানেট (alienate) করা, দেবতারা সেভাবেই এক গোষ্ঠী মানুষের বিরুদ্ধে অপর গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে alienate করে আপন অভীষ্ট পূরণ করেন। তাঁদের দ্বিতীয় রাজনৈতিক খেলা ছিল, শত্রুর ঘর আগেই ভেঙে দেওয়া, পরে তাকে আক্রমণ করা। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের লোক ভাঙিয়ে নিজেদের শিবিরভুক্ত করে সেই বিশ্বাসঘাতককে শত্রুশিবিরে চর হিসেবে নিযুক্ত রাখা অথবা তাকে সামনে রেখে শত্রুনিধন করা। এর ফলে বহিরাগত দেবতারা নেপথ্যে থেকে শত্রু-রাজ্যটিকে অনায়াসে দেবপক্ষভুক্ত করে নিতেন, লোকচক্ষে নিজেদের ভাবমূর্তি বজায় রেখে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতেন।

এই বিভেদের রাজনীতিতে তাঁরা খুবই সফলকাম হয়েছিলেন। বালী সুগ্রীব বিবাদ বাধিয়ে ভায়ের দ্বারা ভাইকে খুন করানো, রাবণপক্ষ থেকে রাজ্যলোভী বিভীষণকে ভাঙিয়ে নেওয়া, ধৃতরাষ্ট্র সভায় বিদুরকে বসিয়ে রেখে কর্ণ দুর্যোধনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সৃষ্টি, দেবক ও বসুদেবকে মথুরার সিংহাসন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিষ্ণু রাজনীতির দ্বারা কংসকে পরাস্ত করা, রাজমন্ত্রী কুম্ভাণ্ড এবং মন্ত্রীপুত্রী চিত্রলেখার সাহায্যে বাণরাজ্য অধিকার [লেখকের 'দেবায়তন হিমালয়' গ্রন্থ দ্রঃ] এমন সব ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে দেবতা এবং তাঁদের স্তাবক ব্রাহ্মণগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আর্য প্রতিষ্ঠাকে সম্পূর্ণ করেন।

দেবগণের বানরপুত্র

রাবণ বধের জন্য বিষ্ণুপুত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা। তিনি রামচন্দ্রের একটি সহায়ক বাহিনী একই সঙ্গে তৈরী করার জন্যও দেবতাদের আদেশ দিয়েছিলেন : "অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনুষু চ। যক্ষপন্নগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীষু চ॥ কিন্নরীণাং চ গাত্রেষু বানরীণাং তনুষু চ। সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্য পরাক্রমান্॥" ১৫-১৬/১৭ অঃ

ব্রহ্মার আজ্ঞায় প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্বী, যক্ষ, ঋক্ষ, পন্নগ, ভল্লুক, বিদ্যাধর কিন্নরী এবং বানরী কন্যাদের গর্ভে পরাক্রমশালী 'বানররূপী' ['বানরবেশী' অর্থাৎ লাঙ্গুল পরিচ্ছদধারী বানরজাতীয়] পুত্র উৎপাদনের আদেশ শিরোধার্য করে দেবতারা সন্তান উৎপাদনের মহোৎসবে যার যেমন ইচ্ছা নারীসঙ্গমে মেতে উঠলেন [প্রসঙ্গত জানাই, বাইবেলেও দেবতাদের 'যাঁর যেমন ইচ্ছা সুন্দরী পৃথ্বীনারী সম্ভোগের' সংবাদ আছে]।

অপ্সরা গন্ধর্বী প্রমুখ পৌরাণিক নামগুলি ভারতবাসীদের ভক্তিভাবে মুগ্ধ করে। সাধারণ ধারণা, ঐসব প্রাণীও স্বর্গদেবতা প্রভৃতির মতো ঈশ্বরীয় লোকের অলৌকিক জীব। এ ধারণা সৃষ্টি করে গেছেন দেবতাদের ভাববাদী চতুর পুরাণ-রচয়িতারা। পূর্ববর্তী আর্য ইতিহাস-সমৃদ্ধ বৈদিক সাহিত্যে কিন্তু এদের জাগতিক পরিচয়ের বেশ তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। বোঝা যায়, কোনো অপার্থিব লোকের অলৌকিক প্রাণী ছিলেন না তাঁরা, তাঁরাও বসবাস করে গেছেন ভারত-বর্ষের পাহাড়ে পর্বতে, সমতলে, সমুদ্রোপকূলে। দেবতা ও ভারতীয় অন্যান্য জাতির সঙ্গে এঁদের যৌন সংসর্গ ঘটেছিল এবং তাঁদের বংশধারা আজও হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

অপ্সরা এবং গন্ধর্বীকে আমরা একই জাতির মানবীরূপে গণ্য করতে পারি। অপ্সরা সম্প্রদায় গন্ধর্বপুরুষদেরই সহচরী এবং তাদের দ্বারাই রক্ষিতা ছিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের বাসস্থান হিসেবে স্বর্গ মর্ত্য উভয় লোকেরই সন্ধান পাওয়া যায় বৈদিক গ্রন্থাবলীতে। আর স্বর্গ বলতে আর্যরা তো হিমালয় অন্তর্ভুক্ত গাড়োয়াল অংশটিকেই বুঝতেন। সেখানেই ছিল তাঁদের গড়দুর্গ শিবির রাজধানী। মর্ত্য বলতে নির্দেশ করতেন তাঁরা গাঙ্গেয় উপত্যকাকে। পাতাল অংশ তাদের অভিধানে

ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চল। গন্ধর্ব এবং তাঁদের প্রেয়সী অপ্সরাদের যেটুকু পুঁথিগত সংবাদ পাওয়া যায়, তাতে এঁদের প্রথমে দক্ষিণদেশীয় সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা পরে দেবলোক কুমায়ুন গাড়োয়াল হিমালয়ে বসতকারী বলে ধারণা হয়। গন্ধর্বরা জলের কাছাকাছি বসতি স্থাপন করতেন। জলক্রীড়া ছিল তাঁদের জাতীয় আকর্ষণ। অপ্সরাগণও সমুদ্রোপকূলে বসবাস করতেন বলে অথর্ববেদে উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তার 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "স্বর্গাঞ্চলে বসতি স্থাপনের পূর্বে হয়ত তাঁদের পূর্বপুরুষগণ সমুদ্রাঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।...স্বর্গাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও অপ্সরাগণ সরোবরের তীরে বাস করতেন এবং তাঁদের প্রতিবেশী থাকতেন গন্ধর্বেরা।...দিব্যলোকে বসতি স্থাপনের পর গন্ধর্বদের দিব্যগন্ধর্ব বলা হত (য ৩০/১)। তাঁরা বিজ্ঞান বিশারদ ছিলেন বলে তাঁদের কেতপূ [য কেতেন বিজ্ঞানেন পুণাতি] আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।... অথর্ববেদে তাদের বিদ্বান বলা হয়েছে (অ ২/১.২)।...এঁরা উত্তম অক্ষবিৎ ছিলেন (অ ৭ ১০৯.৫)।" শ্রীমিত্র আরও জানিয়েছেন, হিমালয়ে যমরক্ষিত স্বর্গের পথে যমের অদ্ভুতদর্শন কুকুর প্রহরা ছিল এবং যমরক্ষীরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বন্দী করে যমের যন্ত্রণাগারে প্রেরণ করতেন। অপ্সরাদের এইসব পথে কুকুর নিয়ে বিচরণ করতে দেখা যেত।

উল্লিখিত বিবরণীসমূহ থেকে বোঝা যায়, গন্ধর্বী অপ্সরা প্রভৃতি সম্প্রদায় কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, তাদের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। রামায়ণ আমলে গন্ধর্বী ও অপ্সরাবৃন্দ সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে এবং হিমালয়ের বিশেষ দেব-অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করতেন। যক্ষিণীদের যে মূর্তি দেখা যায় তাও সুন্দরী মানবী মূর্তি। তাঁদের চিত্রিত রূপ থেকে বোঝা যায়, তাঁরা ছিলেন অপ্সরাদের মতোই স্ববেশ্যা বা দেবজনগোষ্ঠীর রক্ষিতা সম্প্রদায়। হতে পারে এঁরাই ছিলেন দেবদাসী প্রথার পূর্ব সংস্করণ। কিন্নর কিন্নরীরা আজও আছেন হিমালয়ে। তাঁদের কিন্নর দেশ বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা। কিন্নরের পূবে তিব্বত, উত্তরে স্পিতি আর দক্ষিণে তেহরি গাড়োয়াল। 'অমর কোষে' যক্ষ বিদ্যাধর কিন্নর প্রমুখ দশটি দেবজাতির উল্লেখ আছে।

বিদ্যাধর সম্প্রদায়ের আবাস ছিল পাঞ্জাব সন্নিহিত অঞ্চলে। গন্ধর্বরাও এঁদের প্রতিবেশী ছিলেন। সোমদেবের 'কথা সরিৎ সাগরে' বিদ্যাধরদের চন্দ্রভাগা—ইরাবতী সন্নিহিত অঞ্চলে শাকল প্রদেশবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

১। Katha Sarit Sagar C. H. Tawney/Vol. I দ্রঃ।

বিদ্যাধরদের মধ্যে সুরাসুর দুই সম্প্রদায়ই ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে দুই মানব নেতা, শ্রুতশর্মণ ও সূর্যপ্রভ।

পৌরাণিক তথ্যাবলী থেকে আরও জানা যায়, অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও কিন্নরদের লীলাভূমি ছিল ত্রিকূট পর্বত। ভাগবতে ত্রিকূটের অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে সুমেরু পর্বতের পাদদেশে। অন্য মতে ত্রিকূট ছিল পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত।[২]

ঋক্ষ ও ভল্লুক সমজাতীয় সম্প্রদায় মনে করলে হয়ত ভুল করা হবে না। ভল্লুক সম্প্রদায়ের রাজা জাম্ববান ছিলেন ঋক্ষরাজ। জাম্ববান-কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন কৃষ্ণ। জাম্ববতীর প্রথম পুত্র সাম্ব। এঁরা প্রত্যেকেই মানব সন্তান। জাম্ববানও ব্রহ্মার পুত্র। রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা জাম্ববানের সৃষ্টি করেন। ইনি রাম সহায়ক বানর-রাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ঋক্ষ ও ভল্লুক গোষ্ঠীর আদি নিবাস হিমালয়। পরে ব্রহ্মার আশীর্বাদে এঁরা দক্ষিণদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

উদ্ধৃত তথ্যাবলীর আলোকে সেদিনের এক সৃষ্টিযজ্ঞের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখি, পার্বত্য অঞ্চলের গৌরাঙ্গী অপ্সরা এবং দাক্ষিণাত্যের শ্যামলী সুন্দরীদের সঙ্গে দেবজাতীয় পুরুষদের অবাধ যৌনমিলনের ফলে যে দেব-ঔরসজাত বানর জাতীয় প্রধানদের জন্ম হল, ব্রহ্মা তাদের নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় একটি রাম-সহায়ক বাহিনীর রিজার্ভড ফোর্স তৈরী করলেন। উপযুক্ত সময় এরাই রামের বানরসেনা রূপে দেবস্বার্থে লঙ্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে চতুষ্পদ এবং সহজাত লাঙ্গুলধারী বানর-বানরীর উল্লেখ নেই। বরং বানরজাতি কর্তৃক লাঙ্গুল শোভা ধারণের অর্থাৎ লাঙ্গুল সজ্জা গ্রহণের স্বীকৃতিই চোখে পড়ে। মানুষের বানরত্ব লাভ ঘটেছে মুনিতে বানানো প্রক্ষিপ্ত কল্পকাহিনীর মধ্যে। মহাকাব্যে যদিও স্পষ্টতই বলা হয়েছে, "দেবগণ ভগবান স্বয়ম্ভুর [ব্রহ্মার] আদেশ শিরধার্য করিয়া বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন।" —কথক ঠাকুররা কায়দা করে সেই 'বানররূপী' বা 'বানর রূপসজ্জাধারী' দেবপুত্রদের 'কিলকিলা' রবকারী বৃক্ষশাখাবাসী বানরে সরাসরি রূপান্তরিত করে গেলেন। একটি সুশিক্ষিত মানব জাতিকে অবমাননার এমন নজির বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে ও মিথের আধিপত্য যথেষ্ট জোরদার নয়। যে কোনো যুক্তিবাদী নিবিষ্ট পাঠকই কথকতার মিথ্যা ভাষণটি ধরে ফেলতে পারেন। দুর্ভাগ্য

২। Historical Geography of Ancient India, Dr. B.C. Law.

এই, অত্যাবধি ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে যুক্তিপ্রবণতা ধর্মভয়মুক্ত হ'তে পারে নি। যাত্রাপালাগানে এবং নব নব রামায়ণকথায় বেদজ্ঞ, রাজনীতিপ্রাজ্ঞ, প্রখর বুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন এক দক্ষিণী মহাবীর একটি অতিপ্রাকৃত হনুমান রূপেই চিত্রিত হয়ে আছেন।

ভারততাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে, রামায়ণযুগে দক্ষিণী জাতিবর্গের মধ্যে বানর ভল্লুক প্রভৃতি টোটেমী জাতির বসবাস ছিল। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এঁরা অরণ্যময় অঞ্চলে থাকতেন। স্বজাতীয় টোটেম হিসেবে পোশাকের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তাঁরা বাহারী লাঙ্গুল বা লেজ।[৩] আমাদের ঐতিহাসিক কালেও মিশরীয় ক্যারাও এবং মিশরী পুরোহিত সম্প্রদায় লাঙ্গুলভূষণ ব্যবহার করেছেন।[৪] মিশরীয় দেবতারাই ছিলেন লাঙ্গুলজাতীয় পোশাকের আবিষ্কর্তা ও ব্যবহারকারী।

ছদ্মবেশ ধারণে পটুত্ব ছিল বানর জাতির। এজন্য তাদের বলা হয়েছে, 'কামরূপীন', এঁদের দেহবর্ণের বর্ণনা থেকে মনে হয় আর্য অনার্য রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এঁরা বিভিন্ন দেহবর্ণ লাভ করেন। সুগ্রীব প্রমুখ দেবপুত্র ও বানরপ্রধানদের গায়ের রঙ ছিল দেবতাদের মতোই হেমপিঙ্গল। অন্যদিকে কৃষ্ণকায় বনচারী সম্প্রদায়ের বানর সমাজ ছিলেন 'গোলাঙ্গুলা' নামে পরিচিত।

কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় বানর সম্প্রদায়েরই লাঙ্গুলপ্রীতি ছিল এমন নয়, শিক্ষিত মিশরীয়গণ ছাড়াও লাঙ্গুলভূষণ ব্যবহারে আকৃষ্ট ছিল তৎকালীন বেশ কিছু আদিম মানবগোষ্ঠী। বিশাখাপত্তনমবাসী সবরজাতি পোশাকের সঙ্গে লাঙ্গুলের ব্যবহার করতেন। রামায়ণ যুগে অরণ্যচারী অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যেও ছিল লাঙ্গুলপ্রীতি। ডঃ ডি. সি. সেন জানিয়েছেন, অভিষেককালে কোনো কোনো ভারতীয় রাজপরিবারে লাঙ্গুলভূষণ ধারণের প্রথা অবশ্যপালনীয় ছিল। আন্দামানের একটি আদিম গোষ্ঠীকে লাঙ্গুলভূষণ ধারণ করতে দেখেন ভি. ডি. সাভারকার।

আমাদের দেশে যদি যাত্রাপালাগানের আসরে বানর জাতির মানুষী রূপই দেখানো হত, যদি তাদের পোশাকের সঙ্গে একটি লেজ প্রলম্বিত রাখা হত, ব্যাপারটি যথার্থই ঐতিহাসিক হতে পারত। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে ধর্মকথা বলে প্রচারের প্রবণতা প্রাচীন ইতিহাস-সচেতনা থেকে ভারতবাসীকে বঞ্চিত

৩। India in Ramayana Age / Dr. S. N. Vyas.

৪। Egyptian Mythology / Veronica Ions.

করেছে। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে রামকাহিনীর চিত্রায়ণে বানরজাতিকে চতুষ্পদ জান্তব রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত তথ্যের খোঁজখবরে উৎসাহ বোধ করেন নি কথক শ্রোতা কেউই। ফলে বাল্মীকির রামায়ণ পরিণত হয়েছে বড়দের মনোহরণকারী পৌরাণিক রূপকথায়।

দেবমন্দির প্রতিষ্ঠাতারা রাজা মহারাজা। এই শাসক সম্প্রদায় তাঁদের প্রজা-সাধারণকে তথাকথিত অলীক ধর্মপাশে আবদ্ধ রেখে শাসন পরিচালনার সুবিধে করে নিয়েছেন, টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন শোষণের পাকা বনিয়াদটি।

পৌরাণিক ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারত-যুগে বিভিন্ন টোটেমী জাতির অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন জানোয়ারের নামে নিজস্ব টোটেম অনুসারে আদি জাতি প্রজাতি তাঁদের গোষ্ঠী নামও গ্রহণ করতেন। ভারতে এমন জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান নাগ (সর্প টোটেম), ঋক্ষ (ভল্লুক টোটেম), বানর, কুকুর, মহিষ প্রভৃতি সুপরিচিত।

নাগ জাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় পল্লবিতও হয়েছিলেন তাঁরা। নাগ জাতির নামেই নাগপুর। নাগ নেতা বাসুকি কালীয়, শেষ নাগ। এঁদের কেউ কেউ আর্য দেবতা গোষ্ঠীর বশ্যতা স্বীকার করেছেন। বহুজনে আবার দীর্ঘকাল আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব বজায় রেখে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করে আপন গোষ্ঠী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন।

স্যার হারবার্ট রিসলের অধীনে এক সময় একটি এথ্‌নোগ্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট তৈরী হয়। ঐ প্রতিবেদনে প্রকাশ, সাঁওতাল, হোম, মুণ্ডা, ভিল প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে টোটেমী সংস্কারের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। ওড়িষার কুর্মী, কুমহার, ভূমিয়া সম্প্রদায় নাগ, শৃগাল প্রভৃতি টোটেম ব্যবহার করতেন। ধোষের কাটকারি সম্প্রদায় অথবা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশের গোন্দরাও ছিলেন টোটেমী জাতি। ছোটনাগপুরবাসী সোরেন গোষ্ঠীর টোটেম ছিল পাথর, মুরুদের কচ্ছপ, সামাদের হরিণ, টোপনা ও গারহাদদের পাখী, টামারিয়াদের নাগ, বার্লিহাদের ফল ইত্যাদি ছিল সাম্প্রদায়িক টোটেম।

টোটেমী জাতির অস্তিত্ব আর্যদের মধ্যেও কিছু এমন অপ্রতুল ছিল না। ওল্ডেনবার্গ লক্ষ্য করেছেন, মাছ ও কুকুর টোটেম আর্যসম্প্রদায় বিশেষে মান্য ছিল ঋগ্বেদীয় আমলে। ঋগ্বেদে বিভিন্ন লতা বনস্পতির উদ্দেশ্যে স্তুতিমূলক স্তোত্র আছে। বিভিন্ন অচেতন বস্তুও বৈদিক শ্লোকে দেবতারূপে গণ্য হয়েছে।

ম্যাকডোনেল ও কীথ সাহেবরা এগুলিকে আর্য টোটেমের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে ডঃ সি ডি চ্যাটার্জি বলেন, ঋগ্বেদে টোটেমের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। তারই প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে রামায়ণ মহাভারতে।[৫]

মিশরীয় দেবায়তনে বিভিন্ন প্রাণীরূপধারী দেবতারই প্রাধান্য। সূর্যদেবতা 'রা'-এর প্রতীক ঈগল, আবার সূর্যদেবতা স্বয়ং-ই ঈগলরূপী। তুলনায় ভারতীয় গড়ুরকে সহজেই মনে পড়ে যিনি ছিলেন ভারতীয় সূর্যসারথি, অরুণের সহোদর। মিশরীয় দেবতা আইসিস সারসরূপী। জ্ঞানের দেবতা থ' থ'—বেবুন। পাতাল দেবতা সেট-এর রূপ গজকচ্ছপ টাইপ। লম্বা মুখ, চৌকো কান এবং লেজবিশিষ্ট এই দেবতার কাল্পনিক রূপটিও অপার্থিব।

আর্য পুরাণকাররা টোটেমী না-আর্য জাতিগোষ্ঠীকে তাদের টোটেম দ্বারাই অভিহিত করে মানুষের ওপর জান্তব প্রাণীর অবয়ব অরোপ করেছেন। এই মিথ্যাচারিতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। রামায়ণযুগে বানরজাতির সমৃদ্ধির তুলনায় ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর উন্নতি বরং অপেক্ষাকৃত হীন ছিল। কিন্তু আর্য বুদ্ধিজীবীদের পুরাকথা রচনার কৌশল সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা সৃষ্টি করে গেছে।

একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা বানরজাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। তাঁদের সমাজ ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা যূথে বিভক্ত। গোষ্ঠীপ্রধান অভিহিত হতেন যূথপ নামে। কতিপয় যূথপর অন্যতম ছিলেন, দুর্ধর, কেশরী, গবাক্ষ, নীল। সর্বময় সেনাপতির উপাধি, মহা-যূথপ, মধ্যবর্তী পরিচিত ছিলেন, যূথপ-যূথপ উপাধি দ্বারা। বিপৎকালে পাহাড়ে অরণ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীপ্রধানের আহ্বানে একত্রিত হতেন তাঁরা। সুগ্রীবের আহ্বানে এই ভাবে বানর জাতির সমাবেশ ঘটেছিল বলে রামায়ণে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বানর জাতির সমৃদ্ধ রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর (কিষ্কিন্ধ্যা) বর্ণনা আছে রামায়ণে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রাসাদে প্রবেশ করে চমৎকৃত হন। সেখানে তিনি অনেক সুন্দরী রমণী এবং বহু অঢেল বিলাসোপকরণ দেখে বিলাসী সুগ্রীবকে ভৎর্সনাও করেন। বানর রমণী তারার সৌজন্যপ্রকাশ ও বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় এই পর্বে আছে, তাতে বানর রমণীদের মধ্যে সুশিক্ষিতা নারীর অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

৫। Races & Cultures of India / Dr. D. N. Mazumdar / Cast origin. দ্রঃ।

বানর শব্দটি রামায়ণে এক হাজার আশি বার উল্লেখিত হয়েছে। ডঃ ব্যাস শব্দটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উল্লেখগুলি বিচার করে এই শব্দের সাধারণ অর্থ করেছেন, বনচারী। বানরদের 'হরি' নামেও অভিহিত করা হয়েছে এবং শব্দটির উল্লেখ আছে পাঁচশ চল্লিশ বার। 'কপি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে চারশ কুড়ি বার। 'হরি' শব্দ দ্রুতগামিতা বোঝায়। 'কপি' শব্দের দ্বারা এদের লাঙ্গুল-ভূষণ-প্রিয়তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই লাঙ্গুল-ভূষণই বানরজাতিকে সাধারণ বানর পর্যায়ে অবনমিত করে।

বানরজাতি বিজ্ঞানে এবং গৃহনির্মাণ শিল্পে বিশেষ উন্নত ছিল। বালী সুগ্রীবের প্রাসাদ এবং কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর ঐশ্বর্য তাদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। তারা যন্ত্রের ব্যবহারও জানত। যুদ্ধকাণ্ডে বলা হয়েছে, মহাকায় মহাবল বানরগণ সমুদ্রবন্ধনের জন্য হস্তীতুল্য বৃহৎ পাষাণ ও পর্বত [পাথরের চাঁই ?] উৎপাটিত করে যন্ত্রযোগে বহন করে আনে :

হাস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥ [সর্গ ২২]

দেবতাদের ঔরসে বানর নেতাদের জন্ম। বাস্তবিক হাস্যকর কথা নয় কি? দেবতার বীজ বানর উৎপাদন করে, দেববুদ্ধিজীবীরা একথা কী করে বললেন তা যেমন বিস্ময়কর, তারও থেকে কম বিস্ময়কর নয় আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর কাণ্ডকারখানা। ভারতের সরকারী সংস্থা দূরদর্শনের পর্দায় মস্ত সব লাঙ্গুলবান পালোয়ানকে হাজির করা হয়েছিল। দেবপুত্রদের মুখে কারুকার্য করে বানরোপম বানানো হয়েছিল সেগুলি এবং একটি রোমশ ভাল্লুককে রামচন্দ্রের পার্শ্বচর রূপে খাড়া রেখে দারুণ চমকও সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারতবাসী সেই বৃদ্ধবোধ রূপ-কথার রূপালী চিত্র দেখে ভক্তিতে আপ্লুত হয়েছেন। মানুষ স্নানাহারের কথা বিস্মৃত হয়ে ভাগবৎজীবন দূরদর্শনের পর্দায় দেখে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন।

প্রশ্নহীন ভক্তির অপর নাম বোধহয় বিপত্তি, নির্বুদ্ধিতা এবং কুসংস্কার। দূরদর্শনে রামোপাখ্যান দর্শনের সময় যদি কেউ কষ্ট করে মূল রামায়ণের সহজলভ্য অনুবাদ-গুলিও পড়ে দেখতেন, তবে, বলে দিতে হয় না, অশ্রদ্ধায় পর্দা থেকে তাঁদের চোখ দুটি সরিয়ে নিতে হতো। কেননা, দেবতায় প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকলে দেবসন্তানদের ঐ রূপ তাঁদের দৃষ্টিতে অসহ্যই মনে হতে পারত। একবার দেখা যাক, প্রধান বানর-গণের উৎপত্তি হয়েছিল কীভাবে। তাহলেই হয়ত আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার হবে।

পবনপুত্র হনুমান

রামায়ণ বলছে, "বায়ু বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য দেহ, বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, বলবান্ হনুমানকে" উৎপাদন করলেন। এটাই হনুমানের আসল পিতৃ-পরিচয়। তবে যেহেতু বায়ু দেবতাটি সম্পর্কে সঠিক কোনো সাধারণ বিবরণ পাওয়া যায় না, তাই হনুমানের জন্ম নিয়ে নানা পুরাণে নানান গল্প ছড়িয়ে আছে। প্রথমে সেই উল্টোপাল্টা গল্পগুলি জানা দরকার। পরে আলোচনায় বসা যাবে।

একটি গল্প বলছে, হনুমানের জন্ম হয় কেশরী-পত্নী অঞ্জনার গর্ভে এক দেবতার অংশে। দেবতার অংশ বলতে দেবতার ঔরসেই বোঝায়, কারণ সে ভাবেই সবক্ষেত্রে দেবপুত্রদের জন্ম। গল্প বলে, একদিন কেশরী-পত্নী সুন্দরী অঞ্জনা যখন একাকিনী পাহাড়ে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ দেবতা বায়ু বা পবন সেখানে উপস্থিত হলেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণপ্রধানরা একাকিনী নারীকে ভোগ না করে মুক্তি দিতেন না। সুতরাং পবন দেবতার বলাৎকারে অঞ্জনা বিবস্ত্রা হলেন। বলা হল, বায়ুবেগে তাঁর শাড়ি উড়ে গেল। পবনের সঙ্গে মিলিত হলেন অঞ্জনা। অবৈধ এই সঙ্গমের ফলে জন্ম হ'লো পবনপুত্র হনুমানের। যার মা মানবী পিতাও মানুষ (তবে দেবজন গোষ্ঠীভুক্ত) জানি না পৌরাণিক গল্পকারের কোন্ যাদুতে তিনি প্রলম্ব লাঙ্গুলধারী বানরে পরিণত হলেন। হনুমানকে বানর গণ্য করা হলে ভীম কেমন করে মানুষ কৌন্তেয় রূপে মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের মধ্যে নিজের জায়গা করে নেন, সে প্রশ্নটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ তিনিও পবন বা বায়ুর ঔরসেই কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিলেন। নর-বানরের এই ভ্রাতৃ সম্পর্কটি কোন্ ডাক্তারী মতে বাস্তবসম্ভব ? তাছাড়া এক বানরপ্রধান সর্বশাস্ত্রবিদ্, রাজনীতিজ্ঞ, রণনিপুণ, রামানুচরই বা হয়েছিলেন কোন্ মন্ত্রবলে ? জবাব চাইলে পাপ ! ভগবান বাসুদেব বলেছেন, প্রশ্ন কোরো না, মেনে নাও। মেনে নেওয়াতেই শান্তি, না হলেই সংঘর্ষ এবং সবংশে ধ্বংস অনিবার্য।

ভক্ত বলবেন বায়ু কে ? কোন্ দেবায়তনে তাঁর স্থান ? উত্তরে যদি বলা যায়, বায়ুও এক দক্ষিণী পুরুষ, তাহলেই ভক্তের উৎসাহ দ্বিগুণ হবে। তিনি বলবেন, তবে তো মিলেই গেল, বায়ু নিশ্চয় আর এক জাতীয় "মহাপ্রাণী"। তিনিও বানর

জাতীয়, সুতরাং হনুমানের বানরত্ব অনস্বীকার্য। মন্দিরে মন্দিরে তাঁর বানরাকার রূপই পূজনীয়। তিনি ছিলেন রামভক্ত; পারতেন বুক চিরে সারিবদ্ধভাবে রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে দেখাতে। এমন কপিশ্রেষ্ঠ পুজো না পেলে, পূজিত হবেন কি ইন্দ্রজিৎ রাবণেরা? অকাট্য যুক্তি। রামচন্দ্রে শ্রদ্ধাভক্তিশীল এক বানরও যে ভারতবাসীর পূজা অর্ঘ্যের দাবিদার একথা কে অস্বীকার করবে। রাম স্বয়ং ঈশ্বর, কেন না তিনি পাপিষ্ঠ রাবণকে সবংশে নিধন করে সেই সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন স্বজাতিত্যাগী বিভীষণকে। এতোবড় কীর্তি ঐশ্বরিক বৈকি। ঈশ্বর পাপ সহ্য করেন না, যদি অবশ্য আমরা প্রমাণ করতে পারি, রাবণের পাপ ধরার ভার এমনই আকাশচুম্বী করেছিল যে, জগদীশ্বরকে তাঁর কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্রের সমস্যা শিকেয় তুলে নেমে আসতে হয়েছিল ভারতবর্ষের একটি প্রদেশে। মনে হচ্ছে, অতবড় প্রমাণ সাজাতে পারব না। দেখা যাক।

বায়ু দেবতার পরিচয় উদ্ধার করা সত্যিই সমস্যা। আমার প্রস্তাব, এক্ষেত্রে আমরা একটি সূত্র ধরে যুক্তি সাজাতে পারি। বায়ুর একটি কল্পিত মূর্তি পাওয়া যায়। হাতে পতাকা। তিনি হরিণবাহনে চেপে পর্যটন করেন। এই পরিচয় যথেষ্ট নয়। সুতরাং বায়ুকে সনাক্ত করতে হবে তাঁর পুত্র হনুমানের জন্ম-রহস্য ঘেঁটে। অঞ্জনা-বায়ু মিলনের প্রধান গল্পটি আগেই বলেছি। অপর এক গল্পে জানা যাচ্ছে, একবার মোহিনী-বেশী বিষ্ণুকে দেখে শিবের বীর্যস্খলন হয়। সেই দেববীর্য অঞ্জনার গর্ভে স্থাপন করা হ'লে হনুমান জন্মগ্রহণ করেন। দেবতারা মাঝে-মধ্যে নারীরূপের ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। আর নারী দেখামাত্র অপর দেবতা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, তা সে নারী যদি ছদ্মবেশী পুরুষও হয়, তবু। সে যাই হোক, কারো পতিত বীর্য গর্ভে স্থাপন করে কোনো নারীকে গর্ভবতী বানানো দেববিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারত কেননা তাঁরা গর্ভ স্থানান্তরও করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের বিচার্য বিষয় ভিন্ন। এই গল্পে আমরা এক শিবের নাম পেলাম। সেটাই স্মরণে রাখতে হবে।

তিন নম্বর গল্পে বলা হয়েছে, শিবের তেজ কেশরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তখন কেশরী (অঞ্জনার স্বামী) এবং বায়ু পর পর অঞ্জনার সঙ্গে সহবাস করলে শিবতেজে অঞ্জনা গর্ভবতী হয়ে প্রসব করেন হনুমানকে। চার নম্বর কাহিনীতেও শিবপ্রসঙ্গ উপস্থিত। বলা হয়েছে, হরপার্বতীর রমণের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, শিব সেই গর্ভ বায়ুকে দান করেন। বায়ু সেটি অঞ্জনার গর্ভে স্থানান্তরিত করলে অঞ্জনাগর্ভ থেকে হনুমান ভূমিষ্ঠ হন।

খুব গোলমেলে ব্যাপার। তবে তর্কে যেমন একটি সাধারণ উপাদান বা ফ্যাক্টর বেছে নিয়ে সিদ্ধান্ত গড়া হয়, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গড়ার পক্ষে সেই সাধারণ বিষয়টি হলেন শিব ঠাকুর। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ গল্পে প্রকাশ, শিবের নিকট থেকে প্রাপ্ত বীর্যবলেই হনুমানের শরীর গঠিত হয়েছিল। সুতরাং হনুমান জন্মের ক্ষেত্রে নেপথ্যে রয়েছেন শিব বা পশুপতি। পশুপতির সঙ্গে আবার একটি শিংওয়ালা হরিণেরও সম্পর্ক আছে। তবে এই পশুপতি শিব, কৈলাসাধিপতি কিনা তা বলা যায় না। ইনি দক্ষিণ ভারতীয় অনার্য দেবতা পশুপতিই হবেন। শিব অনার্য দেবতা, পরবর্তীকালে আর্য দেবায়তনে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, একথা পুরাণবিদ্ মাত্রেই জানেন। কিন্তু যথার্থ অর্থে শিবই পবন দেবতা নন। গল্পগুলিতে বায়ু বা পবনকে শিবের অনুগ্রহে প্রাপ্ত বীর্যের অধিকারী রূপে বর্ণনা করে শিব ও বায়ুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে নিশ্চিত ধারণা গড়ে দেওয়া হয়েছে। বায়ু যেভাবে শিবপ্রসাদ লাভ করেছেন তাতে তাঁকে শিবানুচর দেবতারূপে গণ্য করা যায়। গ্রন্থান্তরে এবং এই প্রবন্ধাবলীতে বার বার বলেছি, শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবপ্রধানদের পদবিমাত্র ছিল। এক দেবতার উত্তরাধিকারী গদীপ্রাপ্ত পরবর্তী দেবতাও ঐ পদবি দ্বারা পরিচিত হতেন। শিবকে শাসন করতে হত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং হিমালয়ের বেশিতম প্রদেশগুলি। কোনো মানুষের পক্ষেই এতো বড় সাম্রাজ্য একা শাসন করা সম্ভব ছিল না। শিবের প্রতিনিধি শাসক বা দেবতা থাকতেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তাঁরাও শিব উপাধির দ্বারাই পরিচিত ছিলেন। হনুমান জন্মের প্রথম গল্পে কেবলমাত্র বায়ুর নামই পাই। কিন্তু অন্যান্য তিনটি গল্পে শিববীর্যেই হনুমানের জন্ম, একথা বলা হয়েছে। চারটি গল্পের নির্গলিতার্থে মনে হয়, বায়ু এক শিব প্রতিনিধি দক্ষিণী দেবতা। তার ঔরসেই অঞ্জনাগর্ভে হনুমানের জন্ম। এই বায়ু ছিলেন দক্ষিণদেশে মহাসু শিবের প্রতিনিধি প্রশাসক। তাই শিব বীর্যে বলীয়ান বায়ু-কর্তৃক অঞ্জনার গর্ভোৎপাদনকথা প্রতিটি গল্পে সামান্য রকমফের করে বলা হয়েছে।

গল্প যেমনই হোক, হনুমান যে দেবমানবী মিলনের ফলে জাত এ বিষয়ে নিশ্চয় আমরা সন্দেহমুক্ত হয়েছি। আর তা যদি হয়ে থাকি তবে কিছুতেই মানতে পারব না, মহাবীর ও সুপণ্ডিত হনুমান ছিলেন সহজাত লাঙ্গুলধারী এক বানর। এমন এক বিক্রমশালী রাজনীতিজ্ঞ এবং বৈদিক পণ্ডিতকে যাঁরা জন্তুমাত্র ভাবেন আর তাঁর হনুমানরূপে আস্থা রাখেন, তাঁরা লাঙ্গুলবিহীন হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা যে

মানবিক বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী এমন কথা আমি বলতে পারি না। হনুমানের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই একজন বড় মাপের মানুষের মতো।

সূর্যেন্দ্রসূত সুগ্রীব-বালী

বালী সুগ্রীবের জন্ম সম্পর্কে একটি গল্প অন্তত বাস্তবসম্মত এবং পরিষ্কার। কিন্তু যেহেতু তাঁরা পুরাণকারদের হাতে পড়েছেন তাই মূর্খ কথকের লেখনী তাঁদের জন্ম-কাহিনীকে কদর্য ও রহস্যমণ্ডিত করেছে ইচ্ছেমত। আলোচনার সুবিধার জন্য আষাঢ়ে গল্পগুলি আগে বলে নেব। পরে বলব যে গল্পটি বস্তুত গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য, তার কথা।

এক গল্পে জানা যায়, ব্রহ্মার অশ্রু পতনের ফলে এক বানরপুঙ্গবের জন্ম হয়, নাম, ঋক্ষরজা। মেরু পর্বতে স্নান করতে গিয়ে একদিন সেই বানর পরিণত হয় এক সুন্দরী রমণীতে। সুন্দরী একই সঙ্গে ইন্দ্র এবং সূর্যের দৃষ্টিতে ধরা পড়লে দুই দেবতা কামার্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের উভয়েরই বীর্যস্খলন ঘটে। সেই দেববীর্য ঋক্ষরজার বালে বা কেশে পতিত হলে বালজাত হয়ে জন্ম নেন বালী, আর গ্রীবায় পতিত বীর্য জন্ম দেয় সুগ্রীবের। কাম চরিতার্থের পর ঋক্ষরজা ব্রহ্মার প্রসাদে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন এবং ছেলে দুটিকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

অন্য একটি গল্পে পুরুষ অরুণের গর্ভে দুই ছেলের জন্ম, এমন অবিশ্বাস্য আর একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অরুণের বড় সাধ ছিল ইন্দ্রের জলসাঘরে দেবদাসী অপ্সরাদের নাচ দেখবেন। কিন্তু সূর্যসারথি অরুণের পক্ষে পুরুষবেশে সেখানে প্রবেশ করার উপায় ছিল না। ইন্দ্র তাঁর কামকলা নিকেতনে অপর কোনো পুরুষকে প্রবেশাধিকার দিতেন না। অতএব অরুণ মেয়ে সেজে সেখানে গেলেন। কামুক ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ অরুণের ওপর চড়াও হয়ে তাঁর কাম চরিতার্থ করে নিলেন। দেবতাদের ব্যাপারই আলাদা। ইন্দ্রের বীর্যে পুরুষ অরুণের গর্ভে বালীর জন্মসম্ভাবনা দেখা দিলো। ওদিকে ইন্দ্রলোক থেকে সূর্য-প্রাসাদে ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় সূর্য তাঁর সারথির কাছে বিলম্বের কৈফিয়ৎ চাইলেন। অরুণ তাঁর নারীবেশ ধারণের গল্পটি বলেন। সূর্য তাঁকে পুনরায় নারীবেশ ধারণ করতে আদেশ দেন। মেয়ে সেজে অরুণকে দারুণ দেখায়। সূর্য আর কি করবেন, তাঁর শরীরেও তো দেবতার বীর্য। অতএব তিনিও কামার্ত হয়ে অরুণের গর্ভে সুগ্রীবের বীজ বপণ করলেন।

অরুণ-গর্ভ থেকে জন্ম হ'ল বালী ও সুগ্রীবের।

এমন হীন গল্পকাহিনী কী করে যে ধর্মকথা হয় তা ধার্মিকরাই বলতে পারেন। আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখে শুনলেও পুরুষের গর্ভে সন্তানোৎপাদনের অলৌকিতায় আস্থা রাখতে পারব না, এজন্য দুনিয়ার ধার্মিকরা শাপশাপান্ত করলেও বলব, কতগুলি বিকৃতমনের কামুক কথক এসব গল্প বানিয়ে গেছে, পুরাণের পাতা থেকে যা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলা উচিত। আর এটাই বা কেমন কথা, নারী দেখলেই দেবতা ও ঋষিরা ইচ্ছেমত তাদের বলাৎকার করবে এবং তাবৎ জন-সমাজ উধ্বর্বাহু হয়ে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে সঙের মতো কীর্তন করে যাবে! কিন্তু আমরা রাগ করলে কী হবে, এসবই তো ধর্মকথা, ব্রতকথাও। এসব গল্প বাল-বিধবাদের শুনতে হ'ত। জনগণকে মানতে হ'ত। গল্প ফেঁদে ব্রাহ্মণরা বলতে চাইতেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের অধিকার আছে যথেচ্ছভাবে নারী ধর্ষণের। ধার্মিক হলে মেনে নাও, না হলে সবংশে নিপাত যাও।

কিন্তু চুলোয় যাক এই ধর্মকথা। আজ আর দেবদ্বিজের শাসন তর্জন নেই, মোহন্তগুরুর গোপন মন্ত্রগৃহ হয়ত আছে, তবে বামালসুদ্ধ ধরা পড়লে তাদেরও পরিত্রাণ নেই। সুতরাং ভক্তজনে নির্ভয়ে এসব গল্পের গঙ্গাযাত্রা করিয়ে উলুধ্বনি দিতে পারেন, কোনো মৃত ইন্দ্র, বিষ্ণু, বাসুদেব প্রেতলোক থেকে শাসন করতে আসবেন না। বিকৃত মনের যে রচনা সমকামী গল্প সাজিয়ে কথকের উন্মাদ ইচ্ছা পূরণ করেছে, তাকে বাতিল করে পুরাণ ও পৌরাণিক অভিধান কেন নতুন করে সম্পাদনা করা হবে না, বরং সেই দাবি তোলা যায় কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু এ তো আমাদের রাগবিরাগের কথা, শুনছে কে? বরং শোনা যাক সম্ভাব্য সেই কাহিনীটি, যা বালী সুগ্রীবের জন্মরহস্য বস্তুতই উন্মোচিত করতে পারে।

সে কাহিনী বলে, ঋক্ষরজা ছিলেন দক্ষিণদেশীয় এক রাজা। রাজত্ব করতেন কিষ্কিন্ধ্যায়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ইন্দ্র তাঁকে বালী ও সুগ্রীব নামক দুই পুত্র উপহার দেন। এই বালী সুগ্রীবের দেহবর্ণ ছিল দেবতাদের মতোই হেমপিঙ্গল। ছেলে দুটিকে দেবরাজ নিয়ে আসেন অহল্যার গৃহ থেকে। গল্পটির মধ্যে অবাস্তবতার ছিটেফোঁটাও নেই এবং অহল্যা-ইন্দ্র সংবাদের মধ্যেও এদের কথা পাওয়া যায়, যার থেকে এই কাহিনীর সত্যতা প্রামাণিক সিদ্ধি লাভ করে।

অহল্যা ছিলেন গৌতম ঋষির স্ত্রী। অপূর্ব সুন্দরী দেবকন্যা। ব্রহ্মা এই মেয়ে-টিকে কী ভাবে পেয়ে যান এবং বহুদিন গৌতমের কাছে গচ্ছিত রাখার পর তারই

সঙ্গে বিয়ে দেন। শোনা যায় ব্রহ্মার স্বভাবচরিত্রও ধোওয়া তুলসী ছিল না। বেশ কিছু নারীর সঙ্গে ছিল তাঁর অবৈধ যৌন সম্পর্ক। সুতরাং অহল্যা ব্রহ্মার ঔরসজাত বলেও সন্দেহ করা যেতে পারে। পাছে এমন সন্দেহ কোনো যুক্তিবাদীর মনে জাগে, তাই বোধহয় পুরাণকাররা ব্রহ্মার অবৈধ সংসর্গজাত ছেলেমেয়েদের তাঁর মানসপুত্রকন্যা বলে প্রচার করেছেন। অহল্যা সম্পর্কেও সেই কথা। ইনি ছিলেন ব্রহ্মার মানসকন্যা।

যেখানে যত সুন্দরী 'নারী' ছিলেন, তাঁদের খবর থাকত দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। ইনি সুযোগমাত্র তাঁদের ভোগ করে নিতেন। লোভ ছিল তাঁর অহল্যার ওপরেও। কিন্তু অহল্যা ব্রহ্মারক্ষিত বলে কিছু করতে পারেন নি। আবার গৌতমও এক ব্রাহ্মণ নেতা। তাঁর ক্ষমতাও অগাধ। তাঁর স্ত্রীকে ভোগ করাও তো সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু কিছু না করে ইন্দ্র কি সুস্থির থাকতে পারেন! অহল্যার প্রতি নজর ছিল তাঁর অনেক আগে থেকেই। অহল্যাও বোধহয় মনে মনে কামনা করতেন ইন্দ্রকে। তাই সুযোগ বুঝে এক রাত্রে গৌতমের অনুপস্থিতিতে তাঁরা উভয়ে সঙ্গত হলেন। ইন্দ্রবীর্য বিফল হয় না। দুটি ছেলের জন্ম হল, বালী সুগ্রীব। পুরাণকাররা বললেন, ছেলে দুটো ইন্দ্র-ঔরসজাত নয়। তারা পুরুষ অরুণের গর্ভজাত। বলা বাহুল্য, আমরা ঐ অশ্রদ্ধেয় গল্পটিকে আগেই আস্তাকুঁড়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। এমন কি ঋক্ষরজার বাল থেকে বালী আর গ্রীবা থেকে সুগ্রীব এমন অলীক কল্পনাকেও প্রশ্রয় দিতে পারি নি। তাছাড়া পুরাণ পাঠে জেনেছি, আর্য দেবায়তনে ইন্দ্র প্রাধান্য পান এবং সূর্যকে হঠে যেতে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ইন্দ্র ও সূর্যের লড়াই হয়ে গেছলো ইন্দ্রপুত্র অর্জুন অথবা সূর্যপুত্র কর্ণ, দেবতারা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবেন এই প্রশ্ন কেন্দ্র করে। জিতেছিলেন ইন্দ্র। তাই কর্ণকে দেবতারা পরিত্যাগ করেন, যদিও কর্ণ ছিলেন কুন্তীর গর্ভে দেব-ঔরস (সূর্যের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে) জাত প্রথম সন্তান। সুতরাং বালী ও সুগ্রীব যথাক্রমে ইন্দ্র ও সূর্যের পুত্র হলে, দেবতারা বালীবধ করে নিশ্চয় সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাতেন না, বিশেষত রামায়ণ পর্বে ইন্দ্রই যখন নেপথ্য থেকে সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই তর্কের আলোকে, আমার মতে, সবচেয়ে গ্রাহ্য কাহিনীটি হল, বালী ও সুগ্রীব দুটি ছেলেই অহল্যার গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম লাভ করে। দুজনেই স্বয়ং দেবরাজের পুত্র। সুশ্রী, সবল, বিচক্ষণ, জ্ঞানী এবং রাজনীতিজ্ঞ। তাঁদের গায়ের রঙ পাহাড়িয়াদের মতই স্বর্ণাভ।

এমন বালী সুগ্রীবকেও কথক ঠাকুররা 'কিলকিলা' রবকারী বানর বলে প্রচার

করে গেছে। অবশ্য ভিন্ন ভাষাভাষী উত্তরদেশীয় আর্যদের পক্ষে দক্ষিণদেশীয় ভাষাকে 'কিলকিলা' রব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণী মানুষগুলিকে শাখামৃগ বলে মনে করার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

সঙ্গত কারণ মেনে অবশ্য আর্যরা কোনো কিছু করাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের কথায় কর্মে এবং এমনকি নিজেদের মধ্যে আচরণেও নানান অসঙ্গতি ছিল। মিথ্যা ভাষণ, অন্যায় যুদ্ধ, প্রতিপদে বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল সেই নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্মীয় আচরণ। এসব ব্যাপার খুঁটে খুঁটে পৌরাণিক তথ্য নজির উল্লেখ করে আলোচনা করেছি 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বইটিতে। এখানে তাই তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

এতো আলোচনা এতো বিতর্ক করতে হল শুধু 'বানর' শব্দের প্রহেলিকা ব্যাখ্যার জন্য। প্রসঙ্গত আরও বলছি, শুধু বানরই নয়, আর্যরা বিভিন্ন টোটেমী জাতিকে তাদের টোটেম দ্বারাই অভিহিত করেছেন। ভারতবর্ষের দিকে দিকে সেদিন ছিল নাগপূজকদের আধিপত্য। এদের আর্যরা সরীসৃপ নাগ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের মনুষ্য সত্তারই বিলোপ ঘটিয়ে গেছেন। অথচ নাগেদের ক্ষমতা তখন এমনই দিগ্বিদিকে ছড়ানো ছিল যে সে চিহ্ন কালপ্রবাহেও মুছে ফেলা যায় নি। নাগ সম্প্রদায়ের নামে, নাগপুর। শেষনাগ, ভেরিনাগ, বাসুকিতাল, নাগগর তো এখনো আছে। নাগেরা ছিলেন, এখনও নাগ উপাধি প্রচলিত আছে। আর্যরা বাঙলা মুলুকে প্রবেশ করতে পারেন নি। বাঙালীকে তাঁরা বলতেন পাখী। তাঁদের অভিধানেই মানুষ হয়েছে ঋক্ষ ও ভল্লুক। তাই লঙ্কা অবরোধের সময় রামের উপদেষ্টা হিসেবে আমরা একটি রোমশ ভল্লুককেও দেখেছি। এইসব রামায়ণ পালা আমরা বিদেশীদের দেখিয়ে থাকি। ফলে দুনিয়ার লোক ভারতবাসীর পূর্বপুরুষ হিসেবে বানর ভল্লুকদের দেখে বেশ একটা তামাশার সুযোগ পান। আমাদের জাতীয় চেতনা বাস্তবিক বিস্ময়কর।

বানর জাতির মধ্যে, অর্থাৎ সেই দক্ষিণী কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে দুই বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ছিলেন, কৃষ্ণকায় ও হেমপিঙ্গল বরণ। কালা আদমির (বানর) মাঝে যে ধলা আদমির (দেবপুত্র বানরেরা) অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মার পরিকল্পনায় সৃষ্ট একটি নতুন প্রজন্মের দেবস্বার্থরক্ষক সম্প্রদায়। এঁদের সকলেই দেবজন প্রেরিত। কৃষ্ণবর্ণের আদি বানর সম্প্রদায়ের মাথার ওপর এসে ফরসা প্রভুরা প্রধান হয়ে বসলেন সম্ভবত রাজা ঋক্ষরজার আনুকূল্যে এবং ব্রহ্মা

প্রেরিত দেবসেনার সহযোগিতায়। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এভাবেই সেদিন তৈরী হয়েছিল দেবাধীন একটি আর্য ছিটমহল। আর্য উপনিবেশ দক্ষিণদেশে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ঐ নয়া প্রজন্ম বা নিউ জেনারেশন সাহায্য করেছে প্রচুর। তারাই লড়েছে লঙ্কার যুদ্ধে, তারাই গড়েছে সমুদ্র সৈকত থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সাগর পারাপারের সেতু। তারাই এনেছিল সীতার সংবাদ আবার তারাই উদ্ধারও করেছিল সীতাকে।

ব্রহ্মা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ে এবং লঙ্কা বিজয়ে যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিলেন তা সার্থক হয়েছিল, যদিও রামায়ণে ব্রহ্মা যেমন আদ্যন্ত কদর পেয়েছেন, উল্লেখিত হয়েছেন সসম্মানে ; মহাভারতে তেমন করে তাঁর নামডাক অন্তভাগে আর উচ্চারিত হয় নি। স্বাভাবিক ঘটনা। রামচন্দ্রের রাজসভায় গাওয়া হয় রামায়ণ। সে কবেকার কথা। এদিকে মহাভারতের গাওনা হয়েছিল জনমেজয়ের যজ্ঞস্থলে। সেটা হালের কাহিনী। এই সময় কালের ব্যবধানে, মনে হয় ব্রহ্মা তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তি খুইয়ে বসেন।

বিভিন্ন তথ্যাদির আলোকে পরিষ্কার হয়ে আসছে যে কিষ্কিন্ধ্যা মুল্লুকে বালী ও সুগ্রীবের পালক-পিতা ঋক্ষরজার আমল থেকেই দেবতা এবং আর্য ব্রাহ্মণদের দখলদারি প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলে আর্যিকরণের সম্ভাবনা ব্যাপকতা লাভ করছিল ক্রমশ।

বানর জাতির মধ্যে দেবানুগত বংশধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার পরিকল্পনায় সুরগুরু বৃহস্পতি [ক্ষেত্রবিশেষে ইনিই স্বয়ং ব্রহ্মা নামে পরিচিত] বুদ্ধিমান তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নল এবং অগ্নি নীলকে উৎপন্ন করেন। এ ছাড়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণ, পর্জন্য শরভ প্রভৃতির জন্ম দেন। তাঁরা কাজে কাজেই প্রত্যেকে দেবপুত্র।

এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ব্রহ্মার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণে। বলা হয়েছে, "...যে-সকল কপি দশাননের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলসকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ... [সে ভাবেই] প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পুত্র জন্মিল।" [দেখতে যাঁরা দেবরূপী, তাঁরা কেমন করে চতুষ্পদ লাঙ্গুলধারী বানর-বানরী হন ? ভারতীয় দেবতারা কেউ তো বানর ছিলেন না।] গোলাঙ্গুল মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষায় অধিকবিক্রমী বীরসকল প্রস্তুত হইল। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টমনে ঋক্ষী, কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানরসকল

সৃষ্টি করিলেন। ...এই সকল বানর ...আকাশে প্রবেশ ...এবং সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারে। ...এইরূপে অংসখ্য যুথপতি কপি ...যূথপতির মধ্যে আবার প্রধান যূথপতিসকল জন্মগ্রহণ করিল।

"এই সকল বানরের মধ্যে কতগুলি ঋক্ষবান্ পর্বতে ...কতগুলি অন্যান্য পর্বত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। ...এইরূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত... মহাবীর বানরগণে ...পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।" [বাল / ১৭শ সর্গ]

'রাম সহায় হেতোঃ' একটি গোটা জাতির উৎপত্তি মানুষের ইতিহাসে চমকপ্রদ ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রচলিত কথাকাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ কাব্যে সে যুগের আর্যকীর্তি গীত হয়েছিল, একথা মানতে হলে, ব্রহ্মার পরিকল্পনায় উল্লিখিত রূপে এই দক্ষিণী জাতির উৎপত্তির কথাও মেনে নিতে হবে, কেননা এ কাহিনী বালকাণ্ডের পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গ জুড়ে বিস্তারিত করা হয়েছে। বানর জাতির বাসস্থানের নিখুঁত ভৌগোলিক বিবরণ দিতেও মহাকবি বিস্মৃত হন নি। বানরজাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও একটি সাধারণতন্ত্রী, সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, এমন রাজনৈতিক সংবাদও কাব্যমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। ডিটেলের এহেন ব্যবহার একমাত্র ইতিহাসেই প্রয়োজন। বালকাণ্ড সপ্তদশ সর্গের পাঠে জানা যায়:

অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থামুপতস্থুঃ সহস্রশঃ।
অন্যে নানাবিধাঞ্ছৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে॥

বহু সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্বতের উপত্যকায় বসবাস শুরু করলেন, বাকি নানা পর্বতে ও কাননে আশ্রয় নিলেন।

বিন্ধ্য পর্বতমালার পশ্চিমাংশ ঋক্ষবান্ পর্বত নামে অভিহিত ছিল। ডঃ. বি. সি. ল' ঋক্ষমুখ পর্বতের উল্লেখ করেছেন সুগ্রীবের বাসস্থান হিসেবে। এই পর্বত তুঙ্গভদ্রার তীরে অবস্থিত।[১] ঋক্ষমুখ বা ঋক্ষমূক থেকে পম্পা নদীর উৎপত্তি। পম্পা তুঙ্গভদ্রায় পতিত হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এখানেই রামচন্দ্রের সঙ্গে সুগ্রীব ও হনুমানের প্রথম দেখা হয়।

রামায়ণে বানরজাতির স্বতন্ত্র গোষ্ঠী এবং প্রধানদেরও উল্লেখ আছে:—

সূর্যপুত্রং চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রং চ বালিনম্।
ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্বে চ হরিযূথপাঃ॥
নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্।

১। Historical Geography of Ancient India / Dr. B .C. Law.

কেউ কেউ সূর্যপুত্র সুগ্রীব, কেউ ইন্দ্রপুত্র বালী কেউ বা নল, নীল, হনুমান প্রমুখ যূথপতিদের নিকট আশ্রয় নিল।

এই বলবান বনচারী জাতি সর্বযুদ্ধবিশারদ এবং তারা সিংহব্যাঘ্র ও বিশালকায় সরীসৃপদের দলিত করতে লাগল। জানা গেল, বনচারী সুবুদ্ধিসম্পন্ন এই জাতি সামান্য বানরমাত্র নয়, তারা রাজনীতিজ্ঞ যুদ্ধবিশারদ এবং হিংস্রজন্তু দলনকারী ছিল ; যে গুণাবলী সামান্য বানরকুলে অকল্পনীয়।

রামায়ণকাহিনী সূত্রে বানর সভ্যতার আরও পরিচয় আমরা পাব এবং কেবলমাত্র রামধর্মান্ধতাবশতই তখন আর লাঙ্গুলশোভাধারী একটি সমৃদ্ধ জাতিকে জন্তু-জানোয়ার গণ্য করার কুসংস্কার আমাদের অভিভূত করে রাখতে পারবে না।

'রাম না হতে রামায়ণ' লিখিত হল বাস্তব ঘটনাবলীর সমাহারে। প্রবাদবাক্যটিকে ভিত্তিহীন বলার তাই কোনো উপায় নেই। আমাদের মেনে নিতে হবে, বস্তুতপক্ষে রাম জন্মের আগেই রামচন্দ্রের বনগমন, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে রাখেন দেবতারা। রামের বনগমন পিতৃসত্যরক্ষার অদ্ভুত কারণে ঘটে নি।

ঈশ্বরের কোষ্ঠী

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ।
নক্ষত্রেঽদিতি দৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু ॥৮
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ।
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥৯ / বাল / ১৮স.

পায়াসান্ন গ্রহণের পর দ্বাদশ মাসে চৈত্রের নবমী তিথিতে কৌশল্যা প্রসব করলেন জগদীশ্বর জগন্নাথ রামচন্দ্রকে। জন্মের সময় পাঁচটি গ্রহের অবস্থান ছিল সুউচ্চ। পুনর্বসু নক্ষত্রে, কর্কট লগ্নে, চন্দ্র বৃহস্পতির উদিত অবস্থায় নবজাতক রামচন্দ্র প্রসূত হলেন। তিনি সর্বলোকপূজ্য।

নবজাতকের দিব্যমূর্তিও দেখবার মতো। লোহিতবরণ নেত্র এবং রক্তবরণ অধরোষ্ঠ। কণ্ঠস্বর যেন দুন্দুভিধ্বনির মতোই গম্ভীর ও মধুর [লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্]।

কবি বললেন, জগন্নাথ কৌশল্যাগর্ভ-স্খলিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। তিথি নক্ষত্র

সঙ্গ উল্লেখ করতে ভুল হল না। ফলত আমরা রামজন্মকে কেবলমাত্র রূপকথার গল্প বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তাছাড়া জগন্নাথ বললেই ঈশ্বর বোঝায় না। জগদীশ্বর মানে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর একথাও অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে। আকবর বাদশা দিল্লীশ্বরবা জগদীশ্বরবা রূপে পরিচিত ছিলেন। সেকালে সীমিত ভূখণ্ডকেও জগৎ, পৃথিবী প্রভৃতি বলা হত। মহাভারত পুরাণে কেবলমাত্র ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকেই আর্য বুদ্ধিজীবীরা পৃথিবী, মর্ত্য প্রভৃতি নামে এবং হিমালয়ের সীমিত অঞ্চল কুমায়ুন গাড়োয়ালকে স্বর্গ নামে অভিহিত করেছেন। সুতরাং বাল্মীকি তাঁর বর্ণনায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি। রামচন্দ্রকে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়ারও কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। যে ঈশ্বরের রূপ-বিভূতি কেউ, এমন কি দেবতারাও বর্ণনা করতে পারেন নি, তাঁর জন্ম কোষ্ঠী রচনাও অসম্ভব। তাই যখন জগদীশ্বর রামচন্দ্রের কোষ্ঠীর ছক হাতে পেলাম তখন আর সন্দেহই রইল না যে, রাম সামান্য রাজামাত্রই ছিলেন, তাঁকে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস শুরু করেন আর্য ব্রাহ্মণরা রামচন্দ্রের তিরোধানের অনেক পরবর্তী কালে।

খ্রীঃপূব সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বাল্মীকি যদি রামায়ণ রচনা শেষ করে থাকেন তবে রামচন্দ্রের আমল ছিল তারও সহস্রাধিক বছর আগে। রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা, এই তত্ত্বে আধুনিক পণ্ডিতরা আজ আর একমত নন। আধুনিক বিদ্বানদের মতে, রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে (এ. ডি-তে)। রামায়ণের বর্ধিত কলেবরে আধুনিক চেহারাটিও পূর্ণাকৃতি গ্রহণ করে ঐ সময়কালে।[১] কোনো কোনো মতে রামায়ণের অবিকৃত আদিরূপ শ্লোকবদ্ধ হয়েছিল খ্রীঃপূর্ব তৃতীয় শতকে এবং বাল্মীকি সেই আদিকাব্য রচনায় প্রচলিত লোককাহিনী অবলম্বন করেছিলেন। লোককথা অবলম্বনে রামকাহিনী রচনার কথা মহাকবি নিজেও স্বীকার করে গেছেন। যাইহোক, একটা ব্যাপার বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে, রাম-চন্দ্রের ঈশ্বরীভবন ঘটেছিল তাঁর দেহত্যাগের অনেক অনেক যুগ পরে। তাই যে যে শ্লোকে জন্মমাত্রেই তাঁকে জগন্নাথ বলা হয় সেই শ্লোকটি হয় পরবর্তী প্রক্ষেপ অথবা সেখানে 'জগন্নাথ' শব্দের দ্বারা শ্লোক রচয়িতা রামকে বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর বোঝাতে চেয়েছেন। আমরাও তাঁকে দেব-ঔরসে মানবী গর্ভজাত মানব

১। The Ramayana : Its Character, History & Exodus / Dr. Suniti Kumar Chatterjee.

পুত্র বলেই গণনা করব। এবং মেনে নেব যে, তিনি আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক আমলে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন সাধারণ জাগতিক নিয়মে এবং কোনোভাবেই তাঁকে পরমেশ্বর পদবাচ্য কাল্পনিক একটি তত্ত্বমাত্র বলে মেনে নেওয়া যায় না।

কেবলমাত্র রামচন্দ্রের কোষ্ঠীই নয়, অপর ভাইদের জন্মবৃত্তান্তও বর্ণিত আছে রামকথায়।

প্রসন্নমতি ভরতের জন্ম পুষ্যা নক্ষত্রে মীন লগ্নে। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন অশ্লেষা নক্ষত্রে এবং কর্কট রাশিতে।

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥ ১৪/বাল / ১৮

কুলগুরু বশিষ্ঠ এই চার রাজপুত্রের নামকরণ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

দশরথপুত্রদের জন্ম উপলক্ষে যুগপৎ দুই জায়গায় উৎসব হয়েছে। অযোধ্যায় এবং হিমালয়ের দেবশিবির গাড়োয়াল অংশে। এঁরা যে বিষ্ণুপুত্র তারও উল্লেখ আছে বারম্বার। দেবতাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাজপুত্রদের জন্ম, তাই দেবভূমিতে উৎসব হয়েছে। দেবস্তাবক হোমরা-চোমরা ব্রাহ্মণ দলপতিরা নব-জাতকদের সংবাদ নিয়েছেন, আশীর্বাদ করে গেছেন। ব্রহ্মার সভায় শুরু হয়ে গেছে রাবণবধের পরিকল্পনা। রাবণরাজ্যে অবশ্য এই ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছয় নি। সমতলের একটি রাজ পরিবারকে সামনে রেখে দেবতারা যে রাবণ বিনাশের দূরপ্রসারী উদ্‌যোগ গ্রহণ করবেন এমন এক অভিনব চক্রান্তের কথা সরলমতি রাক্ষস সম্প্রদায় সেদিন ভাবতেও পারেন নি। মহাভারত আমলে অনুরূপ দেব-অভিসন্ধির আভাষ কিন্তু চঞ্চল করে তুলেছিল অন্ধ অথচ মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রকে। তাই দেব-ঔরসে কুন্তীপুত্রদের জন্মসংবাদ পাওয়া মাত্র ধৃতরাষ্ট্র গভীর রাত্রে রাজ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করে সিংহাসনে দুর্যোধনের অধিকার গণতান্ত্রিক উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে চেষ্টা করেন। ভক্তির আতিশয্যে মহাভারত রামায়ণ পাঠের সময় আমরা এইসব কূটরাজনীতির সূত্রগুলি লক্ষ্যই করি না। বিভ্রান্তি তাই ছড়িয়ে পড়ে আসমুদ্র হিমাচলে।

পুরাণ মহাকাব্যে একমাত্র দেবতাদের উদ্দেশ্যসাধক দেবপুত্রদেরই কোষ্ঠী ঠিকুজী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ফলত গ্রন্থগুলি যে দেবতাদের নির্দেশে তাঁদেরই নিযুক্ত ভাববাদীদের দ্বারা লিখিত তাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

রামের সমরশিক্ষা

তরুণ রামচন্দ্রের বয়স যখন পনের তখন একদিন বিশ্বামিত্রের শুভাগমন হলো দশরথ প্রাসাদে। আগমনের উদ্দেশ্য রামচন্দ্রকে একটি সম্মুখ যুদ্ধে উপস্থিত করে উপযুক্ত সমরশিক্ষা দান। লক্ষ্য মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস বীরকে হত্যা করা। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, এই দুই ভাই বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। পরে অবশ্য আসল কারণটি জানা যায়। সেই আসল কারণটিই আমাদের জানা দরকার।

মারীচ ও সুবাহু অসুরাধিপতি হিরণ্যকশিপুর বংশধর। সুন্দ অসুরের ঔরসে যক্ষকন্যা তাড়কার গর্ভে তাঁদের জন্ম। তাড়কা রাক্ষসীর বিকট ভয়ঙ্কর ছবির সঙ্গে আমরা আশৈশব পরিচিত। কিন্তু এই মহিলা আদৌ কোনো মানুষখেকো রাক্ষসী ছিলেন না। ছিলেন সুন্দরী যক্ষকন্যা, যাঁদের কথা আগেই বলেছি। মারীচ লোকটিও প্রথমে দেবানুগত সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দেবতা বিষ্ণুর দ্বারপালের দাস হিসেবে কাজ করতেন। একদিন ক্রুদ্ধ বিষ্ণু তাঁকে শাপ দেন, অর্থাৎ দেবলোক থেকে বহিষ্কৃত করেন। বলা হয়েছে, পূর্বজন্মে মারীচ দেবদাস ছিলেন। এই পূর্বজন্ম তাঁর দেবলোক থেকে বিতাড়নের পূর্ববর্তী সময় বলে আমরা বুঝি।

বোঝা যাচ্ছে, দেবতাদের বিরাগভাজন হওয়ায় মারীচ হত্যার আদেশ হয়। আদেশটি পাঠানো হয় বিশ্বামিত্রের কাছে। বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। যুদ্ধবিশারদ। পরে তিনি দেবশিবিরভুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং দেব-স্তাবক ব্রাহ্মণ নেতাদেরও নেতা হয়ে বসেন। মনে হয়, এঁর ওপর ব্রাহ্মণদের আশ্রম বা শিবির রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। সেই সুবাদেই তিনি বিতাড়িত এবং বিদ্রোহী মারীচকে হত্যার আদেশ পান। ইচ্ছে করলে বিশ্বামিত্র নিজেই মারীচ হত্যায় অগ্রসর হতে পারতেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সম্মুখ-যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মারীচ-বধের উপলক্ষে রামকে বনে নিয়ে যান। সন্দেহ নেই, এই ঘটনার পেছনেও ব্রহ্মার পরিকল্পনাই সক্রিয় ছিল।

বিশ্বামিত্র দশরথকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, রামকে বিশ্বামিত্রই রক্ষা করবেন এবং যুদ্ধে সফল হলে তাতে রামের খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। খেলাটি হ'ল, লড়বেন বিশ্বামিত্র আর নাম কিনবেন রামচন্দ্র। তাছাড়া গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র আরও একটি

লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি রামকে অনেক শক্তিশালী দিব্যাস্ত্রও দান করবেন। বিশ্বামিত্র আরও বলেছিলেন, রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ তাপসগণ সকল তত্ত্ব বিদিত আছেন। সুতরাং কিছুমাত্র শঙ্কা না করে দশরথ রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করতে পারেন।

দেবানুগত ব্রাহ্মণরা আগেই সব খবর পেয়ে থাকেন। আর্য দেবতাদের নির্দেশ তাঁদের কাছেই প্রথম আসতো। সুতরাং বশিষ্ঠ প্রমুখও দশরথকে অভয় দিয়ে বলেছেন, দিব্যতেজে, অর্থাৎ দেবতাদের সহায়তায় রাম অক্ষত শরীরেই প্রত্যাবর্তন করবেন। রাবণবধের প্রস্তুতি এভাবেই শুরু হয়েছিল সেদিন।

কোনো ধর্মাধর্ম তত্ত্ব নয়, কোনো নারীহরণ ঘটিত সংকট নয়, নয় কোনো হেলেন অব ট্রয়ের ভারতীয় সংস্করণ, আবার আর্য অনার্যের সংঘর্ষও নয়, —রাম রাবণের যুদ্ধ বহিরাগত আর্য দেবতাদের ও দেবস্তাবক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিকার সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের স্বার্থে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভূভাগে বিস্তার লাভ করেছিল।

কুবের বা রাবণকে অনার্য বলতে পারি না। তাঁরা উভয়েই আর্যপুত্র। পিতা বিশ্রবা মুনি দেবব্রাহ্মণ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। রাবণ নিজে বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন আর্য অনার্য নির্বিশেষে সকলেরই সঙ্গে। বিশ্বামিত্রের পিতা গাধি পরাজিত হন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে। নাগ, তক্ষক প্রমুখ অনার্য জাতিকুলকেও পরাজিত করে রাবণ কর আদায় করেছেন। ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচদের সঙ্গে রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল। রাবণের কাছে আর্য দেবতা যমরাজ এবং কুবের পরাজিত হয়েছেন। দেবতারা ত্রাহি রব তুলে গহন গিরি কন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন। দিগ্বিজয়ী রাবণ হয়ে উঠেছিলেন চাতুর্বর্ণ সমাজসংস্থাপক দেবব্রাহ্মণদের ত্রাসের কারণ। তাঁকে হত্যার জন্য অনেক পরিকল্পনা, অনেক অনেক আয়োজন করতে হয়েছিল গাড়োয়ালবাসী আর্য নেতাদের।

রাবণ তো সমতলবাসী নৃপতি। হিমালয়বাসী আর্য দেবতারা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ সংঘর্ষে একে অপরকে হঠিয়ে দিয়েছেন। সূর্য এবং ইন্দ্রের আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘ দিন বিবাদ চলে। পরে সূর্য এবং সূর্যপন্থীরা ইন্দ্রপন্থীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছেন। সে আর এক ইতিহাস। মহাভারতের শেষ পর্ব এই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

রাবণ বহিরাগত আর্য দেবতাদের আধিপত্য স্বীকার করেন নি। তিনি ছিলেন শিবপন্থী। পশুপতি শিব ভারতীয় আদি জনগোষ্ঠীর মহা দেবতা। বহিরাগত আর্য দেবতাদের সঙ্গে শিব এবং শিবানুচরদের বহুকাল ব্যাপী বহু ক্ষেত্রে সংঘর্ষ হয়েছে। অবশেষে আর্য অনার্য দেবনেতাদের মধ্যে একটি চুক্তির ফলে মহান্ পশুপতি শিব

আর্য দেবায়তনে যোগ দিয়েছেন। রাবণের আমলে মহাদেব ছিলেন আর্য দেবায়তনভুক্ত।

১৫/১৬ বছর বয়সে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম চললেন বনে। এটিই তাঁর প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা। সেনাপতি স্বয়ং বিশ্বামিত্র। এককালে তিনি ছিলেন রাজর্ষি, এখন মহর্ষি। বহু দৈব্যাস্ত্রের মালিক এবং স্বয়ং অস্ত্রনির্মাতা।

অযোধ্যা থেকে অর্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রমের পর রক্ষক বিশ্বামিত্রের অনুগমন করে রাম-লক্ষ্মণ পৌছালেন সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে।[২] একরাত্রি নদীতীরে যাপন করে পুনরায় তাঁদের যাত্রা শুরু হল। গঙ্গা-সরযূর সঙ্গমস্থলে [ছাপরা] একটি আশ্রম দেখে রাম-লক্ষ্মণ আশ্রমটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বামিত্র বললেন, ঐ আশ্রমে একদা কামদেবতা অনঙ্গদেব বাস করতেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ সহ অনঙ্গ আশ্রমেই সে রাত্রি বাস করেন। বিশ্রামাগার হিসেবে আশ্রমটি চমৎকার। সেটি ছিল 'সবকামপ্রদ'।

পরদিন আশ্রমবাসীরা একটি সুনির্মিত তরণীতে তাঁদের তুলে দিলেন। এখানে গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা পরপারে পাড়ি দেবেন। যাত্রাপথে নদীতীরে গভীর অরণ্য প্রদেশ দেখিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, আজ যেখানে অরণ্য, আগে সেখানেই ছিল দেবনির্মিত দুটি জনপদ—নাম, মলদ ও করুষ। অসুর *সুন্দের* স্ত্রী যক্ষিণী তাড়কা ঐ দুটি জনপদ ধ্বংস করেন। মারীচ সেই *সুন্দ*-তাড়কার ছেলে। এই বনাঞ্চল এখন তাড়কার অধীন। তাড়কা বধ করে আমাদের এই গহন কাননভূমি উদ্ধার করতে হবে। আমার নির্দেশে তুমি সেই তাড়কাকে বধ করবে। আরও জানা গেল, এখানেই ছিল অগস্ত্যাশ্রম এবং তাড়কার তাড়নায় অগস্ত্যকে এই আশ্রম ত্যাগ করে যেতে হয়।

ধর্মের উদ্দেশ্য কোথাও অস্পষ্ট নেই। তাড়কা রাক্ষসী টপাটপ মনুষ্যভক্ষণ পাপে বিনষ্ট ছিল না। বিশ্বামিত্রের প্রতিবেদনে তাড়কার রণনৈপুণ্যেরই শুধু পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগে আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠীতে বীরাঙ্গনা নারীর অভাব ছিল না। শিবপত্নী পার্বতী দুর্গা স্বয়ং যুদ্ধে ভয়াল ভয়ঙ্করী ছিলেন। পুরাণে তাঁকে কিরাতেশ্বরী এবং চোর-ডাকাতের রক্ষয়িত্রী বলা হয়েছে। আর্য দেবায়তনে শিবের অন্তর্ভুক্তির আগে এবং পরে বহু সংগ্রামে তিনি বিজয়িনী হয়েছেন। তবু তাড়কা হলেন ভয়ঙ্করী রাক্ষসী আর্য পুরাণে! তাড়কা যে দেববিরোধী

২। সরযূ ছাপরার দক্ষিণে গঙ্গায় পড়েছে

শক্তির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অতএব তিনি আর মানুষ হবেন কী করে।

তাড়কা ও পুত্র মারীচ অগস্ত্য আশ্রম ধ্বংস করেছেন পরমাত্মীয় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। অগস্ত্য মারীচ-পিতা এবং তাড়কার স্বামী সুন্দকে হত্যা করেন। আর্যদের যথেচ্ছাচারের প্রতিশোধ নিতে চাইলে বিদ্রোহীকে তো নরভুক রাক্ষসই বলতে হয়।

সেকালে ক্ষমতাগর্বী মুনি-ঋষিরা ইচ্ছেমত খুন ও ধর্ষণ করতেন। একালেও উচ্চ বর্ণের প্রতাপশালীরা হরিজন সম্প্রদায় ও দুর্বল প্রজাদের ওপর সেই প্রাচীন যথেচ্ছ অধিকার প্রয়োগ করে আসছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে সেসব নৃশংসতার খবর আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। অগস্ত্যগোষ্ঠীর পুরাণ মহাকাব্যে অগস্ত্যের অপরাধের কথা অনুল্লিখিত। সুন্দহত্যার কারণ বিশ্বামিত্র বলেন নি। বলেছেন, পাপীয়সী তাড়কা অগস্ত্য আশ্রম ধ্বংস করে তাকে গহন কাননে পরিণত করেছে এতোবড় পাপ আর হয় না।

আর্য পুরাণে আর্য দলপতিদের পাপকার্য ধর্মের নামে তুলসীধোয়া পবিত্র কার্য, আর স্বামীহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ তাড়কার মতো সুন্দরী গন্ধর্বীর পক্ষে নিতান্তই গর্হিত কাজ।

তাড়কার সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবতারা তাঁদের উড়ন্ত রথে চেপে সমরাঙ্গনের ওপর চক্কর দিচ্ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে অগ্নিদাহনের সময় যেমন উড্ডীন অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্র নাগকুল উৎসন্নে সহায়তা করেন ['কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্র] এক্ষেত্রেও তেমনি দেবতারা নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র ছিলেন না, আকাশমার্গ থেকে তাঁরাও হয়ত তাড়কাসৈন্য নিধন করেছেন। অন্যদিকে রাম-লক্ষ্মণকে পাশে রেখে বিশ্বামিত্র হত্যা করেছেন তাড়কাকে। অতঃপর গল্প সাজিয়ে বলা হয়েছে, রামচন্দ্র তাড়কা বিনাশ করলে ইন্দ্র সহ দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে অবতরণ করলেন এবং রামকে সাধুবাদ জানিয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন,

মুনে কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্গণাঃ।
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে॥

বিশ্বামিত্রের মঙ্গল কামনা করলেন দেবতারা। সন্তোষ প্রকাশ করলেন ইন্দ্র এবং মরুদ্গণ। মরুদ্রা গন্ধর্বদের মতোই পাহাড়ী জাতি। গান বাজনা ও নৃত্যের প্রতি ঝোঁক থাকলেও উষ্ণীষধারী এই উজ্জ্বলবরণ জাতিটি ছিলেন নির্মম যোদ্ধা। আকাশপথ থেকে এঁরা আগ্নেয় অস্ত্রও নিক্ষেপ করতেন।

মরুদ্রা জলে স্থলে আকাশে বিচরণশালী দুর্ধর্ষ যোদ্ধারূপে সেকালে প্রসিদ্ধি

লাভ করেন। তাঁদের যুদ্ধের কথা জানতে পারা যায় অথর্ববেদ থেকে। ঋগ্বেদের বিবরণে পাই, মরুদ্‌রা বীলুচিৎ নামক স্থানে যাতায়াত করতেন। বীলু শব্দের অর্থ পার্বত্য অঞ্চল। ঐ বীলুচিৎ প্রদেশকে কেউ কেউ বেলুচিস্থান বলে অনুমান করেন।[৩] তবে কি তাড়কাবাহিনী বধের জন্য ইন্দ্র বেলুচিস্থানী মিত্রবাহিনী নিয়ে তাড়কাকানন অবরোধ করেছিলেন? স্থলে রাম ও বিশ্বামিত্র, অন্তরীক্ষে মরুদ্‌গণ এবং ইন্দ্র; তাড়কাবধে এই বিশাল সেনা সমাবেশের প্রয়োজন হয়েছিল, যদিও মহাকবি একটি সংক্ষিপ্ত সর্গে (২৬ স) এই পর্বের কথা সেরেছেন, যুদ্ধের আনুপূর্বিক বিবরণ অনুক্ত রেখে সাজানো গল্প শোনানো হয়েছে আমাদের। রামের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য তাড়কার নাসাকর্ণচ্ছেদের আজগুবী গল্প বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রামশরে তাড়কার দুটি বাহুও কর্তিত হয় আর কাটা নাক কান হাত নিয়ে তাড়কা তেড়ে আসেন রাম-লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করতে।

তাড়কার সেনাবাহিনীর কিন্তু কোনো উল্লেখই করা হয় নি। গল্পটি মার খেয়েছে এখানেও। একা তাডকাবধে আর্যদের ঐ বিশাল আয়োজন করতে হয় শুনে দেবদ্বিজের ক্ষমতার প্রতি তর্কপ্রিয় মানুষের শ্রদ্ধা চটে যাওয়ারই কথা। আমরা সমগ্র কাহিনীটি বিশ্লেষণ করার পরেও অকপটে অবশ্যই বলব যে, যত সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করে তাড়কাবধের কাহিনী সাজানো হয়েছে, ঘটনাবলী তত সহজ ও সংক্ষিপ্ত ছিল না। বেশ একটা ঘোরতর যুদ্ধই হয়েছিল। আর যেখানে বড় বড় দেবতা এবং বালুচী সেনাবাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন হয়েছিল, সেখানে পঞ্চদশ বয়ঃক্রম-প্রাপ্ত শিক্ষানবীশ এক রামচন্দ্রের পক্ষে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে গল্প করতে করতে অক্লেশে তাডকাবধ করা নিশ্চয় সম্ভব ছিল না। স্ত্রীহত্যার পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিশ্বামিত্র শিখণ্ডী খাড়া করেছিলেন রাম-লক্ষ্মণকে।

মানবী তাড়কাই বা কর্তিত বাহুকর্ণনাসা নিয়ে রামের প্রতি ধেয়ে আসে কেমন করে? তাডকা তো কুম্ভকর্ণের মতো কোনো রোবট নয়? এ গল্পের একটিই উদ্দেশ্য। যক্ষিণী তাডকাকে এক কাল্পনিক রাক্ষসীতে পরিণত করা। জানি, মানুষখেকো মানুষেরও অসদ্ভাব ছিল না সেকালে, কিন্তু তারাও তো সকলেই মানুষ। মানুষেই মানুষের রক্তমাংস খেয়েছে। রক্তশোষণ পর্ব আজও সমানে চলছে। হত্যা করাও তো ভক্ষণ করা। সে অর্থেও পুরাণে ভক্ষণ শব্দের ব্যবহার অপ্রতুল নয়। আত্মস্থ করাকেও পুরাণকার 'ভক্ষণ-করা' বলেছেন; যেমন 'পুঁথি-

৩। স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা রাজ্যেশ্বর মিত্র দ্রঃ

ভক্ষণ'। আমরা আজও বলি, পরীক্ষার পড়া একেবারে 'গিলে খেয়েছে'। পুরাণের বিশেষ বাগভঙ্গিও বহুক্ষেত্রে গোলমালের সৃষ্টি করেছে। তাই বলে যক্ষকন্যা তাড়কাকে মানুষখেকো রাক্ষসী বানালে সত্যের অপলাপই করা হয়।

পৌরাণিক বাচনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বামিত্র-প্রদত্ত অস্ত্রবর্ণনায় পরিষ্কার। বিশ্বামিত্র নানা অস্ত্রের ফিরিস্তি দিয়েছেন যার মধ্যে আগ্নেয় ও বায়বীয় অস্ত্রও ছিল। আমরা বিস্মিত হলাম যখন বিশ্বামিত্র ধ্যানস্থ হয়ে অস্ত্রগুলিকে আহ্বান জানালেন। অবশ্য যাঁদের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থে 'অর্জুন রথে রোবট' পরিচ্ছেদটি পড়া আছে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন, অস্ত্রকে আহ্বান জানানো যায় না, বেতার যন্ত্র (উয়্যারলেস) এর সাহায্যেই যোদ্ধাকে আহ্বান জানানো যেতে পারে। আর যদি অস্ত্রগুলি রোবট যন্ত্র হয়, তবে স্মরণ করার অর্থ, তাদের সচল করা। বিভিন্ন পুরাণে এবং রামায়ণ মহাভারতে একই রকম এবং একই চরিত্রের এই ধরনের ঘটনা-বর্ণনা আমাদের অনুরূপ ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার করতেই প্রলুব্ধ করে। অর্জুন যেভাবে তাঁর রথের রোবটসেনাকে সচল করেছিলেন এক্ষেত্রেও সেভাবেই অস্ত্রসমূহকে চালু করা হয়েছে, দেখতে পাই। মন্ত্রপাঠ বলতে ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রোগ্রামিং করাও বোঝাতে পারে অথবা বেতার সংযোগে দেবলোক থেকে অস্ত্রপ্রেরণের জন্য বার্তা প্রেরণও হতে পারে।

তাড়কাবধ পর্ব শেষ হল। রামকে সম্মুখ যুদ্ধে দেবতাদের বিশেষ অস্ত্র চালনার শিক্ষাও দেওয়া হল এই সুযোগে।

চাতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠাকামী সমাজের ন্যায়ধর্মের স্বরূপ কী? ধর্ম ধর্ম বলে এতো যে চিৎকার চেঁচামিচি, তারই বা প্রকৃত ব্যাখ্যা কী? বিশ্বামিত্র এই সুযোগে সে সম্পর্কেও শিক্ষা দিলেন দেবশিবির মনোনীত ক্ষত্রিয় রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণকে। ধর্মাধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বিশ্বামিত্র বললেন,

> ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
> চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা॥ ১৭/২৪/বাল
> নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
> পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥ ১৮
> রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
> অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে॥ ১৯
> শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।
> পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্য সূদয়ৎ॥ ২০

বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা॥ ২১

বিশ্বামিত্রের এই ধর্মব্যাখ্যা যে মামুলী রাজনীতি মাত্র, অতঃপর এ সম্পর্কে আমাদের আর সন্দেহের অবসর রইল না। সাদা বাংলায় এবার আমরা তাঁর সেই শাশ্বত ধর্মোপদেশটি শুনব এবং এই গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য লেখা ও পড়ার সময় তা মনে রাখব। তাহলে গুহার আঁধারে নিহিত আর্য ধর্ম সম্পর্কে কোনো ধোঁয়াশা আমাদের মনকে আর ভারাক্রান্ত করবে না।

বিশ্বামিত্র বলেছেন, হে রাজপুত্র, স্ত্রীবধ কার্যে কিছুমাত্র ইতস্তত কোরো না। চাতুর্বর্ণের হিতার্থে রাজপুত্রের (রাজাদের) এটাই রাজকর্তব্য। যিনি লোকরক্ষক, প্রজাবর্গকে নির্বিঘ্নে রাখার জন্য তাঁকে অযশস্কর অনেক নৃশংস কর্মই করতে হয়। যাঁরা রাজাধিকারে নিযুক্ত, এটাই তাঁদের সনাতন ধর্ম। তুমি ধর্মদ্বেষিণী তাড়কাকে স্বচ্ছন্দে বধ করো। পূর্বে পৃথিবী রক্ষার্থে বিরোচন-সুতা মন্থরাকে ইন্দ্র সংহার করেছিলেন। মহর্ষি শুক্রের জননী, পতিব্রতা ভৃগুপত্নী, অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করার কামনা করায় স্বয়ং বিষ্ণু তাঁকে বধ করেন।

অপূর্ব ধর্মকথা, কে অস্বীকার করবে?

গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের স্বার্থে সমাজকে চার ভাগে ভাগ করে দেবতা ও দেবস্তাবক ব্রাহ্মণদের জন্য একটি পরশ্রমেভোগী কায়েমী ব্যবস্থা পত্তনকেই আমরা বলেছেন ধমকর্ম। ধর্ম শব্দের অন্য অভিধা নেই আর্য পুরাণে। সেখানে ধার্মিক কোনো পরমেশ্বরের চিন্তা করেন না। নেই এ শব্দের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক সংকল্প। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নিশ্চিন্ত আরামের সুবন্দোবস্ত করার জন্য রাজা অধিকার ও ব্রাহ্মণদ্বেষী জাতি সমাজের নিধনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু,ইন্দ্রের এবং তদীয় স্তাবক ও প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণ সমাজের একমাত্র ধর্ম। অর্থাৎ তাঁদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আরব্ধ কর্মই ধর্ম। অন্যদিকে আত্মরক্ষার জন্য কৃতকর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেবতাদের যাগযজ্ঞ আক্রমণ করে ব্রাহ্মণ্য অনুপ্রবেশ রোখার কাজটি ছিল দেবতাবিরোধী সমাজের ধর্ম। প্রশ্ন তাই, এই স্বার্থদ্বন্দ্বে কোন্ পক্ষ ধার্মিক কেইবা অধার্মিক? এক এক পক্ষের চোখে বিপক্ষীয়রা অধার্মিক। এছাড়া ধর্মের অন্য ব্যাখ্যা নেই।

তাড়কা নিহত হয়েছেন। মারীচ পলাতক। দেবব্রাহ্মণরা জয়ী হয়েছেন। সুতরাং আনন্দ সন্তোষের উৎসব হ'ল এবং দেবতারা রামলক্ষ্মণকে গ্রহণ করলেন মর্ত্য অর্থাৎ আর্যাবর্তবাসী ক্ষত্রিয় সেনানায়ক রূপে। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁদের সামরিক শিক্ষার প্রথম আংশিক পর্ব শেষ হল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা নিয়োগ হল তাঁদের

দেবসেনানীমণ্ডলীতে। আগেই বিশ্বামিত্র দশরথকে বলে এসেছিলেন যে, রামচন্দ্রকে তিনি দৈব্যাস্ত্র দান করবেন। তাড়কাবধের সঙ্গে সঙ্গেই রামের নিয়োগ এবং অস্ত্রলাভ হল আনুষ্ঠানিক ভাবে। দেবতারা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বামিত্রকে আদেশ দিলেন। বিশ্বামিত্র তখন আগ্নেয়, বায়বীয় সহ বর্ষণাস্ত্র, শোধনাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু দেবসৈন্য দান করলেন রামচন্দ্রকে। বেশির ভাগ অস্ত্রকেই বলা হয়েছে উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত এবং অঙ্গার সদৃশ। অনুমান অমূলক নয় যদি আমরা সেই সব অস্ত্রকে আগ্নেয়াস্ত্র বলে ধারণা করি, কারণ পৌরাণিক আমলে আগ্নেয়াস্ত্রের ঢালাও ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন পুরাণে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মিথিলা যাত্রা

দেবশিবিরে রাম-লক্ষ্মণের কার্যত নিযুক্তির [অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টের] পর বিশ্বামিত্র দশরথপুত্রদের নিয়ে দেবানুগত রাজ্য মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাড়কাবধের পর গহন অরণ্য অতিক্রম করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দশরথপুত্রেরা একটি নয়নাভিরাম পর্বত দর্শন করেন। অতঃপর সেখানে একটি রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, আশ্রমটি সিদ্ধাশ্রম নামে পরিচিত। আগে এটিই ছিল বামনরূপী বিষ্ণুর পুর্বাশ্রম। এই আশ্রম অঞ্চলে মারীচের আবির্ভাব এবং যুদ্ধে সুবাহুর মৃত্যু হয়। মারীচ বিতাড়িত হন। একরাত্রি আশ্রমে বাস করে পরের দিন প্রত্যুষে তাঁরা যাত্রা করলেন মিথিলার পথে। যাত্রার আগে বিশ্বামিত্র বলেছেন, ভাগীরথীতীরে হিমাচলের উদ্দেশ্যে তাঁদের যাত্রা শুরু হল। রাম-লক্ষ্মণ, আশ্রমবাসী তাপস এবং প্রাপ্ত দেবসেনাগণ সহ শতসংখ্য শকটে জনকরাজার জন্য উপহারাদি নিয়ে ক্রমশ উত্তর দিকে এগিয়ে চললেন। সন্ধ্যা নাগাদ পুরো দলটি উপস্থিত হলেন শোন বা মাগধী নদীর তীরে। সবাই জানেন, শোন নদ আজও আছে। নদীটির উৎপত্তি ছোটনাগপুর পর্বতে। পাটনার কাছে শোন সঙ্গত হয়েছে ভাগীরথী অথবা গঙ্গার সঙ্গে।

স্থানটি ছিল দেবানুগত নৃপতি কুশের রাজ্য। কুশের চার ছেলে; কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা এবং বসু। কুশরাজ্যের পরিচয় জ্ঞাপন করে বিশ্বামিত্র বলেছিলেন, চতুর্থ রাজা বসু গিরিব্রজ নগর স্থাপন করেন। এখন তাঁরা সেই শোন নদ তীরস্থ গিরিব্রজেই অবস্থান করছেন। অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মণ এখন রাজগীরে। বর্তমান বিহারের অন্তর্গত সেই প্রাচীন গিরিব্রজই ছিল মগধরাজ্যের রাজধানী। মহাভারত

যুগে রাজা ছিলেন জরাসন্ধ।

শোন নদের তীরে নিশা যাপনের পর পুনশ্চরণ শুরু হলে রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, হে মহাত্মা, আমরা এবার কোন্ পথে যাব ?

মহর্ষি বললেন, এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ।। অর্থাৎ মহর্ষিরা যে পথ ধরে যান আমারও সেই পথ অনুসরণের ইচ্ছা।

সুতরাং হংসসারস মুখরিত পবিত্র জাহ্নবীধারা অনুসরণ করে সানন্দ যাত্রা চলল আরও অর্ধ দিবস। এক সময় পথশ্রান্ত দলটি বহু ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত নদীতীর-বর্তী এক জনপদে এসে যাত্রাবিরতি ঘটালেন। স্নান পান ভোজনান্তে বিশ্বামিত্রকে ঘিরে এরপর পুরাকাহিনী শুনতে বসলেন দাশরথি রাম সহ সহযাত্রীরা। রামচন্দ্রের অভিলাষ, গঙ্গাবতরণের ইতিহাস শ্রবণ। বিশ্বামিত্র এইখানে তাঁদের সেই বিস্ময়কর গঙ্গাবতরণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন, যে অমৃতকথা ভারতীয় জনগণের শ্রুতি ও কথকতার মধ্যে দিয়ে যুগপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে এসেছে। গঙ্গামাহাত্ম্য ভারতবাসীর শিক্ষায় সংস্কারে এবং জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। পবিত্র জাহ্নবীধারার সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে আছে দেবমাহাত্ম্যের সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী।

কিন্তু গঙ্গাবতরণের পবিত্রকথা শুনব আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে। রামায়ণে অনেক সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস উপকাহিনীর আকারে সন্নিবেশিত আছে। এটাই প্রাচীন ইতিকথা, পুরাণ রচনার রীতি। সব উপকাহিনী আলোচ্য হওয়ার যোগ্য নয়। গঙ্গাবতরণের ইতিহাসকেও আমরা অনালোচ্য অনুপুঙ্খের কোঠায় সাবধানে সরিয়ে রাখতে পারতাম যদি না এ কাহিনীর গুরুত্ব হত অপরিসীম। ভারতীয় জনজীবন গঙ্গার পবিত্র সলিলে বিধৌত হয়ে আছে। তাই অন্যতর উপকাহিনীর মতো গঙ্গাবতরণকথাকেও পথপ্রান্তে ফেলে যাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্রের কাছে সে ইতিহাস আমরাও শুনে নেব। কিন্তু তার আগে রাম-লক্ষ্মণকে মিথিলায় পৌঁছে দিয়ে আসা প্রয়োজন, নচেৎ প্রাসঙ্গিক সূত্রটি প্রাচীন পুরাণের রীতিতে মাঝপথে ছিন্ন করে রাখতে হয়। তাতে পাঠের অসুবিধা। তাই আপাতত এগিয়ে চলি। ফের ফিরে আসব জাহ্নবীতীরে।

গঙ্গাবতরণ কাহিনী শুনতে শুনতে কখন নিশাবসান হয়েছে খেয়ালই ছিল না। প্রত্যূষে এক ব্রাহ্মণবাহিনী ত্রস্তপদে এসে বিশ্বামিত্রের কুশল সংবাদ নিলেন। তারা আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন, গাধিপুত্র সদলবলে মিথিলা যাত্রা করেছেন।

গঙ্গা পারাপারের জন্য উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযুক্ত নৌকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাহিনী। অতঃপর জলযানে গঙ্গা পার হয়ে বিশ্বামিত্র আসেন

বিশালা নগরীতে। বিশালার অধিপতি সুমতি নিজে এসে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে রাজপুরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একরাত্রি সুখশয়নে অতিবাহিত করে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর গন্তব্য মিথিলারাজ্যে প্রবেশ করলেন।

পথে গৌতম মুনির আশ্রম। শাপভ্রষ্ট অহল্যা এইখানে একাকিনী পাষাণ-প্রতিমার মতো রামচন্দ্রের আগমনের জন্য প্রতীক্ষায় আছেন। আশ্রমে রামচন্দ্রের আগমন ঘটলে তবেই তাঁর শাপমুক্তি। রামচন্দ্র অহল্যাদর্শনে অভিভূত। এমন অলোকসামান্য রূপ কোটিতে একটি মেলে কিনা সন্দেহ।

অহল্যার কোনো পাষাণপরিণত মূর্তি রামচন্দ্র দেখেন নি। অহল্যার পাষাণী-রূপের কথা গল্প মাত্র। সম্ভবত রামের ভাবমূর্তি গঠনের জন্যই এমন একটি পুরা-কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছিল।

বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা এইরকম: "রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য [গৌতম বলে যান, রাম এলে তাঁর উপযুক্ত পরিচর্যা কোরো] স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন।" ..."অনন্তর মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং রামের সংকার করিয়া ...অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন।"

না, এই গল্পে অহল্যার পাষাণী মূর্তিতে পরিণতি লাভ ও রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পুনর্জীবন অর্জনের কোনো কথাই নেই। অন্য গল্প, কামুক ইন্দ্রের সঙ্গে গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগে অহল্যা সহবাস করেছিলেন। তা সহবাস করে থাকতেই পারেন। সেকালে দেবতার সঙ্গে এধরনের মিলনে ব্রাহ্মণ স্বামীরাও প্রতিবাদ করতে ভরসা পেতেন না। আবার যে কোনো অত্যাচারী ব্রাহ্মণ যে কোনো শূদ্রপত্নীর ওপর যথেচ্ছা বলাৎকারের আইনসঙ্গত অধিকার ভোগ করতেন। হতে পারে এই মিলনের জন্য গৌতম তাঁর ভ্রষ্টা স্ত্রী এবং পরস্ত্রী সম্ভোগকারী ইন্দ্রের ওপর রুষ্ট হয়ে দুজনকেই তিরস্কৃত করে আশ্রম ত্যাগ করেন। তদবধি অনুতাপবিদ্ধা অহল্যা একাকিনী ঐ আশ্রমে তপস্যা করতে থাকেন। এরপর বিশ্বামিত্রদের আগমন উপলক্ষে এবং ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারে রাবণবধের উদ্যোগ আয়োজনে বিশিষ্ট পদমর্যাদার ব্রাহ্মণ নেতা গৌতম অভিমান ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে আসেন মিথিলা ও বিশালার মধ্যবর্তী গৌতমাশ্রমে। চতুর দেবতাদের নির্দেশেই হয়ত তিনি অহল্যাকে সর্বসমক্ষে ক্ষমা প্রদর্শন করেন রামের পদার্পণ উপলক্ষে। অমনি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা গল্প বানিয়ে প্রচার করতে থাকেন, ভগবান রামচন্দ্রের স্পর্শে পাষাণী অহল্যা শাপমুক্ত হলেন।

পুরাণে দেবপক্ষীয়গণের ভাবমূর্তি তৈরীর জন্য দেবস্তাবক বুদ্ধিজীবীরা পটাপট গল্প বানিয়ে মূর্খ বিচারক্ষমতাহীন অশিক্ষিত জনসমাজে তা গেয়ে বেড়িয়েছেন। যুগ যুগ সেই গল্পের গাওনা অবাধে চালু থাকায় সাধারণ্যে গল্পগুলি অলৌকিক দৈবী মহিমার শাশ্বত কাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং ভারতীয় জনজীবনে কুসংস্কারের প্রাচীর প্রাকারে নতুন নতুন গাঁথনি তুলে সেগুলিকে ক্রমশ অভ্রভেদী আকার দান করা হয়েছে। অশ্রদ্ধেয় সেইসব কাহিনীর উৎস বিচার করলেই রটনার সঙ্গে ঘটনার আসমানজমিন ফারাক ধরা পড়ে যায়। ঘটনা বলছে, গৌতম নিজেও অহল্যাকে শাপ দিয়ে পাষাণ প্রতিমায় পরিণত করেন নি।

যাইহোক, অহল্যা পর্ব এই সামান্য ঘটনায়ই সমাপ্ত হল। বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, এই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারটুকুকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে কল্পগল্পটির ঢালাও প্রচার হল তাই দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে আজও ভারতজীবনকে আলোড়িত করে গেলেও কেউ একবার ঐ গল্পের সত্যাসত্য যাচাই করে দেখলেন না।

গৌতম আশ্রম থেকে উত্তর-পূর্ব পথ ধরে বিশ্বামিত্রবাহিনী জনক রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে এসে পৌছালেন। তাঁরা দেখলেন যজ্ঞের [যার আধুনিক নাম সম্মেলন] জন্য বিশাল আয়োজন হয়েছে। দান উপহারলোভী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় দিগ্বিদিক থেকে ছুটে এসেছেন। যানবাহনে রাজপথ সমাকীর্ণ। বোঝা গেল জনকও আগেই রাম-লক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পেয়েছিলেন। তারই আয়োজন তৈরী আছে জনকরাজ্যে।

খবর পেয়ে পুরোহিত শতানন্দ ও অন্যান্য ঋত্বিকগণকে নিয়ে স্বয়ং জনক রাজা বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জ্ঞাপন করে দশরথ-তনয়যুগলকে হরকার্মুকটি দেখাতে অনুরোধ করলেন।

রাজসচিব হরকার্মুক প্রদর্শনের আয়োজন করুন, সেই অবসরে আমরা ফিরে যাই গঙ্গাবতরণ কথায়। যাবার আগে বলে যাই, হরধনুভঙ্গের ব্যবস্থাও ছিল আগে থেকে তৈরী এবং তা বিশ্বামিত্র ও জনক জানতেন। সকল ঘটনাই অতএব দৈবাদেশে ঘটমান।

খালপথে গঙ্গাবতরণ

গঙ্গাতীরে বসে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গঙ্গাবতবরণের কাহিনী শুনেছিলেন রামচন্দ্র। সে ইতিহাস বিশেষ আলংকারিক অর্থাৎ পৌরাণিক সংকেত বাক্যে সাজিয়ে পরিবেশন

করেছিলেন বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র-কথিত কাহিনীটির শ্লোকবদ্ধ রূপ দিয়েছেন বাল্মীকি। যা নিছক ইতিহাস, তাই হয়ত পৌরাণিক রচনাভঙ্গির ঢঙে রামায়ণের বালকাণ্ডে পরবর্তী সময়ে কাব্যরূপ পরিগ্রহ করে। ফলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। মূল কাহিনীর ওপর দেবমাহাত্ম্যের অলঙ্কার চাপানো হয়েছিল। ইতিহাস হারিয়ে গেছে সেই কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রবাহপথে।

কোনো মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকলে গঙ্গাবতরণের নেপথ্যে যে ইতিহাস কপিলভস্মে ঢাকা পড়ে আছে, তাকে আর খুঁজে বার করা যাবে না। কিন্তু যদি আমরা সগরসন্তানদের সঙ্কল্প অনুসরণ করে গল্পের ইমারতটি ভেঙেচুরে খুঁড়ে দেখি, তবে নিশ্চয় সেই পুরাবৃত্তের খানিকটা হদিশ করতে পারব। কাজটি কঠিন। সগরের অপহৃত যজ্ঞাশ্ব খুঁজে বার করার মতোই কঠিন। তবু আমাদের এই কর্তব্যটুকু করতেই হবে। এটাই আমাদের তপশ্চরণ।

গঙ্গাবতরণ বিষয়টি দু ভাগে ভাগ করে নেবো। প্রথম বলব, বিশ্বামিত্র কথিত কাহিনীটি। পরবর্তী পর্যায়ে হাজির করব আমাদের যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ। শুরু করি সেইভাবে:

বিশ্বামিত্র বললেন, পূর্বকালে সগর নামে এক নৃপতি অযোধ্যার শাসক ছিলেন। সগর রাজা বিন্ধ্য এবং হিমালয় পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে একবার এক মহৎ সম্মেলন বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ চলাকালীন যজ্ঞের পবিত্র পর্বদিনে সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্র। যজ্ঞাশ্ব অপহৃত হয়েছে দেখে সগর রাজা তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে অপহৃত যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে আনার আদেশ দিয়ে বলেন:

সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ ॥ ১৩ ৩৯ বালকাণ্ড
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছত। ১৪ ঐ

হে পুত্রগণ! তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করো। প্রত্যেকে এক এক যোজন স্থান সেই যজ্ঞাশ্বের খোঁজে ঘুরে দেখো। সগর স্পষ্ট করে আরও বলে দিলেন, "যাবত্তুরগ সন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্।" অর্থাৎ যতক্ষণ সেই অশ্বের দর্শন না পাও ততক্ষণ পৃথিবী খনন করে যাও।

সগরের আদেশে সগরপুত্রেরা বজ্রকঠিন বাহুবলে প্রত্যেকে এক এক বর্গ যোজন পথ খনন করতে শুরু করলেন। খনন কার্যের ফলে 'ভিদ্যমানা বসুমতী' আর্তনাদ করে উঠলেন। নাগ অসুর রাক্ষসদের আর্তরবে চতুর্দিক উচ্চকিত হয়ে উঠল।

উত্তরাখণ্ডের সমতল অংশ খননের পর তাঁরা উত্তরাভিমুখে জম্বুদ্বীপের পর্বত-

সঙ্কল স্থানেও [অর্থাৎ হিমালয়ে] খনন কাজ শুরু করলেন। নিম্নভূমিতে অনার্য বসতি উৎসাদিত হওয়ায় নাগাসুর এবং রাক্ষসদের আর্তনাদ শ্রুত হয়েছিল। অতঃপর হিমালয়ে খনন শুরু হলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন হিমালয়বাসী দেবশিবিরভুক্ত জাতি, দেবতা ও গন্ধর্বেরা। দেব-জাতীয়রা সদলবলে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন :

ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।

বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ।। ২৫/ঐ

বললেন, হে ভগবন্ ! সগরপুত্রেরা পৃথিবী খনন করছে এবং বহু মহাত্মা ও জলচর-(গন্ধর্ব) দের হত্যা করছে।

সংবাদ শুনে পিতামহ দেবজনবর্গকে আশ্বস্ত করে বললেন : স্বয়ং বিষ্ণু কপিল রূপে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। তাঁর কোপাগ্নিতে সগরপুত্রেরা ভস্মীভূত হবে, সুতরাং তোমাদের ভয় নেই। ৩/৪০/ঐ

বিশ্বামিত্রের গল্পটি এইখানে থামিয়ে আমাদের কিছু কথা বলে রাখি।

উদ্ধৃত গল্পাংশ পাঠে প্রথমেই যে প্রশ্ন আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে তা হল, অপহৃত একটি অশ্বের অনুসন্ধানে সগরের আদেশে ষাট হাজার সগরপুত্রকে ঐ প্রলম্ব খননকর্মে হাত দিতে হল কেন ? অমন একটি অশ্বেরই বা প্রকৃত স্বরূপ কি ? ইন্দ্র যে অশ্বটিকে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছেন এমন তো কোন সংবাদ ছিল না সগরের কাছে। তবে কেন শুরু থেকেই তাঁর আদেশ, যাও ! প্রত্যেকে এক এক যোজন পথ খনন করে যজ্ঞাশ্ব ঘরে ফিরিয়ে আনো ? পৌরাণিক এই আলঙ্কারিক বর্ণনার প্রকৃত তাৎপর্য কী ?

এ গল্পে মূল রহস্যটি হল 'যজ্ঞাশ্ব', যা রাক্ষসের ছদ্মবেশে যজ্ঞারম্ভেই দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেছেন। কিন্তু সগর কি কোনো অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে ? নাকি সেটা ছিল কোনো পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ? দুই যজ্ঞেই যজ্ঞাশ্ব প্রয়োজন। অশ্বমেধের ঘোড়াকে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন দেশ জনপদের ওপর দিয়ে। যে সব রাজ্য অবাধে ঘোড়াটিকে তাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করতে দেয়, তারা যজ্ঞকারী রাজার বশ্যতা স্বীকার করেছে বলে মেনে নেওয়া হয়। যে রাজ্য ঘোটকের গতিরোধ করে, যজ্ঞকারী রাজার সঙ্গে সে রাজ্যকে যুদ্ধ করতে হয়। এজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়ার প্রাধান্য আছে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞেও যে একটি বলিদানের ঘোড়া থাকে আমরা তা আগেই জেনেছি। কিন্তু সগর রাজার যজ্ঞাশ্বটি কোন্ জাতের যজ্ঞের অশ্ব, স্পষ্টত আমাদের সেকথা জানানো হয় নি। বলা হয়েছে,

যজ্ঞাশ্বটিই সগরের সঙ্কল্প। অর্থাৎ সেটি ছিল সগর-সঙ্কল্পের প্রতীক একটি প্রতীকী ঘোটক। ইন্দ্র সে সঙ্কল্পের প্রতীক অপহরণ করেছেন বলতে, অতএব বুঝতে হয়, তিনি সগর-সঙ্কল্প যাতে পূর্ণ না হয় তারই জন্য নানা প্রতিবন্ধক এবং গোলমাল সৃষ্টি করেছিলেন। তবে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে সগর রাজা কোনো যুদ্ধাভিযান করেন নি। সে সুযোগ অবশ্য ইন্দ্রও দেন নি। চতুর ইন্দ্র সগর সঙ্কল্পের যেমনই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকুন, করেছিলেন তা রাক্ষসের ছদ্মবেশে। সুতরাং বৈরী ভাব তাঁর সঙ্গে গড়ে ওঠার কোনো কারণও ঘটে নি।

ইন্দ্রের ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাখ্যা অনায়াসে করা যায়। ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ। সগর রাজা ছিলেন দেবানুগৃহীত 'ধার্মিক' নৃপতি। 'ধার্মিক' অর্থাৎ তিনি দেবস্বার্থের রক্ষক। এহেন এক দেবপক্ষীয় নৃপতির উদ্দেশ্য সাধনের বিরুদ্ধাচরণ ইন্দ্রের পক্ষে প্রকাশ্যে সম্ভব ছিল না। অথচ সগর-সঙ্কল্প পূর্ণ হলে হয়ত এমন এক দেবস্বার্থের হানি ঘটতো, যার কথাও ইন্দ্র বা দেবতারা সগরকে বলতে পারেন নি। বললে সেটা দেবতাদের নির্মম স্বার্থপরতাকে সগরের চোখে স্পষ্ট করে তুলতে পারত। উত্তরাখণ্ডের দেবস্তাবক আযরাও তাতে মর্মাহত হতেন। তাই ইন্দ্রকে ছদ্মবেশে মিত্রপক্ষীয় রাজার উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হয়। দেবতারা এমন বিশ্বাসঘাতকতা আরও বহুক্ষেত্রেই করেছেন তাদের পৃথ্বীপতি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে। তারই জন্য তো লক্ষ শ্লোকে মহাভারতকথাকে ফেনিয়ে বাড়াতে হয়েছে। চক্রান্তকারী দেবতার দোষ ঢাকতে স্তাবক বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যা গল্পের পাহাড় বানিয়ে ঢাকা দিয়েছেন সে সব অপকীর্তি।

খাণ্ডবদাহনে ইন্দ্র সদলবলে আকাশ থেকে গোলাবর্ষণ করে তাঁর বন্ধু রাজা তক্ষকের বংশ ধ্বংস করেছিলেন। এ ঘটনার জলজ্যান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছি 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বইটিতে। ইন্দ্রের এমন বিশ্বাসঘাতকতার সংখ্যা অগুনতি। তার কাছ থেকেই বাসুদেব কৃষ্ণ শিখেছিলেন বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি। কূটচক্রান্তে কৃষ্ণের পারদর্শিতা লক্ষ্য করে দেবতারা তাঁকে বরণ করেন উপেন্দ্র (উপ+ইন্দ্র) পদে। মানুষকে গো-জ্ঞানে নিধন ও শোষণ করার চমৎকার প্রশাসনিক বুদ্ধিমত্তা তাঁর আছে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নারদ তাঁকে আরও একটি উপাধিতে ভূষিত করেন, সেই সম্মানজনক খেতাবটি হল, গোবিন্দ। কেশী হত্যাকারী 'কেশব' এমন একাধিক সম্মানিত উপাধির মালিক। সেটাই তাঁর শতনাম।[১]

১। লেখকের 'যদুবংশ ব্রজপর্ব' গ্রন্থ দ্রঃ, প্রকাশক নাথ পাবলিশিং।

কিন্তু থাক সে কথা। আগে সগরের যজ্ঞাশ্বের স্বরূপ সন্ধান প্রয়োজন।

অনুসন্ধানের জন্য কবি আমাদের একটিইমাত্র সূত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। বলেছেন, যজ্ঞাশ্বর খোঁজে অর্থাৎ সগর-সঙ্কল্প সাধনের উদ্দেশ্যে সগরের আদেশে তাঁর ষাট হাজার প্রজা বিভিন্ন খননাস্ত্র নিয়ে মহা কলরব সহ মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হিমালয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আগেই বলেছি, যজ্ঞাশ্ব নিশ্চয় মেদিনীগর্ভে আত্মগোপন করে নি। ইন্দ্রও ঘোড়া লুকিয়ে রাখেন নি ভূগর্ভে। তবে মাটি খোঁড়া কেন? এই কেনটির উত্তর পেলেই সগরের যজ্ঞাশ্বের বা সঙ্কল্পের হদিশও আমরা পেয়ে যাব। সুতরাং সগরপুত্রদের অনুসরণ করে সগরের কর্মকাণ্ডটি খতিয়ে দেখতে হবে।

সগরের ষাট হাজার পুত্র! আমরা বলব, ষাট হাজার শ্রমিক প্রজা, কারণ প্রজাবৎসল রাজার প্রজারা তার পুত্রবৎ। কবি সরাসরি তাদের পুত্র বলেই উল্লেখ করেছেন। সেই যাট হাজার শ্রমিক প্রজা হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েছিল সগর-শিবির থেকে। রাজার আদেশ মাটি খুঁড়ে এগিয়ে যাও যতক্ষণ যজ্ঞাশ্বকে খুঁজে পাওয়া না যায়। রাজা জানেন, সে খনিত পথেই কোনো এক জায়গায় সঙ্কল্প-সাধক প্রতীকী অশ্বটির আবির্ভাব ঘটবে।

এগিয়ে চললেন খনক বাহিনী। হাতে নিলেন শাবল গাঁইতি জাতীয় মৃত্তিকা-খননকারী উপাদান। সেই খনক বাহিনী ঃ—

যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ ॥ ১৮/৩৯/বাল

অর্থাৎ, বজ্রকঠিন বাহুবলে এক একজন এক এক বর্গ যোজন ভূমি খনন করতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র বললেন,—হে রঘুনন্দন! বজ্রতুল্য শূল এবং হলের আঘাতে বসুমতী ছিন্নভিন্ন হয়ে আর্তনাদ শুরু করলেন। ১৯/৩৯/বাল

বললেন,

শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥ ১৯/৩৯/বাল

এই ভাবে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হলে বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন, বহুজনের সঙ্গে লাগলো বিবাদ সংঘর্ষ। অসংখ্য নাগ, অসুর ও রাক্ষসদের আর্তনাদে পূর্ণ হলো চারদিক। ২০/ঐ

নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাং চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষসত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ ॥ ২০/ঐ

এ ভাবে সগর রাজার খনকেরা পর্বতসঙ্কুল জম্বুদ্বীপের সর্বত্র খনন করতে করতে মহা কলরব সহকারে অগ্রসর হলো। জম্বুদ্বীপ বলতে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম/চতুর্থ শতকেও শিবালিক পর্বতের পাদভূমি থেকে দক্ষিণ সাগরোপকূল এবং পূবে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা আসাম থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকেই বোঝাতো। খনকরা হিমালয়ে সম্ভবত হরিদ্বার হৃষিকেশ থেকে খালপথ খনন শুরু করে উত্তরে দেবপ্রয়াগের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। গাড়োয়াল হিমালয় বা তৎকালের ভৌম স্বর্গের দ্বারদেশ ছিল সেটাই। তাই সে অঞ্চলের অধিকার নিয়ে আর্য অনার্য দেবতাদের মধ্যে দক্ষযজ্ঞের লড়াই বেধেছিল। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঐ অঞ্চল শিব পশুপতির দখলে চলে যাওয়ায় বিপদ গণনা করে আর্য দেবতারা শিবকে দেবতার দেবতা মহাদেব এবং ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর খেতাব দিয়ে ঐ অঞ্চল নিয়ে একটা সন্ধি রক্ষা করে নেন। সন্তুষ্ট অনার্য শিব দক্ষকে নির্বাসিত করেন, তবে বিষ্ণুর সঙ্গে হরিদ্বার কংখল অঞ্চল ভাগাভাগি করে নেন। এই ভাগবাঁটোয়ারার সাক্ষ্য হিসেবে আজও হরিদ্বারের নামের সঙ্গে দুই আর্য অনার্যের নাম একত্রে উচ্চারিত হয়। অঞ্চলটি হরিদ্বারও বটে আবার হরদ্বারও বটে।

কিন্তু মূল কথাপ্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। খনকদের উৎপাতে সমতলে যেমন নাগাসুর রাক্ষসাদি উচ্ছিন্ন হচ্ছিলেন, হিমালয় পথে তেমনি নির্বিচারে পথের বাধা সরাতে গিয়ে খনকরা দেবগন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ঋষিদেরও উৎখাত করছিলেন।

আপদ ঘরের দুয়ারে সমাগত দেখে দেবতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। পাহাড় ভেঙে ছুটলেন তাঁরা ব্রহ্মার শিবির মেরু পর্বতের ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মাকে আসন্ন বিপত্তির সংবাদ দিয়ে তাঁদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানালেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদের সম্বন্ধে পৌরাণিক তথ্য বড় সাংঘাতিক। দেবতা এবং তাঁদের বশংবদ ব্রাহ্মণ নেতারা কোথাও কারো দ্বারা হেনস্থা হয়েছেন অথবা দেবতাদের স্বীকার করে না এমন কারো কোথাও অভ্যুত্থান ঘটছে খবর পেলেই ঐ দেবপ্রধানরা যজ্ঞ করে সেই দুর্বিনীতের ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কুরুক্ষেত্র, প্রভাসক্ষেত্র তো বটেই, বিত্রবানাদি পুরুষ, জরাসন্ধ শিশুপাল কংস বালী, প্রত্যেকের সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্য ব্রহ্মা বড় বড় পরিকল্পনা করেছেন। তাঁরই পরিকল্পনায়, আমরা দেখতে পাবো, কি ভাবে রাবণও সবংশে নিধন হলেন। যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন ব্রহ্মার এটাই ছিল মুখ্য কর্ম। ব্রহ্মা পোস্টটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রীর পদ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সগরখনকদের উৎপাতে দেবগন্ধর্বরা উৎখাত হচ্ছেন শুনে এই পর্বে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার মুখে এক টুকরো কুটিল বাঁকা হাসি মাত্র দেখা গেলো। তিনি কোনো

ষড়যন্ত্র করার জন্য বৈঠক ডাকলেন না। বললেন, তিষ্ঠ! ধৈর্য ধরো দেবগণ! সগরপুত্ররা হিমালয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করছে, করতে দাও। জেনো, তারা জানে না, তারা এই ভাবে নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। দেখবে, কারোকে কিছু করতে হবে না। ওরা স্বখাত সলিলে আপনি ডুবে মরবে।

দেবতারা স্তম্ভিত তাকিয়ে থাকেন, বৃদ্ধ জ্ঞানীর মুখের দিকে। দু চোখে প্রশ্ন।

ব্রহ্মা বলেন :

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবাস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ॥ ৩/৪৪/বাল

অর্থাৎ, এই বসুন্ধরা বাসুদেব মাধবের মহিষী। তিনি কপিলরূপে পৃথিবী ধারণ করে আছেন। তাঁরই কোপাগ্নিতে সগরপুত্ররা দগ্ধ হবেন।

পুরাণকথায় পৃথিবীর ধারক হিসেবে বিভিন্ন প্রাণীর নাম লিখিত আছে। এক ঐ রামায়ণের বালকাণ্ডেও যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী-ধারকরা উল্লেখিত হয়েছেন। সগরপুত্ররা তাদের খনন কর্মের সময় বিরূপাক্ষ নামে এক দিগ্‌গজকে পৃথিবীর ধারকরূপে দেখেছিলেন :

খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।
দিশাগজম্ বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্॥ ১৩ ৪০ ঐ

বিশ্বামিত্র পৃথিবীধারকের মতিগতি সম্পর্কেও সুপরিচিত। তিনি বলেন, ঐ বিরূপাক্ষ বিশ্রামের অবসরে যখন মাঝেমধ্যে মাথা নাড়েন তখন ভূমিকম্প হয়। পৌরাণিক মহাত্মারা যেমন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের মহিমা গায়েব করে দেহবান দেবতাদের মাহাত্ম্য কথা গেয়েছেন, তেমনিই যা কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা, তারই ওপর কল্পিত চরিত্র আরোপ করে দেবলোকের অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করে গেছেন। তার ওপর তাঁদের পুরাণে পৃথিবী শতভাগে খণ্ডিত হয়েছে। তার সীমা কখনো ক্ষুদ্রতর স্থানে কোথাও বা বৃহত্তর জায়গায় সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হয়েছে। তাই বিরূপাক্ষ পৃথিবীর ধারক এই গল্প শোনাবার পরেই, বিশ্বামিত্র আবার এক মহাপদ্ম নামক দিগ্‌গজের রূপকথা বললেন রামচন্দ্রকে। বললেন, দক্ষিণদিকে খনন কর্মের সময় সগর-খনকরা আবার এক পৃথিবী-ধারকের দেখা পেলেন, নাম যাঁর মহাপদ্ম। [১৭ ১৮/৪০/বালকাণ্ড] এই ভাবেই উত্তর দিকে পৃথিবী-ধারক ভদ্রনামক মহাগজের দর্শন লাভ হল। অবশেষে উত্তরপূর্ব দিকে পৃথিবী-ধারক কপিলের সন্নিকটস্থ হয়ে

যখন তাঁরা খনকের আঘাতে তাঁকে বিচূর্ণ করতে আরম্ভ করলেন মহাবিপত্তি ঘটলো ঠিক সেই সময়।

রামচন্দ্র শিশুর সারল্য নিয়ে ভক্তিভরে সকৌতূহলে সেই রূপকথা শুনছিলেন বিনা প্রশ্নে। শুনছিলেন অপরাপর ভারতবর্ষীয়গণ। কিন্তু এই গল্প শুনে আমাদের মনে চাঞ্চল্য জেগেছে। আমরা রূপকথা শোনার বয়সটি পার হয়ে এসেছি। পুরাকথার মধ্যে সন্ধান করছি পুরাইতিবৃত্তের। তাই দেবকোপাগ্নির ভয় উপেক্ষা করেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, কে সেই পৃথিবী ধারক যার মস্তক চালনায় ভূমিকম্প হয় আর কেইবা কপিলরূপী বাসুদেব যিনি রক্তচক্ষু মেলে তাকাতেই ষাট হাজার খনক পুড়ে ঝলসে ছাই হয়ে যান? বিজ্ঞান তো মহাকাশ তোলপাড় করে গ্রহ নক্ষত্রগুলির শূন্যে ভাসমান গোলাকার আকৃতির ছবি পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে। কেউ কোথাও কোনো গ্রহ-গোলক ধারণ করে নেই। চাঁদে নেমে পৃথ্বীপুত্ররা খুঁজে পান নি কোনো চরকা-বুড়িকে। সুতরাং বিশ্বামিত্রের গল্পগুলি রাম রামানুজের মতো বিনা প্রশ্নে শুনি কেমন করে। প্রশ্ন না তুলে তো উপায় নেই।

ভূমিকম্পকারী বিরূপাক্ষকে প্রথমেই বাদ দেওয়া যাক। ভূমিকম্পের প্রাকৃতিক কারণ সম্পর্কে আজ একটি প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রও সঠিক অবগত আছে। সুতরাং বিরূপাক্ষ এক বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটনার রূপক মাত্র। ঘটনার ওপর চেতন-স্বরূপ আরোপ করে পুরাকথক একটি বিরূপাক্ষ বানিয়েছেন, মানুষকে সব শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র আর্য-গোষ্ঠী-স্বার্থ-সাধক ভাগবৎ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে।

অথ প্রশ্ন, বাসুদেব-রহস্য নিয়ে। আমরা এক বাসুদেবকে জানি। ইনি কংসের সভাসদ্ এবং বসুদেবের ক্ষেত্রজ পুত্র। কংসভগিনী 'দেবগভ্যা' দেবকীর গর্ভে স্বয়ং দেবতা বিষ্ণুর ঔরসে তাঁর জন্ম।[২] হরিবংশ পুরাণে যশোদানন্দন এবং মহাভারতে বাসুদেব কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত। এঁর জন্ম-কর্ম জাতকুল বিবাহ সন্তানাদি এবং এক বিষণ্ণ মৃত্যুর ইতিহাস বিশ্বস্ত ভাবে কথিত আছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল পণ্ডিতদের মতে ১০০০-৯০০খৃষ্ট পূর্বাব্দে। সুতরাং তিনি সেই আমলের এক ইতিহাস-পুরুষ।

বিশ্বামিত্র যদি সেই বাসুদেবের ভাগবৎ-মহিমা প্রচারকল্পে গল্পটি বানিয়ে থাকেন তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে সেটা একেবারেই একটি ভিত্তিহীন অবাস্তব উপন্যাস হয়েছে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। কেননা বাসুদেব ধরায় এসেছেন সগর রাজার বহু জেনারেশন পরে। তাঁর পক্ষে গঙ্গাবতরণ পর্বে পৃথিবী ধারণ

২। যদুবংশ/ব্রজপর্ব/তথ্যসূত্র দ্রঃ।

করার প্রশ্নই ওঠে না।

বাসুদেব কৃষ্ণ নরদেহে যাবতীয় মানুষী কর্তব্যই পালন করে গেছেন। বিবাহ করেছেন একাধিক। মন কেড়েছেন বহু গোপবালার। তাঁর জাতিকুল পরিচয়, তিনি এক ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ। দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করে যাদবগণের এক বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব পেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন নি। কুটিল দেবরাজনীতি তাঁকেও সবংশে ধ্বংস করেছে। আর বাসুদেব কৃষ্ণ বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এমনই জন-অপ্রিয় হয়ে পড়েন যে. তাঁর নির্জন বিষণ্ণ মৃত্যুতে ভারতবর্ষের কোথাও কেউ শোকাশ্রু মোচনের আবেগ অনুভব করেন নি। দুর্যোধনের মৃত্যুতে দশদিকে হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হয়েছিল। মহাভারতকথকই সঞ্জয়ের মুখে সেই আশ্চর্য সংবাদ বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের মৃত্যু হল যখন সামান্য এক আভীর ব্যাধের শরক্ষেপে তখন তাঁর পাশে একটি মানুষও ছিলেন না। এমন শোচনীয় পতন মহাভারতে আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি।[৩]

এমন এক বাসুদেব অলৌকিক প্রতিভাবলে তাঁর বহুপুরুষ আগে ঘটমান এক পর্বে উপস্থিত থাকতে পারেন না, কপিলরূপে পৃথিবী ধারণ করা তো অলীক কল্পনা-মাত্র। যদি বুঝতাম তিনি পরমেশ্বরের ভাবরূপক রাধাসমন্বিত বংশীধারী চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ, তাহলেও না হয় মেনে নেওয়া যেত তাঁর অলৌকিক অবাস্তব ক্ষমতাবলী। কিন্তু আমাদের আরাধ্য কৃষ্ণ আর আয়ুধধারী যুদ্ধোন্মাদ কুরুক্ষেত্রের বাসুদেব কৃষ্ণ তো এক ও অভিন্ন নন। প্রথমজন জগদীশ্বরের ভাবরূপক, দ্বিতীয়জন এক নরহত্যাকারী ভয়াল ভীষণ ধ্বংসের অন্যতম নায়ক। এই দ্বিতীয় পুরুষ বসুন্ধরার পতি হবেন কোন্ সুবাদে!

মনে হয়, 'বাসুদেব' শব্দটি এখানে ভিন্ন অর্থের দ্যোতক। 'বাসুদেব' শব্দটিকে বসুমতীর দেবতা বা স্বামী স্বয়ং পরমেশ্বর বলে গণ্য করা যেতে পারে। বসুমতীর বা বসুন্ধরার অধিপতি যিনি তিনিই বাসুদেব। তিনি বসুমতীর মালিক বা স্বামী, তাই কবি বলেছেন, বসুন্ধরা তাঁর মহিষী। অর্থাৎ, কপিলরূপী বাসুদেব প্রকৃতি-দেবীর ঈশ্বর। তাই তিনিই প্রাকৃতিক এক ভূখণ্ডেরও ধারক। পর্বতের এক অন্তঃসলিলা তপ্তধারা, যার উৎসারিত চেহারার রঙ কপিলবরণ, সেই অগ্ন্যুৎসার কাণ্ডটি পৌরাণিক রূপকে কপিলরূপী বাসুদেব তথা কপিল মুনিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৩। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ।

রূপক রূপকথা শোনানো হ'লেও দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা কিন্তু সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর নির্ভর করেই ঐ রূপকল্প তৈরী করেছিলেন। দেবমন্ত্রী বিজ্ঞানী। হিমালয়ের মানচিত্র, তার মাটি পাথর জল তুষার এবং ঋতু বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাঁর আছে বিশিষ্ট জ্ঞানলব্ধ পরিচয়, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তাই তিনি জানেন, হিমালয়ের কোন্ অঞ্চলে আছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। কোথাকার পাথুরে মাটিতে খনিত্রের আঘাত পড়লে শুরু হবে অগ্ন্যুৎপাত ও প্রলয়।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানেন, হিমালয়গর্ভে বহু আগ্নেয় স্রোত আজও বর্তমান। হিমালয়ের উত্থানপর্বে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরি সক্রিয় ছিল। গলিত প্রস্তর স্রোত ঠাণ্ডা হয়ে স্থান বিশেষে কঠিন গ্রানাইট ও শিলাস্তর মজুত করে। মধ্য হিমালয়ে, যেখানে বহু উন্নতশীর্ষ পর্বত বর্তমান, সেখানে গ্রানাইটেরই আধিক্য। গ্রানাইট পাথর প্রচণ্ড চাপের ফলে পুনরায় গলে গিয়ে নোতুন প্রস্তরস্তর সৃষ্টি করে। আর শিলাস্তরের মাঝে মাঝে রয়ে যায় আগ্নেয়ধারার উপাদান।[৪]

হিমালয়ের বুকে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, আছে তপ্ত কুণ্ড। এককালের উষ্ণ ধারা আজ আত্মগোপন করেছে। তার স্মৃতি রয়ে গেছে জায়গাটির গরমপানি নামের মধ্যে। সেদিন তো ছিলই, আজও বইছে অনেক অন্তঃসলিলা উষ্ণস্রোত। বিজ্ঞানী দেবতাদের কাছে এই হিলালয় চরিত্র অবিদিত ছিল না। ব্রহ্মা জানতেন, সগর-শ্রমিকদের খনিত্রের আঘাতে কোনো বিশেষ জায়গার এমনি কোনো উষ্ণধারা রুদ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে আর সেই তপ্তধারায় ভস্মীভূত হবে তারা। এই ঘটনার ওপর পুরাণকার তাঁর বিশিষ্ট বাচনরীতি প্রয়োগ ক'রে অলৌকিকতার সৃষ্টি করেছেন। অগ্নিগর্ভ পর্বত হয়েছে বাসুদেব পত্নী বসুন্ধরা। এবং উষ্ণস্রোত, যা সগর-খনকের আঘাতে উচ্ছ্বিত হয়েছিল, সেই অগ্নি উৎসারণকে কবি কল্পনা করেছেন, কপিলরূপী বাসুদেবের কোপাগ্নি রূপে। সুন্দর কবি-কল্পনা সন্দেহ নেই। উষ্ণ স্রোতের রূপ কপিল বা পিঙ্গলবর্ণ তো হতেই পারে। সেই স্রোত যখন

৪। "While Himalaya was rising, there was volcanic activity in the Himalayan Region. Great quantities of molten rock materials, called magma, were injected into the folds ...This injected granite is young in age. In general the central Himalayan Axis, which has many towering. peaks, is formed of granite." —Geography of Himalaya/S. C. Bose / N. B. T.

"উচ্ছ্রিয়া" উঠেছে, তখন তার সফেন পিঙ্গল জলন্ত রূপ যে ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করেছিল, কবি তাকে ভীষণদর্শন কপিলের কোপাগ্নি বললে, সেই আলঙ্কারিক বক্তব্যের সঙ্গে কপিলমুনির অস্তিত্বের কোন্ সংবাদ পাওয়া যায় ? মুনি আর দেবতা ছাড়া কি চিন্তা ভাবনার বিষয় আর কিছু থাকতে নেই ? কবির স্বাধীনতা নেই। একটি আলঙ্কারিক চিত্র সৃষ্টি করার ? কবি ভাবেন এক, লেখেন এক, তার ব্যাখ্যা ক্ষমতাকাঙালদের বুদ্ধিজীবীরা করেন বিকৃত। সেই বিকারের ফলে পুণ্যার্থীরা সাগরসঙ্গমে ছুটে যান পাপ ধুতে। যখন নৌকা যোগে সাগরে পুণ্যসঞ্চয় করতে যেতে হতো, তখন কত লোক পাপভারে জলে ডুবে স্বর্গ লাভ করেছেন। কত কত গুরুপুরোহিত পুণ্যার্থীদের কাছে পৌরাণিক গল্পগাছা বলে হাতিয়ে নিয়েছেন মূল্যবান দানসামগ্রী। যুক্তিতর্কে ভেবে দেখলে, সগরের সঙ্কল্পসাধন করতে গিয়ে ষাট হাজার খনক হিমালয় পথে ভেসে গেছলো উষ্ণস্রোতে, এটাই প্রতীয়মান হয়। পুরাণকাররা সুযোগ পাওয়ামাত্র সেই ঘটনা কেন্দ্র করে বানিয়ে ফেললেন এক কপিলমুনি। গড়া হলো তাঁর কল্পিত মূর্তি।

খোঁজ করলে জানা যায়, 'বৈখান সাগম' নামক একটি শিল্পশাস্ত্র গ্রন্থে এক কপিলমুনির বর্ণনা আছে। এই কল্পিত কপিলের বর্ণ গণগণে আগুনের মতো লাল। মূর্তির পাশে কমণ্ডলু বা জলপাত্র থাকে। এক করপদ্মে অভয়মুদ্রা, অপর তিন হাতে তাঁর তিন অস্ত্র, হল, খড়্গ এবং চক্র। ইনি অষ্টভুজ। বাকি হাতেও বিভিন্ন অস্ত্র। শ্রীলঙ্কার ইসরুমুনি বিহারের সন্নিকটে এক সরোবরের ধারে পর্বতগাত্রে জনৈক ঋষির মূর্তি খোদিত আছে। ঐ মূর্তির সঙ্গে একটি অশ্বমুখের খোদাই কাজ দেখা যায়। পণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এটি সেই কপিলমুনিরই মূর্তি। অশ্বমুণ্ডটি সগর রাজার যজ্ঞাশ্বের প্রতীক বলে তাঁদের ধারণা। এই মূর্তি আর প্রচলিত কপিল পুরাণে কিন্তু অনেকই তফাৎ। সগর রাজার আমল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক আগের ঘটনা। বাসুদেব কৃষ্ণ কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই ভারত বিখ্যাত হন। সে যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১০০০-৯০০ অব্দে। ওদিকে যে কপিল মুনি সাংখ্যদর্শন প্রণেতা, তিনি ছিলেন ৬৫০ থেকে ৫৭৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মানুষ। এই তিনের মধ্যে কাল ব্যবধানের ফারাক এমনই যে একের সঙ্গে আর একে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

অর্থাৎ সগর সমকালে বাসুদেবের অস্তিত্ব কল্পনার বিষয়ও ছিল না। কপিল মুনি এবং বাসুদেব মাধবকে গঙ্গাবতরণ কাহিনীর সঙ্গে একাকারে মিশিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী প্রক্ষেপকারীরা মিথ্যা কথার শ্লোক গেঁথে।

অলীক কথকতার কুয়াশা সরিয়ে আবার ফিরে যাই হারানো যুগের হিমালয়ে। ভস্মীভূত সগর-সন্তানদের দেহাবশেষ হিমালয়ের কোন্ গিরিকন্দরে চাপা পড়ে রইল, জানি না। সে খবর রাজাও সংগ্রহ করতে পারেন নি। সঙ্কল্প সাধনের পথে এতো বড় বাধা পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হাল ছাড়েন নি। পৌত্র অংশুমানকে পাঠিয়েছিলেন হারানো ষাট হাজার খনকের সন্ধানে। অংশু বিনম্রী এবং 'ধার্মিক'। দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে, পূজা প্রণাম জানিয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান শুরু করেছেন পিতৃব্যদের খনিত পথরেখা ধরে। পর্বতসংকুল গিরিখাতে পৌছে তিনি দেখলেন, খনিত পথের শেষ হয়েছে উত্তুঙ্গ পর্বতশীর্ষের অন্তস্থলে। স্থানটির কোথাও জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ঊষর হয়ে আছে সেই উপত্যকা প্রদেশ। রামায়ণের বালকাণ্ডের (৬/৪১) বিবরণ : অংশুমান তাঁর পিতৃব্যদের দ্বারা খনিত ভূগর্ভপথ দেখতে পেলেন—

স খাতং (খনিত) পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং (ভূগর্ভপথ) মহাত্মভিঃ।
প্রাপগ্গত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ॥

যথার্থ প্রতিবেদন সন্দেহ নেই। অগ্ন্যুদগীরণ এবং তপ্ত স্রোতধারার ফলে উপত্যকা এবং ঊষর শুষ্কতার সৃষ্টি হয়েছে। পর্বত ধসে গেছে। প্রশস্ত হয়েছে গিরিখাত। একটি ভীষণ ভয়াল ধ্বংসের রূপ অংশুমানকে অভিভূত করেছে। তিনি কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন সেখানে। আর তখনই আকাশে শোনা গেছে গুরুগুরু ধ্বনি। অংশুমান সুউচ্চ পর্বতশীর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, শূন্যপথে ভেসে আসছে এক আকাশরথ বা বিমান। সেকালের রাজারা আকাশরথ অনেকেই দেখেছেন, চেপেছেনও সেই বিমানে। অনেকের নিজস্ব বিমানও ছিল। তাই অংশু অবাক হন নি। বিমানাবতরণ পর্যন্ত সেই ভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

বিমান থেকে অবতরণ করলেন গড়ুর বিমানের বৈমানিক গড়ুর স্বয়ং। বললেন, "মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোহয়ং লোকসম্মতঃ॥ ১৭/৪১/বাল।

অর্থাৎ, হে পুরুষব্যাঘ্র, শোক কোরো না। তোমার পিতৃব্যদের এই বিনাশ জগতের মঙ্গল সাধন করবে। তিনি আরও বললেন, সগর পুত্রদের লৌকিক সলিল দ্বারা তর্পণ করা ঠিক হবে না। অর্থাৎ তাঁরা পুণ্যাত্মা, তাঁদের তর্পণ করতে হবে পবিত্র স্বর্ণদী গঙ্গার জলে।

বোঝা গেল, সগর পুত্ররা কোনো গর্হিত কাজ তো করেনইনি, বরং তাঁদের আত্মদানের ফলে মানুষের অশেষ মঙ্গল হবে এটা দেবতারাও জানতেন, কেননা তার স্বীকৃতি আমরা পেলাম বিষ্ণু বিমানের চালক গড়ুরের মুখে।

প্রশ্ন, তবে কেন দেব সভায় অত উত্তেজনা ? ইন্দ্রের ছদ্মবেশ ধারণ ও যজ্ঞাশ্ব অপহরণ ? ব্রহ্মার জ্ঞাতসারে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পুণ্যাত্মা সেই সগর পুত্রদের এই মহামরণ ?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা আগেই পেয়েছি। গরুড়াগমনে দেবমনোভাবের যে পরিবর্তন সূচিত হল, সেই প্রশ্নটির নেপথ্য রহস্য অতঃপর জানতে হবে।

সগর পুত্ররা একটি মহৎ কর্তব্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সগর একটি মস্ত ভুল করেছিলেন। তাঁর মহাযজ্ঞে তিনি দেবতাদের অনুমতি গ্রহণ করে সঙ্কল্প সাধনের উদ্যোগ করেন নি। করলে সে তথ্যও আমাদের জানানো হতো। সগর-খনকবাহিনী রাজার আদেশে দেবদ্বিজের প্রতি কোনো সমীহ প্রদর্শন না করেই মহা কলরবে দেবভূমি গাড়ওয়াল হিমালয়ের দ্বারদেশ অতিক্রম করে খনন কাজ করেছেন। দেবতাদের এটা মর্যাদায় লেগেছে। অথচ সগরের বাহুবলের কাছে তাঁদের শক্তি অকিঞ্চিতকর জেনে তাঁরা সগরকে সরাসরি বাধা দিতেও পারেন নি। সুতরাং ব্রহ্মার পরামর্শে অপেক্ষা করেছেন ষাট হাজার খনকের (অজ্ঞতাবশত) অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য , যে মৃত্যু অবধারিত ভাবে তাদের গ্রাস করবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। খননাস্ত্রের আঘাতে অগ্নিগর্ভ পার্বত্য প্রদেশ হুঙ্কার দিয়ে ফেটে পড়বে। তরল অগ্নিস্রোতে এবং পার্বত্য ধসে আপনি ধ্বংস হবে তারা।

অংশুমান পার্বত্য প্রদেশে পদার্পণ করে সবিনয়ে দেবরক্ষী লোকপালদের প্রতিক্ষেত্রে বন্দনা করেছেন। তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে তবেই অগ্রসর হয়েছেন। রামায়ণে এই দেবলোক রক্ষী লোকপালদের 'দিগ্‌গজ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেখছি, দিগ্‌গজদের স্পষ্ট "সর্বৈর্দিশাপালৈ" বলা হয়েছে। দিশাপালই তো দিকপাল। তাদের সেবা করেন দেবদানবরা।[৫]

অংশুকে গঙ্গার বিষয় বলার পরই গড়ুর তাঁকে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে সগর রাজার কাছে ফিরে যেতে বললেন। বললেন, যজ্ঞাশ্বটি নিয়ে ফিরে যাও এবং তোমার পিতামহের যজ্ঞ সুসম্পন্ন করো :

নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি ॥২১/ঐ

৫। দেবদানবরক্ষোভিঃ পিশাচপতগোরগৈঃ।

পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজম পশ্যত ॥ (বা. রা. বালকাণ্ড/৪১ সর্গ/নবপত্র প্রকাশন সং দ্রঃ)।

কোনো অশ্ব নয়, গঙ্গার উল্লেখ সন্ধানই অশ্বলাভ। যজ্ঞাশ্বের স্বরূপ আর অস্পষ্ট রইল না। গঙ্গাকে কীভাবে নামাতে হবে হয়ত গড়ুর সেকথাও বলেছিলেন। তাই সেটাই হল যজ্ঞের প্রাথমিক সিদ্ধি আর তাই যজ্ঞ সম্পন্ন করায় বাধা রইল না। অংশু প্রত্যাবর্তন করলে

স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।

গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥২৫ ঐ

অর্থাৎ, যজ্ঞসম্পন্ন করে সগর স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন বটে, কিন্তু গঙ্গাকে নামিয়ে আনার কোনো উপায় স্থির করতে পারলেন না।

খনিতপথে গঙ্গা আনয়নের বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে এইখানে কবি ব্যক্ত করলেন। অতঃপর আর কোনো আলঙ্কারিক প্রয়োগ নেই। গঙ্গাবতরণের নেপথ্য কাহিনী এবার বিবৃত হল। আমরা বুঝলাম, খোঁড়াখুঁড়ির পেছনে ছিল খালপথে গঙ্গাকে নামিয়ে আনার সঙ্কল্প। কিন্তু সঙ্কল্পের সাধন হল না। সগর গত হলেন। পৌত্র অংশুমানও ব্যর্থ। তিনিও নরদেহ ত্যাগ করলেন। রাজা হলেন তৎপুত্র দিলীপ। কিন্তু দিলীপও গঙ্গাবতরণের জন্য উপযুক্ত উপায় স্থির করতে পারলেন না। শেষ হয়ে গেল চার চারটি জেনারেশন।

অতঃপর দিলীপপুত্র ভগীরথ অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু নিঃসন্তান ভগীরথ রাজ্যপাট মন্ত্রীদের হাতে সমর্পণ করে হিমালয়ে চললেন গঙ্গা আনয়নের দৃঢ় সঙ্কল্পে মন বেঁধে। সেটাই তাঁর তপস্যা, তাঁর আমৃত্যু সাধনা।

ভগীরথ দেবানুগত রাজা। গঙ্গাকে আনার জন্য তিনি কোনো সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন নি। সোজা চলে গেছেন ব্রহ্মাকে তুষ্ট করতে। ব্রহ্মার শিবিরভুক্ত এলাকা দিয়েই গঙ্গাবতরণের পথ। ব্রহ্মার শিবির ছিল সুমেরু এলাকায়। সুমেরু বলতে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী ও কেদারনাথ চৌখাম্বাকেই বোঝায়। গঙ্গা অবতরণ করেছেন গোমুখ থেকে। ব্রহ্মা ঐ অঞ্চলের অধিকর্তা। আবার ব্রহ্মার ওপরে মহেশ্বর রূপে সম্রাট হয়ে বসেছেন শিব। সুতরাং সেটি শিবলোকও বটে। ছোট রাজপুরুষকে প্রসন্ন করে ঊর্ধ্বতন সম্রাটের কাছে পৌঁছাতে হয়। ভগীরথ এই রীতি জানতেন। তাই আগে ব্রহ্মা-পূজা করে দেবমন্ত্রীকে তিনি নরম করে নিলেন। নিবেদন করলেন তাঁর কাছেই নিজের অভীষ্ট কথা।

গঙ্গাপথ তো বহু দূর ইতিমধ্যেই খনিত হয়েছে। আর্যাবর্তকে গঙ্গাজল থেকে বঞ্চিত করে রাখা দীর্ঘকাল আর সম্ভব নয়। তাছাড়া ভগীরথ নতজানু হয়েছেন গাড়ওয়াল হিমায়ের মালিক আর্য দেবতাদের মহিমা স্বীকার করে। সগরপুত্রদের

মতো তেজ ও দুর্বিনয় নিয়ে তিনি প্রবেশ করেন নি দেবরাজ্যে। অতএব সব দিক বিবেচনা করে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা ভগীরথের বাসনা পূরণে সম্মত হয়ে বললেন, 'বরং বরয় সুব্রত ॥'

ভগীরথ দুটি বর বা প্রার্থনা নিবেদন করলেন, তিনি যেন সগর পুত্রদের সৎকার করতে পারেন পবিত্র গঙ্গাজলে। অর্থাৎ নামিয়ে আনতে পারেন সেই পবিত্রধারা সগরপুত্র-খনিত খালপথে, যেন তাতে দৈবী বাধা উপস্থিত না হয় আর নিঃসন্তান তিনি যেন লাভ করেন একটি সুপুত্র। ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু। ইনি কত নম্বর ব্রহ্মা অবশ্য সে তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস একবার বাঁধ ভাঙলে কোথায় যে কোন্ জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। এ কাজ করতে হবে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে। এবং তার জন্য দরকার উত্তম প্রযুক্তিবিদ্যাধর কোনো জলনিয়ন্ত্রকের সাহায্য। ব্রহ্মা পরামর্শ দিলেন, 'গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে। তাং বৈ ধারয়েতুং রাজন্ নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥" ২৫/৪২/বাল।

অর্থাৎ গঙ্গার পতনবেগ সহ্য করার ক্ষমতা নেই বসুন্ধরার। তাঁকে ধারণ করার ক্ষমতা শূলপানি ছাড়া আর কারও আছে বলে তো আমি দেখছি না।

ব্রহ্মার বাক্যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গঙ্গার পতনবেগ বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা রাখতেন মহাশু মহেশ্বর। এতএব ব্রহ্মার পরামর্শ, যাও ভগীরথ, মহেশ্বরকে তুষ্ট করো!

শিবলোকে গিয়ে মহেশ্বরকে প্রসন্ন করতেই বছরখানেক সময় লেগে গেল ভগীরথের। অবশেষে গঙ্গাধর প্রসন্ন হলেন এবং শুরু হল গঙ্গাধারা নামিয়ে আনার কারিগরি প্রচেষ্টা। মহাকবির আলঙ্কারিক রচনানৈপুণ্যে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডটি খুবই সহজে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "জাহ্নবী বিস্তীর্ণ আকার পরিগ্রহ করিয়া···দুঃসহ বেগে শোভন শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। ···ব্যোমকেশ···তাঁহাকে আপনার জটাজুট মধ্যে তিরহিত করিলেন।" এইভাবে জাহ্নবীধারা শিব জটাজুটে পুনরায় বেশ কিছুকালের জন্য তিরহিত হয়ে রইল। শেষে উপযুক্ত সময় দেখে শঙ্কর সেই দুর্বার ধারাকে তাঁর "জটাজটী হইতে বিন্দু সরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন।" তখন "গঙ্গা বিমুক্ত হইবামাত্র সপ্তধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার হ্লাদিনী পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে; সুচক্ষু সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পূর্ব দিকে এবং অবশিষ্ট একটি মহারাজ ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ···গমনকালে গঙ্গার প্রবাহ কোথাও দ্রুত বেগে, কোনো স্থলে কুটিল গতিতে কোনো

স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদুভাবে বহিতে লাগিল।"

ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্।

বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ॥ ২৪.৪৩ বাল

পার্বত্য নদী তো এভাবেই পর্বত গাত্র ভেদ করে এবং বিভিন্ন গড়ান পথে সর্পিল বিসর্পিল গতিতে কেবলি নিম্নাভিমুখে নেমে আসে। এ বর্ণনা যথার্থ বাস্তব। তবে গঙ্গার এই বহু-বঙ্কিম অবতরণ পথ কোন্‌টি প্রাকৃতিক কারণে এবং কোন্‌টি বা মহেশ্বর ও ভগীরথের প্রযুক্তিবিদদের বিশেষ প্রাযুক্তিক কৌশলে উন্মুক্ত হয়েছিল সেদিন, আজ তা সঠিক চিহ্নিত করা আর সম্ভব নয়। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, গঙ্গাবতরণের যে কাহিনী আমরা রামায়ণে পাই, সেই কাহিনীটি যে গঙ্গাবতরণের সঠিক পথ রেখাকেই অনুসরণ করেছে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পৌরাণিক তথ্যে প্রকাশ, কৈলাসের উত্তরে আছে এক সর্বৌষধিগিরি। এই পর্বত হিরণ্যশৃঙ্গশালী। পর্বত পাদদেশে কাঞ্চন বালুকাময় একটি দিব্য সরোবর আছে। সরোবরের নাম বিন্দুসর। রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ বিন্দুসরের উভয় পার্শ্বে বহুকাল বসবাস করেন।

রামায়ণী বর্ণনা, ভগীরথ যখন বিপুল সোরগোল তুলে শঙ্খনাদ করতে করতে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো গঙ্গাধারাকে তার বদ্ধ জলাশয় থেকে নামিয়ে নিয়ে চলেছেন তখন পার্বত্য পুরুষেরা সেই শোভাযাত্রায় সোল্লাসে যোগদান করেছিলেন। করারই কথা। ঐ জলধারা যে চাষাবাদ এবং পানের জন্য তাদেরও প্রয়োজন ছিল।

এইভাবে গঙ্গাপথ উন্মুক্ত করে চমৎকার অগ্রসরণ হচ্ছিল, মাঝে এক বিপত্তি দেখা গেল। এক জায়গায় গঙ্গার ধারা পার্বত্য গুহাপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। অর্থাৎ স্রোতধারা অন্তঃসলিলাপথে অন্তর্হিত হল। কিন্তু পৌরাণিক কথাকাব্যে যা-কিছুই ঘটুক না কেন, তার প্রাকৃতিক কারণ গায়েব হ'য়ে যায়। ঘটনাটির ওপর অপ্রাকৃত কাহিনী আরোপ ক'রে কল্পিত দেব-ঋষির মহিমা প্রকাশের আয়োজন শুরু করেন কবি ও কথকগণ। গুহাপথে, তুষার স্তূপের নিচ দিয়ে একাধিক পার্বত্য নদী কিন্তু এভাবেই হিমালয় পথে বিচরণ করছে বহু জায়গায়। অলকানন্দার এমন বহমান রূপ সে-পথের যাত্রীরা নিত্য প্রত্যক্ষ করেন। এসব সাধারণ ঘটনা। এখন তা নিয়ে গল্প রচনার সুযোগ নেই। কিন্তু সেকালে ছিল।

গঙ্গার ধারা পার্বত্য কন্দরে প্রবেশ করলে কবি এক জহ্নু মুনির উপাখ্যান রচনা করে ভক্ত শ্রোতার আসরে পরিবেশন করলেন। আমাদের শোনানো হ'ল, ব্রাহ্মণের অলৌকিক ক্ষমতার কথা। কবি বললেন :

গর্বিতা গঙ্গা তাঁর অবতরণ পথে কোনো এক জহ্নু মুনির যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করায় মুনিবরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলো। জহ্নু মহেশ্বরকেও বোধহয় তপপ্রভাবে খর্ব করার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি গঙ্গাকে এক গণ্ডুষে পান করে নিজের গর্ভে আটক করলেন। দেখে দেবগন্ধর্ব ঋষিরা বিস্ময়াকুলভাবে জহ্নু-স্তব শুরু করেন। তখন স্তুতিকারদের প্রতি প্রীত হয়ে পুনরায় গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন জহ্নু। গঙ্গা বেরিয়ে এলেন তাঁর কর্ণরন্ধ্র দিয়ে। সেই থেকে গঙ্গার আর এক নাম হল, জহ্নুকন্যা জাহ্নবী।

গল্পটি ভক্ত শ্রোতার কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য। বস্তুত, একজন মুনি না থাকলে গঙ্গার মুক্তি হয় কী করে। তাছাড়া গঙ্গার জাহ্নবী নামের এমন একটি জুৎসই নেপথ্য ইতিহাস [যার সঙ্গে অলৌকিক দেবমহিমা বিজড়িত] না থাকলে গঙ্গার মহিমাই বা বাড়ে কী করে? তাই গল্পটি ভারতবর্ষ গঙ্গার মতোই শিরধার্য করলেন।

আমরা কিন্তু এই গল্পের মধ্যে প্রাকৃতিক কার্যকারণেরই সূত্র খুঁজে পাই পৌরাণিক তথ্যাবলী ঘেঁটে।

পৌরাণিক তথ্যে বলা হয়েছে, গঙ্গার উৎপত্তি কৈলাসে। কৈলাস শিবলোক। শিব সেই পার্বত্য ধারাকে মুক্ত করে বিন্দুসরে জমা করেন। সেখান থেকে বিভিন্ন ধারায় সেই প্রবল স্রোতকে বিভিন্নমুখী প্রবাহে সংহত করা হলে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্করী বেগ প্রশমিত হয়েছিল, তবে বহু স্থান প্লাবিতও হয়।

পৌরাণিক গঙ্গা কৈলাস থেকে উদ্ভূত হয়ে নেমে আসার সময় স্বাভাবিক কারণেই পার্বত্য গুহাপথও অবলম্বন করে, কেননা জলের গতি সব সময়ই নিম্নাভিমুখী। যেখানে সেই জলধারা উচ্চভূমিতে বাধা পেয়েছে সেখানে নদী তার পথ খুঁজেছে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে। এইভাবে গিরিকন্দরের মধ্য দিয়ে সেই প্রবাহধারা এসে গোমুখ থেকে পুনরায় নির্গত হয়েছে। গোমুখের আকৃতি গোমুখ অপেক্ষা একটি বৃহৎ কর্ণরন্ধ্রেরই মতো। সুতরাং পৌরাণিক জহ্নুকর্ণটিই যে গোমুখ নয়, একথাই বা বলা যায় কেমন করে।

ডঃ শান্তিকুমার নানুরাম ব্যাস বিন্দুসরের অবস্থান নির্দেশ করেছেন গঙ্গোত্রীর দু মাইল দক্ষিণে রুদ্র হিমালয়ে।[৬] পুরাণোক্ত গোকর্ণ প্রদেশটিও তাঁর মতে গঙ্গোত্রীর কাছে গোমুখ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

বন্ধুবর বীরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'গঙ্গার কথা'[৭] গ্রন্থে [মহাদেবের জটা সচক্ষে

৬। India in Ramayana Age দ্রঃ।

৭। 'গঙ্গার কথা'/নাথ পাবলিশিং দ্রঃ।

প্রত্যক্ষ করে] লিখেছেন : গঙ্গোত্রী থেকে ভাগীরথীর ধারা পেরিয়ে অপর পারে গেলে পাওয়া যায় ছোট একটি জলধারা যা এসে মিলেছে ভাগীরথীতে। এই ছোট ধারাটির নাম, কেদার গঙ্গা। কেদার গঙ্গা পেরিয়ে কয়েকশ ফুট এগোলে অপূর্ব দৃশ্য। ধবধবে শাদা পাথরের বুকের ওপর দিয়ে নেমে আসছেন এখানে ভাগীরথী। এই জলপ্রবাহ অসংখ্য ধারায় আকস্মিক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শচারেক ফুট নিচে। সেখানে সৃষ্টি হয়েছে একটি কুণ্ডের, নাম গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডের ওপরের সেই সহস্রধারা জলপ্রপাতকেই বলা হয়, মহাদেবের জটা।

গঙ্গাবতরণ যেখান থেকেই হয়ে থাকুক, ভাগীরথী গঙ্গার যাত্রা শুরু দেবপ্রয়াগে। ঋষিকেশ থেকে ৭০কি. মি. উত্তরে এই প্রয়াগ ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। এখান থেকেই ভাগীরথী গঙ্গা নামকরণ।

কেন হল দেবপ্রয়াগ থেকে ভাগীরথী নাম ? তবে কি দেবপ্রয়াগই সেই পার্বত্য পথ যে পথমুখ পর্যন্ত সগর সন্তানরা খাল খনন করে আর্য দেবায়তনে অনধিকার প্রবেশ করে এবং অজ্ঞতাবশত ভূগর্ভস্থ লাভাস্রোতের উদগীরণ ঘটানোর কারণ হয় ? তপ্তধারা নিঃসরণের ফলে ঐ দেবপ্রয়াগেই কি তাঁদের নরদেহ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছিল ?

সেদিন কী হয়েছিল কে তার জবাব দেবে ? যে কথা পুরাণ-পুঁথিতে নেই তা আমরা আমাদের আলোচনার বহিভূর্ত রাখি। যে সূত্র পাই পুরাণে, সেই সূত্র ধরে আমাদের এতাবৎকাল অর্জিত অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সংস্কারমুক্ত যুক্তিতর্ক তথ্যের সাহায্যে পুরাণোক্ত ঘটনার পুনর্মূল্যায়ণের ও সেই সূত্রে খোঁজ খবরের চেষ্টা করি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে, দেবপ্রয়াগ থেকেই গঙ্গাবতরণের পথ হঠাৎ প্রশস্ত হয়েছে। এই সঙ্গমস্থলটি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে, পুরাকালে বোধহয় কোনো পূর্তবিদ্ দ্বারা এই পথ খনিত হয়েছিল।

গাড়োয়াল হিমালয়ের ওপর রচিত তাঁর তথ্যমূলক গ্রন্থে[৮] শ্রী কে. এস. ফোনিয়া লিখেছেন, "It is delightful and fascinating sight to watch the Bhagirathi, Alakananda and the Ganga flowing deeply into Sculptured Channels carved through the rocks. This sight reminds one of the story of king Bhagirath's undaunted efforts

৮। Uttarakhand—Garhwal Himalyas

in carrying the Ganga in a canal to his land".

রামায়ণী তথ্যে প্রকাশ, সগর থেকে ভগীরথ এই কয়েক পুরুষের অবিরাম চেষ্টায় গঙ্গাকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। মধ্যবর্তী জহ্নু কাহিনীটি কবিকল্পিত। ব্রহ্মা মহেশ্বরাদির গল্প পুরাবৃত্ত। কারণ এই দেবতারা যে পৌরাণিক পুরুষ ছিলেন, বহু পৌরাণিক তথ্যাদি উদ্ধার করে তার সন্ধান আমরা পেয়েছি।

পুরা বিবরণ পাঠে মনে হয়, ভগীরথের পূর্বপুরুষ অংশুমান সম্ভবত দেবপ্রয়াগেই গড়ুরের দর্শন পান। আসপাশে তিনি কোনো জলাশয় দেখতে পান নি সেদিন। কিন্তু গঙ্গার ধারাকে কোন্ পথে নামিয়ে আনতে হবে, গড়ুরের কাছে সেই পথনির্দেশ পেয়েছিলেন অংশু। তখনকার মতো তিনি পথনির্দেশ নিয়েই ফিরে যান।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, আমরা এখানে কিছু প্রমাণ করতে বসি নি। পৌরাণিক মিথগুলির বিচার করতে প্রয়াস গ্রহণ করেছি মাত্র। দেবপ্রয়াগে কোনোও অগ্নিস্রোতের উৎসারণ ঘটেছিল কিনা সেকথা আজ আর বলা সম্ভব নয়; কিন্তু যে গিরিসঙ্কট সৃষ্টি করে গঙ্গাবতরণ হয়েছে, সেই পথের দুপাশের পার্বত্যপ্রাচীর বহুস্থানে গ্রানাইট পাথরে মোড়া। এ জায়গার প্রাকৃতিক বিবরণে গ্রানাইটের উল্লেখ বিশেষ অর্থবহ আর সেদিকেই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। এরপর ভূতাত্ত্বিকরাই আমাদের আরও পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন।

বেশ কিছু পূর্তবিদ্ মনে করেন, যে ভাবে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে এবং তৈরী হয়েছে অবতরণিকা, তা দেখে একথা মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে গঙ্গাকে নামিয়ে আনতে খাল কাটা হয়েছিল। শ্রী ফোনিয়া এ বিষয়ে লিখেছেন, "Some one inclined to believe that the Ganga is a canal designed by king Bhagirath. Its canal like formation in the downhills has led several engineers to support this myth. The Ganga flows to the north at Gangotri, north-west upto Harshil and then turns abruptly to the south towards the land of king Bhagirath. If the Ganga did not change its course at Harsil, it would go away from the land of Bhagirath."

হরসিল থেকে গঙ্গার এই ভ্রমণ পথের অকস্মাৎ পরিবর্তন পৌরাণিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, একথা মেনে নেওয়ার অন্য কারণও আছে। গ্রন্থান্তরে পৌরাণিক এবং বৈদিক সাহিত্য থেকে তথ্য আহরণ করে দেখিয়েছি যে, সে যুগের দেবাসুর সম্প্রদায় উভয়েই জলনিয়ন্ত্রণের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায়

পারদর্শী ছিলেন। অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে নদীর গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন।[৯]

গঙ্গাজল পবিত্র একারণেই যে, তা সর্বদোষমুক্ত এবং ভাগীরথী সমগ্র আর্যাবর্ত প্লাবিত করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়ে ভারতবর্ষের জীবনকে সঞ্জীবিত করেছে। নচেৎ গঙ্গা নামের কোনো বিশেষ স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য নেই। মাহাত্ম্য সৃষ্টি করেছেন পুরাণকার। পুরাণভুক ভারতবাসীও বিশ্বাস করেছেন পার্থিব হিমালয়ে প্রাকৃতিক কারণে উৎপন্ন একটি তুষারগলিত জলধারা নেমে এসেছে জগদীশ্বরের জটা থেকে, পতিত হয়েছে তা স্বর্গচ্যুত হয়ে। আমরা দেখলাম, আর পাঁচটি সাধারণ পার্বত্য নদীর মতোই গঙ্গাও এসেছে হিমালয় থেকে নেমে। নদীর জন্ম পাহাড়েই। সে তো সেখান থেকেই আসবে। তাছাড়া গঙ্গা নামটিরও কোনো বিশেষ মাহাত্ম্য নেই। যে কোনো নদীকেই গঙ্গা নামে অভিহিত করা যায়। কারণ 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ হল, নদী। Ganga appears *"to be an Austric word meaning just river"*.[১০]

পুরাকথার ব্যাখ্যা যথাসম্ভব করা হল। এখন খালপথে গঙ্গাকে নামিয়ে আনা হয় হরসিলের কাছে তার গতিমুখ কারিগরী বিদ্যায় পরিবর্তন করে, আমাদের এই তর্কটি উপযুক্ত মহাত্মারা অনুসন্ধান করে দেখলে, সন্দেহ নেই, ভগীরথের অতবড় ইঞ্জিনীয়ারিং কীর্তি জগৎসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হবে এবং তার দ্বারা আমরা একটি জাতীয় কর্তব্যও পালন করতে পারব ভারতের পুরাকীর্তি উদ্ধার করে।

৯। লেখকের 'দেবায়তন হিমালয়' [যন্ত্রস্থ] গ্রন্থ দ্রঃ।
১০। Kirata-Jana-kriti/Dr. S. k. Chatterjee,

হরধনু বৃত্তান্ত

বিশ্বামিত্র কথিত গঙ্গার কথা শুনলাম। ওদিকে জনক রাজার প্রাসাদে বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় হরকার্মুকটি হয়ত এসে গেছে। এবার জনকালয়ে ফিরে সেই অদ্ভুত অস্ত্রটির সংবাদ নেওয়া যাক।

হ্যাঁ! হরধনু এসে গেছে। আনা হয়েছে একটি আট চাকার গাড়িতে চাপিয়ে। শকটের ওপর একটি "লৌহনির্মিত মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপিত ছিল" সেই পুরাবস্তুটি। এ জিনিস জনক পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সেই বৃত্তান্ত শোনালেন জনক। বললেন, ধনুর মালিক ছিলেন 'দক্ষযজ্ঞ' সমকালীন মহাসু মহেশ্বর শিব পশুপতি।

দক্ষযজ্ঞে আর্য দেবতারা শিব সেনার কাছে পরাজিত হন। সেই মহাসমরে শিব ঐ ধনুহস্তে নিজেও অবতীর্ণ হন। প্রাণভয়ে কাতর পরাজিত দেবতারা পালিয়ে গিয়ে দেবমন্ত্রীর আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। বুদ্ধিমান ব্রহ্মা দেবতাদের রক্ষাকল্পে শিবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে শিবের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। শিব তদবধি দেবতাদের দেবতা 'মহাদেব' এবং ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর রূপে আর্য দেবায়তনে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই স্বীকৃতি পেয়ে প্রসন্ন মহাদেব ধনুটি দেবতাদের উপহার দিয়ে সন্ধি করলেন। দেবতারা ধনুটি জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে ন্যাসস্বরূপ গচ্ছিত রাখেন। [দক্ষযজ্ঞের সন্ধি সাক্ষরের ঘটনা অবশ্য জনক বলেন নি। এই চমকপ্রদ ব্যাপারটি দক্ষযজ্ঞের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে উদ্ধার করেছি। উপযুক্ত অবসরে তার বিস্তারিত আলোচনাও করেছি। জনকের কাছে জানা গেল, হরধনুটি দেবরাতের মাধ্যমে কেমন ভাবে জনকবংশে হস্তান্তরিত হয়েছিল তারই গল্প]

প্রসঙ্গত আমরা জানলাম, দক্ষযজ্ঞ ঘটেছিল রামায়ণ মহাভারতের পূর্বকালে। অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতের আমলে অনার্য দেবতা শিব পশুপতি সন্ধি সূত্রে আর্য দেবায়তনভুক্ত ছিলেন। তবে যিনি দক্ষযজ্ঞ সমকালীন শিব পশুপতি, তিনি নিশ্চয় রাম অর্জুনের আমলে গত হয়েছেন এবং তাঁর গদিতে বসেছেন নোতুন মহাত্মা শিব উপাধি ধারণ করে, যেমন ভাবে বসেন দালাই লামা, পোপ, শঙ্করাচার্য, সাঁইবাবারা।

যাইহোক, হরধনু-ভার-বহনকারী শকটটিকে নাকি টেনে আনা হয়েছিল জগন্নাথের রথের মতো মানুষের প্রচেষ্টায়। আট চাকার শকটটিকে "অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ আকর্ষণপূর্বক আনিতে লাগিল।"

রামায়ণ কথায় অতিশয়োক্তি অনেকরই আছে। এখানে তা পর্বতপ্রমাণ হয়েছে দেখা যায়। জনক রাজা যদি সযত্নে কোনো লৌহ পেটিকায় তাঁর পূর্বপুরুষ-রক্ষিত একটি ঐতিহাসিক পুরাবস্তু রক্ষা করেই থাকেন এবং সসম্মানে সেটিকে কোনো অষ্টচক্রযানে চাপিয়ে মহাসমারোহে আনয়ন করেন তবে তাতে আপত্তির কিছুই দেখি না। আপত্তি ওঠে এই ভেবে যে, সে বস্তু এমনই ওজনে ভারি যে তাকে টেনে আনতে পাঁচহাজার লোককে হাত লাগাতে হয়। যদি সেটাই সত্যি হতো, তবে মিথ্যা হয়ে যায় রামের পক্ষে অবলীলাক্রমে ঐ ধনু তুলে ধরে তাতে 'জ্য' সংযোগ করার গল্পটি। কেন না, বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র নরচন্দ্রিমা মাত্র। তিনি মনুষ্যপুত্র, ক্ষত্রিয় রাজা। পণ্ডিতরা তাঁর শ্বশুর জনক রাজাকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপেই গণ্য করেন; সুতরাং তাঁর পক্ষে ঐ গুরুভার ধনুটি তোলা মোটেই বাস্তবসম্মত ব্যাপার হতে

পারে না। এইখানে পুরাণকারের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। দেবমাহাত্ম্য সৃজনের লোভে তিনি ধনুর ওজন অবিশ্বাস্য রকম বাড়িয়ে দিয়েছেন। রামচন্দ্র যে মস্তবড় মাপের পালোয়ান ছিলেন, সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণে তারও কোনো পরিচয় নেই। বরং তাঁকে দুর্বলচিত্ত অল্পে বিচলিত, সমরে শঙ্কিত রাজপুরুষ বলেই বাল্মীকি চিত্রিত করেছেন। সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডে তিনিই লড়েছেন সবচেয়ে কম আর বাণী দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কেঁদেছেন যখন তখন, হতাশ হয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে। তাঁকে সামলাতে বরং লক্ষ্মণ সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমানদের হিমসিম খেতে হয়েছিল। পাশে থেকে প্রতিমুহূর্তে তাঁরা তাঁকে অভয় আর সান্ত্বনা দিয়েছেন। এমন এক যুবাপুরুষ যে ধনুটি তুলেছিলেন, মনে হয় না তার ওজন ছিল অবিশ্বাস্য রকমের বেশি।

রামচন্দ্রের দ্বারা কয়েক টন ওজনের ভারোত্তলন সম্ভব ছিল না। অমন অসম্ভব কাজ স্বয়ং পশুপতি শিব করেছিলেন বলেও বিশ্বাস করা কঠিন। লৌহ পেটিকার ডালা খুলে যে ধনুটি অবলীলাক্রমে রামচন্দ্র বার করলেন, দেখা গেল, সেটি ছিল এমনই পলকা যে তাতে জ্যা সংযোগ করার চেষ্টামাত্র সেটি দুমড়ে ভেঙে গেলো। সেটাই বাস্তবিক সম্ভব। অতকালের একটি ধনু, কালপ্রবাহে তার ক্ষয়ও ছিল অনিবার্য। পুরোনো সেই ধনুটিতে শক্তি প্রয়োগ করলে সেটি মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়তেই পারে।

কিন্তু রামের হাতে মরচে ধরা বা ঘুনধরা একটি ধনু ভেঙে গেল একথা লেখার সাহস সে যুগে কোন্ কবি রাখতেন? কবিকে একটি গল্প সাজিয়ে তৎক্ষণাৎ রামাবতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হয়েছে। ব্রহ্মার তো তেমনিই আদেশ ছিল, বলেছিলেন, যা শুনেছ তা তো লিখবেই, যা অশ্রুত কিন্তু তোমাকে জানানো হবে সে কথাও লিখবে নির্বিচারে। নির্বিচারে লেখাই ক্ষমতাধীশদের নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য। বিভিন্ন রাজা নিজের আমলের পুরাণ বা পুরাবৃত্ত বিভিন্ন যুগে এভাবেই লিখিয়ে রেখে গেছেন। রাজাদেশে রাজপুরোহিত এবং রাজপূজ্য দেবতাকেই বসানো হয়েছে সর্বোচ্চ আসনে। অলীক কুকাব্য লিখে তাঁদেরই পরমেশ্বর বানানো হয়েছে। অন্যান্য দেবতার মহিমা খর্বিত হয়েছে। এভাবেই বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন দেবতার পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সুতরাং পুরাণকার ইচ্ছে করলেই পরমেশ্বরের আসনে বসিয়ে দিতে পারেন রাজমনোনীত যে কোন ছোট বড় মানুষকে। রাম একটি পুরাতন ধনুর্ভঙ্গ করলেন। এই ঘটনার তিলরূপকে তাল প্রমাণ করা তাই এমন কি আর একটা ব্যাপার। লিখলেই হলো ধনুর্ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এক "ঘোরতর শব্দ হইল" এবং সেই শব্দে সাধারণ মানুষ "হতচেতন হইয়া

ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।"

যদি মানাও যায় ইতর সাধারণ সত্যিই ভয়ঙ্কর কোনো শব্দ শুনে হতচেতন হয়েছিলেন, তবে বুঝতে হবে রামমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দেবদ্বিজরা বিশেষ কোনো কারসাজি করেছিলেন, কেন না রাম লক্ষ্মণকে মিথিলায় নিয়ে আসা থেকে তাঁদের বিবাহ পর্যন্ত সব ঘটনাই দেখা যাচ্ছে দেবতাদের সাজানো ছকে তৈরী। কোনো শব্দ হয়ে থাকলে, বিশ্বামিত্র, জনক রাজা, রাম, লক্ষ্মণ এবং ব্রাহ্মণ প্রধানরা তাতে অভিভূত হন নি। মূর্খ কিছু ইতরজন ও দানলোভী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণরা সেই শব্দে মূর্ছা গেছেন। বোঝা যাচ্ছে, শব্দটি রাজপুরুষদের কাছে পরিচিত ছিল। তাঁরা হয়ত জানতেন, এমন শব্দ হবে ; অথবা পরিচিত ছিলেন এ ধরণের শব্দের সঙ্গে ; তাই অবিচলিতও ছিলেন। যাঁরা জানতেন না, শব্দের আচমকা বিস্ফোরণে তাঁরাই জ্ঞান হারিয়েছেন।

কিন্তু শব্দ কোত্থেকে উৎপন্ন হলো ? অগ্নির নেপথ্যে রোবট ও রথারূঢ় দেবপুত্র দেবকন্যার আবির্ভাবের মতোই এটাও কি ম্যাজিক ? অসম্ভবই বা কি কেউ যদি যথাসময়ে ঘটনাস্থলের সন্নিকটে পর্দার আড়ালে কোনো শক্তিশালী বোমা ফাটিয়ে থাকেন ? সেকালে হরদম বিস্ফোরক ব্যবহার করেছেন দেবতারা। পটকা ফাটিয়েছেন, টিয়ার গ্যাস সেল ফাটিয়েছেন। অথর্ববেদে (১১।১০।৭) ধূমাক্ষী নামে একটি বিস্ফোরকের উল্লেখ আছে। বোমার মতো এটি ফেটে গেলে তার ধোঁয়ায় শত্রুপক্ষীয়দের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হতো।[১] বাইবেলেও আছে এই ধরণের টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের বর্ণনা। দেবদূতেরা ঐ অস্ত্র ব্যবহার করে মানব আক্রমণকারীদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। ঘরের বাইরে আক্রমণকারীদের দিকে কাঁদুনে বোমা ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের কবাট তাঁরা বন্ধ করে দেন। ওদিকে পথের ওপর জনতার মাঝে পড়ে বোমাটি ফেটে গেলে চোখে অন্ধকার দেখে আক্রমণকারীরা। চোখ চেপে পথের ওপর বসে পড়তে হয় তাদের। ইত্যবসরে খিড়কিদোর দিয়ে পালিয়ে যান দেবদূত দুজন।[২] এসব ঘটনা সেকালে আকছার ঘটেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণে তা লিপিবদ্ধও আছে। ব্যাখ্যার অভাবে তৎকালের বিজ্ঞান মান্য হয়ে এসেছে দেবদ্বিজের অলৌকিক কীর্তি কাহিনী হিসেবে, যার ওপর আমাদের অবস্থা বড় শোচনীয় ভাবেই কম।

১। স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা, রাজ্যেশ্বর মিত্র / জিজ্ঞাসা।

২। লেখকের 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থ দ্রঃ।

আমি তো জোর দিয়েই বলতে পারি, রামচন্দ্র কোনো অলৌকিক কাজ করেন নি পুরোনো একটা ধনু ভেঙে। এ তো সামান্য ব্যাপার। অমন যে ব্রজগোপাল বাসুদেব কৃষ্ণ যিনি কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন বলে প্রবাদে, প্রচারে, যাত্রার আসরে এবং কথকতার আখড়ায় ধন্য ধন্য রব, সেটিও যে একটি ডাহা মিথ্যে কথা, তারও প্রমাণ পেয়ে গেলাম 'হরিবংশে'র কয়েকখানা পাতা উল্টেই। 'হরিবংশ' মহাগ্রন্থটি বাসুদেব কৃষ্ণের রাজনৈতিক উন্মেষকালীন ঘটনাবলীর মুনি-রচিত ইতিবৃত্ত। যা নেই মহাভারতে সেই অভাব আরও লক্ষ শ্লোক রচনা করে পুরাণকাররা 'হরিবংশ'কে মহাভারতের 'ডিউ পার্ট' রূপে ভক্তজনমধ্যে প্রচার করেছিলেন। এমন একটি প্রাচীন পুরাণে (খাঁটি সংস্কৃত শ্লোকে) গোবর্ধন ধারণের আনুপূর্বিক ঘটনাবলী বিবৃত আছে। সেখানে কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে, বাসুদেব তাঁর কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেন নি। কৃষ্ণ সহযোগী দেবতারা বিস্ফোরকের সাহায্যে গোবর্ধন পর্বতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি মস্ত গুহামুখ সৃষ্টি করেন। রাতের আঁধারে সেই গুহার ঝুলন্ত কিনারে হাতের তালু রেখে নন্দদুলাল গোপবালক কৃষ্ণ বঙ্কিম বিভঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। চারিদিকে তখনও পাহাড় ফেটে প্রস্তর বৃষ্টি হচ্ছিল। এই গোলমালের মধ্যে রটনা হয়ে গেল, কিশোর কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্খ গোয়ালাকুল পর্বত বিস্ফোরণের ঘটনা কখনো স্বচক্ষে দেখে নি। তারা কৃষ্ণের সেই রূপ দেখে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধীশ্বর হিসেবে মেনে নিলো। এ সমস্তই মহা পবিত্র কথা। এর অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি না জানা থাকলেই গোয়ালাদের মতো শ্রদ্ধা বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে তাকে ধর্মকথা বলে মেনে নিতে হয়। বিচার করলে মানুষের অজ্ঞতা ও মূর্খামি নিয়ে তৎকালীন দেবতারা কেমন ভাবে মানুষকে পরমেশ্বর বানিয়ে গেছেন, সেই সাধারণ ম্যাজিকটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। সাধারণ পাঠকের সংগ্রহে হরিবংশের মূল পাঠ সুলভ নয়। আমি তাই গোবর্ধন বিস্ফোরণ সম্পর্কিত প্রতিটি শ্লোক উদ্ধার করে পৌরাণিক সঠিক ইতিবৃত্তের পাঠ আলোচনা করেছি আমার 'যদুবংশ / ব্রজপর্ব' নামক বইটিতে [প্রকাশক / নাথ পাবলিশিং]।

তাই বলছিলাম, গোবর্ধন ধারণের মতো আরও শত গল্প এবং 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবিরে'র কাণ্ডকারখানার সঙ্গে পরিচিত হলে হরধনু ভঙ্গের গল্পটিকে একটি অত্যন্ত দুর্বল শ্রেণীর পৌরাণিক কষ্টকল্পনা বলেই মনে হবে।

হরধনু ভঙ্গের ঘটনাটি যে সাজানো, তার আরও প্রমাণ এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে। একে একে তারই সঙ্গে এবার পরিচয় করে নেওয়া যাক।

বিশ্বামিত্র তাড়কা বধ করে সোজা রামলক্ষ্মণের হাত ধরে মিথিলায় চলে এলেন। এসেই জনক রাজাকে নির্দেশ দিলেন হরধনু আনতে। হরধনু ভঙ্গ হল। বিয়ে হয়ে গেল রাম ভ্রাতাদের। অথচ সবই ঘটল বিশ্বামিত্রের প্রভুত্বে। দশরথের কাছে তাঁর এই উদ্দেশ্য তো তিনি ব্যাখ্যা করে আসেন নি। রাজপুত্রের বিবাহ বলে কথা। রাজারাজড়াদের নিমন্ত্রণ হল না। পিতা দশরথের এই বিবাহে সম্মতি আছে কি নেই তা জানার দরকার বোধ করলেন না কেউ। ছেলে দুটিকে নিয়ে গিয়ে একেবারে তিনি ছাদনাতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন! এ কী রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ? এই অসম্ভব কর্ম সম্পর্কে তাই কৌতূহলী না হয়ে থাকা যায় না।

দেখলাম, হরধনুর কথা বিশ্বামিত্র আগেই জানতেন এবং জনক জানতেন বিশ্বামিত্র আসছেন। তিনি দশরথপুত্র সহ বিশ্বামিত্রের আগমনে তাই বিস্মিত হন নি। নদী পার করে যে ব্রাহ্মণ দল বিশ্বামিত্রকে মিথিলায় নিয়ে আসেন, তাঁদের জনকই পাঠিয়েছিলেন। দেখা গেল, জনক প্রস্তুত। প্রশ্ন এই, এইসব যোগাযোগ কার নির্দেশে ঘটেছিল। কে ছিলেন নেপথ্যের সেই সর্বাধিনায়ক, যাঁর অমোঘ আদেশে দশরথকে মেনে নিতে হয়েছিল ঐ চুপিচুপি বিবাহ-বাসরটি? ঠিক এখনই এ প্রশ্নের জবাব আমাদের হাতের কাছে নেই। কাহিনীসূত্রে পরে জানা যাবে, আদেশ এসেছিল দেবশিবির থেকে। দেবানুগত রাজা দশরথ ও জনক তাই সে আদেশ গ্রহণ করেছিলেন মাথা নত করে বিনা প্রতিবাদে। ধার্মিকরা প্রতিবাদ শব্দটি জানেন না। প্রতিবাদীর নাম, অসুর, রাক্ষস, পাপিষ্ঠ। প্রতিবাদের পুরস্কার সবংশে নিধন। পাঞ্চালপতি দ্রুপদ দেবপদে আত্মসমর্পণ করেও পাঁচ পতির সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। অবশ্য পরিশেষে মেনেও নিয়েছিলেন তর্কাতর্কির পর। দেবতারা তাঁর এটুকু ঔদ্ধত্যও ক্ষমা করেন নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদী পাঞ্চালদের সবংশে শেষ হয়ে যেতে দেন, রক্ষা করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুন্তী ও পাণ্ডবরা যখন বুঝলেন, স্বজন হত্যা করে তাঁরা শুধুমাত্র নামেমাত্র রাজত্ব পেয়েছেন, আসলে পাণ্ডবদের নিরস্ত্র করে, এবং যুধিষ্ঠিরকে শিখণ্ডী খাড়া করে দেবতা ও ব্রাহ্মণরাই অধিকার করেছেন আর্যাবর্তের শাসনযন্ত্র, তখন তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং মানসিক গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে দেবব্রাহ্মণদের ত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফল হয়েছিল মারাত্মক। দেবতারা ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সঙ্গে হৃষিকেশের সপ্তর্ষি অঞ্চলে একটি পর্ণকুটীরে কুন্তীকেও বন্দিনী করে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। আর পঞ্চপাণ্ডবদের ওপর হুকুম হয়েছিল রাজত্ব ত্যাগ করে বানপ্রস্থে

যাওয়ার জন্য। পথে নিহত হন চার পাণ্ডব। দেবনেতারা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে যান নিরুদ্দেশের পথে, যাকে বলা হয়, মহাপ্রস্থান।[৩] দেবাদেশ অমান্যের ফলাফল যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে জানতেন তা জনক ও দশরথ। অতএব দশরথ পুত্রদের বিবাহে কোনো বড রকম উৎসব হয় নি আর তা মেনে নিতে হয়েছিল দুই রাজাকেই।

জনক হরধনু লাভের কাহিনী ব'লে আরও জানিয়েছিলেন যে, একদিন হলকর্ষণের সময় অযোনিসম্ভবা সীতাকে লাভ করার পর তিনি পণ করেন, যে বীর হরধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারবেন তাঁর হাতেই সীতা-সম্প্রদান করবেন। জনক আরও বলেছেন, তাঁর সেই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অনেকানেক রাজা এসে হরধনুটি নাড়াচাড়া ক'রে গেছেন কিন্তু অদ্যাবধি কেউই সক্ষম হন নি এই কাজে। বীর্যশুল্কা সীতাকে তাই কারো হাতে সম্প্রদান করার সুযোগও হয় নি তাঁর। মজার ব্যাপার এই, জনক গল্পটি মুখস্থ বলেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ অনেকানেক রাজার একটিরও নাম উচ্চারণ করেন নি। রামায়ণেও কোথাও প্রমাণ নেই যে, বিশ্বামিত্র এবং দশরথ-পরিবার ছাড়া ভূ-ভারতে আর কেউ জনকের এমন এক প্রতিজ্ঞার সংবাদ রাখতেন। তাই এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে রামের আগে কেউ এসে জনকালয়ে হরধনুর ওপর শক্তি পরীক্ষা করে গেছেন।

জনকের একটি মাত্র কথায় কিছু অর্ধ সত্য আছে। জনক বলেছেন, বিফল মনোরথ সেই রাজন্যবর্গ হতাশ হয়ে মিথিলা আক্রমণ করেন এবং সে যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়। অবশেষে দেবতাদের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে জনক আক্রমণকারী রাজাদের বিতাড়িত করেন। এ গল্পের কতকাংশ ঘটনা বটে, তবে সীতা লাভে বঞ্চিত রাজারাই যে মিথিলা আক্রমণ করেছিলেন তেমন সংবাদ রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করতে পারি নে। তাই বলছি, জনকের এ গল্পের কতকাংশ তৈরী উপন্যাস, কিছুটা ঘটনা।

ঘটনার বিবরণ পাই বিবাহ বাসরে জনকভ্রাতা কুশধ্বজের আগমন ঘটলে। জনক তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, কুশধ্বজ তাঁর ছোট ভাই। জনক তাঁকে সাংকাশ্যা -নগরীর প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। সাংকাশ্যা নগরীটি রীতিমত লড়াই করে পাওয়া। পিতা হর্ষরমণের[৪] মৃত্যুর পর জনক যখন সুখে রাজত্ব করছেন তখন সাংকাশ্যার

৩। লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ নাথ পাবলিশিং

৪। হর্ষরমণ ছিলেন জনক বংশে উনবিংশ পুরুষ।

অধিপতি রাজা সুধন্বা জনকের কাছে হরধনু এবং জানকী বা সীতাকে দাবি করেন। জনক সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে সুধন্বার দূতকে ফিরিয়ে দিলে সুধন্বা মিথিলা আক্রমণ করেন। কিন্তু সুধন্বা পরাজিত ও নিহত হন। জনক সাংকাশ্য অধিকার করে সেখানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কুশধ্বজকে।

ঘটনা তো এইটুকু। এক রাজা জনকের পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করতে এবং পালিত কন্যা সীতার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে বিফল মনোরথ হয়ে মিথিলা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। এই ঘটনার সঙ্গে সীতার বীর্যশুল্কা হওয়া, হরধনু ভঙ্গকারীর হাতেই সীতা-সম্প্রদান করবেন বলে জনকের পণ ইত্যাদি গল্পের সম্পর্ক কি? সুধন্বার মিথিলা আক্রমণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনা। জনক শুধু শুধু গল্প বানাতে গেলেন কেন, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ছকে? এর কারণ কি রামের সঙ্গে গোপনে বিবাহ দেওয়ার অরাজকীয় ঘটনাটির ব্যাপারে একটা জুৎসই সাফাই তৈরী করা? দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের বন্দোবস্ত যেমন দেবতারা করেছিলেন নেপথ্যে বসে, রামের সঙ্গে সীতার পরিণয়ও হলো একই ভাবে। তফাত এই, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ভারতের তাবৎ রাজন্যবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন; রামচন্দ্রের বিবাহ হলো গোপনে চুপিসাড়ে এবং খুবই তড়িঘড়ি করে। কিন্তু এত তাড়ারই বা কি ছিল?

তাড়া একটু ছিল। কেননা মিথিলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা। এই বনবাস যাত্রাটিও হয়েছিল দেবাদেশে। সুতরাং ঘটনাবলীপরম্পরা ক্রমেই সাজানো।

সীতাকে বীর্যশুল্কা করা হয়েছিল, এই গল্প বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ররাও জানতেন না। এ বিষয়ে তাঁরা কিছুই বলেন নি। আশ্চর্যের কথা, দশরথেরও এ খবর জানা ছিল না। কিন্তু কোনো ভারতীয় রাজা তাঁর কন্যাকে বিশেষ শর্তে সম্প্রদান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে সে সংবাদ সমস্ত রাজারাজড়ার কাছে দূত মারফত জানিয়ে দেওয়াই নিয়ম। নিকটবর্তী রাজ্যের বিখ্যাত এবং দেবানুগত রাজা দশরথ। তিনিও যখন জনকের এমন কোনো প্রতিজ্ঞার কথা শোনেন নি তখন পরিষ্কার বোঝা যায়, উপন্যাসটি 'দেবজন-রচিত' এবং জনক তারই কথকতা করেছেন।

রামচন্দ্র হরধনু ভাঙলেন বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায়। সীতা রামের স্ত্রী রূপে দেব-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বনবাসে রামের অনুগামিনী হবেন, দেবতারা এমনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্যই সীতাকে তাঁরা জনকালয়ে পাঠিয়েছিলেন হিমালয় থেকে। এ সব গূঢ়তত্ত্ব পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রমাণিত। এখানে দেখছি, সে সব ঘটনার

উল্লেখ না করে হঠাৎ চমকের সঙ্গে বিবাহের আদেশ উচ্চারিত হয়েছে। জনক, বিশ্বামিত্র এবং পুরোহিত শতানন্দের আদেশ জানিয়ে বিবাহ বাসরে আমন্ত্রণ করেছেন পাত্রের পিতা দশরথকে। বার্তাবহ তিনরাত্রি অবিশ্রান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে অযোধ্যায় এসে দশরথকে চমকিত করে সংবাদ দিলেন,—

…বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ॥ ১১/৬৮/বাল

এতোবড় অবমাননা, এমন পরাধীনতা সহ্য করেও দশরথকে ভরত শত্রুঘ্ন সহ মিথিলা যাত্রা করতে হ'ল। অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি বিশ্বামিত্রের সেই আহ্বান। ছেলের বিবাহে তাঁর নিজের কোনো কর্তৃত্বই স্বীকৃতি পেলো না। দশরথের সহযাত্রী হলেন বশিষ্ঠ, বামদেব, কাশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন, জাবালি প্রমুখ ব্রাহ্মণ নেতারা। সম্ভবত দেবাদেশ সম্পর্কে তাঁদের কাছে সংবাদ ছিল এবং তাঁরাই দশরথকে ধরে নিয়ে গেলেন মিথিলায়।

কী চমৎকার ছকে সাজানো ঘটনাবলী! কী নিষ্ঠুর, কী অমোঘ দেবতাদের আদেশ। আর কী অসহায় অযোধ্যাপতি দশরথ! মিথিলায় রাম-সীতার একটি পারিবারিক বিবাহ আসরে মন্ত্রধ্বনির মাঝে সেসব প্রশ্ন হারিয়ে গেলো। পাঠক বিবাহের উৎসবটি দেখলেন। দশরথ-পরিবারের মানসিক অবস্থা তাঁদের মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করলো না।

সীতা-দ্রৌপদী-লক্ষ্মী-বেদবতী কথা

দ্রৌপদীর মতো সীতা বীর্যশুল্কা ছিলেন না। তবু এমনই একটি গল্প বানিয়ে বলতে হয়েছিল জনক রাজাকে। উদ্দেশ্য, রামসীতার গোপন বিবাহপর্বটিকে যুক্তিসম্মত করা। রাজপুত্র রাজকন্যাদের বিবাহ হচ্ছে কেবলমাত্র দেবজন প্রেরিত বিশ্বামিত্রের আদেশে, যে বিবাহে ভারতের রাজন্যবর্গের কেউই নিমন্ত্রিত হন নি, এমন কি স্বয়ং দশরথও যে বিবাহ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, সেই প্রথাবিরুদ্ধ ঘটনাটির সমুচিত একটি ব্যাখ্যা বস্তুতই জরুরী ছিল। তাই হরধনু ভঙ্গের বৃত্তান্ত। রাম ধনুর্ভঙ্গ করলে জানকীকে তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতে সম্প্রদান করতে হয়েছে এবং ব্যাপারটি তাই ঘটে গেছে তড়িঘড়ি, কোনো প্রাক্ আয়োজন সম্ভব হয় নি, —গল্পটি রাষ্ট্র হয়ে গেলে দশরথ ও অন্যান্য রাজাদের অগোচরে সম্প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনক

বাধ্য ছিলেন, লোকে এ যুক্তি মানলেও মানতে পারে। তাই গল্প। তবে গল্পটি যে জনকের মাথায় খেলে নি, এটাও অনুমেয়। তবে কি এই গল্পও ব্রহ্মলোকে তৈরী? গল্পের স্রষ্টা কি স্বয়ং ব্রহ্মা, যাঁর নেপথ্য নির্দেশে সীতা সহ রামচন্দ্রকে যেতে হবে বনবাসে অথবা প্রকৃতপক্ষে আর্য সম্প্রসারণবাদীদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য অভিযানে? সব প্রশ্নের উত্তর ঘটনার ধারায় সঠিক মিলে যাবে। তবে এখানে বুঝি, বীর্যশুল্কা সীতার কাহিনীটি দশরথের কাছে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। তবে ঘটনাবলীর আকস্মিক গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে এবং সেই ঘটনাবর্তে বিশ্বামিত্র তথা দেবতাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে দেখে তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিকের মতো জনকালয়ে নীরব দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। বুঝেছিলেন, যা ঘটছে, সেই মুহূর্তে তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। দেবাদেশ জনক রাজার মতো তাঁকেও পালন করতেই হবে। বুঝেছিলেন, ধনুর্ভঙ্গকারীকেই কন্যা সম্প্রদান করবেন, জনকের এমন ধনুর্ভাঙা পণ বস্তুতই থেকে থাকলে তিনি স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতেন তৎকালীন রাজরীতি অনুসারে। মিথিলায় জনক কিন্তু সেসব আয়োজন করেন নি। তিনি আগেই জানতেন, বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে আসছেন দেবজন প্রেরিত সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ দেওয়ারই উদ্দেশ্যে। সংবাদ জানা ছিল বলেই রাজ্যের সীমান্তদ্বারে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের পাঠিয়েছিলেন। দেবতাদের এইসব চক্রান্তকারী খেলার সঙ্গে যেহেতু দশরথেরও পরিচয় ছিল, তিনি তাই বুঝেছিলেন, নেপথ্যের চক্রান্ত সুদূরপ্রসারী। চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে অযোধ্যা ও রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে। সুতরাং কিছু একটা দশরথকেও করতেই হবে। কিন্তু কী করবেন দশরথ? তিনি যে এখন দেবচক্রান্তের অধীন দ্রুপদ রাজার মতোই অসহায়।

দ্রুপদের সম্মতির তোয়াক্কা না রেখেই দেবতা শঙ্করের আদেশে দ্রৌপদীকে বরণ করতে হয়েছিল পঞ্চপতি। দ্রুপদের আপত্তি টেকে নি। চোখ রাঙিয়ে দেবতারা তাঁকে স্তব্ধ করে দেন। বিধিবহির্ভূত পঞ্চপতিবরণ অবশ্য বস্তুত ঘটে নি। বিধিমত কেবলমাত্র দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরেরই বিবাহ হয়। বাকি চার ভায়ের ক্ষেত্রে কোনো শাস্ত্রীয় বিবাহানুষ্ঠান হয় নি। পুরোহিত যুধিষ্ঠিরের বিবাহ দিয়েই স্থান ত্যাগ করেন। বাকি চারজনের বেলায় একটি পুরোহিতহীন অনুষ্ঠান হয়েছিল যার কোনো সামাজিক মূল্য ছিল না। অর্থাৎ দ্রৌপদীকে মেনে নিতে হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে চার উপপতিকে। সে হিসেবে সীতার ভাগ্য ভালো। তাঁর ওপর কোনো উপপতি চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, কোনো সাজানো স্বয়ম্বর সভাও বসানো হয় নি।

পুরাণ মহাকাব্য পাঠে জানা যায় সীতা, দ্রৌপদীর জীবনে বেশ কিছু সমধর্মী ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত সে কারণেই দ্রৌপদীর মতো সীতার ক্ষেত্রেও বীর্যশুল্কা হওয়ার কাহিনীটি রামায়ণে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মনে হয়, বুদ্ধিমান ব্রহ্মা স্বয়ং গল্পটি সাজিয়ে সেটি সাধারণ্যে প্রচার করার জন্য আদেশ করেন জনক রাজাকে। এসব বুঝে দশরথ অসহায় ও বিমর্ষ বোধ করেছেন। অযোধ্যায় ফিরে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তিনি প্রতি রাত্রে।

সীতা দ্রৌপদীর জীবনের সমধর্মী ঘটনাগুলির মধ্যে কয়েকটি ঘটনা এখানে আলোচনা প্রয়োজন, যেমন :

দ্রৌপদীকে অযাচিত ভাবে দ্রুপদ লাভ করেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞে। আগেই বলেছি, দ্রৌপদীকে তাঁর ওপর দেবতারা জোর করেই চাপিয়ে দেন। সীতাকেও মিথিলাপতি জনকের হাতে জবরদস্তি জিম্মা করে দেওয়া হয়। জনকের আপন সন্তান ছিল। সন্তান লাভের জন্য তিনি কোনো যজ্ঞও করেন নি, কিন্তু ব্রহ্মার পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজনে তাঁকে গ্রহণ করতে হয় সীতার দায়িত্বভার। তবে দ্রৌপদীলাভ হয়েছিল বহুজনের সম্মুখে, সীতা লাভের সময় জনকের আশপাশে কোনো সাক্ষীসাবুদ রাখা হয় নি। এই ব্যতিক্রমেরও রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল।

জনক সীতাকে কুড়িয়ে পেলেন ক্ষেত চষতে গিয়ে। লাঙলের ফলায় মাটির সঙ্গে উঠে এলো সেই দেবকন্যা। বয়ঃপ্রাপ্ত হল জনকালয়ে। জনক বলছেন,

> অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রংলাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
> ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা॥
> ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।
> বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা॥ ১৪ ৬৬ বালকাণ্ড

কন্যা হলাগ্রভাগে উত্থিতা বলেই তার নাম রাখলেন, সীতা। এই অযোনিজা কন্যাকে এখন তিনি বীর্যশুল্কা করেছেন।

বেশ গল্প। ক্ষেত থেকে একটি শিশুকন্যা কুড়িয়ে পেলে ব্যাপারটিকে কেউ অবাস্তব ঘটনা বলবেন না। আধুনিক কালে কত গোপন মায়ে সন্তানকে ডাস্টবিনে ফেলে যান। তবে সে কালে এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে। একমাত্র কুন্তীই তাঁর কানীনপুত্র কর্ণকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নদীতে। কিন্তু পৌরাণিক আমলে পরপুরুষের ঔরসে সন্তানলাভ কোনো লোকলজ্জার ব্যাপারই ছিল না। পৌরাণিক বহু বিশিষ্ট চরিত্রই ছিলেন জারজ সন্তান।

তবু তর্কের খাতিরে সীতাও তার জন্মদাত্রী কর্তৃক পরিত্যক্তা, এমন একটি গল্পও

মেনে নিতে রাজি ছিলাম। জনক রাজার একটি উক্তি আমাদের সেই সহজ স্বীকৃতি-টুকুতে উপনীত হওয়ার পক্ষে কিন্তু মস্ত এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দিলো। জনক বললেন, মেয়েটি অযোনিজা অর্থাৎ সে মাতৃগর্ভ থেকে জাত নয়। শুরু হলো বাস্তব কথায় অবাস্তব গল্প চাপানোর এক নম্বর প্রয়াস। দু নম্বর অবাস্তব কথা, সীতা উঠলেন হলাগ্রভাগে।

জনক রাজা ঐতিহাসিক পুরুষ। দেবতাদের পাল্লায় পড়ে নির্লজ্জরকমের অনর্গল মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। যেমন, প্রথমত, হলাগ্রভাগে অর্থাৎ লাঙ্গলের খোঁচায় যতটুকু মাটি ওলটপালট হতে পারে সেই উত্থিত মাটির চাবড়ায় একটি শিশুর আবির্ভাব বাস্তবে সম্ভব নয়। মাটির সঙ্গে কেঁচো কেন্নো সাপ শামুক উঠতে পারে, জন্তু বা মানুষের ছানা অতটুকু মাটির ডেলায় চাপাপড়া থাকে না। তাছাড়া কবর খুঁড়ে এক দেবশিশুর আবির্ভাব ঘটলে শিশুটিকে জ্যান্ত পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। মরণশীল দেবতার সন্তান শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মাটির নিচে মরে থাকতো। কিন্তু জনক একটি মিথ্যা গল্প সাজিয়ে বললেন, হাল চষে তিনি নাকি একটি মৃত্তিকা-কুম্ভ পেয়ে ছিলেন। সেটি ফাটিয়ে দেখেন, দিব্বি একটি ফুটফুটে মেয়ে চোখ পিট-পিট করে তাকিয়ে আছে।

জনক পৌরাণিক যুগের রাজা। যা বলেন, তাই মানতে হয়। না হলেই প্রজারা পায় কঠোর সাজা। রাজা আরও বললেন, কন্যা 'অযোনিজা'। অর্থাৎ সে যোনিজাত নয়। প্রজারা মানলো। কিন্তু আমরা মানতে পারলাম না তাঁর এই সৃষ্টিছাড়া গল্প। জনক তো মেয়ে কুড়িয়ে পেলেন। কিন্তু কে তাঁকে বলল, মেয়েটি অযোনিজা? তবে কি হালচষার কথা মিথ্যে? কেউ কি তাঁকে কন্যা দান করে বলে গেলেন, জনক! দেবতার আদেশ, যেমন বলা হল, তেমনি একটা গল্প গেয়ে বেড়াও আর মেয়েটাকে সামলেসুমলে রাখো যতদিন না ব্রহ্মা তাঁর একটা বর জুটিয়ে দেন। ব্রহ্মা যে রকম করিতকর্মা পুরুষ, তাঁর পক্ষে এই রকম একটা গল্প তৈরী করে দেবদাস জনককে দিয়ে তা প্রচার করানো নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। মনে হয়, সেটাই ছিল আসল ঘটনা।

জনকের গল্প যে ডাহা মিথ্যে তার অপর প্রমাণ, জনক বলেছেন, তিনি নিজে মাঠে নেমে লাঙ্গল দিচ্ছিলেন ক্ষেতে। জনকের রাজপ্রাসাদটি তো চাষার ঘর নয়। রীতিমত প্রাসাদ। তাঁর আজ্ঞাবহ দাসদাসী সেনাসামন্তও কম ছিল না। তাহলে একা একা তিনি মাঠে লাঙ্গল কাঁধে জমি চষতে যেতেন এই কথাটা বিশ্বাস করি কী করে? কোনো উৎসব উপলক্ষে রাজার পক্ষে প্রতীকী ভাবে হালচাষ করা অবশ্য অসম্ভব নয়। একালের রাজা মন্ত্রী ভি. আই. পি. রা বনমহোৎসব

করেন গাছ পুঁতে। বহু গণ্যমান্য লোক সঙ্গে থাকেন। গর্ত খুঁড়েই রাখা হয়। চারাগাছটি অন্যে বহন করে নিয়ে যায়। সুন্দরী মেয়ের হাতে মূল্যবান পাত্রে মাটি থাকে। মাননীয় গর্তের কাছে বসে সেই চারা পুঁতে দেন। মাটি অন্যে ঢালেন চকচকে ঝারি থেকে (খুব হালকা ধরনের অবশ্যই)। মাননীয় সেই গর্তে কয়েক ছিরিক জল ঢেলে দেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনাও এমনি আর এক উৎসব। ভিত্ তৈরী। প্রস্তরও গাঁথা। বহনকারীর হাত থেকে মাথা সিমেণ্ট তুলে লেপে দেওয়া। তারপরই বক্তৃতা। পুরীর রাজা সোনার ঝাড়ু বুলিয়ে দিতেন জগন্নাথের রথের তলায়। সেটাই রাজার পথঝাড়ু দেওয়া। এ সব দৃশ্য অনুষ্ঠানের সময় দেখতে আসেন হাজার লোকে।

কিন্তু হতভাগ্য জনককে কোন্ দুর্বিপাকে পড়ে একাকী গামছা জড়িয়ে, কাদায় পা ডুবিয়ে জমি চষতে হয়েছিল, জানি না। রাজা সীরধ্বজ জনক বলদের লেজ মুচড়ে, পাচনি হাঁকড়ে জমি চাষ করছেন, দৃশ্যটি কল্পনা করলেই ব্রহ্মার কৌতুকপূর্ণ শ্মশ্রুকুঞ্চিত মুখখানি দেখতে পাই। বুঝি, হিমালয়ে বসে কৌতুককর অবিশ্বাস্য গল্প বানাবেন ব্রহ্মাজী, আর অধীনস্থ রাজারাজড়াদের তাই প্রচার করে হেনস্থা হতে হবে বুদ্ধিমান সমাজে।

কিন্তু এ যদি ব্রহ্মার কৌতুক, তবে সম্ভাব্য আসল ঘটনাটি কি রকম ? কে এই সীতা ? কেমন ভাবেই বা তাঁর জনকালয়ে আগমন ?

সীতার মুখেই একবার তাঁর শৈশবের গল্প শোনা গেছে। রামবনবাসের ঠিক প্রাক্কালে এ গল্প শুনিয়েছিলেন তিনি রামচন্দ্রকে। রাম যখন বিদায় নিতে এলেন জানকীর কাছে, বললেন, রাজপুরুষ ভরতের মনোরঞ্জন করে তুমি বছর চোদ্দ কাটিয়ে দাও, তখন রামের সেই কাপুরুষোচিত জঘন্য ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সীতা বলেন, রাম বিনা দোসরা কারোকে তিনি তাঁর বরতনু উপহার দিতে পারবেন না। বনপথে রামের অনুগমনই তাঁর কাম্য। রাম বললেন, জানকী ! তুমি রাজপুত্রী, পারবে কেন দীর্ঘ বনবাসের কষ্ট সহ্য করতে ? উত্তরে সীতা জানালেন, রামচন্দ্র জানেন না, দক্ষিণের বনপথে তাঁর অনুগমন করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছেন সীতা শৈশব থেকে। বনবাস যাত্রার জন্যই ছিল তাঁর দীর্ঘ সাধনা। বললেন, "শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন।" তারপর পিত্রালয়ে অবস্থানের সময়ও, "দৈবজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে বনবাস আছে।... দৈবজ্ঞরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে। সময়ও উপস্থিত। এক্ষণে

আমি কোনোমতেই ক্ষান্ত হইব না।"[১]

পুরাণের ভাষায় তপস্যা শব্দের অর্থ ঈশ্বরারাধনা নয়। তাপস-তাপসী এবং দৈবজ্ঞরা আরাধনা করতেন ব্রহ্মা এবং দেহবান দেবতাদের। দেবরাজনীতির সঙ্গে এঁদের ছিল প্রত্যক্ষ সংযোগ। এরা দেবতাদের বার্তাবহ রূপে রাজা ও ব্রাহ্মণ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। পৌরাণিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণে পৌরাণিক শব্দাবলীর নোতুন বিভিন্ন অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আমরা জেনেছি, দৈবজ্ঞ অগ্নি দেবতাটি ছিলেন দেবদূতদের শীর্ষস্থানীয় নেতা। এজন্যই সম্ভবত দেবতার উদ্দেশ্যে আয়োজিত যজ্ঞস্থল বা সভা অনুষ্ঠানে অগ্নিকে সাক্ষী রাখা হয়। তিনিই দেবলোকের সঙ্গে সর্বোচ্চ সংযোগকারী অফিসর। এসব আলোচনা গ্রন্থান্তরে সবিস্তারে প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা করেছি। এখানে এক তাপসী এবং দৈবজ্ঞ আমাদের আলোচনার বিষয় হওয়ায় তাপস-তাপসী দৈবজ্ঞদের গূঢ়ার্থ সম্পর্কে সে সব প্রসঙ্গ স্মরণে রাখতে হবে। বুঝতে হবে, এক দৈবজ্ঞ এবং এক তাপসী এসে দেবতাদের আদেশ সীতার মা এবং পালক পিতা জনককে জানিয়ে গিয়েছিলেন।

সীতা যদি শিশুকাল থেকেই জনকালয়ে লালিতপালিত হতেন তবে দুবার দেবদূতের আগমন এবং তার উল্লেখ ছিল নিষ্প্রয়োজন। সীতার মায়ের উল্লেখও স্বতন্ত্র ভাবে নথিবদ্ধ করার দরকার হত না। কারণ জনক বর্তমানে স্বতন্ত্র এক মাতৃগৃহের উল্লেখ প্রত্যাশিত নয়। সীতার এই মা যদি হতেন জনকপত্নী রাজরাণী, কোনো দেবদূত রাজা জনকের কাছে না গিয়ে কোন্ কারণে তবে অন্তঃপুরে জনক-মহিষীর কাছে দেববার্তা জানাতে যাবেন? সেকালে রাজমহিষীদের রাজনীতিতে এই পদমর্যাদা তো থাকার কথা নয়। সুতরাং সীতার পিতা এবং মাতার গৃহ স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করার অন্যতর কারণ ছিল বলেই মনে হয়।

শৈশবে সীতা তবে কি অন্যত্র তাঁর মায়ের কাছে ছিলেন? পরে প্রাপ্তবয়সে ব্রহ্মা তাঁকে জনকপুরীতে প্রেরণ করেন? যদি তাই ঘটে থাকে, তবে তো নস্যাৎ হয়ে যায় জনকের বক্তব্য, সীতা ছিলেন 'অযোনিজা' এবং হলাগ্রভাগে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

সীতার জন্মেতিহাস রামায়ণে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেটির খোঁজ করতে হবে পরবর্তী পুরাণে। কারণ, দেবতার ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য সীতার লক্ষ্মীস্বরূপী একটি মূর্তি গড়া হয়েছে সেখানেই।

১। বা-রা। অনু—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক, ভারবি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং স্কন্দ পুরাণে কিছু তথ্য আছে। স্কন্দ পুরাণ বলে, বিষ্ণুর স্বীকৃতি নথিবদ্ধ করা আছে এই ভাবে যে, ত্রেতাযুগে যখন তিনি রাবণকে নিহত করেন, তখন কন্যা বেদবতী তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সীতারূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী, মহীতল থেকে উত্থিতা হয়ে জনকের কন্যাত্ব গ্রহণ করেন :

পুরা ত্রেতাযুগে পুণ্যে রাবণং হতবানহম্।
তদা বেদবতী কন্যা সাহায্যমকরোচ্ছ্রিয়ঃ॥
সীতারূপাভবল্লক্ষ্মীর্জনকস্য মহীতলাৎ।[২]

কাহিনীতে দুর্বোধ্য গোলমাল নেই অথচ সেটা পুরাণ, এমনটি হয় না। তাই এই গল্পেও একটি অনিবার্য গোলমাল সৃষ্টি করা হয়েছে রামচন্দ্রকে বিষ্ণু এবং সীতাকে লক্ষ্মী বানিয়ে। অর্থাৎ পুরাণকার বাপের (বিষ্ণুর) নাম ভুলিয়ে পুত্রকেই (রামকে) পিতারূপে উল্লেখ করেছেন। আমরা অবশ্য জানি, রামচন্দ্রের জন্ম বিষ্ণুর ঔরসে। এ তর্ক আগেই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি।

রামকে যখন বিষ্ণুর অবতার বানানো হয় আলোচ্য পুরাণ হয়ত সেই সময়কার কথকের দ্বারা গীত। সেজন্যই রাম সরাসরি বিষ্ণু রূপে বর্ণিত হলেন।

বিষ্ণুর লক্ষ্মী সঠিক যে কে তা জানা যায় না। পুরাণকার তাই যখনই যাঁকে বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী রূপে জেনেছেন, তখন তাঁকেই লক্ষ্মীরূপে মহিমান্বিতা করে গেছেন। লক্ষ্মী কখনো বেদবতী, কখনো তুলসী। এঁরা আবার জাড়তুতো খুড়তুতো দুই বোন। দুটি বোনকেই দেবতারা জন্মমাত্র গন্ধমাদন পর্বতে নিয়ে যান দেবদাসী বানিয়ে। সেখানে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কী ভাবে দেবস্বার্থ পূরণের জন্য নারীগুপ্তচর রূপে দেবশত্রুর মনোরঞ্জন করে দেবতার ষড়যন্ত্র সফল করতে হয়, তারই ট্রেনিং-প্রাপ্তা এই দুই বোন কালক্রমে সুর বিরোধী দুই অসুর, রাবণ ও শঙ্খচূড়ের প্রাণবধে ব্রহ্মার পরিকল্পনা সফল করেন। অর্থাৎ নারীগুপ্তচরবৃত্তিতে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় বারঙ্গানাবৃত্তির পাঠও তাঁদের নিতে হয়। তুলসীর কাজ ছিল শঙ্খচূড়ের মনোরঞ্জন। শঙ্খচূড় হত্যার পর তুলসীকে সহবাস করতে হয় বিষ্ণুর সঙ্গে। বিষ্ণুর এহেন অপকর্মটিকে কথাচাপা দেওয়ার জন্য ভক্তিরসামৃত পুরাণ গেয়ে বেড়ান কথক ঠাকুররা[৩]। এদিকে বেদবতী সীতাকে বাস করতে হয়েছে লঙ্কায়। রামচন্দ্রের ধারণা ছিল, রাবণ বেদবতীকে ভোগ না করে এমনি বসিয়ে

২। স্কন্দপুরাণম্ / বিষ্ণুখণ্ডে ৫ম অ।

৩। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ / প্রকৃতি খণ্ড / অনু পঞ্চানন তর্করত্ন. নবভারত।

বসিয়ে খাওয়ান নি, কিছু না কিছু নিশ্চয়ই সংসর্গ ঘটেছিল। তাতে অবশ্য বেদবতী সীতার আসে যায় না কিছু। তাঁর কাজের ধারাই তো অমনি। সেই কাজ শিক্ষা করাই ছিল দেবলোকে তাঁর তপস্যা। দেবতার অভীষ্ট পূরণের জন্য ব্রহ্মার ইচ্ছায় দেবদূত অগ্নি তাঁকে রেখে গেছলেন রামচন্দ্রের কাছে। এ সবই সুস্পষ্ট পুরা কথা। অতঃপর সেকথায় আসি।

বেদবতী সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বিবরণ "কুশধ্বজকন্যা বেদবতী গন্ধমাদন পর্বতে বহুকাল তপস্যা করত সেই স্থান বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

কুশধ্বজ এবং ধর্মধ্বজ ছিলেন শিবভক্ত বৃষধ্বজের পুত্র রাজা হংসধ্বজের দুই ছেলে। এঁরা সূর্যশাপে (সূর্য দেবতার আক্রমণে ?) রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীহীন (অর্থাৎ সম্পদহীন) হলে দেবতাদের আরাধনা করেন শ্রীযুক্ত হওয়ার কামনায়। পরবর্তী গল্প পাঠে বোঝা যায় দুই ভাই তাঁদের দুই কন্যাকে দেবতাদের কাছে (সম্ভবত) বিক্রী করে দেন। কুশধ্বজ কন্যা বেদবতীর গর্ভধারিণী মায়ের নাম মালাবতী। কুশধ্বজ যখন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তখন মেয়ের জন্ম হওয়ায় নাম রাখা হয় বেদবতী। ওদিকে ধর্মধ্বজ এবং তদীয় পত্নী মাধবীর মিলনে জন্মলাভ করেন তুলসী। পুরাণ বলে, "তুলসী ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র ব্রহ্মা-প্রেরিতা প্রকৃতির ন্যায় সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করত বদরী তপোবনে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন।"

জাতমাত্র মনুষ্য সন্তান স্বেচ্ছায় একাকী দূরভ্রমণে বার হয়ে হাজার বারো ফুট উচ্চ গন্ধমাদন পর্বতে চলে গেলেন, পুরাণকারের এই রকম তৈরী করা গল্পে আর আস্থা নেই। আমরা দেখছি দুই মেয়ের জন্মকালেই দেবপুরোহিতরা এলেন এবং তাদের নামকরণ করলেন। তারপরেই তাঁরা চলে গেলেন হিমালয়ের দেবশিবির গন্ধমাদন পর্বতে।[৪]

সেযুগে এবং এযুগেও দেবদাস দেবদাসী অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী করা হয়। ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিচর্যাবৃত্তি গ্রহণ করার অর্থ আপন ব্যক্তিসত্তা সমর্পণ করে দেবশিবিরের আজীবন দাসত্ব বরণ করা। ক্রীতদাসের মতো দেবতার অভিসন্ধি পূরণই তখন তাদের একমাত্র কর্তব্য। এভাবে সত্তা বিসর্জন দিলে জাতকের পিতৃমাতৃ

৪। গন্ধমাদন পর্বত গাড়োয়াল হিমালয়ের একটি বৃহদংশের নাম। রুদ্র হিমালয় এবং কৈলাস পর্বতমালার অংশীভূত। এই পর্বতে মন্দাকিনী প্রবাহিত। মন্দাকিনী নেমেছে কেদার অঞ্চল ছুঁয়ে।

পরিচয় বিলুপ্ত হয়। সে পরিচয় তখন তার পূর্বাশ্রম। পরবর্তী আশ্রম দেবসেবা। নোতুন নাম, নোতুন পরিচয় লাভ হয়। এক্ষেত্রে জন্মমাত্র দেবপুরোহিতরা এসে দুই মেয়ের নামকরণ করলেন মন্ত্রপাঠ করে। তারপর তাদের নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ের দেবশিবিরে। সেখানে দুজনকেই তৈরী করা হল কামকলানিপুণা সুরসিকা নারীরূপে। পুরাণকার তুলসীকে নিপুণ 'কামুকী' বলে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্মার আদেশে তুলসী সেই ভাবে তৈরী হলে ব্রহ্মা বললেন, সুন্দরী! তুমি শঙ্খচূড়ের পত্নী হও। পরে নারায়ণ বিষ্ণুকে পতিরূপে পাবে। বলা হয়েছে, ব্রহ্মার নির্দেশ প্রদত্ত হওয়ার পর 'কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চবান নিক্ষেপ করিলেন'। অর্থাৎ কামশাস্ত্রের ষোলকলায় স্নাত হয়ে তুলসী বরণ করলেন সুরবিরোধী সুপুরুষ অসুররাজ শঙ্খচূড়কে। কামে জর্জরিত করে ফেললেন তিনি শঙ্খচূড়কে। শঙ্খচূড়ের অমন বিক্রম তুলসীর রূপে এবং যৌনক্রীড়ায় বিনষ্ট হল। দেবতারাও এই সুযোগে হত্যা করতে সমর্থ হলেন অপরাজেয় সেই অনার্য ভূপতিকে। কেন এতো কাণ্ড? কারণ ঐ শঙ্খচূড় ছিলেন মহাপ্রতাপান্বিত রাজা। তিনি আর্য শিবির তছনছ করেন। হোম যজ্ঞস্থল বিনষ্ট করে দেবতাদের আশ্রয়, অধিকার, অস্ত্র-ভূষণাদি সমস্তই বলপূর্বক হরণ করেন। তাই দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে বীর্যহীন করার উদ্দেশ্যে প্রথমে তুলসীকে নিয়োগ করেন, পরে দেববাহিনী তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করে হত্যা করেন। শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হলে দেবতা বিষ্ণু পরমাহ্লাদে তুলসীর কামুকীদেহ ভোগ করতে লাগলেন। তখন দেবভোগ্যা তুলসী লক্ষ্মী নামে পরিচিতা হলেন।

অপূর্ব এই ধর্মকথায় যুদ্ধ এবং নিকৃষ্ট যৌনক্রীড়াদির বর্ণনা ছাড়া আর যে কাহিনীমালা আছে, তার মাথামুণ্ডু, আগুপিছু কোনো পারম্পর্যই নেই। অসংলগ্ন বাক্য সমাহারে সর্গসমূহ আচ্ছন্ন। সেসব আগাছা বাছাই করা বর্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এখানে একটি কথা শুধু বলে রাখি, শঙ্খচূড়কে তুলসী বিভিন্ন প্রসঙ্গ বলার সময় অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলেন, "যে ব্যক্তি কন্যা পালন করত বিপদে পতিত হইয়া অথবা ধনলোভে সেই কন্যা বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠ নিয়ত কুম্ভীপাকনরক ভোগ করে।" তুলসী শঙ্খচূড়ের সঙ্গে রতিসুখ উপভোগ করার সময় অকস্মাৎ কন্যাবিক্রয়কারী পিতাদের ওপর অমন ভাবে মানসিক উষ্মা প্রকাশ করলে বিস্মিত হয়ে ভাবি, এই অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের মূল সূত্রটি কোথায়? উত্তর পাই, এই বিরাগ বোধহয় পুঞ্জীভূত তুলসীর ক্ষোভ থেকেই সঞ্জাত। তিনি হয়ত জানতেন, তাঁর পিতা তাঁকে দেবতাদের কাছে বিক্রী করেছেন এবং দেবতারা তাঁকে

বাধ্য করেছেন বারাঙ্গনাবৃত্তিতে। এ জন্যই তাঁর ক্ষোভ।

তুলসী এবং বেদবতীকে বলা হয়েছে, গোলকপতি নারায়ণের লক্ষ্মী! অর্থাৎ আমরা যে শ্রীময়ী লক্ষ্মীর পুজো করি সেই ভাবরূপ-কল্পিত মাতৃমূর্তিকে পুরাণ মহাকাব্যের পাতায় খোঁজ করলে মন আহত হবে। না খোঁজাই ভালো। অত নোংরামির মধ্যে পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে না টেনে তাঁদের ভাবমূর্তি পুজাই শ্রেয়।

পাঁচালী পুরাণে পরমেশ্বর এবং প্রকৃতির ভাবরূপ অতি নিকৃষ্ট ভাবে বিনষ্ট হয়েছে। দেবতারা মহান ঈশ্বরকে নির্বাসিত করে গুচ্ছের মিথ্যায় ঠাসা পুরাণ পাঁচালী তৈরী করে এক এক দেবপ্রধানকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। খুঁজে দেখলে দেখা যাবে, বিভিন্ন ধর্মাচরণের মধ্যে মানুষের ভাবকল্পনার পরমেশ্বর গায়েব হয়ে গেছেন। মানুষ তাঁকে নির্বাসিত করে দেহবান গোষ্ঠী নেতা ও নেত্রীদের ঈশ্বর বানিয়েছে বিভিন্ন যুগে। বলা হয়েছে, তারাই পরমাত্মার অবতার এবং পূজনীয়। তাদের নাকি অনেক ক্ষমতা, যদিও তাঁরাও মরণশীল। দুরারোগ্য ব্যাধি ও জরার হাত থেকে তাঁরা যোগবলে নিজেদেরই উদ্ধার করতে অক্ষম। বিপৎকালে তাঁরাও পলায়ন করেন এবং সামান্য মানুষের কুঁড়েঘরেই আশ্রয় নেন। [তিব্বত থেকে পালিয়ে আসার সময় অবতার দালাই লামাকে হতদরিদ্র তিব্বতীদের দুর্গন্ধময় গোশালায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। এমনই ঐশ্বরিক মহিমা এই সব অবতারি ধর্মগুরুদের]।[৫]

তুলসীকে মোটামুটি জানা গেল। যে ভাবে তাকে জানলাম সেই রূপে ভাবতে পারি না আমাদের আরাধ্যা দেবী নিত্য পবিত্র অপূর্ব শ্রীময়ী লক্ষ্মী দেবীকে। তিনি সর্বঐশ্বর্যশালিনী, চিরকল্যাণময়ী, বরদাত্রী। সেই বৈভবদায়িনী জননী লক্ষ্মী মানুষের সকল অভাব পূরণ করেন। পরমেশ্বরী তিনি কোনো পৌরাণিক চরিত্রমাত্র নন, তিনি ধ্যানলব্ধ, একটি ভাবের, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবরূপক। তাঁকে পাঁচালী-পুরাণের গল্পে সন্ধান করা বাতুলতা মাত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকারও এই সত্যটুকু জানতেন। জানতেন বলেই স্পষ্টত বলে গেছেন, "লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও রাধিকা প্রভৃতি আদি সৃষ্টি স্বরূপা হইলেও ইহারা [বাস্তব] নহেন, ইহাদিগের অংশস্বরূপ যে স্ত্রীরূপ তাহাই বাস্তব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" অর্থাৎ ঋষির ভাবরূপক যে পরমেশ্বরী তাঁরা পৌরাণিক

৫। দালাই লামার আত্মজীবনী / বঙ্গানুবাদ: স্বদেশ ও স্বজন / অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় / আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স।

বাস্তব চরিত্র নন। তাঁদের অংশস্বরূপ এবং অংশস্বরূপা বলে পুরাযুগের কতিপয় নরনারীকে পুরাণকাররা চিহ্নিত করে গেছেন। পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর স্থানে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বসানো হয়েছে সেইসব নরনারীকে দেবদেবী বানিয়ে। চালু করা হয়েছে তাদেরই পূজা ব্রাহ্মণ স্বার্থে, রাজা রাজ্য টেঁকসই করার উদ্দেশ্যে।

পুরাণের স্পষ্ট উদ্দেশ্য পুরাণকাররাই ব্যাখ্যা করে গেছেন। আমি সেই ব্যাখ্যা সবার সামনে তুলে ধরে শুধু একটা কথাই বলছি। ক্ষমতাসীনের চক্রান্তে বহুকাল ঠকে এসেছি, এখন সেই প্রতারণার বাতাবরণ ছিন্ন করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে, না হলে পরমেশ্বরকে নোংরা কাদায় বসিয়ে নিজেরাই আমরা পূতিগন্ধময় নোংরামির মধ্যে ক্রমশই ডুবে যেতে থাকব।

পুরাণ যাঁদের বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবী বলে চিহ্নিত করলেন, সেই বাস্তব লক্ষ্মীদের কেউই পবিত্র চরিত্র নমস্যা নারী নন। মানুষকে বৈভবশালী করে তার অনটনের সুরাহা করার জন্য এঁদের কারও কোনই দায়িত্ব নেই। এঁরা কামনিপুণা, দেহ-পশারিণী সর্বেশ্যার দল। দেবতার আদেশে নারী গুপ্তচর হিসেবে দেবশত্রুর মনোরঞ্জন করে দেবতার স্বার্থ পূরণই ছিল পুরাযুগে এঁদের একমাত্র কর্তব্যকর্ম। এই সব বাস্তব পৌরাণিক লক্ষ্মীদের মধ্যে অহল্যা, মেনকা, তুলসী, বেদবতীদের উল্লেখ আছে। পুরাণপাঠে জানা যায়, এই নারীরা দেবস্বার্থে দেহদান করেই বিখ্যাত হয়েছিলেন, এঁদের অন্য কোনো গুণই ছিল না।

মেনকাকে স্বর্বেশ্যা বলে সকলেই জানেন। তুলসী ও বেদবতীকেও আলোচ্য পুরাণপাঠে স্বর্বেশ্যা বলেই জানা যাচ্ছে। এঁরা সবাই লক্ষ্মী অভিধা লাভ করলেন কোন্ যুক্তিতে? পুরাণে দেবতা বিষ্ণুর দাসীদেরই ঐ পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফলত অন্য বিপত্তিও দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুত্র রামচন্দ্র এবং মহাভারতীয় চরিত্র বাসুদেব কৃষ্ণের মহিষীরাও একই অভিধা লাভ করেছেন। উল্লিখিত লক্ষ্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন রামপত্নী সীতা এবং দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ-মহিষী রুক্মিণী। এছাড়াও ব্রজনন্দন কানাইয়ের লীলাসঙ্গিনী গোয়ালিনীরাও লক্ষ্মী। এক্ষেত্রে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর ঔরসজাত পুত্র রাম এবং বাসুদেব কৃষ্ণ [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ] পুরাণকারের কলমে একাকার হয়ে গেছেন। রাম ও কৃষ্ণের অবতার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরবর্তী পুরাণে রাম ও কৃষ্ণকে স্বয়ং বিষ্ণু বলে প্রচার করার ফলেই তাঁদের মহিষী এবং নর্মসহচরীদেরও লক্ষ্মীর পদমর্যাদা দান করা হয়েছে। এ ভাবেই পুরাণের গল্প গচ্ছিত হয়েছে পুরুষানুক্রমে আমাদের মতো ইতরজনের হাতে।

রামায়ণে বিভিন্ন সীতার উল্লেখ পাওয়া গেছে। একজন জানকী, অপর নারী বেদবতী। রামচন্দ্রের পত্নী সীতার পরিচয় সন্ধানে আমরা যে কুশধ্বজ কন্যা বেদবতীর তথ্য পেলাম, প্রশ্ন হল, তিনিই কি জানকী সীতা ? না, ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এমন সহজ স্বীকৃতি প্রদানে নারাজ। অবশ্য স্কন্দে উক্ত বিষ্ণুর বয়ানে বেদবতী সীতাকে যেভাবে জানা গেছে সেই তথ্যটুকুতে সন্তুষ্ট থাকলে ব্যাখ্যার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু তাতে গোলমাল পরিষ্কার হত না। তাই ব্যাপারটির আরও একটু বিশ্লেষণ দরকার।

স্বর্ণমৃগরূপী মারীচ বধের প্রাক্‌কালে সীতা বদলের একটি কাহিনী সীতার সঠিক পরিচয়টিকে রহস্যাবৃত করেছে। মারীচ বধের আগ্ মুহূর্তে দণ্ডকারণ্যে হঠাৎ উপস্থিত হন দেবদূত অগ্নি। রামের শিবিরে এসে একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে রামকে বলেন, "সীতা হরণের কাল উপস্থিত হইয়াছে ...অতএব আপনি...সীতাকে আমার নিকট অর্পণ করুন, নিজ সমীপে ছায়া রূপিণী সীতাকে রাখুন। পুনর্বার অগ্নি পরীক্ষা সময়ে আপনাকে সীতা প্রদান করিব। এই জন্য দেবগণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।..." তখন "রাম তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কিছু না বলিয়া ব্যথিত হৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন।...তৎপরে অগ্নি গোপনীয় বিষয় নিষেধ করত সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় অন্যের কথা কি, লক্ষ্মণ পর্যন্তও বুঝিতে পারিলেন না।"[৬]

সমস্ত ব্যাপারটিই রাজনৈতিক টপ সিক্রেট। দেবতারা বিচক্ষণ সাবধানী মতলবী যোদ্ধা। তাঁরা আগেই চর মুখে সংবাদ পেয়েছেন যে মারীচের সাহায্য নিয়ে রাবণ আসছেন সীতা হরণ করতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লম্বা রাজনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেছে ব্রহ্মলোক গাড়ওয়াল হিমালয়ে। ব্রহ্মা ঠিক করে ফেলেছেন, রাবণের এই অদূরদর্শী চপলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা রাবণালয়ে একজন সুচতুরা এবং গুপ্তচরবৃত্তিতে সুশিক্ষিত নারীকে নারীগুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করার সুযোগ গ্রহণ করবেন। নারী গুপ্তচরটি যদি সঠিক কাজ করতে পারে, তবে তাঁর দ্বারা রাবণের অন্তঃপুরে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলা যাবে। দেবতারা চেষ্টায় ছিলেন রাবণপক্ষ থেকে বিভীষণ প্রমুখ রাজ্যলোভী ও রাবণবিদ্বেষীদের ভাঙিয়ে আনতে। সীতারূপিণী কোনো নারী গুপ্তচর এ জাতীয় রাজনৈতিক ভাঙনেও সবিশেষ সাহায্য করতে পারে। সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মা অগ্নিকে

৬। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ / প্রকৃতি খণ্ডে ১৪শ অ দ্রঃ / নবভারত পাবলিশার্স।

পাঠালেন দণ্ডকারণ্যে সীতা বদল ক'রে আনার জন্য। অগ্নি জানকী সীতাকে নিয়ে গেলেন এবং রেখে গেলেন বেদবতীকে তাঁর জায়গায়। পরিকল্পনাটি সুদূর-প্রসারী। এই পরিকল্পনায় লঙ্কাবিজয়ের পর কেমনভাবে অগ্নিধূমের ভোজবাজির মধ্যে আবার রামের হাতে জানকী সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে দেবতারা তাঁর ছায়ারূপিণী বেদবতীতে ফেরত নিয়ে যাবেন তারও ছক কষা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদটিও যেন ছবির মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বলতে পারেন, একেবারে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে-চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্র সমাপ্তের আগেই তার সচিত্র সিনেরিও রেডি। ছক যখন তৈরী তখন যুদ্ধটাও সোজা। ছক অনুসারে ঘটনার গতি যদি সঠিক থেকে তবে দেবতাদের জয়ও অবধারিত। চমৎকার পরিকল্পনা। কিন্তু যেহেতু সবটাই মিলিটারি টপ সিক্রেট তাই তা কেবলমাত্র রামচন্দ্রকেই জানানো হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দেবতারা রামের দাসানুদাস লক্ষ্মণকেও বিশ্বাস করেন না।

এই ভাবে তাঁরা বেদবতীকে রেখে জানকীকে নিয়ে গেছেন গাড়ওয়াল হিমালয়ের একটি গুপ্ত আবাসে। গাড়ওয়াল হিমালয়ে যমুনার পশ্চিমে তমসা নদীর অবরোহণ পথে পড়ে শৃঙ্গেরি গ্রাম। এখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নামে একটি গুহা আছে। অগ্নিদেবতা সেখানেই জানকী সীতাকে এনে লুকিয়ে রাখেন বলে একটি স্থানীয় জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তথ্যটি পেয়ে গেলাম সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ভ্রমণ-কাহিনীতে।[৭]

অগ্নি জানকী সীতাকে নিয়ে গেলেন, রেখে গেলেন বেদবতী সীতাকে। যিনি রাবণালয়ে থেকে রাবণবধে সাহায্য করেছেন, স্কন্দপুরাণ মতে তিনিই বেদবতী। ব্রহ্মপুরাণ বলছে, সীতা বদল হ'ল। সুতরাং সীতা এক নয়, দুই বিভিন্ন নারী। বেদবতীর স্বর্বেশ্যারূপিণী পরিচয় আগেই পেয়েছি। পেয়েছি সে পরিচয়ের অনুকূলে পৌরাণিক তথ্য প্রমাণ। কিন্তু কে এই সুশীলা রমণী, যিনি রামের পরিণীতা স্ত্রী, দেবপ্রেরিতা এবং জনকগৃহে লালিতপালিত রাজকন্যা?

পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে কুশধ্বজ নামে দুজন রাজাকে পাওয়া যায়। হংসধ্বজপুত্র কুশধ্বজকে বেদবতীর পিতা হিসেবে আগেই চিহ্নিত ক'রে নিয়েছি আমরা। দ্বিতীয় কুশধ্বজ ছিলেন মিথিলাপতি সীরধ্বজ জনকের ভাই, যাঁর দুই মেয়ে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ হয় যথাক্রমে ভরত এবং শত্রুঘ্নর সঙ্গে।

৭। বহুপতির দেশে / বরেন গঙ্গোপাধ্যায় দ্র।

কোনো কোনো পৌরাণিক অভিধানে জানকী সীতার পিতা রূপে সীরধ্বজ ভ্রাতা কুশধ্বজের উল্লেখ দেখা যায়। ভায়ের মেয়েকে জনক পালন করেছেন এমনটি হ'লে ভালোই হ'ত। সীতার 'আইডেনটিটি' নিয়ে এতো গোলমালে পড়তে হ'ত না। তাঁকে অযোনিজা, হলাগ্রভাগে প্রাপ্তা ইত্যাদি গল্পে মুড়ে দেবতাদের কীর্তি-ঘোষক পুরাকথায় হাজির করতে হতো না। কিন্তু যেহেতু সীতাতত্ত্বে এমন গোলমাল, তাই তাঁর ঐ রকম সহজ পরিচিতির সম্ভাবনা প্রথমেই বাতিল করে দিতে হয়। এদিকে অগ্নি যে দুই সীতারূপিণী নারীকে (বেদবতী ও জানকী) অদলবদল করে দিলেন, মানতেই হবে তাঁদের দুজনের মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য না থাকলে লঙ্কা বিজয়ের পর যখন সীতাকে জনসমক্ষে রামচন্দ্রের কাছে হাঁটিয়ে আনা হ'ল এবং কটুবাক্যে রাম তাঁকে প্রকারান্তরে 'বারাঙ্গনা' বলে তিরস্কার ক'রে পরিত্যাগ করলেন, তখন লক্ষ্মণ নিশ্চয় বেদবতী সীতার সঙ্গে জানকী সীতার বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতেন। রাবণালয়ে সীতাকে দেখে সূর্পণখাও সনাক্ত করতেন বেদবতীকে নকল সীতা ব'লে। কিন্তু এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। লক্ষ্মণ সীতার পদযুগল ভিন্ন কখনো মুখদর্শন করেন নি বলে একটি গল্প অবশ্য চালু আছে। কিন্তু দীর্ঘ বনবাস পর্বে চকিত নজরে কখনো সীতামুখ লক্ষ্মণের নজরে আসে নি এমন কথা ভাবা যায় না। অতএব জানকীর সঙ্গে বেদবতীর চেহারাগত সাদৃশ্য স্বীকার করতেই হয়। দেবতারা যাদুবলে অথবা বৈজ্ঞানিক প্লাস্টিক সার্জারি ক'রে বেদবতীর মুখ সীতার মতো বানিয়ে দিয়েছিলেন, এমনটিও কষ্টকল্পনা মাত্র। কারণ একই বেদবতী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেবতাদের নারীগুপ্তচর রূপে দ্রুপদরাজার কাছে দ্রৌপদীরূপে প্রেরিত হন। এই তথ্যও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে একই জায়গায় লিখিত আছে, যদিও ব্যাপারটি অসম্ভব বলে মনে হয়।

এ অবস্থায় জানকী এবং বেদবতীকে দুই যমজ বোন ছাড়া অন্যতর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। সুতরাং এমনটি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক যে, হংসধ্বজপুত্র কুশধ্বজের ও ধর্মধ্বজকে হৃতরাজ্য ফেরত দেওয়ার সময় দেবতারা তাঁদের তিনটি কন্যাকে পণস্বরূপ গন্ধমাদন পর্বতে নিয়ে যান। একজন ধর্মধ্বজকন্যা তুলসী, অন্য দুজন হংসধ্বজপুত্র কুশধ্বজ দুই যমজকন্যা বেদবতী এবং সীতা। তিনটি মেয়েকেই দেবতারা ট্রেনিং দিয়েছেন। তিনজনই দেবতা বিষ্ণুর লক্ষ্মী নাম্নী দাসীদের অন্তর্ভুক্ত হ'ন। দেবাসুর যুদ্ধে তাঁদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস ক'রে দেব-অভিসন্ধি পূরণ করতে হয়। এটি ছিল এক ধরনের নারী গুপ্তচরবৃত্তি, যে শক্তিকে দেবতারা নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ব্রাহ্মণনেতা এবং শক্তিশালী ভারতবর্ষীয়

ভূপালদের দেবশিবিরে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রেও এই নারীরা ব্যবহৃত হয়েছেন। এসব কাজ করতেন উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, প্রমুখ অপ্সরাবৃন্দ। উর্বশী তাঁদের প্রধান। এই অপ্সরাদের হারেম রক্ষা করতেন বোধ হয় হিমালয়বাসী গন্ধর্বরা। রাজা পুরূরবার কাছ থেকে উর্বশীকে দেবলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গন্ধর্বরা নিযুক্ত হন। পুরূরবা উর্বশীকে স্থায়ীভাবে কাছে রাখতে চাইলে রাজাকে উর্বশী বলেছিলেন, রাজা তাঁকে গন্ধর্বদের কাছ থেকে প্রার্থনা ক'রে নিতে পারেন।[৮] এই প্রার্থনার অর্থ কি ভাড়া অথবা ক্রয় করা? জানকী সীতা এক মাতৃগৃহের কথা বলেছেন রামকে। হতে পারে, দেবশিবিরে তিনি যখন হিমালয়বাসিনী, তখন যে মহিলা তাঁকে লালন করেন, তাঁকেই তিনি মা বলে জানতেন। তাঁর পূর্বাশ্রমে মা ছিলেন মালাবতী। হিমালয়ে থাকার সময় তাঁকে সব রকম কৃচ্ছ্রসাধন করতে শেখানো হয় এবং এমন-ভাবে তৈরী করা হয় যাতে রামের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য অভিযানে তিনি উপযুক্ত সহচরী হতে পারেন। রামকে এই অভিযান করতে হবে ব্রহ্মার পরিকল্পনায় রাবণবধকল্পে। রাম ভোগী পুরুষ। আহারে বিহারে শয়নে তিনি ভোগসুখা-ভিলাষী ছিলেন। তাই দেবতারা তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত সহচরীও তৈরী রাখেন। জানকী সেই সহচরী। তিনি স্বমুখে বলেছেন, রামের অনুগমন দেবতার নির্দেশ। সেজন্যই তাঁর জানকীরূপে জনকালয়ে অপেক্ষা। এটাই তাঁর ভাগ্যলিপি। দৈবজ্ঞরা অর্থাৎ দেবলোকের অভিজ্ঞ বার্তাবহরা যা ব'লে গেছেন তা খণ্ডন করার সাধ্য কারো নেই। অতএব তাঁকে দাক্ষিণাত্য অভিযানে সহগামিনী হ'তেই হবে।

বস্তুত এ ভাবেই তো ব্রহ্মার নির্দেশে পূর্বাপর ঘটনা ঘটে চলেছে। রামজন্মের আগেই অপারেশন লঙ্কার ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়ে গেছে দেবশিবিরে। তারই জন্য বিশ্বামিত্র রামকে মিথিলায় নিয়ে এসেছেন। তারই জন্য চুপিসাড়ে এবং অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে রামসীতার। একমাত্র বেদবতী এবং জানকী যমজ বোন, এই তর্ক ছাড়া প্রতিটি ঘটনাই পৌরাণিক সাক্ষ্য সমর্থিত। যমজ ভগ্নী ব্যতীত এই ঘটনাবলীর অন্যতর ব্যাখ্যা হয় না ব'লেই আমাদের প্রস্তাব। সামান্য এই তর্কটি সমগ্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হতে পারে এবং তার সম্ভাব্যতা পণ্ডিতজনে খতিয়ে দেখতে পারেন।

প্রসঙ্গত এখানেই বেদবতীর পরবর্তী অথবা অগ্রবর্তী আশ্রম, যাকে ইংরেজিতে

৮। বামন পুরাণ / উত্তর ভাগ / ২৯

বলতে পারি অ্যাসাইনমেণ্ট, সেই দ্রোপদীরূপের আলোচনাও সেরে রাখা যায়। বেদবতীর দ্রৌপদীরূপ আলোচনায় বেদবতীর পরিচিতি আরও পরিষ্কার হয়ে আসে।

পুরাণ পাঠে জানা যায়: "তিনি সত্যযুগে কুশধ্বজকন্যা বেদবতী ও ত্রেতাতে রামপত্নী জনকাত্মজা জানকীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং তদীয় ছায়াই দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদী হইয়া তিন যুগেই বিদ্যমান রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতগণ ত্রিহায়ণী বলিয়া থাকেন।"[১]

বেদবতী স্বর্বেশ্যা। দেবতারা এই নারীকে সামরিক প্রয়োজনে গুপ্তচরবৃত্তিতে এবং রাষ্ট্রনৈতিক কর্মে নিযুক্ত করতেন। এঁকে তাই যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইনি দুঃসাহসিনী, প্রয়োজনে সুভাষিণী আবার কটুবাক্য উচ্চারণের দ্বারা কার্যসিদ্ধিতেও সুনিপুণা। পুরুষজাতিকে ভয়ডর করার মতো নরম মন তাঁর নয়। দুঃখ ও লাঞ্ছনা স্বীকারেও অকম্পিতা।

এ জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একটি বড় রকমের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মের ভার অর্পণ ক'রে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল দ্রুপদালয়ে। নির্দেশ ছিল পর্যায়ক্রমে পাঁচ কুন্তীপুত্রকে সহবাসে তুষ্ট রাখতে হবে। সাধারণ কোনো উত্তরপ্রদেশবাসিনী এই অস্বাভাবিক (দেশাচার অনুসারে) বৈবাহিক জীবন পালন করতে পারতেন না। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা দেবলোকের স্বর্বেশ্যা কিন্তু এ কাজ অনায়াসেই করেছিলেন। সম্ভবত যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর আসল পরিচয় জানতেন, তাই দেবলোকের নির্দেশে তিনি অক্লেশে দ্রৌপদীকে পাশায় পণ রেখেছেন, হেরেছেন সে খেলা ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং এক রকম জবরদস্তি করেই। তারপর দ্রৌপদীকে সভায় আনার জন্য তিনিই আদেশ দিয়েছেন। সভায় এসে বেদবতী দ্রৌপদী নিজের রজঃস্বলা অবস্থার কথা অকপটে জানিয়ে উপস্থিত গুরুজন সহ রাজপুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বক্তৃতা করেছেন যা রাজরাণীদের ক্ষেত্রে অসম্ভব কার্য। দ্রৌপদীর অপমানে অন্যান্য পাণ্ডবরা বিচলিত হ'লেও তাই দেখা যায় যুধিষ্ঠির ছিলেন অবিচলিত। প্রকাশ্য সভায় কর্ণ যখন বললেন, "দ্রৌপদী বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্তার বশবর্তিনী হইয়াছেন,...ইনি বারস্ত্রী...সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসনা করা আশ্চর্যের বিষয় নহে।" তখন ভীষ্ম সহ পঞ্চ পাণ্ডব সকলেই মৌন থেকে সে কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাটের প্রাসাদে অজ্ঞাতবাস

১। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ / প্রকৃতি খণ্ডে ১৪শ অ।

কালে সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদীকে গভীর রাত্রে পাঠানো হয়েছিল কীচকের প্রাসাদে। একাকিনী দ্রৌপদী মোহিনীবেশে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুরাপানে উন্মত্ত করেছেন তাঁকে এবং তাঁর সেই মত্ত অবস্থার সুযোগে ভীমসেন গোপন ষড়যন্ত্রে হত্যা করেছেন অপরাজেয় বীর কীচককে। কীচককে প্রলোভিত ক'রে সুরাপানের দ্বারা দুর্বল করানো বারস্ত্রী ছাড়া আর কার দ্বারা সম্ভব ছিল? কাজটি বেদবতীর পক্ষে নারীগুপ্তচর হিসেবে কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। নারী গুপ্তচররা এভাবে শত্রুশিবির ধ্বংস করতে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করে থাকেন। মহাভারত জুড়ে বলা হয়েছে [কোনো অজ্ঞাত কারণে] দ্রৌপদী ছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের সখী। কী করে কোন্ সূত্রে তাঁদের সখ্যতা, আমরা অবশ্য তা জানি না। যাই হোক, এই কৃষ্ণই দ্রৌপদী সম্পর্কে কর্ণকে বলেছিলেন, কর্ণ যদি দুর্যোধন পক্ষ ত্যাগ ক'রে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন, তবে, "দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবে।" দ্রৌপদীকে বারস্ত্রী হিসেবে না জানলে কৃষ্ণের পক্ষে এমন উক্তি করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু এসবই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। মহাভারতে সেই সমুদয় অমৃতকথার আলোচনা কৌতূহলী পাঠক লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বইটির পাতা উল্টে জেনে নিতে পারেন।

দশরথের দুঃস্বপ্ন

চার ছেলের বিয়ে দিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন রাজা দশরথ। চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ এবং অবসন্ন রাজা। মিথিলা থেকে বরযাত্রী ফেরত এলো গোপনে। অযোধ্যা নগরী মুখরিত হ'ল না রাজপুত্রদের বিবাহোৎসব উপলক্ষে। রাজপথে জ্বললো না একটিও বাড়তি আলো। নহবৎখানায় বাজলো না শানাইয়ের সুর। আমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতে পরিপূর্ণ হ'লো না রাজধানী। রাজপুত্ররা প্রাসাদ-দ্বারে পৌছলে কেবলমাত্র "রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ সহকারে হোমপূত কৌশেয় বসনসুশোভিত বধূগণের পতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উহাদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।" প্রজারা রাজান্তঃগ্রহে এক-পাত ভালোমন্দ খাওয়ারও সুযোগ পেলো না। এমন নিরানন্দ বিবাহ কোনো রাজপরিবারে কখনো কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে ব'লে শোনা যায় না। রাজপরিবারে একটি

বাড়তি অতিথি নেই যাকে নিয়ে আমোদ করা যেতো। বাড়তি মানুষের মধ্যে ছিলেন শুধু কৈকেয়ীভ্রাতা যুধাজিৎ। কিন্তু রাজা দশরথ তাঁর এই সম্বন্ধীটির আগমন ভালো চোখে দেখেন নি। বুঝেছিলেন সে আগমনের পেছনে আছে গভীর রাজনৈতিক কূটনৈতিক চক্রান্ত। তাঁকে নিয়ে দশরথের পক্ষে আনন্দ করার তাই কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমরা দেখেছি, রামায়ণ মহাভারত পুরাণে কেবলমাত্র গল্পের খাতিরেই কোনো ঘটনা ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনাই হয় পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। গল্প, উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণের দাবিতে অথবা লেখকের বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঘটনাক্রম সাজানো হ'তে পারে। ইতিহাসে কিন্তু ঘটনাই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই সেখানে ঘটনার দ্বারাই চরিত্রাবলী আন্দোলিত হয়। তাদের ক্রিয়াকর্ম, উত্থানপতন, ক্রমবিকাশ ঘটনানির্ভর। পুরাণের যে অংশ নিছক ইতিহাস, সে অংশে ঘটনাবলীর অনুসরণেই চরিত্রগুলির আসা যাওয়া। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লেই পুরাণপাতায় প্রবেশ করে উপদেশাত্মক বক্তৃতা, ভক্তির অসংলগ্ন উচ্ছ্বাস এবং অলৌকিক গল্পগাছার আবর্জনা। এসবই সঠিক যুক্তিতর্কের দ্বারা ইতিবৃত্তের অঙ্গ থেকে সাবধানে চেঁছে ফেলা যায়।

রামের বিবাহপর্বের ঠিক আগমুহূর্তে অনাহূতভাবে অকস্মাৎ কেকয়রাজপুত্র যুধাজিতের আগমন এবং অযোধ্যায় একরাত্রি যাপনের পর মিথিলা-গমন অকারণে হয় নি। নিঃশব্দ বিবাহপর্বের মতোই তাঁর আগমনের নেপথ্যেও ছিল নিশ্চয় বিশেষ নিগূঢ়তত্ত্ব যা রাজা দশরথকে ভাবিত করেছিল। কিন্তু রামায়ণ আলোচনার ক্ষেত্রে এই তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনাটি পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর এই বিশিষ্ট পদার্পণের কারণ ক্রমশ স্পষ্ট হবে। সুতরাং ঘটনার আলোকেই তার স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করব আমরা। রামায়ণে কথিত আছে দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি সবিশেষ আসক্ত ছিলেন। কিন্তু যুধাজিৎকে দশরথ একটিও কুশল প্রশ্ন করেন নি। অযোধ্যায় ফিরেও ভগ্নীপতি-সম্বন্ধীর মধ্যে কোনো বাক্যালাপ হয় নি। বরং একান্তে ভরতকে ডেকে বলেছেন, ভরত! তোমার মাতুল যুধাজিৎ তোমাকে মাতুলালয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। তুমি ঘুরে এস। মনে হয়, রাজা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন যুধাজিৎকে সত্বর অযোধ্যা থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য। রাজার মন তখন ছিল নানা অশুভ চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তিনি বিষণ্ণ হয়ে কেবলই অনাগত কোনো দুর্যোগের আশঙ্কা করছিলেন। মিথিলা থেকে ফেরার পর অতিবাহিত করছিলেন বিনিদ্র রজনী এবং দেখছিলেন ভয়াবহ

সব দুঃস্বপ্ন যে কথা সংগোপনে রামচন্দ্রের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে দশরথ বলেছেন।

ভরত-যুধাজিৎ বিদায় নেওয়ার পর মনে মনে অনেক যুক্তিবিচার করে অবশেষে দশরথ একদিন তাঁর বিশ্বস্ত ও অধীনস্থ কয়েকজন মন্ত্রীকে আহ্বান ক'রে বললেন, "মন্ত্রিগণ! আমার দেহে জরার সঞ্চার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিকূলতা, বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাতও হইতেছে। এই কারণে এই যৌবরাজ্য"-এ রামকে অভিষেক করার বাসনা হয়েছে।

বৃদ্ধ হলে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার বাসনা স্বাভাবিক। দশরথ কিন্তু এই বাসনার নেপথ্যে একটি গূঢ় কারণ ইঙ্গিতময়ী ভাষায় তাঁর একান্ত বিশ্বস্তদের কাছে বলেছিলেন।

বলেছেন, অন্তরীক্ষে দুর্যোগ ঘনীভূত হচ্ছে। অন্তরীক্ষে প্রতিকূলতার উল্লেখ পৌরাণিক ভাষায় একটি সাঙ্ঘাতিক কথা। অন্তরীক্ষ (বা আকাশ) শব্দটি দেবতাদের গমনাগমন পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেখানে। যখনই দেবশিবিরের আক্রমণ আশঙ্কিত হয়েছে তখনই ঐ অন্তরীক্ষে দুর্যোগের কথা বলেছেন পুরা-কথক। দুর্যোধনকে নির্বাসিত করার প্রস্তাব যখন তাঁর খুল্লতাত বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের সভায় ব্রাহ্মণ সমর্থকবৃন্দের করতালিধ্বনির মধ্যে উত্থাপিত করেন, যখন বেদব্যাস তাঁর জননী সত্যবতীকে হাস্তিনাপুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যান কুরুবংশে দৈবদুর্যোগ সমাগত জেনে, যখন ব্রজপুরে ইন্দ্রের দ্বারা শিলাবৃষ্টি করানো হয়, তখন এমনই সব ক্ষেত্রে আসন্ন বিপদকে অন্তরীক্ষের প্রতিকূলতা বলা হয়েছে। দশরথ এই প্রতিকূলতা আশঙ্কা করেই সত্বর রামের অভিষেক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতে চান। দশরথ-মন্ত্রীরা বোঝেন তাঁর উদ্বেগের কারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মতিও জানান। মন্ত্রী-মণ্ডলীতে নিজের প্রস্তাব অনুমোদিত করিয়ে নিয়েই দশরথ তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ মিত্র রাজাদের আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। এবং সবিশেষ লক্ষণীয় ঘটনা হ'ল, আমন্ত্রিতের তালিকায় তিনি সাবধানে দুটি নাম বাদ দিলেন : তিনি "কেকয়রাজ (অনভ) ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না।"

রাজার সিদ্ধান্ত নির্ভুল। তিনি বুঝেছেন, দেবশিবিরের সঙ্গে ঐ দুই রাজা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাঁর অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই জনক ও বিশ্বামিত্র রাজপুত্রদের বিবাহের আয়োজন সম্পন্ন করেছেন এবং সদূর কেকয় রাজ্য থেকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুধাজিৎ ছুটে এসেছেন দেবশিবিরের নির্দেশেই। পরবর্তী

যে ঘটনা ঘটতে চলেছে সেই চক্রান্তে তাঁরাও অন্যতম শরিক। যখন বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে আসেন আশঙ্কার মেঘ তখনই দশরথকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি গররাজি ছিলেন তাদের পাঠাতে। কিন্তু রাজপুরোহিতদের আদেশ অমান্য করা সম্ভব হয় নি বলেই ছেলে দুটিকে ব্রাহ্মণ নেতার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হন। দশরথের আপত্তি দেবশিবির ভালো চোখে দেখেন নি। দেবশিবিরের বিশ্বাস দশরথ সেদিনই হারিয়ে বসেন। আর সেজন্যই মিথিলাপতি বিবাহের সব আয়োজন সম্পন্ন করে তবেই তাঁকে দূত মারফত ডেকে পাঠান ব্রাহ্মণ নেতাদের আদেশ জানিয়ে। যুধাজিৎ কি কারণে এসেছিলেন, দশরথ তার হদিশ করতে না পারলেও যুধাজিতের আচরণ তাঁকে সন্দিগ্ধ করেছে। দশরথ তাই কেকয়রাজকে তার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় বলে ভাবতে পারছেন না।

রামের অভিষেক স্থির ক'রেই রাজা দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে বললেন, সুমন্ত্র অবিলম্বে রামকে নিয়ে এসো। সভাস্থলে রামের আগমন হ'লে সহর্ষে রাজা বললেন, বৎস! তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করতে মনস্থ করেছি। তুমি তৈরী হও। রাজধর্ম বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশও দিলেন পুত্রকে। তারপর সভাভঙ্গে পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করা মাত্র দশরথ ব্যস্ত হয়ে পুনর্বার রামকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন সুমন্ত্রকে। বিস্মিত সুমন্ত্র আবার রামকে আনতে গেলে রাম সশঙ্কচিত্তে তাড়াতাড়ি সুমন্ত্রকে ("গৃহে প্রবেশ করাইয়া") কক্ষাভ্যন্তরে ডেকে নিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন করিলে সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল।" সুমন্ত্র অবশ্য কিছুই বলতে পারেন নি। দশরথের অন্তরে কোন্ আশঙ্কার প্রতিক্রিয়া চলছে বোধহয় তা সুমন্ত্রের জানা ছিল না। কিন্তু রাজপুত্র রাম বুঝেছেন, কোনো বিশেষ দুর্বিপাক নিশ্চয় ঘটতে চলেছে, তা না হলে কিছুক্ষণ আগে বিদায় দেওয়ার পরই পিতা তাঁকে ডেকে পাঠাতেন না। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত কুটিল। রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ রামচন্দ্রকে দশরথের এই বিচিত্র আদেশ কাজে কাজেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। আর রামেরও দুশ্চিন্তা প্রমাণ করছে যে, তিনিও একটি নেপথ্য চক্রান্তের আভাস পেয়েছেন। এমনটি না হলে রাম সুমন্ত্রের হাত ধরে তাড়াতাড়ি ঘরে এনে একান্তে তাঁকে প্রশ্ন করতেন না।

রাম পুনরায় সাক্ষাৎ করলে দশরথ বললেন, "বৎস!...আমি অশুভ স্বপ্নসকল দেখিতেছি।...দৈবজ্ঞরা কহিতেছেন,...দারুণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদগ্রস্ত হন; এমন

কি ইহাতে তাঁহার মৃত্যুও সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষতঃ মনুষ্যের মতি স্বভাবতই চপল।...আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর।...সুতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব।... শুভকার্যে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে এই কারণে অদ্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে, বৎস, ভরত প্রবাসে কালযাপন করিতেছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়।"[১]

আবার সেই দৈবজ্ঞ। দশরথ দৈবজ্ঞদের মুখে শুধু আসন্ন বিপদ সম্ভাবনার কথাই শোনেন নি, হয়ত বা তাঁর জীবনহানির আশঙ্কা সম্পর্কে স্পষ্ট শাসানিও শুনেছেন। তাই তিনি আর তিলমাত্র দেরি করতে চান না। যদি দেবষড়যন্ত্রের বলি তাঁকে হ'তেই হয়, তবে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় রামকে সিংহাসনে বসিয়েই তিনি সেই অমোঘ মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেবেন।

যুধাজিৎকে রাজার সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে, আর তাই ভরতের নির্লোভ চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা সত্ত্বেও যুধাজিৎ-ভাগীনেয়র ওপরে তিনি বিশ্বাস অটল রাখতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে, দেবতাদের মদতে হঠাৎ ভরতের মতিগতিরও পরিবর্তন হতে পারে এবং তেমন কিছু ঘটলে নির্বিবাদে রামকে অভিষেক করা সম্ভব হবে না। রাজা সেজন্যই ভরতের অনুপস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চান। দশরথ জানেন, ভায়ের বিরুদ্ধে ভাইকে খাড়া করে ঘর ভাঙানোর খেলা খেলতে দেবতারা অভিজ্ঞ এবং পটু। অনভিপ্রেত ভাইটিকে অধার্মিক এবং জাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে ধার্মিক আখ্যা দিয়ে তাঁরা ভ্রাতৃ-বিরোধ শুরু করিয়ে দেন। অযোধ্যার ওপর দখলদারির মতলবে এমনই আর একটি খেলা হতে পারে; এবং সম্প্রতি দেবতাদের বিরাগভাজন দশরথ নিহতও হতে পারেন। এসবই তাঁর দুঃস্বপ্ন, তাঁর বিনিদ্ররজনী যাপনের কারণ।

১। বা. রা./ অনু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য / ভারবি.

মন্থরা-মন্ত্রণা

অভিষেকের দিন প্রাতঃকালে প্রাসাদের ছাদ থেকে আনন্দমুখরিত নগরীর দৃশ্য দেখছিল মন্থরা। কেকয়রাজদুহিতা রাণী কৈকেয়ীর সঙ্গে তাঁর তত্ত্বাবধান করার জন্য মন্থরা এসেছিল অযোধ্যায়। কেকয়িনী মন্থরার বুঝি পছন্দ হ'ল না দৃশ্যটি। সে ত্বরিতপদে নেমে এলো সুন্দরী কৈকেয়ীর মহলে। রাণীকে তিরস্কার ক'রে তাঁর

পিত্রালয়ের পরিচারিকা বললে—হায় রে বোকা মেয়ে! তুমি এখনো নির্বোধের মতো বসে আছো? ওদিকে যে তোমার শিরে সর্বনাশ উপস্থিত!

বিস্মিত চোখে কৈকেয়ী জানতে চান—কেন গো, কী এমন অমঙ্গল ঘটেছে?

—কী আর ঘটতে বাকি আছে! মন্থরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে—রাজা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার আয়োজন করেছেন। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ তো বোঝো না,—কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে চলল।

সংবাদ শুনে উল্টো ফল, সরলমতি কৈকেয়ী সানন্দে মন্থরাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার মুখে ফুল চন্দন। কী আনন্দের খবরই এনেছো। রাম ভরতে কি তফাত আছে? তারা দুজনেই যে আমার কাছে সমান গো। রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ অপেক্ষা প্রিয় সমাচার আর কী হ'তে পারে:

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥

এই ব'লে বাৎসল্যরসামোদিতা কৈকেয়ী সানন্দে তাঁর কণ্ঠহারটি উপহার দিলেন মন্থরাকে।

দুঃসাহসিনী মন্থরা কেকয়রাজ পরিবারের পুরনো পরিচারিকা। কৈকেয়ীকে সে শিশুকাল থেকে লালন করেছে। সুতরাং তিরস্কার করার অধিকারও তার আছে। কেকয়রাজ্যের দাসী রাজনীতিতে চৌকশ এবং সে নিশ্চয় ছিল রাজা অনন্তের একান্ত বিশ্বস্তা, তাই সে সরলা কৈকেয়ীর রক্ষণাবেক্ষণে প্রেরিত হয়েছিল। সুতরাং কৈকেয়ীকে সুখী দেখে তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠে মন্থরা বললে—মূঢ় মেয়ে! রাজা দশরথ দুষ্ট এবং শঠ প্রকৃতি। দেখলে না, কৌশল করে ঐ শঠ বৃদ্ধ ভরতকে এই সময় মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিলেন নির্বিঘ্নে রামকে অভিষেক করার উদ্দেশ্যে।

কৈকেয়ীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য মন্থরা অনর্গল কুমন্ত্র বর্ষণ শুরু করল যদিও রাজনৈতিক ভাবে দেখলে মন্থরার বক্তব্য একেবারে অযৌক্তিকও ছিল না। সে বলেছে, রাম কৈকেয়ীর সপত্নীপুত্র। রামের রাজ্য লাভে ভরতের প্রভাব হ্রাস পাবে, কৈকেয়ীকে তখন কৌশল্যার অধম দাসী হয়ে থাকতে হবে। আজকের প্রতাপ তখন তার থাকবে না। তাছাড়া···সর্বশেষে মোক্ষম আঘাত হেনে মন্থরা বলে—তাছাড়া, ভরত রামের পিঠোপিঠি। রাজ্যে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য রাম ভরতের সর্বনাশ করতে পারে। রাজনীতি বড়ই নিষ্ঠুর। হয়ত ভরতকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে অথবা হত্যাও করতে পারে।···

নাঃ! কৈকেয়ী দুই হাতে দুই কান চেপে ধরেন। আর সর্বনাশের কথা শুনতে

চান না। তিনি মা। সব ছাড়তে পারেন। পারেন না নিজপুত্রকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিতে। অতএব মন্থরার উদ্দেশ্য তাঁর মনে অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া শুরু করে। তিনি প্রস্তুত হন মন্থরা-মন্ত্রণা অনুসারে রাজার সঙ্গে কী ভাবে বাক্যালাপ করবেন, তার জন্য।

মন্থরার ধৃষ্টতায় আমরা কিন্তু বিস্মিত না হয়ে পারি না। সামান্য পরিচারিকা রাজা দশরথকে শঠ প্রবঞ্চক ব'লে গালমন্দ করার দুঃসাহস পায় কোত্থেকে? কী ভাবে কৈকেয়ীর সরল বিশ্বাসী মনকে বিপথচালিত করতে হবে তাও সে জানে নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের মতো। আলোচনা করে কূট রাজনীতির। এই সমস্ত আচরণ সাধারণ পরিচারিকসুলভ নয়। সে এই ইঙ্গিতও করেছে যে, দশরথ কৌশলে ভরতকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রামকে দশরথ বলেছিলেন, যুধাজিৎই ভরতকে নিয়ে যেতে চান। ভরতের মাতুলালয় গমনকে মন্থরার মতো এক নারীর পক্ষে রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার। মন্থরার কাজটির পেছনে কোনো কূটনৈতিক চাল ক্রিয়াশীল কিনা এ বিষয়ে কাজেকাজেই সন্দেহ জাগে। যুধাজিতের হঠাৎ অযোধ্যায় আগমনের রহস্য ফিরে মনে পড়ে।

যুধাজিৎ নিশ্চয় খবর নিয়ে এসেছিলেন যে মিথিলায় দশরথপুত্রদের বিবাহপর্ব প্রস্তুত। কিন্তু তিনি সরাসরি মিথিলা না গিয়ে অযোধ্যায় দশরথের অনুপস্থিতি-কালে একরাত্রি অতিবাহিত ক'রে গেলেন কেন? তবে কি এই সুযোগে তিনি কেকয়রাজ পরিবারের একান্ত বিশ্বস্তা রাজনীতি-অভিজ্ঞা মন্থরার সঙ্গে একান্তে বৈঠক ক'রে গেছেন? আসন্ন ঘটনাবলীর আভাস দিয়ে তাকে তার ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন সারারাত? বলেছেন কি, ঘটনাবর্তে রাজা দশরথ বিচলিত হয়ে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে পারেন এবং অভিষেকের আয়োজন হয়েছে দেখলেই মন্থরা যেন অবিলম্বে কৈকেয়ীকে আপন সন্তানের শুভাশুভ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। কৈকয়ীকে যেন বোঝানো হয় কূটকৌশল করে দশরথই ভরতকে সরিয়ে দিয়েছেন সুতরাং ভরতের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত হচ্ছে যা নিবারণ করা এখনই দরকার।

চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। এ ধরনের মন্ত্রণায় সরলমনা কোন্ মা বিপদ গণনা না করবেন। কিন্তু এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা শঠ রাজনীতিকেরই মাথাতেই আসতে পারে। মন্থরার মতো সামান্যা পরিচারিকার দ্বারা প্ল্যান করে কৈকেয়ীর মন ভাঙানো সম্ভব নয়। সেজন্যই যুধাজিতের বিশেষ সময় অকস্মাৎ আগমন ও প্রত্যাবর্তনকে আমরা সন্দেহের বাইরে রাখতে পারি না। পরবর্তী

ঘটনা এই পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটেছে।

মন্থরা-মন্ত্রণায় বিরক্ত হয়ে কৈকেয়ী বলেছেন, রাম জ্যেষ্ঠ, রাজ্য তো তারই প্রাপ্য। কেন মিছিমিছি অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছ তুমি ?

উত্তরে মন্থরা বলেছে, দেখো, "নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজকার্য পরিচালনার ভারার্পণ" করেন। দেখো, রাম লক্ষ্মণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ। "রাম লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণ হন্তারক হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" বার বার ভরতের অমঙ্গল আশঙ্কা নানাভাবে ব্যক্ত হলে ভীতা কৈকেয়ী বলেছেন, এখন "কী উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা অবধারণ কর।

"মন্থরে! আজই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজই ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।"

কৈকেয়ী বস্তুত নিষ্পাপ সরলা এক নারী। রাজকর্মের কিছুই বোঝেন না। ভরত অনুপস্থিত, তবু তিনি বলেন, আজই তিনি তাকে রাজ্যে অভিষেক করাবেন বৃদ্ধ রাজাকে বশীভূত করে। অবাস্তব ধারণার বশবর্তিনী জানেন না, কীভাবে রাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। তাই তাও মন্থরার কাছেই জানতে চান। মন্থরা উপদেশ দেয়, কৈকেয়ী যেন অলঙ্কার ত্যাগ ক'রে ভূমিশয্যা গ্রহণ করে। তাহলেই বৃদ্ধ রাজা কুশল প্রশ্ন করবেন, কৈকেয়ীর মান ভাঙাবার চেষ্টা করবেন। সুযোগ বুঝে কৈকেয়ী তখন যেন রাজার কাছে প্রথমেই কথা আদায় ক'রে নেয়, সে যা চাইবে রাজা তাকে তাই দেবেন। রাজা যদি অলঙ্কার দিতে চান তাতে যেন কৈকেয়ী সংকল্পচ্যুতা না হয়। কথা তাকে আদায় করতেই হবে এবং রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে সে চাইবে ভরতের অভিষেক এবং রামের নির্বাসন। চোদ্দ বছর রাম বনবাসে থাকলে সেইসময় ভরত প্রজাদের বশীভূত ক'রে নিজের রাজত্ব নিষ্কণ্টক করে নিতে পারবে। কৈকেয়ী, যেমন শেখানো হয়েছে সে ভাবেই, রাজাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করে ফেলেন।

পরবর্তী ঘটনা আলোচনার আগে একটি প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। নানা জনের মনে প্রশ্নটি উঠতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে, কেকয়রাজ দেবশিবিরের সঙ্গে কোন্ স্বার্থে চক্রান্তে লিপ্ত হলেন তাঁরই জামাতার বিরুদ্ধে? উত্তর সোজা। রাজা অনভ তাঁর কন্যা কৈকেয়ীর সমৃদ্ধি চান। চান নাতি ভরতই রাজা হোন।

পররাজ্য আপনজন শাসিত হলে তাতে রাজনৈতিক লাভ আছে। এমন রাজনৈতিক লাভের জন্য আজও তো দেখি পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন। এইসব রাজনীতি এবং কুবুদ্ধি দ্বারা আর্যাবর্তের একে এক অপরের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে দেবতারা ফায়দা তুলতেন। দেবতারা হয়ত রামের রাজপুরুষকে আশু অভিষেকের আঁচ পেয়ে তা কেকয়রাজকে জানান। এবং ভরতকে অযোধ্যা থেকে সরিয়ে নিতে পরামর্শ দেন। ভরত এই সময় অন্যত্র থাকলে অযোধ্যার প্রজাবর্গ ভরতকে নির্দোষ ভেবে তাঁর প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখতেন না। তাতে ভরতের পক্ষে রাজ্যশাসনও সহজ হবে। হয়ত দেবতারা ভরতকে সিংহাসনে বসাবেন বলেও কথা দেন, অবশ্য যদি অনভ তাঁর কন্যা কৈকেয়ীকে সঠিকভাবে চালনা করে দশরথের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। বাকি সমস্ত দিক দেবতারাই সামলাবেন।

দেবশিবিরের সঙ্গে এমন একটি সমঝোতায় এসে অনভ যুধাজিৎকে পাঠিয়ে দেন ভরতকে কেকয়রাজ্যে আনার জন্য। না হলে হঠাৎ নাতিদর্শনে অনভের এই আকস্মিক উদ্বেজনা হবে কেন? ইতিপূর্বে ভরত তাঁর এতো আদরের নাতি ছিলেন বলে প্রমাণ নেই।

ঘটনার কুটিল গতি অতঃপর সেই খাতেই গড়িয়ে চলল। যথানির্দিষ্ট উপায়ে কৈকেয়ী রাজাকে "বচনবদ্ধ" করলেন "স্বসৌন্দর্যে বশীভূত" করে। কৈকেয়ীর অভিলাষ না জেনেই রাজা তাঁকে তাঁর অভীষ্ট প্রদান করবেন বলে কথা দিলেন।

কৈকেয়ী বললেন, "মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। রাম দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বৎসর তপস্বীবেশে কাল যাপন করুন।" কৈকেয়ী নিতান্ত বালিকা। বিনা ভূমিকায় তাঁর এই প্রার্থনার ফলাফল কি তাও তিনি জানেন না। জানেন না কেন রামকে দণ্ডকারণ্যে চোদ্দ বছরের জন্য পাঠানোর প্রস্তাব তাঁকে দিয়ে করানো হল। চোদ্দ বছরের বিশেষ তাৎপর্যই বা কি? পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে রামকে দণ্ডকারণ্যেই বা কেন পাঠাতে হবে? যদি কথাই আদায় করতে হয় তবে নির্বাসনের মেয়াদই বা কেন হল না আজীবন? এতো গূঢ়তত্ত্ব কৈকেয়ী জানেন না, ভরতকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করাই তাঁর একমাত্র চিন্তা এবং তাই তিনি মুখস্ত বলেছেন শেখা-বুলি। পৃথিবীতে দণ্ডকারণ্য কোথায়, হয়ত তাও ছিল কৈকেয়ীর অজ্ঞাত। তিনি ভেবে দেখেন নি, এতো জায়গা থাকতে দণ্ডকারণ্যেই বা রামকে নির্বাসিত

করার বাসনা কেন? সেকালে অরণ্যের কি অভাব ছিল? দশরথ স্তম্ভিত। কৈকেয়ীর চরিত্র তাঁর জানা আছে। তিনি জানতেন, কৈকেয়ী খুশিই হবেন রামের অভিষেক সংবাদ শুনে। তাঁর মনে পাপ নেই। কিন্তু এই আকস্মিক আঘাতে দশরথ ভাবলেন, এ তিনি কী শুনছেন? "ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ"? [১]

মিথ্যাই বলা হয়েছে স্ত্রৈণ দশরথ কৈকেয়ীর প্রভাবে রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন। বরং দেখি কৈকেয়ীকে রামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অংশীদারণী দেখে রাজা তাঁর সমস্ত সংযমের শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে উত্তেজিত অভব্য ভাষায় তিরস্কার করেছেন প্রিয় তরুণী ভার্যা পাঞ্জাবনন্দিনী কৈকেয়ীকে। বলেছেন: "নৃশংসে! দুশ্চারিণী! কুলনাশিনি! পাপীয়সি!" [নৃশংসে দুষ্ট চরিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি] "তুমি এখনই এই অভিপ্রায় ত্যাগ কর।" তারপর মনের সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, "বিশেষ কারণ ভিন্ন তোমার চিত্তের যে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না।" অর্থাৎ, বিশেষ কারণ ব্যতীত তুমি এমন প্রস্তাব করতে পারো বলে আমি বিশ্বাস করি না।

এবারেও দেখছি, দশরথের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। তিনি ঘরে-বাইরে চক্রান্তের আভাস পেয়েছেন। বলেছেন, "কৈকেয়ি! তুমি যখন দুর্দৈববশতঃ আমার আলয়ে বাস করিতেছ।" তখন দেখছি, ইক্ষ্বাকুকুল ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, "কালসহকারে তাহাই ঘটিল।"

'দুর্দৈব' এবং 'কালসহকার' শব্দ দুটি আমাদের অপরিচিত নয়। দেবশিবির রচিত দুর্দৈব উপস্থিত হলে দেবতার দূত কালের আবির্ভাব ঘটে ধ্বংসের বারতা বহন করে।

সুতরাং যা অনিবার্য, রাজা দশরথ অথবা কৈকেয়ীর তা আর নিবারণ করার ক্ষমতা নেই। এখন তারা চান বা না চান, দেবতাদের স্বার্থে রামকে দণ্ডকারণ্যে যেতেই হবে, এবং তাঁর অনুপস্থিতির কালে ভরতকে হাল ধরতে হবে অযোধ্যার। এটাই দেবতাদের ইচ্ছা। ব্রহ্মার এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যিনিই বাধ সাধবেন, মৃত্যু এবং ধ্বংস তাঁর অনিবার্য।

১। 'গ্রহবিশেষের আবেশ' বলতে অন্তরীক্ষে ভ্রমণকারী দেবতা এবং তাঁদের বার্তাবহ দৈবজ্ঞদের প্রসঙ্গে ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। দশরথ ভাবছেন, এও কি সেই একই চক্রান্তের জের! তবে কি ভ্রাতা যুধাজিতের মতো কৈকেয়ীও কূটচক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছিল?

সরলা কৈকেয়ীকে দশরথের সঙ্গে কথোপকথনকালে অকস্মাৎ অতি নির্দয় এবং প্রাণহীন যন্ত্রবৎ পুত্তলীমাত্র হয়ে উঠতে দেখে বাস্তবিক বিস্মিত হ'তে হয়। যিনি ক্ষণপূর্বে রামের অভিষেক সংবাদ শোনামাত্র মন্থরাকে নিজের কণ্ঠহার উপহার দিয়েছেন তিনি রাজার দীন প্রার্থনা এবং সমস্ত কঠিন তিরস্কার উপেক্ষা ক'রে বললেন, "নরনাথ। দেখিতেছি তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, তুমি ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত নিরন্তর বিহারের বাসনা করিতেছ।" বললেন, যা ঘটবেই "কিছুতেই (তার) ব্যতিক্রম হইবার নয়।"

'ধর্ম' শব্দের যাদুস্পর্শে মন্ত্রপূত ভুজঙ্গের মতোই, দেখা গেল, দশরথ তাঁর বাক্যবিষভাণ্ডটির মুখ বন্ধ ক'রে তীব্র যন্ত্রণায় 'হা রাম!' শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করলেন এবং "ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইলেন।" ধর্মের আঘাত এমনই সাঙ্ঘাতিক যে কিছুক্ষণের জন্য তিনি হতচেতন হয়ে পড়ে থাকলেন। পরে সম্বিৎ ফিরে এলে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "বল, কে তোমাকে এই অসৎ বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল!" অর্থাৎ কৈকেয়ীর মুখে 'ধর্মে'র উল্লেখমাত্র দশরথ বুঝেছিলেন, আর সন্দেহ নেই, কৈকেয়ীকে ধর্মভূতে ধরেছে। নেপথ্যে দেবতার রক্তচক্ষু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'ধর্ম' শব্দটি তাঁদেরই একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক 'কোড ওয়ার্ড'। রাজা বলেছেন, কৈকেয়ী, বুঝলাম, তুমি ভূতাবিষ্ট হয়েছ, তাই তোমার আচরণে বৈপরীত্য লক্ষিত হচ্ছে। তুমি "শত্রুবর্গের আনন্দবিধান" করছ। কিন্তু আমি "এই অনিষ্টকর কঠিন অনুরোধ কখনই রক্ষা করিব না।"

বস্তুত দৈব-ইচ্ছা সম্পর্কে সজাগ হয়েই তিনি রামের অভিষেক করতে মনস্থ করেছেন। দৈবকেও আর তিনি গ্রাহ্য করেন না। জানেন, "সুখের কথা দূরে থাকুক, (এখন তাঁর) জীবন (নিয়েই) সংশয় উপস্থিত"। তবু দৈব-ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি নারাজ। দশরথ এই সময় সম্পূর্ণভাবে তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ক্রোধ উষ্মা সবটুকুই বর্ষণ করেছেন কৈকেয়ীর ওপর, যাঁকে মুখ বুজে সইতে হচ্ছে সবই। রাজার চেয়ে তিনিও যে কোনো অংশেই কম অসহায় নন। দেবরিচ্ছার নাগপাশ তাঁকেও জড়িয়ে ফেলেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। তিনি বুঝেছেন, কিছুই করণীয় নেই। রাজা বিকারগ্রস্তের মতো প্রলাপ বকছেন নিজের অসহায় অবস্থায় জর্জরিত হয়ে। সুতরাং তিনি যে গালমন্দ করছেন, সেটা তাঁর অন্তরের উক্তি নয়, তিনি তাঁর ক্ষোভ মিটিয়ে নিচ্ছেন আদরিণী ভার্যাকে আঘাত হেনে।

দশরথ তখন এমনই বিমূঢ় যে অসহায় কৈকেয়ীর যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছেন অবাস্তব প্রস্তাব ক'রে। যদিও জানেন, যা দেবনির্দেশ এবং অনিবার্য, তাকে

মানতেই হবে, যদিও জানেন, সে নির্দেশ অমান্য করার জন্য তাঁর শিয়রে মৃত্যু আসন্ন, তবু বশ্যতা স্বীকার করে রামকে বনবাসে পাঠাতে তিনি অক্ষম। নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো দুর্বল কৈকেয়ীকেই কাতর ভাবে অনুরোধ করছেন, তুমি আমার অহিতাচরণ করো না, "আমি তোমার চরণ ধরি, তুমি প্রসন্ন হও!" আঘাতের ধাক্কায় বার বার মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। একটি ভয়ঙ্কর কালরাত্রি সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে গ্রাস করেছে কৈকেয়ীর প্রসাদকক্ষ। এমন পিতৃস্নেহকে যে কাব্যপুরাণ দোষারোপ করে সে গ্রন্থের নিষ্ঠুরতা অসামান্য।

সমগ্র ঘটনস্রোতে যা আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা হল, কৈকেয়ীর মুখে ধর্মাধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতার উদ্গার, যা তাঁর এতাবৎকাল পরিচিত চরিত্রে অপ্রত্যাশিত। এই বক্তৃতামালায় কিছু প্রাচীন পুরুষের ব্রাহ্মণ সেবায় আত্মদান করার ঘটনাও উল্লেখিত হয়েছে। অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গে ব্রাহ্মণ পদে আত্মসমর্পণের উপদেশ কৈকেয়ীর মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব বক্তৃতা যে কৈকেয়ী বস্তুতই দিয়েছিলেন দশরথের প্রত্যুক্তির ধারায় তা সুস্পষ্ট হয় নি। কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে রাজাকে বলেছিলেন, দেবাসুর যুদ্ধে আহত রাজাকে যখন তিনি সেবা করেন, দশরথ নাকি তখনই তাঁকে বরদান করতে চান, কিন্তু কৈকেয়ী উপযুক্ত সময় সেই বর প্রার্থনা করবেন বলেন। ব্যাপারটি যেমন কৈকেয়ীকে শোনানোই হয়েছিল, এ বিষয়ে তাঁর মুখে ঘটনা স্মরণের স্বীকৃতি কিছু শোনা যায় নি, তেমনি দশরথকেও গল্পটি শোনানো হ'লে এ সম্পর্কে তিনিও কোনো কথা বলেন নি। এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করাও তাই সম্ভব নয়।

কৈকেয়ীকে বরদানের প্রসঙ্গটির বাস্তবতা অস্বীকার করে তাই স্বভাবত যুক্তিবাদী লক্ষ্মণ বলেছিলেন, "যদি বর প্রসঙ্গ সত্য হইত, অভিষেক আরম্ভের পূর্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল?" লক্ষ্মণ স্পষ্টতই বুঝেছিলেন রাম-অভিষেকে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির পরিকল্পনাটির উৎস কোথায়? বুঝেছিলেন, দৈব অর্থাৎ দেবতারাই নেপথ্যের ষড়যন্ত্রী।[২] তাই রামকে তিনি বলেন, "আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত…দৈবের প্রশংসা করিতেছেন।… এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না।…আপনি যে-ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি।"

২। বা. রা / অযোধ্যাকাণ্ড, বিংশ সর্গ

লক্ষ্মণের জানা ছিল ধর্ম কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা নয়, ধর্ম ও দৈব বলতে একটি পক্ষ ও স্বার্থান্বেষী শিবিরকেই বোঝায়। একটি তত্ত্বকে মান্য বা অমান্য করা যায়, তত্ত্ববিষয়কে কেউ 'দ্বেষ' করে না। তার বিরুদ্ধে অসিযুদ্ধও ঘোষণা করে না। লক্ষ্মণ ষড়যন্ত্রী ধর্মের বিরুদ্ধে দৃপ্ত দুর্যোধনের মতোই যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্রস্তুত ছিলেন। বলেছেন, "আর্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন।"

এতো অজস্র ধর্মকথা ব্যর্থ হয়ে যায় যখন জননী কৌশল্যাও তথাকথিত দৈব ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ধর্মের পার্থক্য উল্লেখ করে রামকে বলেন, "ইহারই (লক্ষ্মণের) মতানুবর্তী হও।···কৈকেয়ীর অধর্মজনক বাক্যে শোকবিহ্বল জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্মানুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর। তাহাতেই তোমার ধর্ম সঞ্চয় হইতে পারিবে।"

দেবাদেশই ধর্ম, এই পৌরাণিক ব্যাখ্যা কালক্রমে ব্রাহ্মণবিজিত ভারতবর্ষে ভাগবৎ-পাঠ-নির্ভরশীল ভারতবাসীকে বোঝানো হয়েছিল। ক্রমশ নানান পাঁচালী ও কুসংস্কার তার প্রচারকে অব্যাহত করল যখন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ সুরবিরোধী নৃপতিদের হারিয়ে অসহায় ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের পায়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হ'ল। কিন্তু দেবতারা যতদিন প্রত্যক্ষভাবে সশরীরে যুদ্ধ ধ্বংস এবং হত্যালীলায়, চক্রান্ত শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় কৃতিকর্মা রূপে আসমুদ্র হিমাচলে তৎপর ছিলেন, ততকাল তাঁদের স্বার্থসাধক পাঁচালীনির্ভর ধর্মকে কেউ আধ্যাত্মিক সদাচার অথবা ধর্মাচার বলে গণ্য করতেন না। দৈবধর্ম বলতে সেকালে দেবরাজনীতিই বোঝাতো। দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করারও কোনো কারণ তখন দেখা দেয় নি। এজন্যই লক্ষ্মণ কৌশল্যা দশরথরা দৈবধর্মের বিরুদ্ধাচারে ধর্মভয় করেন না। এজন্যই দুর্যোধন বলেছিলেন, তিনি এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী, দেবতাদের কোনো ঐশী ক্ষমতার বুজরুকি তিনি স্বীকার করেন না, তাঁদের সূচ্যগ্র মেদিনীও বিনাযুদ্ধে অর্পণ করতে রাজি নন এবং তাঁর দেশপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীয় সমস্ত ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গ তাঁরই নেতৃত্বে তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হন। বর্ণাশ্রমধর্মী আর্য-আগ্রাসন প্রতিহত করতে সমুদ্রতরঙ্গের মতো ধেয়ে আসেন তাঁরা। তাই দেখি, কৃষ্ণের যদুবংশীয় বীরপুরুষদের অধিকাংশ সহ তাবৎ ভারতবর্ষ সেদিন কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে ধর্মযুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন দুর্যোধনের নেতৃত্বে। অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাঁরা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন সত্যধর্ম। ওদিকে দেবশিবির সহ পাণ্ডবপক্ষে পাঁচটি মাত্র রাজ্য যোগদান করেছিল।

অস্পষ্ট ধর্মাধর্ম বিতর্কের মধ্য দিয়ে সেই ভয়াল রজনী অতিবাহিত হ'লে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত দশরথ প্রত্যূষের ফরসা আকাশের দিকে তাকিয়ে পুনরায় যেন হৃত মানসিক বল ফিরে পেলেন। অর্ধ উন্মাদের মতো ক্ষিপ্ত স্বরে ব'লে উঠলেন, না, আমি কোনো কথা শুনব না। সব কিছু অবমাননা ক'রে রামকেই রাজ্য দেব। তখন কৈকেয়ীর মুখে শোনা গেল কঠিন আদেশের সুর, কৈকেয়ী বললেন, "তুমি এখন এ আবার কি প্রকার কথা কহিতেছ ?···এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শত্রু দূর না করিয়া এ স্থান হইতে এক পাও যাইতে পারিবে না।

"তখন অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ী! **আমি ধর্মবন্ধনে বদ্ধ** হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় কর; আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।"

এক রাতের মধ্যে কৈকেয়ী ও দশরথের আমূল পরিবর্তন বাস্তবিক বিস্ময়কর। ইতিপূর্বে কৈকেয়ীকে যে ভাষায় গালমন্দ করেছেন দশরথ, ঘোষণা করেছেন কৈকেয়ী ও ভরতকে ত্যাজ্য করবেন বলে, বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর ভরত তাঁর মুখাগ্নি করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হলো, সেই একই দশরথ হঠাৎ কৈকেয়ীর দ্বারা বশীভূত হলেন, এমন ঘটনা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইতিপূর্বে কৈকেয়ীও কখনো রামকে 'শত্রু' বলে উল্লেখ করেন নি। এখন তাঁর মুখে এই শব্দ শুনে অবিশ্বাসী মন আমাদের বলছে, একথা আদৌ কৈকেয়ীর মুখে উচ্চারিত হতে পারে না, শব্দটি বসানো হয়েছে কৈকেয়ীকে লোকচক্ষে হীন করার জন্যই। তাঁর সংলাপে একটি কথাই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তা হ'ল, তাঁর উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা, "মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কি প্রকার কথা কহিতেছ ?" অর্থাৎ দশরথের মত পরিবর্তনে যে সর্বনাশ উপস্থিত হ'তে পারে সেই কথা ভেবেই কৈকেয়ীর উদ্বেগ।

প্রশ্ন তাই, তবে কি রাত্রে কোনো এক সময়ে দশরথ রামকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে রাজি হয়েছিলেন ? তাঁর ওপর কি দেবনিশাচরদের চাপ অনিবার্য হয়েছিল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা তাঁর স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল ? এমনটিই হয়ত ছিল প্রকৃত ঘটনা, আর তাই সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আদেশ স্মরণ করে দশরথ তাঁর রাজকীয় ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। শোনা যায় নিদারুণ কাতর অসহায় উক্তি, "**আমি ধর্মবন্ধনে বদ্ধ**।" দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলেন, "আর দ্বিরুক্তি করিব না। কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।" বস্তুত রাজা নিরুপায়।

তিনি এখন স্বগৃহে কার্যত বন্দী। কৈকেয়ীর বয়ানে তাঁর এই বন্দিত্বের ঘটনাও মহাকবি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় ছন্দবদ্ধ করে গেছেন। কৈকেয়ী বলেছেন, রামকে বনবাস না দিয়ে রাজা অতঃপর ঐ কক্ষ থেকে এক পা-ও কোথাও যেতে পারবেন না।

ইতিপূর্বে কৈকেয়ী ধর্মের উল্লেখ করে বলেছিলেন, মহারাজ! রামের যাত্রা ও ভরতের রাজ্যলাভ অনিবার্য, এর ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। এই অনিবার্যতা, এই ব্যতিক্রমবিহীন বদ্ধ অবস্থা—এসবই নেপথ্যের মহাশক্তির অস্তিত্ব ইঙ্গিত করছে। একথা যেমন সীতা বলেছেন, তেমনিই রামও স্বীকার করেছেন। এই পর্বে রামের আচরণও লক্ষণীয়।

রাম প্রথম বিস্মিত হন দশরথ তাঁকে দুবার আহ্বান জানিয়ে অভিষেকের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করলে। দ্বিতীয়বার তাঁর জন্য অধিকতর বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল। অভিষেকের দিন রাজা প্রত্যুষেই তাঁর সাক্ষাৎ চেয়ে সারথি সুমন্ত্রকে পাঠিয়েছেন জেনে হৃষ্টমনে রাম সীতাকে বলেছিলেন, মহারাজ কৈকেয়ী ভবনে আমার সাক্ষাতের অপেক্ষা করছেন। "কৃষ্ণলোচনা কৈকেয়ী নিরন্তর মহারাজের শুভকামনা করেন।" তিনিও নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন আমারই জন্য। এই বলে রথারোহণে তিনি মহারাজের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাম নিজেও যে অত্যন্ত আনন্দিত তাঁর এই কথায় তা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, যা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। রামচন্দ্র কিন্তু বিস্মিত হলেন কৈকেয়ীর কক্ষে প্রবেশমাত্র। দেখলেন, দশরথের চেহারায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি ক্লেশ ক্লান্ত, যেন জীবন্মৃত। রামের দিকে তাকিয়ে কেবলমাত্র অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে পারলেন, "রাম!" নামটি উচ্চারণ করেই তাঁর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। **"পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহার"** (দশরথের) অবস্থা দেখে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন।

মহাকবি এখানে দুটি মাত্র শব্দে অনেক কথাই বলে নিলেন। শব্দ দুটি আপাত-তুচ্ছ। কিন্তু 'সুচতুর রাম' এই শব্দদ্বয় জানিয়ে দিল রামচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই মুহূর্তে অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছে। রাম দশরথের বিপদাশঙ্কার কথা আগেই শুনেছেন। এখন বুঝলেন, বিপদ তাঁর পিতাকে ইতিমধ্যেই গ্রাস করেছে। দশরথ বদ্ধ হয়েছেন ষড়যন্ত্র জালে।

দশরথ স্বমুখে কিছুই বলতে পারলেন না। দণ্ডকারণ্য যাত্রার নির্দেশ দিলেন কৈকেয়ী। তিনি বললেন, "জল নির্গত হইয়াছে, আলিবন্ধনে যত্ন নিরর্থক।" অর্থাৎ যা অনিবার্য তাকে মেনে নিয়ে রাম তুমি প্রস্তুত হও যাত্রার জন্য। সপ্তদশ

বর্ষীয় রাম[৩] মুহূর্তমধ্যে আশ্চর্য ভাবে পরিবর্তিত হলেন। অতঃপর তাঁর কথাবার্তা, আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। দেখা গেল, তিনি যেন দণ্ডকারণ্য যাত্রার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল এবং এই যাত্রাপথে যে কোনো প্রতিবন্ধকই তিনি নিষ্ঠুর ভাবে উচ্ছিন্ন ক'রে অগ্রসর হ'তেই বদ্ধপরিকর। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এমন আকস্মিক ওলটপালটের জন্য রামায়ণকার যাঁকে একমাত্র দায়ী ব'লে প্রতিপন্ন করতে বহু বাগ্‌বিস্তারের দ্বারা অসম্ভব, অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য একটি কারণকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, রামচন্দ্র তার উল্লেখমাত্র করলেন না, উপরন্তু কৈকেয়ীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মহীয়সী মহিলা বলে ঘোষণা ক'রে ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত বিদ্রোহী লক্ষ্মণকে উত্তেজনা সম্বরণ করতে আদেশ দিলেন। রামের এমন আচরণ কৌশল্যা এবং লক্ষ্মণ সহ রাজপ্রাসাদের সকলকে তো বটেই আমাদেরও বিস্ময়ে মূক ক'রে দিল। সকলেই হয়ত বোঝবার চেষ্টা করলেন যে দশরথ কৈকেয়ী এবং রামচন্দ্রের মধ্যে রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিশ্চয় এমন কোনো গূঢ়তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে যার ফলে দণ্ডকারণ্য যাত্রাই শ্রেয়স্কর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে রামচন্দ্রের কাছে। কৈকেয়ীর নির্দোষিতায়ও রাম নিঃসন্দেহ হয়েই এসেছেন।

পুত্রবৎসল দশরথ রামকে ছেড়ে এক দণ্ডও থাকতে পারেন না। সেই প্রাণাধিক রাম দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করবেন, তাতে তাঁর মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও পিতৃস্নেহ তরুণ পুত্রকে কোনো বিপদের মুখে সমর্পণ করতে রাজি নয়। বিশ্বামিত্রের সঙ্গেও রামকে যেতে দিতে তিনি আপত্তি তুলেছিলেন। দেবতাদের আদেশ হলেও পুত্রের জন্য সে আদেশ অমান্য করতে দশরথ কিছুমাত্র বিচলিত হতেন না। কিন্তু যুধাজিৎ এসে এমনই ব্যবস্থা করে গেছেন যে দশরথ এখন কার্যত বন্দী। আর সেই ধর্মবন্ধন তাঁকে পুত্রের বিয়োগব্যথাও নীরবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে। আর এটাও সুনিশ্চিত যে দশরথ সুন্দরী তরুণী ভার্যার প্রভাবে রামের দণ্ডকারণ্য যাত্রার আদেশে সম্মতি দেন নি। তাঁর ক্ষেত্রে অসহায় নীরবতার অন্যতর গূঢ়তর কারণ অবশ্যই ছিল। রাম এসবই নিশ্চয় বুঝেছিলেন। সে জন্যই কৈকেয়ী বা দশরথের প্রতি কোনো ক্ষোভ এ সময় তিনি প্রকাশ করেন নি।

লক্ষ্মণ যখন প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলছেন, এই গর্হিত আদেশ দানের জন্য প্রয়োজনে তিনি পিতৃহত্যা করতেও পশ্চাৎপদ হবেন না।[৪] তখন তাঁকে

৩। বা. রা. অ. কাণ্ড / ২০ সর্গ ভারবি।

৪। ঐ।

ভৎর্সনা করে রাম বলেছেন, "পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্মসংক্রান্ত। ...বনগমনে কোনমতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কহিতেছি, তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয় ধর্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর।"[৫]

আবারও সেই ধর্মসংক্রান্ত গূঢ়তত্ত্বের দোহাই। এই শব্দটি মুহূর্তমাত্রে সকল তর্কের অবসান করতে পারে দেবানুরক্ত সমাজে। এক্ষেত্রে তাই-ই হ'ল। এক সমগ্র অযোধ্যা 'ধর্ম' শব্দের যাদুতে হাহাকার মাত্র সম্বল করে রামচন্দ্রকে বিদায় দিলো। উৎসবমুখর নগরী তার সমস্ত সাজসজ্জা আভরণ খুলে ফেলে বিবাহরাত্রে বৈধব্যবরণের ন্যায় নিষ্ঠুর নিয়তিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মূক ও বধির হয়ে গেল।

দশরথপুত্রদের বিবাহ যেমন নিরানন্দের, রামের দণ্ডকারণ্য যাত্রাও তেমনি শোকচ্ছায়ামণ্ডিত নিঃশব্দ নিষ্ক্রমণ। এই দুই ঘটনার কার্যকারণ অযোধ্যাবাসী কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। দুর্বোধ্য হয়ে রইল এ ঘটনা আমাদের কাছেও যুগ যুগ ধরে।

যশাভিলাষী রামের বনগমন

রাম যাবেন বনবাসে ধর্মসংক্রান্ত কারণে। কারণটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'লেও দেবনির্দেশে এবং দেবতার ভাবমূর্তি রক্ষাকল্পে সে কারণকে প্রকাশ্যে স্পষ্টতা দেওয়ার সুযোগ নেই। গূঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের নেপথ্য-কারণ সাধারণ্যে অপ্রকাশ্যই থাকে। সাংবাদিকের প্রশ্নে সদুত্তর দিতে পারেন না যেমন মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণকারীরা; এজন্য বহুজনের বহু অবুঝ দোষারোপও যেমন তাঁদের বিনাপ্রতিবাদে সহ্য করতে হয়; কৈকেয়ীর রুদ্ধদ্বার কক্ষে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তার ফলে তিন প্রধান চিরকাল বিভিন্ন দোষের ভাগী হ'লেও একই কারণে মুখ খুলে স্বদোষ স্খালনের চেষ্টা করার সুযোগ পান নি। দশরথ কামুক, রাম অদ্ভুত পিতৃসত্য পালনকারী এক দুর্বলচেতা পুরুষ এবং কৈকেয়ী ক্ষমতালোভী, ষড়যন্ত্রকারিণী, মহিলারূপে চিরকাল কীর্তিত হয়ে রইলেন। যদিও এসবের কোনটিই সত্য নয়।

কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারার অসহায়তা রামকে বিরক্ত ও রুষ্ট করেছে। লক্ষ্মণকে তিনি বলেন, ধর্মার্থে ক্ষাত্রতেজ সংহরণ করতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যস্বার্থে

৫। বা. রা. অ. কাণ্ড / ২০ সর্গ / ভারবি।

ক্ষাত্রতেজ বিসর্জন দিতে। বিলাপকারিণী জননী কৌশল্যাকে নিষ্ঠুর বাক্য শাসন করে বলেছেন, "আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার (পিতার) সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম।" মহানুভব রামচন্দ্র শোকবিহ্বলা গর্ভধারিণীকে পরশুরামের নজির উল্লেখ করে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করতেও ইতস্তত করেন নি। অর্থাৎ দেবস্বার্থ রক্ষার্থে রাম মাতৃহত্যাও শিরোধার্য বলে মানেন। মাকে বলে যান, "স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু।" বেশ বোঝা যায়, এই নির্দেশ পুরুষশাসিত পুরোহিততান্ত্রিক সমাজের আইন, রামের মুখ দিয়ে তা প্রচার করা হয়েছে। অবশ্য রাম নিজেও সেই সমাজেরই শাসনাধীন। সুতরাং এই সংলাপ তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত বলেও ধরে নেওয়া যায়।

কৌশল্যাকে ধর্মোপদেশ দিলেন রামচন্দ্র। এমন কি রক্তচক্ষু প্রদর্শন ক'রে পরশুরামের উল্লেখ করতেও তাঁর পুরুষোত্তম জিহ্বা আড়ষ্ট হ'ল না অথচ পিতা দশরথের জীবনমরণ সমস্যার যিনি কারণ বলে কথিত সেই কৈকেয়ী সম্পর্কে রামের মুখে শোনা গেল বাছাই-করা কয়েকটি বিশেষণ। আমাদের বিস্মিত করে লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র বললেন, "যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি [রামের নির্বাসন বিষয়ক] প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য সাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন। সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে কোনোমতেই পারিব না। ...লক্ষ্মণ! প্রাপ্ত রাজ্যের পুনঃপ্রত্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, **দৈবই ইহার নিদান**...ভাই! তুমি তো জানই যে,...কৈকেয়ী আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্নভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যবাক্য নাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে **দৈব ভিন্ন অন্য কোনো কারণই দেখি না।**"

'ধর্ম' এবং 'দৈব' এই দুই ব্যাখ্যাতীত শব্দের গূঢ়ার্থ আমাদের কাছে অবশ্য এখন আর দুর্বোধ্য নয়। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ বহুবার আমার বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছি। দেব ব্রাহ্মণের স্বার্থে ন্যায়-অন্যায় কর্ম নির্বিশেষে যে নিয়ামক নীতির দ্বারা সমর্থিত হয়, সেই নীতিমালাই 'ধর্ম'। 'ধর্ম' তাই বহুরূপী। দেবস্বার্থে পাপ অন্যায় ঘৃণ্য আচরণও 'ধর্ম', আবার বস্তুত মানবকল্যাণকামী কর্মাদিও 'ধর্ম'। 'ধর্মে'র তাই কোনো বিশিষ্ট রূপ নেই। ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেবতারও সাধ্যাতীত। তথাকথিত, সাধু মহাত্মারা বহুরূপী ধর্মের ব্যাখ্যায় গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে

বলেছেন, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, ধর্মের তত্ত্ব গুহার আঁধারে নিহিত আছে। এমনই এক ব্যাখ্যাতীত নিগূঢ় রহস্যময় ধর্মের অঙ্গুলীনির্দেশে দশরথ কৈকেয়ী রাম রুদ্ধদ্বার কক্ষে দেবতার অভিসন্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরে দেবনির্দেশ শিরোধার্য ক'রে রামচন্দ্র সেই কক্ষচ্যুত উল্কার মতো বেরিয়ে এসেই শুরু করেছেন দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার জন্য আস্ফালন। এই শুভযাত্রায় যিনিই প্রতিবন্ধকস্বরূপ, রামচন্দ্র তাঁকেই গালমন্দ ক'রে শাসন ক'রে থামিয়ে দিতে চাইছেন, কেননা সেটাই দেবতার নির্দেশ। আরও নির্দেশ, কোনো কথা প্রকাশ্যে বলা চলবে না। যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে রাম দণ্ডকারণ্যে চলেছেন দেববাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে, তবে যে শত্রুর বিরুদ্ধে এই অভিযান, সেই শত্রু সতর্ক হবে এবং সেও প্রস্তুত হবে সম্মুখ সমরের জন্য। কিন্তু দেবতারা চান গোপন প্রস্তুতি বিনা বাধায় শত্রুর দ্বারদেশ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে এবং তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করতে। তাই পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে রাম বনবাসে যাবেন সুদূর দণ্ডকারণ্যে। প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং জয় তিনকাণ্ডে ব্রহ্মার গণনা অনুসারে সময় লাগবে চোদ্দ বছর। এই চোদ্দ বছর রামের অযোধ্যার সিংহাসন সামলাবেন ভরত। রুদ্ধদ্বার কক্ষে যে এসব আলোচনাই হয়েছিল তা পরবর্তী ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের হাতে অন্যতর তথ্য নেই।

রাম ভালই বুঝেছেন দেবতাদের পরিকল্পনা। তাই কৈকেয়ীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেই ঘোষণা করলেন অভিষেক স্থগিত রইল। যাত্রার জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নকে তিনি আর প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। রাম পেয়েছেন যশ খ্যাতি এবং রাজত্ব সব কিছুরই প্রতিশ্রুতি। তিনি কৌশল্যাকে কঠিন বাক্যে স্তব্ধ করে বললেন, "আমি রাজ্যলোভে মহাফলজনক যশ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না।"

আপাতভাবে এই মহাফলজনক যশ পিতৃসত্য পালন। এটাই সর্বলোকে প্রচার করা হলো যুদ্ধাভিযানের তোড়জোড়কে গোপন রাখার জন্য। রাম এই নাটিকার নায়ক মনোনীত হয়েছেন। অতএব অভিনয় তাঁকেও করতে হবে। তবে এই নাটিকায় সর্বোত্তম অভিনয় করেছেন কৈকেয়ী। তিনি শত লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করছেন, ক্ষিপ্ত হয়ে এমন কিছু করে বসেন নি যাতে তাঁর ভূমিকায় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তিনি নীরবে মেনে নিয়েছেন তিনি দুশ্চারিণী, কুলনাশিনী, লোভী এবং শঠ চরিত্রের পাপিষ্ঠা নারী। যদিও দশরথ এবং রাম জানেন, কৈকেয়ী নির্দোষ। তাঁকে সামনে রেখে রামের দণ্ডকারণ্যে যাত্রার কৈফিয়ত তৈরী করা হয়েছে। কার্যত তিনিই শুধু নন, তাঁর একমাত্র পুত্র ভরতও এখন দেবশিবিরের

হাতে বন্দী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুদূর পাঞ্জাব অঞ্চলে। ছেলের মুক্তিপণ মাকে শুধতে হবে নিপুণ অভিনয় ক'রে। মাথা পেতে নিতে হবে সমস্ত কলঙ্ক। তা হ'লে ভরত শুধু মুক্তিই পাবেন না, চোদ্দ বছরের জন্য অযোধ্যার সিংহাসনটি তাঁরই দখলে থাকবে। এমতাবস্থায় অভিনয়ে রাজি না হয়ে কৈকেয়ীর অন্য উপায় ছিল না। পুত্রের মুক্তিই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি তাঁর বাসনা নয়।

এ সবই রাম বুঝেছেন। বুঝেছেন বলেই যাত্রার আগে কৈকেয়ীকে সসম্মানে রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাওয়ার দায়িত্বও অনুভব করেছেন তিনি। অথচ স্পষ্টত কিছুই বলার উপায় নেই। অতএব দেবতা ও দেবানুগত সমাজের সংকেতপূর্ণ 'দৈব' শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করে লক্ষ্মণকে বোঝাতে চেয়েছেন, জেনে রাখো লক্ষ্মণ, মাতা কৈকেয়ী নির্দোষ। তিনি যা করেছেন তা দৈব নির্দেশেই করেছেন। যা কিছু বর্তমানে ঘটমান তার নেপথ্য কারণ 'দৈব' বা দেবশিবির। সুতরাং বৃথা বাক্যে আর কালক্ষেপ কোরো না। সাধারণ সকলকে বলেছেন, পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্যত্যাগ করে তিনি চললেন বনবাসে। সত্য পালন মহাধর্ম। তিনি সেই যশোলিপ্সু। মনে মনে জানতেন, যশ বলতে তিনি দেবশিবিরের সাহায্যে রাবণবধ ক'রে যশস্বী হবেন। এতো বড় যশ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর কি হ'তে পারে। রাজ্য ত্যাগ নয়, ফিরে আসবেন আসমুদ্র ভারতবর্ষের মালিক হয়ে। সুতরাং এমন ভাগ্য কে আর হেলায় হারায়।

দশরথ কিন্তু ছিলেন অল্পে তুষ্ট। দেবতাদের এই পরিকল্পনায় তাঁর মনের সায় ছিল না। তিনি দেবচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ। জানেন, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কুচক্রী। একবার কোনো রাজা ও রাজত্বকে আপন কুক্ষিগত করতে পারলে সেই রাজাকে তাঁরা কার্যত দেবশিবিরের দাস বানিয়ে রাখেন। কেড়ে নেন রাজার সমস্ত ক্ষমতা, শাসনকার্য অর্পিত হয় ব্রহ্মার প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ নেতাদের হাতে। রাজা থাকেন কেবলমাত্র হুকুমনামায় শিলমোহর অঙ্কিত করার জন্য। সুতরাং সেই সাম্রাজ্য লাভে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই লভ্য নয়। পাণ্ডবরা এমন সাম্রাজ্য পেয়ে হতাশায় শেষ পর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করে মহাপ্রস্থান করেছিলেন [লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ]। দশরথ সুতরাং অভিনয় করেন নি। প্রকাশ্যে 'দৈব'কে দোষারোপ করেছেন : কৈকেয়ীকে 'দৈবাধীন' জানার পর বলেছেন, তিনি দশরথের শত্রুশিবিরের দাসী, অযোধ্যায় বসে তাঁর কুলনাশের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে দশরথ ত্যাগ করলেন। নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন বারংবার কৈকেয়ীর সতর্কীকরণ

সত্ত্বেও। কৈকেয়ী ভয় পেয়েছিলেন, দেবশিবিরকে অমান্য করে রাজা বিপদে পড়বেন এই আশঙ্কায়। তাই রাম আসতেই ব্যাকুলভাবে তাঁকে বলেছেন, রাম তুমিই তোমার পিতাকে বোঝাও। সম্ভবত রাম বুঝিয়েওছিলেন। কিন্তু দশরথের বাৎসল্য অনেক বেশি প্রভাবশালী। আপন জীবন রাজ্য সমৃদ্ধির বিনিময়ে তিনি চান শুধু রামকে রক্ষা করতে। তাই কোনোভাবেই যখন রামের যাত্রা নিবারণ করতে পারলেন না, তখন অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি রামকে বলেছিলেন, রাম আমাকে বন্দী ক'রে, তুই অযোধ্যার সিংহাসনে বসে পড়। বুঝেছিলেন, রামের অভিষেক সম্পন্ন ক'রে ফেলতে পারলেই দেবতাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। রাম বনবাসী হলেন পিতৃসত্য রক্ষার্থে, এই গল্প সাজিয়ে তখন আর রামকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো যাবে না। ভরতের বিপদের কথা তিনি কিন্তু একবারের জন্যও ভেবে দেখেন নি।

দেবশিবিরকে অমান্য করার শাস্তি বৃদ্ধ রাজাকে পেতে হয়েছিল। তিনি বস্তুতই মারা গেলেন। কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হ'ল, মহাকবি সেকথাও আমাদের জানান নি। এ ঘটনা গায়েব হয়ে গেছে।

অতএব বাকি ঘটনা পরিষ্কার। রাম যাবেন দণ্ডকারণ্যে ভবিষ্যতে মহাযশ লাভের আকাঙ্ক্ষায়। কৌশল্যাকে তিনি বললেন, "জীবন কাহারই চিরস্থায়ী নহে।" অতএব যশ লাভের এই সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করতে নারাজ। জানি না, লক্ষ্মণকে কৈকেয়ী সম্পর্কে রাম যা বললেন তাতে কৌশল্যা কী বুঝেছিলেন। সব শোনার পর তিনি আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, "রাম! তুমি বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আমার সাধ্য নহে। বোধ হয়, অবশ্যম্ভাবী বিয়োগকাল অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। ...বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন।" বোঝা যাচ্ছে, কৌশল্যাও নেপথ্যের দেবচক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তাই তাঁর সোজা কথা, "দৈবই তোমাকে অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন"।

বুঝলাম, অরণ্যগমন হিমালয়স্থ দেবশিবিরের নির্দেশ, পিতৃসত্য রক্ষা অছিলামাত্র। বুঝলাম, চোদ্দ বছরের জন্য এটাই রামের 'ভবিতব্য', অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঘটমান কার্যসূচী। এবং আরও বুঝলাম, দেবতাদের এই নির্দেশ অবশ্য পালনীয়, তাই তা অনিবার্য। এমন কি এজন্য জানকীও প্রস্তুত জেনে রাম তাঁকে বলেছেন, যখন জানলাম এইজন্যই তুমি তৈরী হয়ে আছ, তখন আর প্রশ্ন কি, চলো, তুমিও আমার সঙ্গিনী হও।

ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দিলে দেবানুগত রাজ্যে কোনো অনুষ্ঠানই সুসম্পন্ন হয় না। রামচন্দ্রের অভিষেক উপলক্ষে বিশাল যাগযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণের জন্য দান দক্ষিণার আয়োজন করতে হলো। অথচ রাম যাবেন বনবাসে, আপাতদৃষ্টিতে তার মতো দুঃখজনক ঘটনা আর কী হ'তে পারে? কিন্তু বাস্তব ঘটনা তো তা নয়, সেজন্যই দেখি, রামচন্দ্র ব্রাহ্মণবিদায়ের ঢালাও আয়োজন করলেন। দেখলাম, রাম বস্তুত খুশি। তিনি জানেন, যাচ্ছেন তিনি মহাযশপ্রার্থী হয়ে। নিযুক্ত হয়েছেন দেবতাদের দণ্ডকারণ্য অভিযানের নায়ক রূপে। এমন সম্মান ও সুযোগ আর্যাবর্তের অপর কোনো দেবানুগত রাজপুরুষের ভাগ্যে ঘটে নি। সুতরাং লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন, রাজকোষ উজাড় ক'রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মার ভজনাকারী সম্প্রদায়ের নেতাদের অজস্র উপঢৌকোন প্রদানের ব্যবস্থা করতে। রামের পক্ষে এই মুহূর্তে এমন আদেশ প্রদান বিসদৃশ ঘটনাই বলতে হবে। তিনি এখন সর্বসমক্ষে রাজ্যচ্যুত জটাবল্কলধারী নির্বাসিত সন্ন্যাসী মাত্র। আর সেটাই বাস্তবিক সত্য হ'লে রাজকোষের ওপর তাঁর এখন কোনোই কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, রামের আদেশে অযোধ্যার রাজকোষ শূন্য হ'তে চলল। রাজার সম্পদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হল ব্রাহ্মণপদে।

পুরাকথায় গল্প গাওনা হয় এক ভাবে, আর বাস্তব ক্রিয়াকর্ম হ'তে দেখি ঠিক তার বিপরীত। ক্ষণপূর্বে শুনলাম, রামচন্দ্র জটা চীর ধারণ করে বনবাস যাত্রায় আদিষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁর যাত্রার প্রাক্‌কালে দেখতে পাই, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পাঠাচ্ছেন আচার্য বশিষ্ঠের আলয় থেকে "দিব্য শরাসন, দুর্ভেদ্য বর্ম, অক্ষয় তূণ, খড়্গ" প্রভৃতি অস্ত্র আনতে। দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বনবাসযাত্রীর সাজসজ্জা। জটাবল্কলের ওপর বর্ম এঁটে রাম যাবেন বনে!

রামচন্দ্র নাকি মস্ত দাতা! রামরাজত্বে প্রজাদের যে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল, তা নাকি ইতিহাসে বিরলশ্রুত ঘটনা। এই বিশ্বপ্রচার কিন্তু মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায় রামচন্দ্রেরই আচরণে। শুভযাত্রায় নিষ্ক্রমণের আগে তিনি যাঁদের পুরস্কৃত ক'রে গেলেন, যাঁদের পায়ে ঢেলে দিলেন রাজকোষে মজুত প্রজাশোষিত সম্পদ. তাঁরা সমাজের সবচেয়ে প্রতাপশালী কতিপয় ব্রাহ্মণ নেতা এবং প্রত্যেকেই তৎকালে

অতুল ধনসম্পত্তির মালিক।

প্রথমেই লক্ষ্মণের ওপর আদেশ হ'ল বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে অর্থ দান করা হোক। সুযজ্ঞপত্নীকে বহুমূল্য কণ্ঠহার এবং সুযজ্ঞকে একটি সেরা হস্তীও দান করা হলো। প্রথমেই সুযজ্ঞকে দান করার আদেশে মনে হ'তে পারে, রাজগুরুপুত্রই সম্ভবত রামচন্দ্রের কাছে দেবশিবিরের নিয়োগপত্রটি এনে দেন এবং বশিষ্ঠ তাঁকে দণ্ডকারণ্যে যাত্রার কারণ গোপনে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন। এমন অনুমানে উপনীত হওয়ার পক্ষে আমাদের কাছে একটিমাত্র যুক্তি আছে। আমরা দেখেছি, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণকে যেতে দিতে দশরথ যখন গররাজি, তখন বশিষ্ঠই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, রামের কোনই বিপদের সম্ভাবনা নেই, বরং বিশ্বামিত্রের আদেশ পালিত হলে রাম দেবশিবির থেকে বহু শক্তিশালী অস্ত্র পাবেন এবং পথে রামকে তাঁরাই রক্ষা করবেন। পূর্ববর্তী এই ঘটনা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, বশিষ্ঠের সঙ্গে দেবশিবিরের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এবং তা থাকারই কথা। দেবানুগত সমস্ত রাজাই পরিচালিত হতেন ব্রহ্মাসেবী কোনো না কোনো ব্রাহ্মণ নেতার নির্দেশে। ব্রাহ্মণ নেতারা সে যুগে রাজপরিবারের অস্ত্রগুরু ছিলেন। তাঁরা এক-একজন বিশাল সেনাবাহিনীর প্রধান। তাঁদের আশ্রমগুলিও ছিল সেনা-নিবাস। এসব তথ্য রামায়ণপাঠেই জানা যায় এবং তা আমরা আগেই জেনেছি। সুতরাং বশিষ্ঠপুত্রকে নমস্কারী দেওয়ার একটি অস্পষ্ট কারণ অনুমান ক'রে নিতে পারি।

সুযজ্ঞের পর দান প্রদত্ত হ'ল বিশ্বামিত্র এবং অগস্ত্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন এই, দুই শস্ত্রবিদ এবং লড়াকু ব্রাহ্মণ নেতা ঠিক এই সময়ে অযোধ্যায় কী কারণে উপস্থিত? মিথিলাপর্ব সেরেই তো বিশ্বামিত্র চলে গেছলেন হিমালয়ে দেবতাদের সঙ্গে দেখা করতে। তবে কি তিনিই আবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন দেবতাদের পরবর্তী নির্দেশ, অর্থাৎ রামের দণ্ডকারণ্যে যাত্রার ব্যবস্থাপত্র নিয়ে? সঙ্গে এলেন অগস্ত্য? ইনি দণ্ডকারণ্যের পথে রামের জন্য সেনাশিবির তৈরী ক'রে পরবর্তী পর্যায়ে অপেক্ষায় ছিলেন। এই দুই নেতার উপস্থিতি সন্দেহজনক আর তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাড়ম্বরে ব্রাহ্মণ নেতাদের দান দক্ষিণায় তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাজকোষের বাকি সম্পদ সমবেত ব্রাহ্মণবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করার আদেশ দিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, "তাঁহারা [ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়] ...অত্যন্তই অলস।" অথচ "সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে।" বললেন, "তুমি সেই সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগকে [দেবানুগত

সমাজে সাধু মহাত্মারা পরশ্রমভোজী অলস ও পরান্ন পালিত] রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, সহস্র বলীবর্দ চনক মুদ্গ এবং দধিদুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান করো।"

এইখানে বলতে বাধ্য, রামচন্দ্র কার সম্পদ ঐ অলস লোভী উপবীতধারীদের মধ্যে বণ্টন করছেন? কাদের শ্রমে অর্জিত হয়েছে ঐ বিপুল সম্পদ? তাঁর কানে কি আর্ত শ্রমকাতর প্রজাদের আবেদন পৌঁছায় না? প্রাসাদের বাইরে সমবেত সাধারণ মানুষ তারস্বরে রামধুন গাইছে, 'ভজ রাম, সীয়ারাম' ব'লে—সেই তাঁদের শোষণ ক'রে অলস ব্রাহ্মণ সেবাই কি রামচন্দ্রের বিশ্বজোড়া প্রখ্যাতির কারণ? তাঁর এতাদৃশ ব্যবহারের জন্যই কি তিনি আজও ভারতবাসীর ভগবান? ঘটনা যা রামায়ণে বিবৃত, তাতে তো মনে হয়, তাঁর শরণ নিলে বর্ণাশ্রমী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদেরই শুধু সম্পদ বৃদ্ধি হয়। যাদের আছে, তারা আরও পায়. যাদের নেই তারা হয় সর্বস্বান্ত আর এরই নাম, রামরাজত্ব। ভারতবর্ষ সেই রামায়ণী মহাভারতী যুগ থেকে শোষকেরই পূজার্চনা ক'রে আসছে।

তা যাঁর যেমন অভিরুচি ও শিক্ষা তিনি সেভাবেই ভজনা করুন। আমাদের সময় নেই। রামচন্দ্র রথে চড়ছেন। আমরা রিপোর্টার মাত্র। আমাদের তাঁর বাহিনীর সঙ্গে তাঁর অনুগমন করতে হবে।

রাজরথ চলতে শুরু করেছে। সঙ্গে চলেছেন বিরাট ব্রাহ্মণবাহিনী।

রথ যখন উপস্থিত হ'ল তমসা[১] নদীর তীরে। পশ্চিম দিগন্তে বেলা তখন ঢলে পড়েছে। জানা গেল তমসাতীরেই রাত্রিবাসের আয়োজন প্রস্তুত। একরাত্রি বাস করার পর রামচন্দ্র রথে চেপেই পার হলেন তমসা। গ্রীষ্মের দাবদাহে নদী তখন মজে আছে। পরপারে অবতরণ করলেন রাম লক্ষ্মণ সীতা। সারথি সুমন্ত্রকে রথ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হ'ল। সুমন্ত্র পুনরায় রথ নিয়ে ফিরে এলেন।

১। আলোচ্য তমসা অযোধ্যার সীমান্তগামিনী নদী। আর এক তমসা নদী আছে গাড়োয়াল হিমালয়ের পশ্চিম সীমায়। এই নদীর উত্তরণ পথের দুই ধারে মহাভারত যুগের দুর্যোধনপূজক এবং পাণ্ডবপূজকরা আজও বসবাস করেন। দুর্যোধন ও কর্ণদেবতার মন্দির আছে সেখানে একাধিক। দুর্যোধন পূজকরা জাতিভেদ মানেন না, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের অন্যায়কারী পাপিষ্ঠ বলে বর্ণনা করেন। নিম্ন তমসা অঞ্চলে থাকেন আবার পাণ্ডব পূজকরা। এঁরা জাতিভেদ মানেন, ঘৃণা করেন কর্ণদুর্যোধনকে। মহাভারতের ইতিহাস সেখানে আজও সশরীরে অবস্থান করছে।

পুনশ্চ রথযাত্রা। ক্রমশ কোশল দেশের সীমান্তে পৌঁছে রথ পরপর তিনটি নদী অতিক্রম করল। বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা। ওই তিন নদীই অযোধ্যার দাক্ষণে সরযূ, মালিনী এবং তমসার সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত। তিনটি নদীই কোশল রাজ্য প্লাবিত করে ভাগীরথী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। বারানসীর উত্তরে বেদশ্রুতি ও গোমতী আর প্রয়াগে স্যন্দিকা এসে মিলেছে গঙ্গা যমুনার সঙ্গে। নদীগুলি পার হয়ে রথ থামলো শৃঙ্গবের পুর। এখানেই নিষাদ জাতির অধিপতি গুহর রাজধানী। শৃঙ্গবের পুর আধুনিক উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এলাহবাদ থেকে বাইশ মাইলের মধ্যে মির্জাপুর, তারই কাছাকাছি ছিল গুহর রাজত্ব। গঙ্গাতীরবর্তী শৃঙ্গবের পুরে রামচন্দ্র প্রথমেই দর্শন করলেন দেবতাদের প্রমোদকানন ক্রীড়া পর্বত। তারপর গুহর রাজপুরীতে গেলেন পানাহার ও রাত্রিবাসের জন্য। অতিথ্যের ত্রুটি হ'ল না।

অনার্য গুহ রামসীতার জন্য সুখসজ্জার ব্যবস্থা ক'রে রাতভোর লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করলেন, আর, এই সময় রামসীতার দ্বারদেশে ব'সে সারারাত্রি তাঁদের পাহারাও দিলেন। ভোরে গাত্রোত্থান ক'রে রাম বাইরে এসে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন, যাও, এবার যাত্রার আয়োজন করো। আমরা তো অবাক। সদ্যবিবাহিত ভাইটিকে সঙ্গে এনেছেন কি রাম একেবারে ক্রীতদাস বানিয়ে! নিজে তো আরামে আছেন। ভাই এসেছে অযোধ্যায় সব পরিত্যাগ ক'রে। রাতভোর পাহারা দিয়েছে দাদাবৌদিকে। তা একটিবার সেজন্য তাঁকে কোনো সাদর সম্ভাষণ করলেন না, জানালেন না কৃতজ্ঞতা। সোজা হুকুম করলেন যাত্রার আয়োজন করতে। দেখলাম লক্ষ্মণজী অক্লান্ত। ভাবলাম, মানুষটা রোবট নাকি? এর না আছে কোনো দাবি, না আছে নিদ্রাতন্দ্রা! আমাদের চোখে লক্ষ্মণজী একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে গেলেন সেদিন থেকেই।

রাতে সারথি সুমন্ত্রও গুহর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। রামের আদেশ পেয়ে রথ ছুটিয়ে তিনি ফিরে গেলেন অযোধ্যায়। গুহর সাহায্যে রাজকীয় বজরা প্রস্তুত হ'ল। রাম লক্ষ্মণ সীতা, সঙ্গে লটবহর এবং অস্ত্রাদিও বজরায় উঠলো।

রাম 'বর্ম ধারণ করলেন' এই সংবাদটুকু মুখ ফসকে ব'লে ফেলেই বাল্মীকি তাড়াতাড়ি ভ্রম সংশোধন ক'রে দেবনির্দেশ মতো সাজানো গল্পটির খেই ধরে বললেন, জটাচীরধারী নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের বনবাসযাত্রা এইখান থেকে রীতিমত শুরু হ'ল। রিপোর্টিং ডায়রীর পাতায় আমাদের কলম আটকে গেল। বাল্মীকির কোন্ ঘোষণাটি সত্য, কোন্ রামচন্দ্রকে আমাদের প্রতিবেদনে আলোচ্য করব? বর্মাস্ত্রধারী

রাম, নাকি বল্কলসম্বল রামচন্দ্র ? কে সত্যি ? দেবাদেশ শোনা গেল, সত্যমিথ্যার বিচার কোরো না। সবই মায়া। যা দেখছ তা মায়া। যা বাস্তব তা মায়া। সত্য তাই, যা বলা হবে। সেটি যে মানে, সেই-ই ধার্মিক। যে তর্ক করে সে সুরবিরোধী অ-সুর, রাক্ষস। মেনে নিলে তুমি হনুমান, বিভীষণ, যুধিষ্ঠির। না মানলে রাবণ, দুর্যোধন শিশুপাল।

গঙ্গা পার হয়ে যেখানে অবতরণ করলেন রামচন্দ্র, সেই স্থানের নাম, বৎস দেশ। বৎস বা বংশ নামক জাতির দেশ। শৃঙ্গবের পুর থেকে খুব একটা দূর নয়। এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ বর্তমান কোসাম। প্রাচীন কৌশাম্বী। প্রয়াগ সন্নিকটে যমুনাতীরবর্তী এই স্থানে রামচন্দ্র প্রথম ভূমিশয্যায় রাত্রি যাপন করেন।

রামচন্দ্রের পরবর্তী বিশ্রামস্থল গঙ্গাযমুনা সঙ্গমক্ষেত্র প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, ভরদ্বাজ আশ্রমটি মস্ত এলাকা গ্রাস ক'রে খুব সযত্নে নির্মিত হয়েছে। লোকলস্কর এবং কিঙ্করকিঙ্করী আশ্রম পরিপূর্ণ ক'রে আছে। চারদিকে অতিথি আপ্যায়নের ঢালাও ব্যবস্থা। রামকে অভ্যর্থনা করলেন ভরদ্বাজ স্বয়ং। বোঝা গেল, রাম এই পথে আসছেন, এ খবর তিনি আগেই পেয়েছেন, তাই অভ্যর্থনার আয়োজনও হয়েছে সাড়ম্বরে।

ব্রাহ্মণ নেতা ভরদ্বাজের সঙ্গে রামচন্দ্রের বৈঠক হয়েছিল। ভরদ্বাজের কাছে রাম পেলেন পরবর্তী পথনির্দেশ। নির্দেশ, এরপর রামের গন্তব্যস্থল হবে চিত্রকূট পর্বত। ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে চিত্রকূটের দূরত্ব দশ ক্রোশ। খুব এমন কিছু দূর নয়। ভরদ্বাজ জানালেন, ব্যবস্থা সেখানেও তৈরী। অপেক্ষায় আছেন সেখানে তথাকার দেববাহিনী। এই বাহিনী গড়ে উঠেছে গোলাঙ্গুলা, ভল্লুক, বানর প্রভৃতি জাতির সেনা নিয়ে।

শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। নিছক বনবাস নয়। রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পরবর্তী ঘাঁটিতে ব্রহ্মার সেনাবাহিনী প্রস্তুত আছে। মনে পড়ে গেল, রাম-সহায়ক একটি বাহিনী দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা রাম জন্মের সমকালেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। এই সেনাদের কেউ দেবপুত্র, কেউ কেউ ব্রাহ্মণ নেতৃবর্গের ঔরসজাত। অতএব নির্ভাবনায় যাত্রা শুরু করা যেতে পারে শঙ্খনাদ ক'রে। আধুনিক ঘটনা হ'লে রাম সদলবলে ড্রাম বিউগ্‌ল্‌ বাজিয়ে যাত্রা করতেন। যাত্রার আগে আরেকটি রাত আরামে বিলাসে কেটে গেল ভরদ্বাজের আশ্রমে। তারপর শুরু হ'লো যাত্রা।

ভরদ্বাজ রামকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, "রাম! সঙ্গমতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া

এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে…অত্যুচ্চ এক বটবৃক্ষ আছে।…উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া…বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকূটে গিয়াছি, ঐ পথ দিয়াই তথায় গমনাগমন করা যায়।"

এ তো রূপকথা নয়, নির্ভুল পথনির্দেশ। ভরদ্বাজ যেমনটি বলেছিলেন উক্ত সংলাপ হুবহু তেমনই না হলে ভরদ্বাজের শেষের কথাটি বোধ হয় লিখতে ভুলে যেতেন মহাকবি। ভারি সুন্দর বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে। ভরদ্বাজ পথের বর্ণনা দিয়ে বললেন, তিনি অনেকবার ঐ পথে চিত্রকূটে গিয়েছেন, *ঐটিই* সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত পথ। এভাবেই তো আমরা পথের নিশানা জানাই।

ভরদ্বাজ একটি কথাচিত্র সাজিয়ে দিলেন। সুতরাং অচেনাপথে পাড়ি দিতে অসুবিধা হ'ল না। আশ্চর্য হলাম আরও এই ভেবে যে, এক একটি বিশ্রামস্থলে আসার আগেই নেপথ্যে কে বা কারা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যাত্রার সংবাদ পৌছে দিচ্ছেন! এ যেন রামচন্দ্রের ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরী। আগেভাগে পথে পথে ট্যুরিস্ট লজ বুক করা আছে। পৌছালেই সাজানো ঘর আর উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় প্রস্তুত। সেখানে সাময়িক বিশ্রাম অন্তে পুনরায় যাত্রা। এভাবেই একটির পর একটি ঘাঁটি অতিক্রম করে দণ্ডকারণ্যের পথে এগিয়ে যেতে যেতে নেপথ্যের সেই সংবাদবাহক এবং ব্যবস্থাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়েছে আমাদের। তখন বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। কিন্তু সে কথা যথাসময়ে জানানো যাবে যখন তাঁর দেখা পাবো মুখোমুখি।

চিত্রকূটে পৌছে রাম গেছলেন বাল্মীকির আশ্রমে, এমন একটি বর্ণনা আছে। কিন্তু বাল্মীকির সঙ্গে রামচন্দ্রের কোনো আলাপের বর্ণনা নেই রামায়ণে। তা থাকার কথাও না। বাল্মীকি রামকাহিনী শুনে রামায়ণ রচনা করেছেন। সুতরাং রাম যখন বর্ম এঁটে সৈনিক মুটের মাথায় অস্ত্রশস্ত্র আর জানকীর জন্য দশরথের দেওয়া চোদ্দ বছর ব্যবহার-উপযোগী বসনভূষণ আভরণের বাক্স-প্যাটরা চাপিয়ে দণ্ডকারণ্য অভিযানে বের হয়েছেন, তখন তো বাস্তবিকপক্ষে রামায়ণকার বাল্মীকির চিত্রকূটে উপস্থিত থাকারই কথা নয়। বোঝা যাচ্ছে, চিত্রকূটে গিয়েই তিনি বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এই গল্পটি নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন নয়। পরবর্তী কেউ গোঁজামিল গেঁথে দিয়েছেন ইতিবৃত্তের পাকা ইমারতে সুবিধামত একটি ফাঁক খুঁজে নিয়ে। তাই বাল্মীকির শুধু উল্লেখই আছে, এর বেশি কথা নেই। অথচ অন্যত্র যেখানে রাম গেছেন সেখানেই আশ্রমাধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর আলাপ-

আলোচনা হয়েছে। সে আশ্রমে তিনি রাত্রিবাসও করেছেন। বাল্মীকির আশ্রমে রামচন্দ্রকে আপ্যায়নেরও কোনো আয়োজন ছিল না। বলা হয়েছে, চিত্রকূট পৌঁছে লক্ষ্মণকে রাম বললেন, "এই পর্বতে ফলমূল প্রচুর উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু।...ইহা বাস করিবার যোগ্য স্থান। আইস, আমরা এই চিত্রকূটের আশ্রয় লইব।" এবং তাঁরা সেখানেই কাঠের বাঙলো বানিয়ে বসবাস শুরু করলেন। এই হল রামায়ণিক তথ্য, কিন্তু কোনো পুরাণকার হয়ত ভাবলেন, এ কেমন কথা। রাম চিত্রকূটে অথচ একবার মহাকবি বল্মীকির সঙ্গে দেখা করলেন না, তাও কি হতে পারে। তাই তিনি এখানে দুটি ছত্র যোগ করে দিলেন। পরবর্তী পুঁথিতে সে কথা এই ভাবে গোঁজা হ'লো,"তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে আত্মনিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।"

আকস্মিকভাবে লিখিত ছত্র দুটির পরও কিন্তু রমাচন্দ্র চিত্রকূটে বনবাসের কথা পূর্বপ্রসঙ্গের জের ধরেই বলেছেন এবং একটি কাষ্ঠনির্মিত গৃহ প্রস্তুত করার আদেশ দিয়েছেন লক্ষ্মণকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাল্মীকি আশ্রমে গমনের কথাটি প্রক্ষিপ্ত। ভরদ্বাজ চিত্রকূটের পথনির্দেশ দেওয়ার সময়ও বাল্মীকি আশ্রমের কোনো উল্লেখ করেননি। অথচ তিনি চিত্রকূটে একাধিকবার গেছেন। বাল্মীকি তৎকালে বর্তমান থাকলে ভরদ্বাজ অবশ্যই তার উল্লেখ করতেন। তাছাড়া বাল্মীকির সঙ্গে বৈঠক এবং তার আশ্রমে আহার আচমন না করেই রামচন্দ্র সদলবলে সেখানে গৃহনির্মাণে উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ পেতেন না। এমনটি হলে দেবতাদের মহর্ষিকুল থেকে বাল্মীকির নাম ছাঁটাই হয়ে যেত। রাম যেকালের মানুষ সে সময় যে ব্রহ্মা লঙ্কার যুদ্ধ পরিকল্পনা করেছিলেন, আর বাল্মীকিকে যে ব্রহ্মা রামায়ণ রচনার আদেশ দেন, বলা বাহুল্য, তাঁরাও একই ব্যক্তি নন। রামায়ণী যুগের ব্রহ্মা-খেতাবধারীর কোনো উত্তরসাধক ব্রহ্মাপদাধিকারী বাল্মীকির আশ্রমে গেছলেন। তিনি রামচন্দ্রের ইতিকথা অর্থাৎ ইতিহাস গুছিয়ে লিখতে মহাকবিকে আদেশ দেন। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়। মহাকবি বাল্মীকি যখন চিত্রকূটে বসবাস করেছেন তখন সেখানে রামচন্দ্রের চিহ্নমাত্র ছিল না। রামের সঙ্গে বাল্মীকির সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে কবিকে কেবলমাত্র শোনাকথার ওপর নির্ভর করে রামায়ণ রচনা করতে হতো না।

আমরা রামচন্দ্রের সহযাত্রী। দেখলাম, লক্ষ্মণ একটি সুন্দর কাষ্ঠগৃহ বানিয়ে ফেললেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, একা লক্ষ্মণ বানিয়ে ফেললেন একটা মস্ত

বাঙলো! তিনি কি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মালিক ছিলেন নাকি? তবে বলব, প্রশ্নটির জন্য ধন্যবাদ। বলব, বস্তুত সেটা সম্ভব নয়। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে আদেশ পালনকারী বহু লোকলস্কর সেনা সামন্ত ছিল। যুদ্ধে যেতে হলে সেনাপতি ও সেনার সঙ্গে সিভিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়র, মিস্ত্রি, মুচি, বাবুর্চি, মুদ্দোফরাস, নার্স, বদ্যি, কুলিকামীন সবই সঙ্গে নিতে হয়। তাঁদের সঙ্গেও সেই মস্ত বাহিনীই ছিল। তবে মহাকবি রাম লক্ষ্মণের কৃতিত্বকে বড় করে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য এমনভাবে গল্প সাজিয়েছেন যেন বিশ্বচরাচরে রাম লক্ষ্মণ সীতা এই তিন ব্যক্তিই শুধু বনপথে ভ্রমণ করেছেন এমনই একটা ধারণা সবার মনে গেঁথে বসে। মাঝে-মধ্যে অবশ্য কারো কারো কথা তিনি বলেও ফেলেছেন। যেমন সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরে জানিয়েছিলেন, চিত্রকূট থেকে ফিরে গুহর অনুচর রামচন্দ্রের সমস্ত সংবাদ গুহকে জানিয়েছিল। অর্থাৎ সে ছিল চিত্রকূট পর্যন্ত রামবাহিনীর সহচর। বাল্মীকি একথা কিন্তু চিত্রকূটপর্বে একবারও উল্লেখ করেন নি যে রামের সঙ্গে ছিলেন সীতা ও লক্ষ্মণ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী। অথচ বাক্সভর্তি করে অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্র আভরণ খনিত্র (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি) সবই এসেছিল। কে সে সব বহন ক'রে বেড়াচ্ছিলেন? রামচন্দ্র তো ফুলবাবু। কুটোটিও নাড়তে পারেন না। সর্ব ঘটে তাঁর লক্ষ্মণই ভরসা। অথচ লক্ষ্মণ তো দশগ্রীব বিশবাহু, বহুস্কন্ধ আজব গাড়ি নন যে একা একা সেসব বহন করবেন। আর রাজপুত্র ভেলা বাঁধবেন, কাঠ কাটবেন, কাঠ চেরাই করে তক্তা বানাবেন,পেরেক ঠুকে দেওয়াল,পাটাতন,চালা বানাবেন,তারপর মৃগ শিকার করে তা সুস্বাদু ক'রে রন্ধনও করে দেবেন,এতো দাবি ঐ একটা নিতান্ত তরুণ রাজপুত্রের ওপর স্বয়ং রামচন্দ্রও নিশ্চয় করতে পারতেন না। অথচ দেখছি, সর্বকর্ম করতেই আদেশ দিতেন তিনি লক্ষ্মণকে আর মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্মণ তা করেও ফেলতেন। লক্ষ্মণের চীর বস্ত্রের গিঁটে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ বাঁধা না থাকলে তার পক্ষে এই সর্বকর্মপটুত্ব অর্জন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, বস্তুতই তার সাহায্যকারী ছিল নানা বৃত্তির নানা মানুষ। লক্ষ্মণ ছিলেন তাদের সর্বময় কর্তা। রামের আদেশ সেই শ্রমিকবাহিনীর দ্বারা রূপায়িত করাই ছিল তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব। বোধহয় আমরা এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে পরে আরও কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ রামায়ণী পথেও কুড়িয়ে তবে নিতে পারব। এখনও সেই প্রতিবেদনটি হাজির করার সুযোগ পাই নি।

ফেরা যাক পূর্ব প্রসঙ্গে।

চিত্রকূট এলেন অথচ একবার বাল্মীকির সঙ্গে দেখা করলেন না, এমন অভদ্রতা কি রামচন্দ্রের সাজে। হয়ত নিজের কথা লিখতে লজ্জা পেয়েছেন বাল্মীকি, এই

ভেবেই পুরাণকার তখন পণ্ডিতী করে দুটি ছত্র ঠেসে দিলেন। একবার ভেবে দেখলেন না, রামকে চাক্ষুষ দেখেছেন এমন কথাও বাল্মীকি বলেন নি। বিচার বিবেচনা করে প্রক্ষিপ্ত রচনার অনুপ্রবেশ ঘটে না। বিশেষত যে সমাজ বিচার করে কিছু গ্রহণ করার শিক্ষা পায় নি, যে সমাজ পরমুখাপেক্ষী এবং সাবালক হতে যার পাপের ভয়, সে সমাজে গুরু পুরোহিত পণ্ডিত এবং ধর্মপালা-গায়কের অত পরিশ্রম স্বীকার করে আগুপিছু বিবেচনার দরকার কি। কথকঠাকুর বললেন, আর যুগে যুগে তাই মান্য হল।

বিদেশী গবেষকে বলে না দিলে এ সমাজের মান্যগণ্যরা আবার যে কিছুই মানতে চান না। এঁরা চিরসবুজ, চিরনাবালক। স্বজাতির বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী তাই এঁদের পরের ঘরে চলে যায়। আধুনিক সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীরা হতাশ হয়ে বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কেউ বা আপন আবিষ্কারের স্বীকৃতি না পেয়ে হতাশা আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হন। যাঁরা এ দুটির কোনোটিই করতে পারেন না, তাঁদের গ্রাস করে এমন একটা সমাজ তাই অনেক অলীক কুকাব্যকে ঈশ্বরের বাণী বলে এবং অপদার্থ সৃষ্টিকে পুরস্কার প্রদানের দ্বারা স্বীকৃতি দিয়ে দিব্যি সন্তুষ্ট থাকে।

যাইহোক, রামচন্দ্রের কোনো আচরণেই বোঝা গেল না যে তিনি তাঁর ইতিবৃত্তকার বাল্মীকির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বরং আমরা লক্ষ্মণের তদারকিতে রামচন্দ্রের একটি স্থায়ী বাসস্থান গড়ে উঠতে দেখলাম চিত্রকূটে।[২]

২। Chitrakut—It stood at a distance of 20 miles (10 krosas) from the hermitage of Bharadvaja. It is the modern Chitrakuta, a famous hill, lying 65miles west-south-west-of Allahabad [J.R.A.S. April 1894] It is situated four miles from the modern Chitrakuta railway station. It lay to the south-west of Prayaga.

Rama dwelt on this hill situated on a river called the Payasviri or Mandakini. ···There were two rivers at Chitrakuta called the Mandakini and Malini. ···Mahabharata refers to the Chitrakuta parvata and the Mandakini river. —Hist. Geog. of Ancient India/Dr. B.C. Law.

নেপথ্য চক্রান্তের আঘাত এবং রামচন্দ্রের বিরহ সহ্য করতে না পেরে দেহরক্ষা করলেন অসহায় রাজা দশরথ। জীবন তাঁকে অনেক কিছুই দিয়েছিল। দেয় নি বোধহয় আপন শক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। ভরসা করেছিলেন তিনি দেবানুগ্রহ এবং ব্রাহ্মণপদে। ফলে কার্যত-বন্দী রাজার মৃত্যু বর্ষণ করলো তাঁর ওপর শুধুই অপযশ। এমন নির্মম মৃত্যুর হাত ধরে এমন অহেতুক অপযশ শিরে ধারণ করে খুব কম রাজাকেই বিদায় নিতে হয়েছে। তবু তাঁকে দেখে জেনেও অনেক ভারতবর্ষীয় রাজার চৈতন্যোদয় হয় নি সেদিন, রামচন্দ্র নিজেও পারেন নি দেবজন-প্রদত্ত প্রলোভনের বাহুপাশ প্রত্যাখ্যান করতে।

দশরথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার শাসনকর্তৃত্ব চলে গেল ব্রাহ্মণ নেতাদের হাতে। দলে দলে তাঁরা এসে দখল নিলেন অযোধ্যার শাসনযন্ত্রটির। এলেন মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, গৌতম ও জাবালি। বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রণালয় পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শে বসলেন তাঁরা। রাজকার্যের বিধিব্যবস্থা করে পুরোহিত বশিষ্ঠকে আদেশ দিলেন অযোধ্যার সিংসাসনে ভরতকে অভিষেক করার জন্য। ভরত তখনও শত্রুঘ্ন সহ মাতুলালয় কেকয়রাজ্যে রয়েছেন। দূত প্রেরিত হল তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দূতকে বলা হল, তাঁরা যেন ভরতকে রামের বনবাস ও দশরথের মৃত্যুসংবাদ না দেন। সেটা রাজ্যের গোপন ব্যাপার। ভরত ছেলেমানুষ। আঘাত পেলে ও ভেঙে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির গুপ্তচর মুখে ব্যাপারটি প্রচার হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিকভাবে এ ধরনের প্রচার অনভিপ্রেত। হয়ত এজন্যই দূতের প্রতি সত্য অনুচ্চারিত রাখার আদেশ ছিল। আর ভরত ফিরে এসে যাতে পিতার পারলৌকিক কাজ করতে পারেন, তাই দশরথের মৃতদেহটি জিইয়ে রাখা হ'ল তৎকালীন বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি "তৈলপূর্ণ কটাহে"। সেটি কেমন জিনিস, হিমঘরের ঠাণ্ডায় মৃত বস্তুকে টাটকা রাখার যুগে তা নিয়ে আমাদের সপ্রশ্ন হওয়ার আর প্রয়োজন নেই। তবে এই সব কর্মকাণ্ড যে নিছক রূপকথা নয়, একটি বাস্তব ইতিহাসের প্রতিবেদন, এই প্রশ্নটি ভেবে দেখার সময় এসেছে। এমন সূক্ষ্ম ও হিসেবী রাজনীতি

অপরিপক্ব কোনো গল্প লিখিয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনামাত্র হতে পারে না, যে কোনো বুদ্ধিমান পাঠকই তা একবাক্যে স্বীকার করবেন।

দূতগণের কেকয়রাজ্যে গমনের একটি নিখুঁত পথপরিচয়ও ঐ ঐতিহাসিক প্রতিবেদনে লিখিত আছে। দূতেরা ঘোড়ায় চেপে অযোধ্যা থেকে "নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রমপূর্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিমভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে ...অনন্তর পাঞ্চালদেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে [লক্ষণীয়, দুই মহাভারতীয় বিশিষ্ট রাজ্যের নামই এখানে উল্লিখিত] গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল।" পরে "শরদণ্ডা অতিক্রমপূর্বক ...কুলিঙ্গ নগরে প্রবেশ করিল। পরে...ইক্ষুমতী পার হইল। নদী তীর ধরিয়া দূতেরা বাহ্লীক দেশের[১] সুদামন পর্বতে গমন করিলে।" রাত্রিকালে "গিরিব্রজ[২] নগরীতে বিশ্রাম করিত লাগিল।"

কেকয়রাজ্য থেকে অযোধ্যায় আসতে ভরতের সময় লেগেছিল সাত রাত্রি।

নিখুঁত বাস্তব প্রতিবেদনের মধ্যে দেবতানুরাগী পুরাণকাররা অবাস্তব গল্প ফাঁদেন দেবকীর্তির দোষ ঢাকতে কিংবা গুণকীর্তন করার উদ্দেশ্যে। আলোচ্য ঘটনাবলীর মধ্যে তাই একটি গল্পের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভরতের একটি দুঃস্বপ্ন দর্শনের গল্প শোনানো হয়েছে। ভরত দেখছেন, দশরথ স্বীয় পাপে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। উদ্দেশ্য, দেবতাদের অপকীর্তির পাপ দশরথের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। আর এক মজার ব্যাপার, দূতকে অযোধ্যার সংবাদ জিজ্ঞেস করার সময় ভরতের ঠোঁটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কৈকেয়ী সম্পর্কে কটূক্তি। বলা হয়েছে ভরত জিজ্ঞেস করলেন, "আমার প্রজ্ঞাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাবা আত্মম্ভরী মাতা" কেমন আছেন। কৈকেয়ীর যে এতো সব দোষ ছিল মহাকবি কখনই তা কিন্তু বলেন নি। তাছাড়া রাজপুত্র ভরত সর্বসমক্ষে রাজকর্মচারীর সামনে মাতৃনিন্দা করবেন এটাও অসম্ভব। দেবতার দোষ ঢাকতে সেই একটি অসম্ভব গল্পও আমাদের বড় করে শুনিয়ে কৈকেয়ীর প্রতি শ্রোতার শ্রদ্ধা চটিয়ে দেওয়ার

১। বিপাশা-শতদ্রুর মতান্তরে ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী দেশ। পাণিনি ও পতঞ্জলি মতে বাহ্লীক ছিল পাঞ্জাব অঞ্চলে। বাহ্লীকরা ছিলেন না-আর্য জাতি। —[Geographical Encyclopaedia of Ancient & medieval India / pt I / K. D. Bajpai / 1967].

২। বিপাশা তীরবর্তী, কেকয়রাজ্যভুক্ত।

চমৎকার কারসাজি করা হয়েছে এইখানে। নির্বুদ্ধি কথকদেরও দুর্বুদ্ধি বেশ পাকা ছিল।

ভরত তাঁর মাকে রূঢ় কথা বলেছেন অযোধ্যায় এসে পিতার মৃত্যু ও রামের বনবাসের সাজানো কারণ যে কৈকেয়ী এই গল্পকথা শুনে। তার আগে মাতার প্রতি তিনি অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন এমন খবর কোথাও নেই।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পর ভরতের উত্তেজনা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তবুও কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের জবানীতে যে কঠিন তিরস্কার উচ্চারিত হয়েছে তার মান ঠিক ভরতের চরিত্রানুগ নয়। নৃশংসে, কুলনাশিনী, পাপীয়সী শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার দশরথের তিরস্কারেরই পুনরুচ্চারণ। তাই কৈকেয়ীর প্রতি ভরত-বর্ষিত বাক্যবাণে ভরত চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। মনে হয়, ভৎর্সনাবাক্য কবিকৃত কথামালামাত্র। বস্তুতই ভরত কী বলেছিলেন তার সঠিক প্রতিবেদন এখানে দুর্লভ। যাই হোক, ঘটনাচক্রে একটি ব্যাপার পরিষ্কার, তা হ'ল, রামের নির্বাসনে ভরত খুশি হন নি, পিতার মৃত্যুতে মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রতিক্রিয়ার জলন্ত পরিচয় পাওয়া যায় শ্রাদ্ধ শান্তির পর মন্থরার সঙ্গে শত্রুঘ্নের রূঢ় ব্যবহারে। শত্রুঘ্ন সুমিত্রানন্দন এবং লক্ষণের সহোদর। তাঁর মধ্যে লাক্ষ্মণিক তেজ সমভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মণ রুষ্ট হয়ে পিতাকে আবদ্ধ করতে এমন কি বধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর চরিত্রটি কঠোর এবং বিদ্রোহী। দেখা গেল, শত্রুঘ্নও প্রয়োজনে পিতৃনিগ্রহে অসম্মত ছিলেন না। ভরতকে তিনি বলেছেন, "আর্য লক্ষ্মণ মহাবলপরাক্রান্ত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উহাকে (রামকে) কেন বনবাসদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না? যে রাজা স্ত্রীলোকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল। [এখানে লক্ষ্মণের বীরত্ব দ্বারা রামচন্দ্র রক্ষিত হন, এই একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতি আমাদের চমকিত করে। কথাটি যে অসত্য নয়, পরে তার একাধিক প্রমাণ আমরা পাব।]

দেবস্বার্থের ভাষ্যকারদের চতুর কূটনীতি এমন ভাবে কৈকেয়ী ও দশরথকে সর্বদোষের উৎস হিসেবে সেদিন খাড়া ক'রে দিয়েছিল যার ফলে পিতৃনিগ্রহ অথবা পিতৃহত্যায়ও সন্তান প্ররোচিত হয়েছে। স্বাভাবিক জীবনধারা এবং প্রত্যয়কে দেবতারা অস্বাভাবিক কূটতৎপরতার কাদাজলে নিক্ষেপ করেছিলেন গর্হিত অকল্পনীয় চক্রান্ত তৈরী করে।

ভরত শত্রুঘ্নের কথপোকথনের সময় মন্থরা কক্ষদ্বারে উপস্থিত হ'লে ভরত তাকে "নির্দয় ভাবে গ্রহণ" করে শত্রুঘ্নের হাতে সমর্পণ করেন। বলেন---সকল নষ্টের মূল এই পাপীয়সী কুব্জাকে তোমার খুশিমত শাস্তি দাও। মন্থরার শাস্তি অবশ্য তেমন মারাত্মক হয় নি, ভরতই তাকে ক্ষমা ক'রে মুক্তি দিয়েছেন।

দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তেরটি রাত্রি উদযাপিত হলে ভরতের রাজ্যা-ভিষেকের আয়োজন করলেন ব্রাহ্মণরা। কিন্তু ভরত রাজি হলেন না। তিনি বনবাসী রামচন্দ্রকেই রাজ্য দান ক'রে তাঁব জায়গায় চতুর্দশ বছর বনবাসে কাটাবেন বলে ঘোষণা করলেন। ব্রাহ্মণরা জানেন, নাটকের আর এক অঙ্ক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সাধারণ্যে খেলাটি আরও জমজমাট হবে। কারণ দণ্ডকারণ্য যাত্রা স্থগিত হওয়ার নয়। সেটাই মুখ্য দেবকার্য। সুতরাং রাম প্রত্যাবর্তন করবেন না। ওদিকে ভরতের ভাবমূর্তি প্রজাসাধারণের চোখে উজ্জ্বল থাকবে। ফলত লাভবান হবেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। কারণ কার্যত তাঁরাই থাকবেন শাসনকর্তৃত্বে। ভরত নিমিত্তমাত্র। সদলবলে চতুরঙ্গী সেনা সাজিয়ে ভরতকে নিয়ে তাঁরা চিত্রকূট পর্বত অভিমুখে শোভাযাত্রা বার করলেন। রামের গতিবিধি ব্রাহ্মণ নেতাদের নখদর্পণে। সুতরাং রামের আশ্রমে উপনীত হ'তে অসুবিধা হ'ল না।

এই শোভাযাত্রায় "যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জ্বল যানে গমন করিতে লাগিলেন।" অর্থাৎ সর্ব নষ্টের মূল ব'লে কথিত কৈকেয়ীও চলেছেন এবং মহাকবি তাঁর প্রতি প্রচুর বিষোদ্গারের ইতিহাস তৈরী করলেও তাঁকেও 'যশস্বিনী' অভিধা থেকে বঞ্চিত করেন নি। প্রশ্ন তাই, কেন এ ধরনের গোলমালের কারণ কি? বাল্মীকি যে অসাবধানী কবি এমন প্রমাণ তো নেই। তবে পাপীয়সী অকস্মাৎ আবার 'যশস্বিনী' হয়ে ওঠেন কেমন করে? মনে মনে জবাব পাই, হয়ত কবির মনে কৈকেয়ীর আসল স্বরূপ সর্বদাই জাগত ছিল। তিনি জানতেন, কৈকেয়ী অপাপবিদ্ধা। কেবলমাত্র দেবতাদের নির্দেশেই তাঁকে পাপীয়সী সাজানো হয়েছে। তাই কৈকেয়ীকে 'যশস্বিনী' বলতে কুণ্ঠিত হন নি তিনি, তাকে সঙ্গে নিতেও আপত্তি হয় নি অন্যান্য ব্রাহ্মণ নেতাদের।

ভরতের যাত্রাপথে এক অভিনব ঘটনা ঘটেছিল।

ভরত তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে এক রাত বিশ্রাম করেন নিষাদাধিপতি গুহের রাজ্যে। গুহ সামান্য ভূস্বামী। তার রাজগৃহে বিশাল ভরতবাহিনীর স্থান সংকুলান হয় নি। আপ্যায়নের সমুচিত ব্যবস্থা করার যোগ্যতাও বোধহয় তার ছিল না। উপযুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁবু ফেলে রাত্রিবাস করেছেন অযোধ্যার রাজপুরুষেরা। ভরত

বলেছেন, আপনি যে আতিথেয়তা করায় উদ্‌যোগী হয়েছেন এতেই আমরা সন্তুষ্ট। ব্যস্ত হতে হবে না, ব্যবস্থা আমরাই করে নিচ্ছি।

কিন্তু যা সম্ভব হয় নি নিষাদাধিপতির পক্ষে, দেখা গেল তার সহস্রগুণ আয়োজন নিমেষের মধ্যে করে ফেললেন এক আশ্রমাধ্যক্ষ মুনি, ভরদ্বাজ। সে এমনই এক আয়োজন যা ভরতের সেনাবাহিনীকে মুগ্ধ করলো, বিস্মিত সেনারা বললে, এতো সুখ স্বর্গেও দুর্লভ। অযোধ্যায় ফিরে লাভ নেই। ভালো হয় যদি থাকা যেতো এখানেই।

খুবই আশ্চর্যের কথা। আশ্রম বলতে আমরা বুঝি, শান্তিপূর্ণ কাননে একটি পর্ণ কুটীর যেখানে সাধু মহাত্মারা পারলৌকিক উন্নতির জন্য সাধন ভজন ক'রে থাকেন। কিন্তু ভরদ্বাজ যা দেখালেন, যা দেখতে পাব দণ্ডকারণ্যের পথে অন্যান্য আশ্রমে, তাকে মোটেই সাধনভজনের জন্য নিভৃত আলয়মাত্র বলা যায় না। যে কোনো রাজপুরীর চেয়ে সেগুলির জমি জায়গা এবং ধনসম্পদ অনেক বেশি। সাধু মহাত্মারা সেখানে কিসের সাধনা করেন জানা নেই। পুরাণ মহাকাব্যে পাঠে বুঝি, তাঁরা কূটনীতি, যুদ্ধ পরিচালনা, অস্ত্রাগার রক্ষা এবং সেনাশিবির পরিচালনা করেন। এক একটি আশ্রমে এক একটি বৃহৎ সেনানিবাস। সেখানে বিলাস ও আরামের প্রাচুর্য। সেখানে রাজারা আসেন ভয়ে ভয়ে, করজোড়ে। পরামর্শ করেন শত্রু বিনাশ ও ধ্বংসকার্যের। ভরতাগমনে ভরদ্বাজ আশ্রমে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তা মোগল বাদশাদের প্রমোদভবনেও অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল কি না সন্দেহ।

রাজকীয় অভ্যর্থনার জন্য ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রম অঙ্গনে বসিয়ে দিলেন সারিবদ্ধ শতাধিক 'চতুর্শাল গৃহ'। সেই সব 'গৃহ' নয়নাভিরাম শিল্পকর্ম সুশোভিত। সেখানে স্নান ঘর, শয়ন ঘর, বসার ঘর, প্রমোদ ঘর সবই ছিল। ইন্টিরিয়র ডেকরেশন করলেন দক্ষ শিল্পীরা। পাতা হলো 'সুরচিত শয্যা' ও 'আস্তীর্ণ আসন'। নানা অলঙ্কৃত বস্ত্র ও পাত্র এলো। আয়োজন হলো উৎকৃষ্ট ভোজ্য, সুস্বাদু সুরা ও পানীয়ের খাওয়ার পর আচমনের ব্যাস্থাও ছিল অত্যাধুনিক। আনা হয়েছিল 'হেমময় হস্ত-প্রক্ষালনপাত্র'। হাত ধোওয়ার জন্য পাত্র বড় হোটেল এবং উৎসব বাড়িতে ক্যাটারাররা দেয়। আশ্রমেও এসব চলে তা রামায়ণ পাঠ না করলে কে জানতো। তাছাড়া মেনু কার্ডে আইটেমও ছিল গ্র্যাণ্ড। যেমন, 'ফলরস সিদ্ধ সুগন্ধি সুপ', উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস, পায়স, মধু, 'পিঠরপক্ব মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস এবং মদ্য'। এছাড়া ছিল আর্য খানা 'দধি', 'সুগন্ধি কেশরগৌর

তক্র,[৩] রসাল, দুগ্ধ ও শর্করা'[৪]। 'স্নানঘট্টে চূর্ণকষায়[৫], কল্ক[৬] প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুসজ্জিত আছে'। আছে 'নির্মল কুর্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ'[৭]। তালিকা প্রলম্ব। কিন্তু এই ক্ষুধাবৃদ্ধিকারী খাদ্যতালিকা আপাতত মলাটবদ্ধ করে প্রমোদ-বিলাসের অন্য আয়োজনের দিকে ফিরে তাকানো যাক। অধিকতর লোভনীয় ব্যবস্থা সেখানে।

স্নানের ব্যবস্থায় ভরতের সৈন্যদল উন্মত্ত হয়ে উঠল। কেননা 'প্রত্যককে সাত-আটজন স্ত্রীলোক সুরম্য নদীতীরে (সুইমিং পুল ?)[৮] লইয়া গিয়া স্নান ও কেহ কেহ মধু পান করাইতে লাগিল। সে কেমন মধু ? না জানাই ভালো। ম্যাসেজ ক্লিনিকও বসানো হয়েছে। অপ্সরাদের লাগানো হয়েছে রাজপুরুষ ও সৈন্যদের গাত্রমর্দন এবং গাত্রমার্জনা করার কাজে। বলা হয়েছে, 'কোন কোন মহিলা (তাহাদের) পাদমর্দন এবং কেহ কেহ বা অঙ্গমার্জন আরম্ভ করিল'।

'চক্ষু চড়ক গাছ' কাকে বলে, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় তা উপলব্ধি ক'রে থাকবেন। সৈন্যরা তো প্রকাশ্যেই বলাবলি করেছে, কোন্ ছার অযোধ্যায় কে করে প্রত্যাবর্তন ? এখানে থেকে যেতে পারলেই ভালো হয়। ভরদ্বাজ আশ্রম প্রাঙ্গণে যে ম্যাড হাউজ বসানো হয়েছিল তার বাদশাহী ব্যাপারে কে না মুগ্ধ হবে। নাচের আসর সেই রাতে জমিয়ে তুলেছিলেন পার্বতী সুন্দরী অপ্সরাবৃন্দ। এইসব বারাঙ্গনাদের হিমালয় থেকে পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং কুবের। বলা হয়েছে, "উহারা যে পুরুষকে হস্তগত করে সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া ওঠে।" তা তো হবেই, একে নারী তায় স্বর্বেশ্যা, যারা নাকি রীতিমত শিক্ষিতা কামকলানিপুণা। দেবতাদের কামশাস্ত্রে যৌনক্রীড়ার কতই না বিভঙ্গ। তার শতরূপ উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রগুলিতে আজও জীবন্ত আছে প্রস্তরপ্রতিমায়।

৩। ফুলের পাপড়ি যুক্ত লস্যি।

৪। চিনি : সুগার কিউব।

৫। সুরভিত অঙ্গরাগ, (পাওডার ?)।

৬। গন্ধদ্রব্য (ও ডি কোলন ?)

৭। টুথপিক।

৮। 'আকাশের ন্যায় শ্যামল সরোবরে'র কথাও আছে। আধুনিক সুইমিং পুলগুলিকে মনে পড়িয়ে দেয়। নদীতীর যখন সুরম্য তখন তা সযত্নসৃষ্ট বলেই মনে হয়, যা সুইমিং পুলের সঙ্গেই তুলনীয়।

এমন ধর্মকর্মে কে না অভিলাষী হবেন। স্বর্গ তো একেই বলে। এরই নাম নন্দনকানন, চৈত্ররথবন, দেবতার ক্রীড়াপর্বত। সুতরাং ভরদ্বাজ সেরাত্রে ধর্মের ধ্বজা আশ্রমের উদ্যানে যথার্থই উড্ডীন করতে সমর্থ হন।

এই ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামভজনাকারীদের তোয়াজ করার জন্য। অতএব আমরা বলব, রামচন্দ্র তুমি আগে বাড়ো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। বলব, সীয়ারাম,জয় রাজা রাম···। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপরই কি বলা উচিত হবে সব কো সুমতি দে ভগবান ? ভগাবনের মতি-গতির নমুনা যা ভরদ্বাজ আশ্রমে দেখা গেল, তারপরও সুমতি প্রার্থনা করে, এমন বুকের পাটা কি ভরদ্বাজেরই আছে? তিনি ভরত প্রমুখ রাজন্যবর্গের সঙ্গে স্বর্বেশ্যা "অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনার নৃত্য" অবলোকন করছেন। আর যাই করুন, এই মুহূর্তে মুনিরা সুমতি প্রার্থনা করবেন না। ওটা তোলা থাক শোষিত ভরতবাসীর জন্য। তাঁরা হনুমানের পায়ে সিঁদুর লেপে সুমতি চাইবেন এইসব প্রমোদ প্রাঙ্গণ থেকে শতহস্ত দূরে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খরাপীড়িত নিরস জমিতে ব'সে। সুখী নেতা বলবেন, রাম ভজ, সব পাবে। তারা বলবে, জয় রাম সীয়ারাম, আর অনন্তকাল বসে থাকবে তীর্থের কাকের মতো। ভগবান বলবেন, দুঃখ কোরো না। ইহকাল যন্ত্রণাময়। শান্ত নির্লোভী হও, মৃত্যুর পর প্রার্থিত স্বর্গে বাগানবাড়ির মজলিসে নিশ্চয় প্রবেশ-পত্র একখানা পেয়ে যাবে। জীবন তো এতটুকুন। কিন্তু ভেবে দেখো, মরার পর অনন্ত কাল পড়ে থাকে। তা সেটাই যাতে সুখের হয় সেজন্য এই ছোট্ট জীবনটা দেবতার পায়ে সমর্পণ করে কেঁদে কাটিয়ে দাও, আখেরে লাভ হবে। লাভের আশায় দারিদ্র্যদুর্গন্ধযুক্ত শরীর সাগরে গঙ্গায় ধুয়ে ধুয়ে যে মানুষ ভক্তিভরে মালা জপতে থাকবে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। মরলেই সুখ, যদিও মৃত্যুর পর এই শরীরধারী তুমি আর থাকবে না। সুতরাং তোমার ভোগ সুখ দুর্ভোগও থাকবে না। এই অবস্থাটায় নির্বাণ লাভের আনন্দানুভূতি লাভ হবে। সেই তোমার সুখের স্বর্গ।

কিন্তু ভরদ্বাজ আশ্রমের লৌহফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে এইসব ঈর্ষাকাতরতা নিষ্ফল। বরং সাহস থাকলে যাও দ্বার ঠেলে ভেতরে। সরাসরি প্রশ্ন করো কী ভাবে অত্যল্প সময়মধ্যে ভরদ্বাজ এতো বড একটা আয়োজন করে ফেললেন। কী এর পেছনের রহস্য। কিন্তু কাকে প্রশ্ন করবে? ভরদ্বাজ যে এখন সুরাপানে, সুখাদ্য আস্বাদনে, নারীসঙ্গে অনন্যহৃদয়।

অগত্যা রামায়ণিক তথ্যে নজর করা যাক। খবর হলো "মহর্ষি অগ্নিশালায়

প্রবেশ করিয়া…বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিলেন…**শিক্ষাস্বর প্রয়োগপূর্বক।"**

'শিক্ষাস্বর' বলতে কি বুঝব? যে 'স্বর' শিক্ষাদ্বারা লব্ধ হয়েছে? অর্থাৎ এমন এক কণ্ঠস্বর যা ভরদ্বাজের নিজস্ব নয়। তবে সে কণ্ঠটি কার? কোনো বিশেষ যন্ত্রের? মন্ত্র যখন নয়, নয় তথাকথিত যোগবল, অথচ যে স্বর ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে এলাহাবাদ অঞ্চল থেকে গাড়োয়াল পর্বত বা গন্ধমাদন পার্বত্য এলাকায়, হিমালয়ের দশ-বারো হাজার ফুটের মতো শীর্ষলোকে, সেই স্বরটি যন্ত্রমাধ্যমেই প্রেরণ সম্ভব। সে যন্ত্রটি হ'তে পারে বেতার বা উয়্যারলেস যন্ত্র। শক্তিশালী ট্রান্সমিটার। এটি ব্যবহার করতে শিক্ষা নিতে হয়, তাই তা 'শিক্ষাস্বর'। যন্ত্রটি রক্ষিত আছে অগ্নিশালায়। দেবতারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহারকে অলৌকিক মহিমা দান করতেন। এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার আগে কয়েকটি অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের আড়ম্বরপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ভারদ্বাজ যন্ত্রটি ব্যবহারের পূর্বে "সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জন" করেছিলেন। এসব আড়ম্বর ও ভড়ং শিখিয়ে দেবতারা নিছক বিজ্ঞানকে ম্যাজিক বা অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত করতেন। এসব প্রক্রিয়া তপস্যা ক'রে শিখতে হ'তো। তপস্যার অর্থ দেবতাদের সেবা। সেবায় তুষ্ট হ'লে তাঁরা স্তাবককে কিছু কিছু অস্ত্র দান করতেন। এই দানের নাম, বরদান। এবং দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দিতে হ'তো নৈবেদ্য বা মূল্যবান সব উপঢৌকন।

ভারদ্বাজ যেভাবে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়ায় অর্জুনও সংবাদ পাঠান। কুন্তী মাদ্রী আহ্বান করেন দেবতাদের। এসব কাণ্ড সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' এবং 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' গ্রন্থদ্বয়ে। অনুসন্ধিৎসু সে ব্যাখ্যা কষ্ট করে সেখানেই দেখে নেবেন, বিভিন্ন পৌরাণিক তথ্য নজিরের উল্লেখ সহ এসব ব্যাখ্যা পুনরায় করার সুযোগ নেই এখানে।

ভরদ্বাজ দেবতাদের কাছে চাইলেন, খাদ্য, মৈরয় ও সুসংস্কৃত সুরা এবং ইক্ষুরস-স্বাদু সুশীতল পানীয়। আহ্বান করলেন, "ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা ও পর্বতবাসিনী সোমাকে।" নাম শুনে মনে হয়, দেবতারা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকেই দেবদাসী সংগ্রহ করতেন, যাঁরা ছিলেন চিরকুমারী। দেব-প্রয়োজনে এইসব দেবদাসী পুরুষের মনোরঞ্জনে বাধ্য থাকতেন।

"সুররাজ পুরন্দর ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার কাছে যাঁহারা (যে বারনারীরা) গমনাগমন করিয়া থাকেন সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান" করলেন ভরদ্বাজ।

এখানে এক 'পুরন্দর' ইন্দ্রের উল্লেখ আছে, ভরদ্বাজ যাঁকে খবর পাঠিয়েছেন। এই ইন্দ্র নিশ্চয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালীন ইন্দ্র নন। কারণ লঙ্কাকাণ্ড ও ভারতযুদ্ধকাণ্ড বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে বহু পুরুষের ব্যবধান। এ বিষয়ে এই গ্রন্থে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছি পৌরাণিক তথ্যাদির আলোকে।

যাইহোক, ভরদ্বাজের আশ্রমে যে বিশাল আয়োজন হতে দেখলাম তাতে বোঝা গেল, ভরদ্বাজ আশ্রমটি কয়েক শত একর জমি নিয়ে বিস্তৃত ছিল। সেজন্যই সেখানে অতগুলি তাঁবু বা 'চতুর্শাল গৃহ' তৈরী করা সম্ভব হয়। এক রাত্রে একাধিক চতুর্শাল গৃহ বানানো হয়েছিল বললে তাঁবুর কথাই মনে হ'তে পারে। তাঁবুর তিন দিক দেওয়াল ও প্রবেশপথ নিয়ে চারটি দিক। সেকালের রাজারা তাঁবুর ব্যবহার করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে স্কন্ধাবার স্থাপনের কথা হামেশা পাওয়া যায়। স্কন্ধাবার মানে তাঁবুশিবির। সুদৃশ্য মনোরম তাঁবুকে চতুর্শাল গৃহ বলা যেতেই পারে।

ভরদ্বাজের আতিথ্যে বড় সুখেই কেটে গেল এক দিন এক রাত। পরদিন প্রত্যূষে বিদায় নেওয়ার সময় ভরত সকলের সঙ্গে ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণনেতা ভরদ্বাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কৈকেয়ীর পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, "এই সেই আর্যরূপিণী অনার্যা কৈকেয়ী।...এই পাপীয়সীই আমার জননী।"

উত্তরে মৃদু হেসে ভরদ্বাজ বললেন, "বৎস! তুমি তোমার জননীর ওপর দোষারোপ করিও না। রামের এই নির্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে। এই ঘটনায় দেব দানব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য অবশ্যই সাধিত হইবে।"

কৈকেয়ী যে ঘরে-বাইরে বিনা দোষে লাঞ্ছিতা হ'চ্ছেন দেবশিবিরের মাতব্বররা তা জানেন। অথচ স্পষ্ট ক'রে দেবতাদের অভিসন্ধির কথাও বলা যাচ্ছে না। তবু কৈকেয়ীকে তাঁর স্বমর্যাদায় রক্ষা করার একটা চেষ্টা এবং দায়িত্বও আছে। তাই বারবার কারণ না দেখিয়েই কৈকেয়ীকে দোষারোপ করলেও জনান্তিকে রামচন্দ্রকে এবং ভরতকেও কৈকেয়ীর নির্দোষিতার কথা জানিয়েছেন মুনিরা। এখন ভরদ্বাজ প্রায় স্পষ্টতই বললেন, মিছিমিছি কৈকেয়ীকে দোষারোপ করো না। রামের বনযাত্রা দেব দানব ও ব্রাহ্মণদের অভীষ্ট সাধন করবে। এতে তাঁদের হিতকর কাজই করা হয়েছে।

অর্থাৎ বুঝতে হয়, কৈকেয়ীকে বরদানের প্রসঙ্গ এবং তারই উল্লেখ করে রাম-চন্দ্রের অভিষেক বন্ধ করে দিয়ে তাঁকে বনে পাঠানোর সব গল্পই দেবতাদের বানানো। বানানো সেই অন্ধ মুনির পুত্রবধের গল্পটিও হতে পারে। অথবা হয়ত বস্তুতই 'শব্দবেধী' দশরথ কখনো মৃগয়ায় গিয়ে এক মুনিপুত্র বধ করেও থাকতে পারেন।

রামকে বুকছাড়া করার সময় তাঁর মনে হয়েছে, মুনির ছেলেকে না জেনে হত্যা করার পাপেই আজ তাঁর এই শাস্তি। এমন প্রায়শ্চিত্তবোধ সব মানুষের মনেই আসে, তবে তার সঙ্গে মুনিশাপ ফলবতী হওয়া এবং তারই ফলে রামের বনবাস যাত্রা যে হয় নি তা তো স্পষ্টত মুনিরাই বলছেন।

এরপর ভরতকে চিত্রকূটের পথ বুঝিয়ে দিলেন ভরদ্বাজ। এখানে পুনশ্চ লক্ষণীয়, কোনো বাল্মীকি আশ্রমের উল্লেখ এবারেও তিনি করলেন না।

'কোবিদার ধ্বজা' উড়িয়ে অযোধ্যার রাজরথ শোভাময়ী চিত্রকূটের পাকদণ্ডি পথ বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল। রথের সামনে পেছনে চলেছে সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য যানবাহন। পার্বত্য অরণ্যপ্রদেশ সচকিত হয়ে উঠেছে তুমুল কোলাহলে। সেই ঘর্ঘররবে সতর্ক হয়ে উঠেছে রামসেনারাও। সেনাধ্যক্ষ লক্ষ্মণ দূর থেকে অযোধ্যার ধ্বজা লক্ষ্য ক'রে দ্রুত ছুটে গেলেন সীতার সঙ্গে মধুরালাপে প্রমত্ত রামচন্দ্রের কাছে। লক্ষ্মণ বুঝেছেন ভরত আসছেন সঙ্গে বিশাল বাহিনী নিয়ে। লক্ষ্মণের আশঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর ভবিষ্যতে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করবেন এই বাসনায় ভরতের আগমন। সুতরাং বিপদ এসেছে দ্বারে করাঘাত হেনে। লক্ষ্মণের ইচ্ছে, ভরত আরও এগিয়ে আসার আগেই তিনি শত্রুকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেন।

শুনে রাম নিশ্চিন্ত মনে হাসেন। বলেন, না লক্ষ্মণ, তার দরকার নেই। রাজ্যে আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। বলেন, "যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যে আমার কী হইবে?...ধর্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও তোমাদের নিমিত্তই অভিলাষ করি।...ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্ধনের জন্যই আমার রাজ্য লাভের বাঞ্ছা, লক্ষ্মণ!

অনায়াস মিথ্যাভাষণে এবং কপট অভিনয়ে সুপটু রামচন্দ্র ভারি চমৎকার আত্মপ্রশংসা করতে পারেন। লক্ষ্মণ জানেন না, বৃহত্তর রাজ্যসম্পদ এবং সম্মান প্রতিপত্তি লাভের আশাতেই রামের দণ্ডকারণ্য যাত্রা। লক্ষ্মণ এও জানেন না যে, অযোধ্যার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও পূর্বাপর ঘটনাবলী ব্রাহ্মণদূতমুখে রামচন্দ্র প্রতিদিনই পেয়ে থাকেন। হয়ত ভরত আসছেন রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এই সংবাদও রাম পেয়ে গেছেন আগেই। কিন্তু সেই সংবাদ লক্ষ্মণের অজ্ঞাত। তাই লক্ষ্মণের উত্তেজনা আশঙ্কা কিছুই রামচন্দ্রকে স্পর্শমাত্র করে না। তিনি নিশ্চিন্ত, বিপদ তাঁর ধারকাছে ঘেঁষবে না, কারণ দেবতারা রামকে ঘিরে আছেন। চারদিকে সুকঠিন সিকিউরিটি। রাম তাই সীতার সঙ্গে প্রেমালাপ করেন আর তাঁকে প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য দেখিয়ে কাব্যোচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সময় কাটান। পাহারাদার লক্ষ্মণকে মাঝে-মধ্যে শোনান ধর্মকথা। আদেশ করেন রামসীতার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সর্বদা যত্নবান হতে।

লক্ষ্মণ না জানলেও কিন্তু নেপথ্য চক্রান্তের বেশ কিছু খবর আমরা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছি। জেনে গেছি, রাম কেন বনবাস যাত্রায় হঠাৎ এক পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছিলেন, আর ক্রমশ দেবচক্রান্তের চমকপ্রদ সংবাদ আরও জানতে পারব এই যাত্রার পথে। রামের ভ্রাতৃপ্রেম যে কত ঠুনকো তারও বিস্ময়কর প্রমাণ অপেক্ষমান আছে। সে প্রমাণ যখনই পাবো, বুঝব, কেবলমাত্র নিজের সম্মান প্রতিপত্তি এবং সিংহাসন রক্ষার করুণ প্রচেষ্টায় রাম একে একে দেবনির্দেশে ত্যাগ করেছেন সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে। ভায়েদের জন্যে তিলমাত্র ত্যাগ করে রামচন্দ্র কখনো দেবতাদের বিরাগ ভাজন হয়েছেন, এমন অপবাদই বরং রামচন্দ্রকে দেওয়া যায় না।

আর্য সম্প্রসারণবাদীরা মিথ্যাভাষণ ও অন্যায় আচরণকে অলঙ্কার স্বরূপ ধারণ করেছিলেন। গোষ্ঠীস্বার্থ পূরণে যে কোনো উপায় অবলম্বনকে তাঁরা স্বধর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর অবশ্য ন্যায় কর্তব্য অকর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন এবং সেইসব উপদেশ আশ্চর্য মানবহিতৈষী এবং সমাজসচেতন। ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে আর্য ঋষিদেরই দান। তবে সকল উপদেশেরই আদ্যন্ত লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য একটি কায়েমীস্বার্থপুষ্ট পরশ্রমভোগী সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করা।

মহাকাব্য পুরাণের মিথ্যাভাষণে ইতিহাস অবলুপ্ত হয়েছে। ভরত বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এই সংবাদ লক্ষ্মণ কোনো গাছে চড়ে সংগ্রহ করেন নি। তাঁর সঙ্গে ছিল সেনাসামন্ত এবং রাজনৈতিক গুপ্তচর-বাহিনী। চরমুখেই নিশ্চয় তিনি ভরত এবং তাঁর বাহিনী সম্পর্কে খবর পেয়ে-ছিলেন। সুতরাং এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ভরতের ঐ বাহিনীর [যদি বস্তুতই কোনো সংগ্রাম সংঘর্ষ হত] গতি রোধ করতে হলে, লক্ষ্মণেরও বিপুল সেনাদল থাকার কথা। তিনি একাকী ভরতবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারতেন না, মুনিতে বললেও আমরা তা স্বীকার করতে পারি না। পারি না তার কারণ, রাম লক্ষ্মণকে রাবণবাহিনীর সঙ্গে সসৈন্যেই যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁদের এমন কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল না যার বলে এককভাবে তাঁরা কোনো তৎকালীন বীর পুরুষের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। সুতরাং আমরা বারবার বলতে বাধ্য যে, বনবাস শব্দটির

অর্থ আর্যপুরাণে রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাসকেই বোঝায়। মহাভারত আলোচনা প্রসঙ্গেও আমার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একাধিক প্রমাণ উদ্ধার করেছি, এক্ষেত্রেও যে প্রমাণের অভাব হবে না, তা বলাই বাহুল্য। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণগুলি পাঠক নিজেই মিলিয়ে নেবেন। ভরতবাহিনীর গতিরোধ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে লক্ষ্মণ রামসেনার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিলেন, রাম ও রামানুজের অলৌকিক ক্ষমতা জাহির করার উদ্দেশ্যে সে সত্য কিন্তু মহাকাব্যে অনুক্তই থেকে গেছে।

রামচন্দ্রের দর্শন লাভ ক'রে অনর্গল অশ্রুমোচন করলেন কৈকেয়ীপুত্র ভরত। সর্বসমক্ষে জ্যেষ্ঠকে অনুরোধ করলেন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য। দুনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক অনন্যসাধারণ সাধু দৃষ্টান্ত। যখন দেব-প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নেতারা ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করার জন্য প্রস্তুত, কোনো ষড়যন্ত্র অথবা আয়াস গ্রহণ না ক'রেই যখন তাঁর হাতে বহু-ঈপ্সিত রাজ্য সমর্পিত হতে যাচ্ছে, তখন প্রথা মেনে জ্যেষ্ঠকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভরতের এ হেন উদ্যোগ কেবলমাত্র প্রশংসনীয়ই নয়, বিস্ময়করও বটে। অনেকে এজন্যই ভরতের মধ্যে সর্বোত্তম মহত্ত্ব এবং নির্লোভ সাধুতার উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, এই দুর্লভ চরিত্রটির প্রতি বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা স্বতঃই জাগ্রত হয়।

ভরতকে বোঝানো হয়েছে, রামচন্দ্রের রাজ্যত্যাগের মূল কারণ ভরতমাতা কৈকেয়ীর লোভ ও লালসা। ভরত অপরিণতবয়স্ক। কুটিল রাজনীতির তাৎপর্য তিনি ধরতে পারেন নি, তাই বিশ্বাস করেছেন একটি মুনিতে-বানানো আষাঢ়ে গল্পো। বিশ্বাস ক'রে দারুণ আঘাত পেয়েছেন। মায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা তাঁর নির্লোভী মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। তিনি মায়ের লালসার ফলে নিজে ছোট হয়ে গেছেন এবং নিজেকেই অপরাধী গণ্য করছেন। অথচ এই অপরাধের অংশ-ভোগী হতে হয়েছে তাঁকে আপনার অজ্ঞাতসারেই। ফলত মাতা কৈকেয়ীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে সেই অপরাধের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু কৈকেয়ীর আচরণ অপেক্ষাও বিস্ময়কর রামের আচরণ তাঁর বাগ্‌রুদ্ধ করেছে। রাম ভরতকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, "তুমিও **অজ্ঞতানিবন্ধন** তোমার জননীর প্রতি **অকারণ দোষারোপ করিও না**।

রামচন্দ্রের ভর্ৎসনাবাক্যে উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় তন্মুহূর্তে স্তম্ভিত চমকিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এ কেমন ভর্ৎসনা? যে কৈকেয়ীর প্রতি এত অজস্র দোষারোপ বর্ষিত হয়েছে, রামচন্দ্র স্বয়ং যাঁর নিন্দাবাদ করেন সময় বিশেষে, সেই

রামই একই মুখে ভরতকে ভর্ৎসনা করে বলছেন, জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ কোরো না। তাহলে এটাই প্রমাণিত যে, অদ্যাবধি আর্য প্রভুরা যাঁকে দুষ্ট রমণী বলেছেন, তিনি অকারণেই সেই দোষারোপের ভারবহনে বাধ্য হচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্দোষ, দেবতারা বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে এবং দশরথকে দোষী সাজিয়েছিলেন। এসব তত্ত্ব রামচন্দ্রের সম্যক জানা আছে, নেই তা লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সহ আপামর সাধারণের। তাই রাম বললেন, 'হে ভরত, অজ্ঞতা নিবন্ধন অকারণ দোষারোপ করিও না।' চমৎকার ছলচাতুরী। ব্রাহ্মণ অবতারদের ক্ষণমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নির্দোষ দোষী সাব্যস্ত হন, আবার তাঁরাই পরবর্তী ক্ষণে দোষী বলে কথিত একই ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে সনাক্ত করেন। ধর্মের কল এভাবেই বাতাসে নড়ে। ধর্মের অর্থ তাই গুহার আঁধারে নিহিত। ধর্ম মানে সেজন্যই আমরা বুঝি ক্ষমতাধীশের আনুকূল্যকারী একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার বলে তাঁরা ধারণ করেন তাঁদের প্রশাসনের বলগারজ্জু; ধর্ম শব্দের অন্তর কোনো আধ্যাত্মিক অর্থ সেদিন ছিল না, হয়তো বা আজকেও নেই।

রাজ্যলোভী যুধিষ্ঠিরকেও রামচন্দ্রের মতোই মিথ্যার বেসাতি করতে হয়েছিল। ধর্মের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও করেন নি। যুদ্ধে অপরাজেয় হয়েছিলেন আর্য সম্প্রসারণবাদীরা কেবলমাত্র অন্যায় আর মিথ্যাচার মূলধন করে। কর্ণ দুর্যোধন কংস দ্রোণাচার্য কিম্বা ইন্দ্রজিৎ বালী রাবণকে ন্যায়যুদ্ধে পরাস্ত করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার ছিল যদি সেই প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণদের সমতুল অন্যায়াচরণে পারদর্শী হতেন। যে অর্জুনকে ছলনার দ্বারা বলহীন করতে হয়েছিল একলব্যকে, যে বালীকে অন্তরালবর্তী রামচন্দ্র নিধন করেছেন অসতর্ক মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণে, যে শিশুপাল নিহত হয়েছেন নির্জনে গোপনে, যে কীচক প্রাণ দিয়েছেন দ্রৌপদীর ছলনায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একাকী গভীর রাত্রে, যে জরাসন্ধ নিহত হয়েছেন ছদ্মবেশী কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দুর্বল হাতে,তাঁদের কেউ-ই দ্বিতীয় শ্রেণীর বীর ছিলেন না; একমাত্র দোষ ছিল, তাঁরা যুদ্ধের সময় তৎকালীন নীতি নিয়ম মানতেন, প্রতিজ্ঞার মূল্য দিতেন এবং অদ্ভুত ক্ষমার আদর্শে আপন ধ্বংসকেও আলিঙ্গন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। স্বদলীয় অভিমন্যু এবং ঘটোৎকচকে অভিনব উপায়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির নির্মমভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন। তবু এমন নিষ্ঠুরতায়ও আমরা যে বিচলিত হইনি তার একমাত্র কারণ, আর্যবুদ্ধিজীবীদের মিথ্যাভাষণের পৌনঃপুনিকতা।*

* প্রসঙ্গত লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' এবং যদুবংশ (ব্রজপর্ব) দ্রষ্টব্য।

ধীর ভাবে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনলেন রামচন্দ্র। পুত্রস্নেহাতুর দশরথ যে ব্রাহ্মণ্যচক্রান্তের শিকার হয়েছেন, সেই ব্রাহ্মণনেতৃত্বে স্বীকৃতি জানিয়েই রামের স্বেচ্ছাবনবাস। রামের পক্ষে তাই পিতৃবিয়োগে বিচলিত না হওয়াই বিচিত্র নয়। কিন্তু রাজনীতি হলো কুশলী অভিনেতাদের নাট্যমঞ্চ। রামকে সেজন্য সর্বসমক্ষে অশ্রুবিসর্জনও করতে দেখি। নিয়মমাফিক একপ্রস্থ রোদনপর্বের পর মন্দাকিনী তীরে দশরথের উদ্দেশ্যে রাজপরিবারের তর্পণ সমাপ্ত হতে রামচন্দ্র ভরতকে একটি প্রলম্ব দার্শনিক বক্তৃতার দ্বারা মুগ্ধ করলেন। বললেন, ভরত! তুমি পিতার মৃত্যুজনিত শোক পরিহার করো। মৃত্যুই নরদেহের একমাত্র সঙ্গী। নদীস্রোতের মতো আয়ু চিরবহমান। নদীর যে ধারা সমুদ্রাভিসারী, তার কদাচ প্রত্যাবর্তন নেই। বললেন, অতএব "তুমি আপনারই অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কী হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে এবং তোমারই সহিত বহুপথ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে।... যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। ...সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিহার করা সুধীর লোকের কর্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগ দুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর। পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছি তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব।"

বাঁধিয়ে রাখার মতোই উপদেশ, সন্দেহ নেই। আরও ভালো হতো যদি এই উপদেশ রামচন্দ্রের আপন জীবনের সদাচারের দ্বারা উপলব্ধ এবং ব্যক্ত হতো। দুঃখের বিষয়, রাম চরিত্রে সেই মহাত্মাই দুর্লভ যা এমন দার্শনিক উপদেশ দানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

প্রথমত সকল অবস্থায় বিলাপ ও রোদন পরিহার করার শিক্ষা লক্ষ্মণের থাকলেও ছিল না স্বয়ং রামচন্দ্রের। তাঁর চারিত্র্যদৌর্বল্য বারম্বার প্রকাশ করে ফেলেছেন তিনি বনবাস কালে। সীতার আসঙ্গসুখে বঞ্চিত হয়ে রামচন্দ্র যে ভাবে সমস্ত অরণ্য কানন উচ্চকিত ক'রে বিলাপ ও রোদনে দিবসরজনী অতিবাহিত করেছিলেন তাতে রামানুজ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি সাধারণে বিস্মিত বিরক্ত হয়ে অবতারকে সদুপদেশ দিতে বাধ্য হন। উপযুক্ত অবসরে সেই মজার দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। তার আগে রামের বক্তৃতাও হজম করতে হবে। রামের এই বিসদৃশ আচরণে যে প্রতিবাদী বলবেন, পিতার মৃত্যু রামচন্দ্রকে অনায়াসে সহ্যশক্তি দান করলেও নারীসঙ্গ বিয়োগে তিনি যন্ত্রণায় হাহুতাশ করেছেন, এটা

বড়ই পরিতাপের বিষয় —সেই প্রতিবাদীকে আমরা নিশ্চয় জগৎ-দুর্লভ পাপিষ্ঠ ব'লে একবাক্যে চিহ্নিত করব। কারণ আমাদের দেবভক্তিও যে জগদ্দুর্লভ।

দ্বিতীয়ত রাম ভালো ভাবেই জানতেন যে, দশরথ ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসন দান করতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অস্বীকৃতই ছিলেন, তত্রাচ এই রামই যখন ভরতকে বললেন, 'পিতা তোমাকে এইরূপই [রাজ্যভার গ্রহণ করতে] অনুমতি করিয়াছেন,' তখন রামচন্দ্রের দ্বারা অক্লেশে টাটকা মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হ'তে শুনে আমরা লজ্জায় অধোবদন হয়েছি।

তৃতীয়ত, রাম যখন স্বীকার করেন, 'আমি যথায় যে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছি তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব', তখন সতর্ক পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে, রামচন্দ্র বিশেষ পক্ষ থেকে নিযুক্তি নিয়েই দণ্ডকারণ্য যাত্রা করেছেন, এজন্য অন্যান্য যুক্তি সবই মিথ্যা।

রামচরিত্রের পাশাপাশি অতএব ভরতচরিত্রের সরল মাধুর্য বড় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

কিন্তু আর্য পুরাণকাররা তো স্বদলীয় স্বার্থে ইচ্ছেমতোই গল্প বানান, তাই পুনশ্চ দেখতে পাই কৈকেয়ীর নির্দোষিতা সম্পর্কে রামচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার পরেও কৈকেয়ীকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেন নি, তারই অদ্ভুত ধর্মসঙ্গত ব্যাখ্যা করছেন ভরত রামচন্দ্রের কাছে। অবিশ্বাস্য অনুপুঙ্খ। এই গপ্পোটি পুনরায় যুক্ত করা হ'লো তখন, যখন আমরা জেনে গেছি, কৈকেয়ী যা কিছু করেছেন তার পেছনে ছিল এক গভীর চক্রান্তকারী চক্র, যে চক্রের অমোঘ আদেশ মুখ বুজে পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাঁর। তাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে জঘন্যতম অপবাদ, যদিও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। ক্ষণপূর্বে তাঁর নির্দোষিতা স্বীকার করেছেন রাম, আবার ক্ষণমাত্র ব্যবধানে রামের মুখেই ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা এমন একটি গল্প শোনালেন যার উদ্দেশ্য কৈকেয়ীর ওপর কলঙ্ক-লেপন! সেই বস্তাপচা কাহিনী, কৈয়েকীর কাছে দশরথ নাকি প্রতিজ্ঞা করে বর দেন যে তিনি কৈকেয়ীর যে কোনো তিনটি অভীষ্ট পূরণ করবেন। এ সম্পর্কে, আগেই বলেছি, লক্ষ্মণ যথার্থ প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, বর প্রসঙ্গ যদি সত্যিই হবে, তাহলে রামের অভিষেকের আয়োজন শুরু হওয়ার আগে, ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠানোর আগেই কেন তা উত্থাপিত হয় নি। কী এর নেপথ্য রহস্য। কেমন ক'রে এই গল্প বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

খুবই সঙ্গত প্রশ্ন সন্দেহ নেই। ভালো লাগে লক্ষ্মণ চরিত্রটি এজন্যই। মাঝে-

মধ্যেই তাঁর মধ্যে পুরুষোচিত তেজের প্রকাশও দেখতে পাই। তবে সেযুগে এতোটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না ঘটানোই উচিত ছিল, কেননা লক্ষ্মণের ব্যক্তিত্ব দেবতা তথা ব্রাহ্মণনেতৃত্ব সুনজরে দেখেন না। স্বার্থ পূরণের পর তাঁরা নির্বাসিত করেছিলেন লক্ষ্মণকে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বয়ং রামচন্দ্রকেই ঐ নির্বাসনদণ্ড-নামায় শীলমোহর এঁকে দিতে হয়েছিল। রাম বুদ্ধিমান। স্ত্রী ও বংশবদ অনুজকে বর্জন করে দেবরোষ থেকে সাবধানে নিজেকে রক্ষা করেন তিনি। যথাসময় এসব তথ্য আলোচ্য করা যাবে। ধর্মের নিগূঢ়ার্থ সেই সময় সম্যক উপলব্ধ হবে। অবশ্য তার দ্বারা ধর্মীয় পুরাণের জগদ্দলটি যে জাতির ঘাড় থেকে খসে পড়ে তার শিরদাঁড়া খাড়া করে দেবে এমন আশা নেই, কারণ পণ্ডিতরা এসবই বুঝেও না বোঝার ভান করবেন। তথ্যাদি গায়েব করে ভক্তিমূলক যে সব অদ্ভুত পুরাণ রচিত হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডের সহস্রাধিক বর্ষ পরে, সেগুলিকেই চলচিত্রে রূপায়িত করে আপামর সাধারণকে রূপকথা শোনানো হবে। আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে পাঠাগারের ধূলিমলিন প্রকোষ্ঠে আশ্রিত হয়ে। তবু যথানিযুক্ত আমি পরমেশ্বরের নির্দেশে তাঁকে হঠিয়ে মানুষের ক্ষমতালাভের বিচিত্র ইতিহাস খুঁজে যাব, যেহেতু তাঁর যেমন অভিপ্রায় ও নির্দেশ, আমাকে তেমনভাবে খোঁজ খবর তো সংগ্রহ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ সেবক রূপে নিজেকে নিবেদন করার প্রেরণায় রাম এমনই উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, স্বজাত ও স্বধর্মকে কঠিন ভাষায় গালি দিতেও কসুর করেন নি। ক্ষত্রিয় সন্তানের স্বধর্ম ত্যাগের চমকপ্রদ উদাহরণ ব্রাহ্মণ জাবালির সঙ্গে তাঁর বাক্য বিনিময়ের মধ্যে নথিবদ্ধ হয়ে আছে। রাম যখন স্পষ্টত বনবাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা না করে বহুচর্বিত ধর্মের দোহাই পাড়তে শুরু করলেন, ঋষি জাবালি তখন বলেছিলেন, "যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব রাম! পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোনো পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান ও পরক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাজ্যভার গ্রহণ কর"।

প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্ত রামচন্দ্র বলেন, "আপনার বুদ্ধি বেদ বিরোধী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্যকে নিন্দা করি।" তর্কে নয়, দোষারোপের দ্বারাই রাম জাবালিকে পরাস্ত করতে চেয়েছেন।

রাম আরও বলেছেন, "ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃশংস পামরেরা যাহার সেবা করে,

আমি সেই নামমাত্র ধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করিব।"

সম্মান প্রতিপত্তি ও ভারত জয়ের আকাঙ্ক্ষায় রামচন্দ্র ভুলে গেলেন তাঁর জন্মকুলগোষ্ঠী। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করার জন্য উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মণপদে ক্ষত্রিয়ধর্ম বিসর্জন দিতেই তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ব্রাহ্মণ পাদপদ্ম লেহনের পরিণাম যে অবশেষে কত ভয়াবহ হ'তে পারে লালসা তাঁকে সেই সম্ভাবনার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। ফলে আজীবন শুধু দেব-আজ্ঞা পালন ক'রে এবং ব্রাহ্মণ নেতাদের আদেশ মেনেই কাটাতে হল তাঁকে। বড়ই যন্ত্রণার জীবন। এমন পরাধীন রাজপদ আঁকড়ে তবুও তিনি বহু দুঃসহ রজনী নির্বিবাদে অতিবাহিত করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে ব্রাহ্মণ্যপদে মাথা নত করে দ্রুপদ রাজাও হারিয়েছিলেন তাঁর রাজপ্রতাপ, যুধিষ্ঠির এক মহাশ্মশানে স্বজনহীন অবস্থায় ব্রাহ্মণ নেতাদের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়ে কুরুক্ষেত্র-পরবর্তী জীবন শুধু বিলাপ ক'রে কাটিয়েছিলেন। কৃষ্ণের ব্রাহ্মণপদে দাসত্বের এক বিস্ময়কর উদাহরণ হল, একবার দুর্বাসার আদেশে কৃষ্ণ রুক্মিণীর অনাবৃত সারা অঙ্গে উত্তপ্ত পায়স লেপন করেন এবং দুর্বাসা যখন কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণীর উন্মুক্ত অঙ্গেও স্বহস্তে পায়স লেপন ক'রে তাঁকে রথে জুড়ে চাবুক মারতে থাকেন কৃষ্ণ তখন সে দৃশ্যের নীরব দর্শকমাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণকে বাধা দেওয়ার মতো বুকের পাটা তাঁর ছিল না, ব্রাহ্মণের কদভিপ্রায়ের কবল থেকে পারেন নি তিনি নিজ মহিষীকে রক্ষা করতে। এমন যে সব ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের বীরত্ব ও পুরুষত্ব, তাঁরাই উন্নীত হয়েছেন ভারতবাসীর পুরুষোত্তম ঈশ্বরাবতার ও স্বয়ং ঈশ্বর রূপে!

রামচন্দ্রের চণ্ডমূর্তি দেখে জাবালি বললেন, "রাম! আমি নাস্তিক নহি। নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।"

ভারি অদ্ভুত যুক্তি। পুরো ব্যবসাদারী ব্যাপার। এমন যুক্তি কি জাবালি ব্যঙ্গচ্ছলে সর্বসমক্ষে উপস্থিত ক'রে ব্রাহ্মণ্য শক্তি-সেবক প্রভুবৃন্দকে বাক্‌রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন? কেন না, জাবালি তো বটেই, আমরাও বিভিন্ন পৌরাণিক তথ্য প্রমাণে জেনে গেছি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আসল স্বরূপ এবং তাঁদের গুহায় নিহিত গূঢ় ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা বস্তুতই গোলমেলে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের

স্বার্থে তা প্রয়োজনে এভাবেই 'না'-কে 'হ্যাঁ' এবং 'হ্যাঁ'-কে 'না' করতে পারে। প্রয়োজনে নাস্তিক, পরক্ষণেই আস্তিক হওয়া তাঁদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। দেবতাদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য যে কর্ণকে তাঁরা দেবপুত্র জেনেও সূতপুত্ররূপে প্রত্যাখ্যান করেন, দেবপক্ষে যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ গিয়ে সেই কর্ণকেই তাঁর আসল পরিচয় উত্থাপন করে দেবশিবিরের পক্ষে অস্ত্রধারণ করার আমন্ত্রণ জানান। এমন বহুরূপী ধর্ম কাজে কাজেই যথেচ্ছাচারী। জাবালি তারই স্বরূপ প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়ে বিপদে ফেললেন ধর্মধ্বজাদের। তখন ব্যাপারটা সামাল দিতে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বললেন, "বৎস! জাবালি লোকের গতাগতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছেন।" অর্থাৎ ঢের হয়েছে। এবার তর্কে ক্ষান্তি দাও। এবার ইচ্ছে করলে জাবালি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারেন। এই তর্ক থামাতে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের তৈরী করা সৃষ্টি-কথন-কাহিনী আবৃত্তি করে দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি আকর্ষণের প্রয়াস করলেন। এই সৃষ্টিকথা-কাহিনী প্রত্যেক পুরাণে একই ভাবে বিবৃত থাকে। এখানে বশিষ্ঠের কাহিনীটি অপ্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র সবিশেষ উল্লেখ্য এই যে, বশিষ্ঠও স্বীকার করলেন, সগর রাজা খনন কাজের দ্বারাই গঙ্গার অবতরণ পথ উন্মুক্ত করার প্রযত্ন গ্রহণ করেছিলেন এবং ইক্ষ্বাকুবংশের রীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রই অযোধ্যার সিংহাসনে যোগ্য অধিকারী!

কিন্তু সর্বসমক্ষে এ তো ব্রাহ্মণ নেতাদের অভিনয়মাত্র। রাম তা জানেন। আর জানেন বলেই তেজ ও সাহসের সঙ্গে বশিষ্ঠের উপদেশও প্রত্যাখ্যান ক'রে দণ্ডকারণ্য যাত্রার সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন।

ওদিকে ভরত দেখলেন গ্রন্থিমোচনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। তখন তিনি উপস্থিত জনতার প্রতি লক্ষ্য ক'রে বললেন, "সভ্যগণ! শ্রবণ কর। মন্ত্রিবর্গ! আপনারাও শুনুন। আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই। জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্যপালন···যদি ইহার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধিরূপে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।"

কিন্তু ভরত তো জানতেন না, বনবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য রাবণনিধন। রামকে দণ্ডকারণ্য যেতেই হবে। সুতরাং নাটকের যবনিকা পতন হ'ল ভরতের মাথায় রামচন্দ্রের পাদুকা স্থাপন করে। সর্বসমক্ষে ভরত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হলেন! রামের অবর্তমানে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে

রামচন্দ্রের পাদুকা, আর রামচন্দ্রের জন্য এই পাকা ব্যবস্থাটি সাক্ষীসাবুদ সামনে রেখে সুসম্পন্ন ক'রে গেলেন স্বয়ং নেপথ্যের নায়ক দেবতারাই। ফলে রামের রাজত্বও রইল, আবার ব্রাহ্মণেরাই হলেন সে রাজ্যের প্রকৃত শাসক এবং ভরত তার নিয়মমাফিক প্রতিনিধি শাসক। রামায়ণিক তথ্য জানায়ঃ রাম ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্বগণ (দেবজাতীয় পুরুষ) তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।...অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, "বীর!...রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও।"

স্পষ্ট হ'ল দেবতাদের অভিসন্ধি। আবারও বোঝা গেল, রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার কথা প্রচার মাত্র। উদ্দেশ্য, দেবস্বার্থে রাবণনিধন। রামের ছদ্মবনবাস তাই দেবস্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।

দেবানুগত রাজারা সেকালে জ্যান্ত দেবতাদের সাক্ষাৎ যমের মতো ভয় পেতেন। দেখা গেল দেবতাদের আগমন ও আদেশে ভরত ভয়ে কাঁপছেন। কবি সেই ঘটনার প্রতিবেদন এইভাবে রেখে গেছেন, "অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত-বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য! আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না...আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।"

হয়ত ভরত নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল নন, নতুবা পুরো ব্যাপারটির মধ্যে তিনি গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেয়ে শঙ্কিত হয়েছেন এবং এই সব নোংরা রাজনীতির বাইরে শান্তিতে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু অত সহজে তো মুক্ত পাওয়ার উপায় নেই। ভূতে পেলে ওঝায় ভূত নামিয়ে দিতে পারে। দেবতায় ধরলে মরণপণ লড়াই ভিন্ন নাই অন্য পথ। সুতরাং ভরত রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন অযোধ্যায়। প্রতিজ্ঞা করলেন ঐ পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি নগরীর বহির্ভাগে চোদ্দ বছর কৃচ্ছ্রসাধণায় রত থাকবেন এবং সেখান থেকেই রামের প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজকার্য দেখাশোনা করবেন। আসলে ভরতের রাজা হওয়া হ'ল না, তিনি বিনি-মাইনের ভারবাহী কর্মচারী গোমস্তা নিযুক্ত হলেন।

তাঁকে বিদায় জানাবার সময় রাম বলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শেই ভরত যেন রাজকার্য পরিচালনা করেন। এবং যে কৈকেয়ী দেবস্বার্থ সাধনের জন্য নীরবে রাজ্যসুদ্ধ মানুষের ঘৃণা ও করুণার পাত্রী হয়েছেন, যেহেতু রাম তার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন, তাই ভরতকে আবারও বলে দিলেন, "তোমার

জননী তৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভবশতই হউক যে কার্য করিয়াছেন তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে।"

কৌশল্যা বা সুমিত্রার জন্য কোনো রকম ভাবনা নেই ভগবান রামচন্দ্রের। তিনি শুধু দেবশিবিরের স্বার্থসংরক্ষক কৈকেয়ীর সুব্যবস্থার জন্যই চিন্তিত। তাই বারবার ভরতকে বলেছেন, কৈকেয়ী নির্দোষ। ভুল ক'রে তাঁর প্রতি কোনো রকম অন্যায় আচরণ করবে না, এটাই আমার আদেশ।

ভরতচরিত্র মহৎ অথবা ভীরু, এ তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে ভরত যে নির্লোভী এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেক অক্ষম পুরুষও রাজ্যলোভে নিজের ক্ষমতা যাচাই না করেই মা বাবা ভাই কাকাকে হত্যা করে রাজপদ অধিকার করেছেন। ভরত তাঁদের মতো লোভী পাষণ্ড নন। রাজ্য এবং প্রজার মঙ্গলের জন্যই তিনি রাজপদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। মানুষের সমাজে এরকম মতিগতি বস্তুতই মহত্বের পরিচায়ক এবং তদর্থে ভরতও একটি মহৎ চরিত্র।

দণ্ডকারণ্যে বিরাধবধ

চিত্রকূটের আবাস রামচন্দ্রকে ছেড়ে যেতে হল রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার খর রাক্ষসের ভয়ে। লঙ্কার রাক্ষসজাতি দক্ষিণ ভারতের অরণ্যময় প্রদেশে আগে থেকেই বসবাস করতেন। আগেই বলেছি, রাবণ কুবেরের কাছ থেকে রাক্ষসজাতির পৈতৃক রাজ্য লঙ্কা পুনরুদ্ধার করেন। তখন রাক্ষসেরা স্বর্ণলঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং রাবণের আমলে লঙ্কারাজ্য সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রাক্ষসদের অধিকৃত স্থানও কিছু কিছু থেকে যায়। রাবণের প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন রাক্ষসনেতা সেইসব অঞ্চলের রক্ষক ও শাসকরূপে অবস্থান করতে থাকেন দক্ষিণ ভারতেই।

অরণ্যকাণ্ডে প্রবেশের আগে জানা গেল, রাবণভ্রাতা খর চিত্রকূট পর্যন্ত রাক্ষসজাতির প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যোগী হন। রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ শিবিরগুলির ওপর উৎপাত শুরু করে। তখন ভীতসন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণেরা চিত্রকূট ত্যাগ করে পালাতে আরম্ভ করেন এবং রামচন্দ্রকেও তাঁরা চিত্রকূট ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রামচন্দ্র সর্বশক্তিমান এবং 'সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি'রূপে বর্ণিত হ'লেও খরের আগমন

সংবাদ শুনেই পালিয়ে যান চিত্রকূট থেকে। রামচন্দ্রের পলায়নের কথা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করলেন না রামচরিত রচয়িতা। তিনি বললেন চিত্রকূটে বসবাসে রামের আর প্রবৃত্তি হয় নি।

চিত্রকূট ত্যাগ করে রাম দণ্ডকারণ্যের পথে অগ্রসর হলেন। মাঝে একরাত বিশ্রাম করেন অত্রি মুনির আশ্রমে। এই সময় থেকে রামের সঙ্গে আর অযোধ্যা-বাসীদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না। রাম-বনবাস বিষয়ক সাজানো নাটকের অবসান হলো। অতঃপর রামলক্ষ্মণসীতার যাত্রা রাজনৈতিক অভিযান। এই পর্বে তাই দেখা গেল, অত্রি মুনির আশ্রমে, বনবাসের রূপসজ্জা ত্যাগ করে সীতা সালঙ্কারা হলেন। হয়ত রাম লক্ষ্মণও তাঁদের নাটকীয় বেশ পরিবর্তন করেছিলেন। তবে সে কথা স্পষ্টত বলা হয় নি। ইতিপূর্বে আমরা অবশ্য শুনেছি, রাম লক্ষ্মণের অঙ্গ বর্মাচ্ছাদনে আবৃত থাকত।

দণ্ডকারণ্যের উত্তর দিকটি ব্রাহ্মণ বসতির দ্বারা তৎকালে বেশ জমজমাট ছিল। রামচন্দ্র "দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। ...ঐ সকল আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে।" বর্ণনায় জানা যাচ্ছে, বিলাসব্যসন, খাদ্য পেয় ফলমূলাদি এবং হোমযাগের প্রচুর উপকরণ ছিল সেইসব আশ্রম নামক অট্টালিকায়। সেখানে নারী সম্ভোগের ব্যবস্থাও ছিল যথারীতি; সেখানে "অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে।" তাপসগণ যে কী ধরনের তপারাধনা করতেন এইসব বর্ণনা থেকে তা ভালোই বোঝা যায়।

ব্রাহ্মণ কবি বাল্মীকি অবশ্য জাতভাইদের ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্য লিখেছেন, "ঐসব পবিত্রস্বভাব তাপসগণ" রামকে বলেছেন, "আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখনো কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমরা কিন্তু এর প্রতিটি শব্দেই অনাস্থা উত্থাপন করি। মহাভারতে দেব-শিবিরভুক্ত রাজা কুন্তীভোজ কুন্তীকে বলেছিলেন, খুব সাবধান, ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতই ক্রোধনস্বভাব।

রামচন্দ্র মিথ্যাভাষীদের প্রণিপাত ক'রে গল্প শুনতে বসলেন তাঁদের কাছে। পরদিন গভীর বন প্রদেশে তাঁর যাত্রা শুরু হল তাপসগণ প্রদর্শিত পথে।

বনপথে প্রথম যে অদ্ভুত প্রাণীটির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল সেই প্রাণীর বর্ণনা কৌতুহলোদ্দীপক। প্রাণীটি দীর্ঘকায় এবং রাক্ষসজাতীয় পোশাক পরিহিত। তাড়াছা 'ভীষণ ঘোরদর্শন'। 'উহার আস্যদেশ' ও 'উদর স্ফীত' 'নেত্র

কোটরান্তর্গত', পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। সেই দীর্ঘকায় প্রাণীটি প্রথমে সীতাকে ও পরে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বনমধ্যে দ্রুত এগিয়ে যেতে শুরু করলো। লক্ষ্মণ ও সীতা ভয় পেলেও রাম নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বললেন, "বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছাক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, 'ইহাই আমাদের গমন-পথ।"

বুঝলাম, রাক্ষসরূপসজ্জায় সজ্জিত এই অদ্ভুত প্রাণীটি রামচন্দ্রের গমনপথে বিশেষ একটি যানের বিকল্পস্বরূপ কাজ করছে এবং এমনটি যে ঘটবে তা রাম আগেই জেনে এসেছেন নেপথ্যের কোনো দেবদূতের কাছে; সেজন্যই তিনি নিশ্চিন্ত।

বনচারী বিশালাকার এই আগন্তুক নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে, সে ব্রহ্মার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতেরও অবধ্য। তার নাম, বিরাধ।

যদিও বিরাধের সঙ্গে রামের একটি যুদ্ধের গল্প আমাদের শোনানো হয়েছে, গল্পটি কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যভাবে খাড়া করা যায় নি। কারণ বিরাধকে প্রথমে রাক্ষস বলা হয়েছিল। সেই রাক্ষসের প্রতি রামনিক্ষিপ্ত শরজাল ব্যর্থ হয়েছে। তত্রাচ বিরাধ রাম লক্ষ্মণ সীতাকে আক্রমণ করে নি,কোনো ক্ষতিও করে নি তাঁদের। বরং হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ বনপথ পাড়ি দেওয়ায় ব্রহ্মাপ্রেরিত দূতের মতোই সে ওঁদের সাহায্য করেছে। দুই প্রলম্ব হাতে ভূমি থেকে তুলে নিয়েছে রাম লক্ষ্মণ সীতাকে, তারপর যখন তরতর করে এগিয়ে গেছে তখন রাম নিশ্চিন্ত মনে লক্ষ্মণকে বলেছেন, এই প্রাণী তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে, সুতরাং মা ভৈঃ।

বিরাধের সঙ্গে বিরোধের কাহিনীটি সম্পূর্ণ একটি কল্পগল্প। সে গল্প রামবীরত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে সাজানো হয়েছিল। বর্ণনাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, গল্পরচয়িতা এই নাটকের শত্রুমিত্র সম্পর্কে নিজেই সম্যক পরিচিত নন। এমন অবস্থায় তিনি যে যুদ্ধঘটনা সাজিয়েছেন, কাজে কাজেই তা অবিশ্বাস্য হয়েছে। বিরাধ একটি যন্ত্রযান মাত্র এবং সে যন্ত্রের গাত্রাবরণ দুর্ভেদ্য কোনো ধাতু দ্বারা নির্মিত ছিল।

বিপদসংকুল বনপথ পার হওয়ার পর বিরাধ নামক রাক্ষসরূপী যানটিকে তার চালকের সহযোগেই রাম লক্ষ্মণ ধ্বংস ক'রে ফেলেছেন। বিরাধ-যানের যে একটি চালক এতোক্ষণ অনুল্লিখিত ছিলেন, কার্যোদ্ধারের পর কবি সেই চালকের পরিচয় প্রকাশ করে বলেছেন, তার নাম, তুম্বুরু। তুম্বুরু জাতিতে গন্ধর্ব। যক্ষরাজ কুবের এই তুম্বুরুকে হিমালয় থেকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করেন এবং তাকে বলে দেন, দশরথপুত্র রাম তোমাকে সংহার করলে তুমি রাক্ষসমূর্তি পরিত্যাগ ক'রে পূর্ববৎ গন্ধর্বমূর্তি ধারণ ক'রে স্বর্গে প্রত্যাগমন কোরো। অবশ্য এখানেও প্রচলিত

পৌরাণিক কথনরীতি প্রয়োগ করে একটি শাপশাপান্তের গল্প জোড়া হয়েছে, তবে গল্পটি জুতসইভাবে জোড় খায় নি। গল্পটি বলে, তুম্বুরু দেবনারী রম্ভার প্রতি আসক্ত হওয়ায় কাজে অনুপস্থিত থাকে। ফলে ক্রুদ্ধ কুবের তাকে শাপ দিয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করেন।

পুরাণে দেবতা ও মুনিরা কথায় কথায় শাপ দেন। বিচিত্র এই ঘটনা। দেখা যায়, হিমালয় থেকে নিম্নভূমিতে কারকে কার্যোপলক্ষে প্রেরণ করা হলে সেই ব্যবস্থাকেও দেবতার অভিশাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেবভূমি হিমাচল সেকালে এমনই একটি সুখপ্রদ জায়গা ছিল সেখান থেকে কারকে বিতাড়িত করা হলে তা একটি চরম শাস্তি রূপেই গণ্য হ'ত। সমতলে পোস্টিংও তাই ছিল অভিশাপস্বরূপ।

দেবভূমে অবাধ ও অবৈধ যৌনচার ছিল দেবতা ও দেবজাতীয় নারীপুরুষের নিত্যকর্ম। তুম্বুরু যক্ষরাজ কুবেরের কর্মচারী ছিলেন। এই দেবজাতীয় গন্ধর্ব রম্ভার সঙ্গে রতিলীলায় আসক্ত হয়ে তার কর্তব্যে অবহেলা করে অর্থাৎ নির্ধারিত ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকে। তখন মালিক কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে স্থানান্তরে দেবকার্যে নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ তুম্বুরুর অপরাধে তাকে স্বর্গ থেকে পাতালে (হিমালয় থেকে দাক্ষিণাত্যে) দেবকার্যোপলক্ষে ট্রান্সফার বা বদলি করা হয়। সুন্দর সাজানো পার্বত্য শহর থেকে রাক্ষসজাতীয় শত্রুপক্ষ-অধ্যুষিত ভয়ঙ্কর জঙ্গলে কোনো কর্মচারীকে 'ট্রান্সফার' করার অর্থ তো তার ওপর মস্ত অভিশাপ বর্ষণ করার সামিল। তুম্বুরুর ক্ষেত্রে সুতরাং সেটাই হয়েছিল ঘটনা। আদেশ ছিল তাকে সেই গহন অরণ্যে রামের যাত্রাপথে অপেক্ষা করতে হবে। রামচন্দ্রকে দুর্গম বনাঞ্চল পার করে দিলে তবেই তার ডিউটি খতম। সে ফিরতে পারবে হিমালয়ে। খুবই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। এই ঘটনার সঙ্গে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ যুদ্ধঘটনা সাজানোর আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক কথাকাররা দেবপক্ষীয়গণের ভাবমূর্তি গড়ার ব্যাকুলতায় যত্রতত্র এই রকম ছকবাঁধা গল্প সাজাবেনই। সে গল্পে লক্ষ কোটি অদ্ভুত সব শরনিকর প্রয়োগের রূপকথা থাকবে, ইন্দ্রতুল্য বীরত্বের স্তুতি থাকবে এবং সুমেরু-আকার বস্তুনিচয়েরও বর্ণনা থাকবে। এসব প্রথাবদ্ধ রচনারীতি। তাই অতঃপর এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হ'লে সংক্ষেপেই তার ব্যাখ্যা সেরে নেব। এসব ঘটনার বর্ণনা পড়াও যেমন ক্লান্তিকর, তার ব্যাখ্যা করাও তেমনি সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে হ্যাঁ, এ গল্পে একটি বিষয় লক্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য বটে। লক্ষণীয় এই

যে, গন্ধর্ব তুম্বুরুকে বিরাধ রাক্ষস বলে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হ'ল, বিরাধ রাক্ষস রামকে গন্তব্যে পৌঁছে দিলে তুম্বুরুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাম লক্ষ্মণ বিরাধকে মাটিতে পুঁতেছেন। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাটি এইরকম :

"বিরাধ শরবিদ্ধ, খড়্গাহত এবং ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও…প্রাণত্যাগ করিল না।" তখন লক্ষ্মণকে রাম বললেন, "অস্ত্রাঘাতে কোনমতে ইহার প্রাণ নাশ করিতে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করাই কর্তব্য…"। শুনে বিরাধের খোলস ছেড়ে তুম্বুরুর আবির্ভাব ঘটল। তুম্বুরু তার পূর্বালোচিত অভিশাপ প্রাপ্তির গল্পটি শুনিয়ে বললেন, "এক্ষণে…অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বলোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে ষাটযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক …মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর।…এক্ষণে তুমি আমায় গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর। মৃত নিশাচরগণের বিবর প্রবেশই চিরব্যবহার…"

পুরাণকাহিনীর রচনারীতির সঙ্গে ঘুড়িওড়ানোর কায়দার কিছু সাদৃশ্য আছে। ঘুড়ির খেলোয়াড় যেমন তার লাটাই থেকে একবার সুতো ছাড়ে ফের তখনই সে সুতো গুটিয়ে নেয়, পুরাণ-কথকও তেমনি একবার যদি বোধগম্য বাস্তব বর্ণনা করে ফেলেন অমনি যেন চমকিত হয়ে সচেতন হন এবং তৎক্ষণাৎ বাস্তব কথাসূত্র গুটিয়ে ফেলে পুনরায় শুরু করেন বিভ্রান্তিমূলক বানানো গল্প। এক্ষেত্রে তুম্বুরুর দেবকার্যে নিযুক্তির গল্পে অভিশাপের বিভ্রান্তি সত্ত্বেও যখন একটি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার সঙ্গে সবেমাত্র আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি তখনই পুরাণকথক কবি সচেতন হয়ে উঠলেন। ভাবলেন তাই তো, দেবোপাখ্যানটি বড়ই সরলীকৃত আকার ধারণ করেছে। সর্বনাশ, এখনই তো সাধারণে দেবতাদের সমস্ত চক্রান্তের কথা বুঝে ফেলবে। ছি ছি, এতোটা সুতো ছাড়া ঠিক হয় নি। এভাবে গল্প বললে দেব-উদ্দেশ্য ফেঁসে যেতে (অথবা ঘুড়ি জগতের ভাষায়, 'ভোকাট্টা' হতে) পারে। সুতরাং বাস্তবতার সুতো হুড়হুড় করে গুটিয়ে ফেলে কবি ফের শুরু করলেন নোতুন বিভ্রান্তিকর বর্ণনা। বলা হ'ল, রামকে পথনির্দেশ দিয়ে তুম্বুরু বললে, এবার আমার কাজ শেষ, প্রত্যাবর্তন করব হেড অফিস হিমাচলে। [এপর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা]। তার পরই তুম্বুরু বললে, হে রাম! এখন তুমি আমাকে কবর দাও। মাটি চাপা থাকাই নিশাচরের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু তুম্বুরু কবরে গেলে তার পুনরুত্থান হবে কেমন করে? আমাদের এই প্রশ্নে ঝুলিয়ে দিয়ে কবি হাসলেন। মজা তো ঐখানেই। তুম্বুরু দেবলোকে ফিরবে। সাধারণ গতিতে ফিরলে দেব-

লোকের মাহাত্ম্য নষ্ট হবে। তার চেয়ে সে কবর ফুঁড়ে মৃত বায়বীয় শরীরে দেবলোকে প্রস্থান করেছে, এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হ'লে নির্বোধ শ্রোতা তৎক্ষণাৎ কপালে হাত ঠুকে কেঁদে ভাসাবে, কেননা দেবদ্বিজের কথা শুনলেই কাঁদতে বসে জয় জয় বলতে হয়, যেমন মন্ত্রীর ভাষণ শেষ হ'লেই হাতে তালি বাজানোর নিয়ম।

কবর অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল। তবে তুম্বুরুকে নয়, বিরাধ নামক রাক্ষসবেশধারী দেবযানটিকেই রাম লক্ষ্মণ ও তুম্বুরু মাটিতে পুঁতে দিলেন।

প্রশ্ন হবে, বিরাধ রাক্ষস যে একটি যান বিশেষ, এ খবর কোথায় আছে? উত্তরে বলব, বিরাধ শুধু একটি যানই নয়, বিশেষভাবে নির্মিত এই যানটি ছিল সুরক্ষিত। এর ওপর আরোহণ ক'রে রামচন্দ্র নির্বিঘ্নে বিপদসংকুল বনপথ পার হয়েছেন। এই যানটি ছিল উচ্চতায় দীর্ঘাকার এবং এর উদরে বসে দিব্যি সম্ভাব্য আক্রমণ বাঁচিয়ে যাওয়া যেত। যানটির পেটে কোনো দ্বার ছিল না। আধুনিক ট্যাঙ্কের মতো তার বক্ষাবরণী খুলত মাথার ওপর। সেজন্যই বিরাধ-যানের দুটি শুণ্ডাকার হস্ত মাটি থেকে রাম লক্ষ্মণ সীতাকে তুলে নিয়ে যানের উপরিভাগ দিয়ে উদরে পুরেছে। রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যেমন সৈন্যরা মাথায় গাছগাছড়ার ঝোপ লাগায়, গায়ে পরে পত্রপত্রালির রঙে ছোপানো জামা, সাঁজোয়া গাড়ির ওপর গাছগাছালির আবরণ চাপায়, বিরাধ-যানটিকে তেমনি রাক্ষসজাতির সাজসজ্জায় মুড়ে নেওয়া হয়েছিল। যানটি পরিচালনা করছিলেন যান-বিশারদ গন্ধর্বজাতিরই এক চালক, তুম্বুরু। যানটি পাছে শত্রুর হস্তগত হয়, এজন্য গন্তব্যে পৌঁছে প্রথমেই তার কলকব্জা নষ্ট করে দিলেন রাম। শুণ্ডাকার বাহুদুটি ভেঙে ফেলা হ'ল। কণ্ঠও (এই কণ্ঠ কি উদরসদৃশ কক্ষে প্রবেশ করার ঢাকা অংশ!) অকেজো করে দিলেন রামবাহিনী। এরপর তুম্বুরুর পরামর্শে যানটিকে কবর দিয়ে তুম্বুরু প্রত্যাবর্তন করলেন। যাবার সময় রামকে শরভঙ্গ আশ্রমের হদিশ দিয়ে গেলেন।—পরিষ্কার গল্পটি এরকম হওয়াই সম্ভব। কুম্ভকর্ণের মতো যুদ্ধযান যে কালে ব্যবহৃত হয়েছে, পুষ্পকের মতো দ্বিতল উড়ন্ত যান যাঁরা ব্যবহার করেছেন, বেতার নির্দেশ পাঠানো যাঁদের যোগাযোগের স্বভাবিক মাধ্যম ছিল, তাঁরা একটি বিরাধ যন্ত্র ব্যবহার করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দেবতাদের আমলে যে সব অতি অদ্ভুত স্থাপত্যকীর্তি তৈরী হয়েছিল, সেই সমস্ত দেব-আবাসের ভগ্নস্তূপ আজও দেশবিদেশে আমাদের বিস্মিত করে। বিরাধ-যানটি সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত নগণ্য কারিগরীর নিদর্শন মাত্র।

উড়ন্ত যানে ইন্দ্র

তুম্বুরুর নির্দেশিত পথে শরভঙ্গ আশ্রমে পৌঁছালে রামচন্দ্র সেখানে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন। দেখলেন, বসনভূষণ অলঙ্কার পরিহিত দেবরাজ ইন্দ্র শূন্যে ভাসমান নিশ্চল একটি রথ বা যান থেকে শরভঙ্গের সঙ্গে কথা বলছেন। দূর থেকে ঐ অবস্থায় ইন্দ্রকে দেখে নিম্নস্বরে অনুজ লক্ষ্মণকে রাম বললেন, "বৎস। ঐ দেখ কি আশ্চর্য রথ, কেমন উজ্জ্বল।···গগনতলে প্রভাবান ভাস্করের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে।"

ইতিপূর্বে রামচন্দ্র পরশুরামের উড়ন্ত যানটি দেখেছিলেন।[১] প্রচুর হাওয়া ছুটিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে, মেঘগর্জনের গম্ভীর শব্দ তুলে যানটি অবতরণ করেছিল। ছোটখাটো একটি উড়োজাহাজ এভাবে অবতরণ ক'রে থাকতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রের উড়ন্ত রথটির আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অদৃষ্টপূর্ব। তাই রাম আশ্চর্য হয়েছেন। যানটি উজ্জ্বল বলতে যানের বিভিন্ন আলোর কথা বলা হয়ে থাকবে। এই যানটি যে রূপকথার পক্ষীরাজ চালিত নয়, কবির প্রতিবেদনে সে তথ্যেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাম বলেছেন, ইন্দ্রের রথে অশ্বযোজিত থাকে। কিন্তু ভাসমান এই রথের সঙ্গে কোনো অশ্ব সংযুক্ত নেই। রামের বিশ্বাস, নিশ্চয় সেই হরিৎবর্ণ অশ্বযুগল আকাশমার্গে অন্যত্র কোথাও বিচরণ করছে। আসলে ইন্দ্র যখন কুমায়ুন অঞ্চলে তাঁর পার্বত্য রাজধানী অমরাবতীতে ঘুরে বেড়ান তখন অশ্বযোজিত রথে চেপে ঘোরেন। কিন্তু বর্তমান রথটি একজাতের বিমান। তা যন্ত্র চালিত।[২]

রাম শূন্যে ভাসমান স্থির বিমান ইতিপূর্বে চাক্ষুষ করেন নি। সেজন্যই ইন্দ্রের স্থির উড়ন্ত যানটি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা। পথে বার হ'য়ে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। বানররাজ সুগ্রীবের যে

১। বালকাণ্ড ৭৪ সর্গ বা. রা.—ভারবি প্রকাশনা দ্রঃ।

২। দেবতাদের যন্ত্রচালিত স্পীডবোটও ছিল। লেখকের 'মহাভারতের স্বর্গ দেবতা'। (নাথ পাবলিশিং) ২য় সংস্করণ দ্রঃ।

ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল রামের তাও ছিল না। সীতা-অন্বেষণপর্বে রাম সুগ্রীবের কাছে ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

রাম না-ই জানুন, জানতেন ব্রাহ্মণ নেতারা। ভরদ্বাজ মুনি বিমান শাস্ত্রের ওপর একটি পুরো গ্রন্থই রচনা ক'রে গেছেন। নাম, 'বৈমানিক শাস্ত্রম্'। এই পুঁথির পাতা থেকে বেশ কিছু পৌরাণিক বিমানের কারিগরির সংবাদ পাওয়া যায়। বিমানের সংজ্ঞা দিয়ে ভরদ্বাজ বলেছেন,

পৃথিব্যপ্স্বন্তরীক্ষেষু খগবদ্বেগতস্ স্বয়ম্।
যস্সমর্থো ভবদ্গন্তুং স বিমান ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যা আপন শক্তিতে পাখীর মতো জলেস্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারে তারই নাম বিমান। এই বিমান পরিচালনারও ছিল নানান প্রাযুক্তিক কৌশল। বৈমানিক জানতেন, বিমানকে শূন্যমার্গে একই জায়গায় স্তব্ধ ক'রে রাখার পদ্ধতি যাকে বলা হয়েছে, 'বিমানস্তম্ভনক্রিয়ারহস্যম্'।

ভরদ্বাজকথিত উপায়ে ইন্দ্র তার বিমানটিকে মাটি থেকে সামান্য উচ্চতায় দাঁড় করিয়ে শরভঙ্গের সঙ্গে গোপন আলাপে নিমগ্ন থেকে থাকতে পারেন অথবা এক্ষেত্রে হয়ত তিনি আধুনিক হেলিকপ্টার জাতীয় কোনো ছোট আকাশযানেই এসে থাকবেন। বিমানের স্বরূপ যেমনই হোক, রাম তাঁকে ভাসমান একটি উড়ন্ত যান থেকে শরভঙ্গের সঙ্গে নিভৃতে আলাপরত অবস্থায় দেখেছিলেন এবং সেই অদ্ভুত বিমানটির প্রতি লক্ষ্মণের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন। অর্থাৎ ঘটনাটি বস্তুতই ঘটেছিল।

রাম লক্ষ্মণকে আসতে দেখে ইন্দ্র সহযাত্রীদের বলেছিলেন, "দেখ, রাম এই দিকে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতেই চল আমরা স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।"—এই বলে ষড়যন্ত্রী ইন্দ্র চম্পট দিলেন। এক একটি স্থানে পদার্পণের আগেভাগে দলবল সহ রামচন্দ্রের থাকার জন্য যে ব্যবস্থা ইন্দ্র করে রাখছিলেন, সেই নেপথ্য আয়োজনের কথা সর্বসমক্ষে জানাতে চান নি দেবরাজ। লক্ষ্মণ অথবা রামের রক্ষাবাহিনী দেবতাদের কলকাঠি নাড়ার খবর জেনে যাক, সাবধানী ইন্দ্র তাঁর সমরপ্রস্তুতির ক্ষেত্রে তেমন শৈথিল্য ঘটতে দিতে নিশ্চয় নারাজ ছিলেন।

অতএব তিনি পালিয়ে গেলেন। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। শরভঙ্গও এই পলায়নের প্রকৃত অর্থ রামকে বললেন না। রাম যখন জানতে চাইলেন, "তপোধন! সুররাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন?" তখন গুচ্ছের মিথ্যা গল্প শুনিয়ে ইন্দ্রের

প্রকৃত উদ্দেশ্য চাপা দিয়ে শরভঙ্গ বললেন, "বৎস ! আমি কঠোর তপঃসাধনপূর্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে…দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না।"

ইন্দ্র যে রামকে দেখেই সরে পড়েছেন এই তথ্য মুনিবর গায়েব করলেন। এমন মিথ্যাভাষী মুনি যে কী ধরনের তপঃসাধনে সিদ্ধপীর হয়েছেন, আমাদের তা বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য শরভঙ্গের গল্পটির ভিন্নতর একটি ব্যাখ্যা যে না পাওয়া যায় এমন নয়। শরভঙ্গের তপঃসাধন মানে দেবকার্য সাধন। বন জঙ্গলে দেবঘাঁটি আগলে তাঁর এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। এবার ব্রহ্মলোক হিমালয়ে অবশ্যই তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু ইন্দ্র নিশ্চয় শরভঙ্গের প্রমোশনের চিঠি নিয়ে হিমালয় থেকে ছুটে আসেন নি। তিনি দেবরাজ, সামান্য কোনো বর্তাবাহক বা মেসেঞ্জার নন। তাঁর আগমনের অবশ্যই অন্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রশ্ন হ'ল কী সেই উদ্দেশ্য ?

রামায়ণে ইন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে নিজস্ব অনুমিতি গড়ে নিতে হবে।

আমরা দেখেছি, অযোধ্যা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর রাম যে পথে অগ্রসর হয়েছেন সে পথের মাঝেমাঝেই তাঁর জন্য দেবাশবিরের বিশ্রামাগার ও দেবঘাঁটি তৈরী ছিল। বিপদে রক্ষার জন্য দেবতারা বিরাধের মতো যন্ত্রযানও মোতায়েন রেখেছিলেন। একটি দেবচৌকি ত্যাগ করার সময় চৌকিদারের [আশ্রমাধ্যক্ষ মুনির] কাছেই রাম পেয়েছেন পরবর্তী বা অগ্রবর্তী ঘাঁটির পথ-নির্দেশ। অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে পৌছে দেখেছেন, আয়োজন প্রস্তুত। ঘাঁটির মালিক সেনাধ্যক্ষ মহর্ষিরা সমস্ত ব্যবস্থা তৈরী রেখেছেন।

উত্তরাখণ্ড থেকে দক্ষিণী জনস্থান পর্যন্ত এই যে প্রলম্ব প্রস্তুতি, এসবই ছিল সুররাজ ইন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে এবং তাঁরই আজ্ঞাধীন। সুতরাং অনুমান অমূলক হবে না যদি বলা যায়, ইন্দ্র এসেছিলেন শরভঙ্গের চৌকি পর্যবেক্ষণে বা ইনসপেকসনে। হয়ত তড়িঘড়ি উড়ন্ত রথে তিনি পরবর্তী বা আরও অগ্রবর্তী ঘাঁটির প্রস্তুতি দেখতে চলে গেলেন যাতে রাম সেখানে পৌছে নিরাপদ আশ্রয় পান এবং সদলবলে পৌছলে তাঁদের খাদ্য পেয় শয্যার অভাব না হয়। সমরাভিযানে এসব খুঁটিনাটি মাঝে মধ্যে সমরাধ্যক্ষদের সরেজমিনে তদন্ত ক'রে যেতে হয়। ইন্দ্রের পক্ষে আকাশপথে একবার ঘুরে যাওয়া তাই ছিল খুবই স্বাভাবিক, তা নিতান্ত অলীক কল্পনামাত্র নয়।

রামকে সেনাসামন্ত বুঝিয়ে দিয়ে শরভঙ্গ বস্তুতই হিমালয়ের ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় পরবর্তী দেবঘাঁটির হদিশ দিয়ে গেলেন তিনিও। চমৎকার ব্যবস্থা।

রামচন্দ্র আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার মর্ত্যলোকের মন্দাকিনী ধারার তীরভূমি দিয়ে তাঁর যাত্রা সুতীক্ষ্ণ আশ্রমের দিকে। সুতীক্ষ্ণও একটি সামরিক ঘাঁটি আগলে প্রতীক্ষা করেছিলেন রামচন্দ্রের। রাম উপনীত হতে সুতীক্ষ্ণ বললেন, "দেবরাজ ইন্দ্র আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন।" প্রমাণ হয়ে গেল, আমাদের অনুমিতিটি বৃথা হয় নি। ইন্দ্র রামচন্দ্রের পদার্পণের আগেই অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়ে সব ব্যবস্থা তদারক করে গেছেন।

এক রাত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে অতিবাহিত করে পরদিন সুতীক্ষ্ণের আজ্ঞাবাহক-দের নিয়ে দণ্ডকারণ্যের ব্রাহ্মণ আশ্রমগুলি ঘুরে দেখেছেন রামচন্দ্র।

দণ্ডকারণ্যেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। এক একটি ঘাঁটি বা আশ্রমে এজন্য রামকে এক মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত থেকে যেতে হ'লো। এভাবে সেখানেই তিনি দশটি বছর সমরায়োজনে এবং সামরিক শিক্ষার কারণে অতিবাহিত করলেন।

অগস্ত্যমুনি কথা

সুতীক্ষ্ণর কাছে পথনির্দেশ নিয়ে রাম অগস্ত্যমুনির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ স্থাপনে অগস্ত্যই ছিলেন মুখ্য রূপকার।

অগস্ত্য আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হলে অগস্ত্যকীর্তির আভাস দিয়ে লক্ষ্মণকে রাম বললেন, "বৎস!...যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য অসুরকে [দেবতা বা সুরবিরোধী জাতি] বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে...ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না।... এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না।"

অগস্ত্যের তালুকটিকে ঘিরে ছিল কড়া সামরিক পাহারা। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষীর মাধ্যমে অগস্ত্যের কাছে রামচন্দ্রের আগমন সংবাদ পাঠিয়ে সীমানার বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অগস্ত্যের অনুমতি পেয়ে রক্ষীরা সসম্মানে রামকে অগস্ত্যভূমির প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন। বিশাল সেই অঞ্চলে একের পর আর এক মহল দেখতে

দেখতে রামচন্দ্র অগ্রসর হলেন অগস্ত্যদর্শনে। পথে পড়ল, ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্যস্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবেরস্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ু ও বরুণের স্থান, গায়ত্রী বসু এবং নাগ জাতির দেবানুরক্ত সম্প্রদায়ের নেতা বাসুকীর স্থান। এরপর এলো দেবতাদের বৈমানিক প্রধান গরুড়ের নামাঙ্কিত গড়ুরস্থান ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের স্থান। সবশেষে ধর্মস্থান অতিক্রম ক'রে রাম লক্ষ্মণ সীতা উপস্থিত হলেন অগস্ত্যশিবিরে, যার নাম, আশ্রম।

স্পষ্ট বোঝা যায়, বিভিন্ন দেবতার যে বিশেষ দায়িত্বকর্ম ছিল, এক একটি স্থান বা শিবিরে সেইসব বিভাগীয় দায়িত্ব অর্পিত ছিল বলেই ঐ সব শিবিরের অনুরূপ নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক দেবতাকে বলা হত দিকপাল। তারা দৈব শাসনযন্ত্রের এক এক বিভাগের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের নামান্বিত শিবির অনুরূপ দায়িত্বে কর্মব্যস্ত থাকত। কয়েকটি শিবিরের বিশ্লেষণ করলেই ঐ নামমাহাত্ম্য বোঝা যেতে পারে

ব্রহ্মা দেবমন্ত্রী। তাঁর নামাঙ্কিত স্থানটি অগস্ত্য শিবিরের মন্ত্রণালয় ও সভাগৃহ [কনফারেন্স হল] বুঝতে হবে। ইন্দ্র, সোম, কার্তিক প্রমুখ দেবসেনাধ্যক্ষদের নামে শিবিরগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাগীয় সেনাদপ্তর ছিল। বরুণ নামাঙ্কিত স্থানটিকে অস্ত্রাগার, বায়ু ও বাসুকী স্থানকে দেবশিবিরভুক্ত নাগ-আর্য প্রধানদের জন্য স্বতন্ত্র অবস্থান শিবির, এবং কুবের স্থানটিকে অগস্ত্যশিবিরের ভাণ্ডার বা স্টোর ডিপার্টমেন্ট বলে সহজেই বোঝা যায়। গড়ুরস্থানটিকে আমি দেববিমানের জন্য বিমান পোতাশ্রয় হ্যাঙ্গার এবং বৈমানিকদের বিশ্রামাগার বলে উল্লেখ করলে বোধ হয় ভুল করব না। ধর্মস্থান এসবেরই উপরে। ধর্ম শব্দের দ্বারা দেবতারা তাঁদের প্রশাসনিক আইনকানুন বোঝাতেন। অগস্ত্যশিবিরে ধর্মস্থান অতএব সমগ্র শিবিরের প্রশাসন বিভাগ বা এসট্যাবলিশমেন্ট সেন্টার ছিল। নিখুঁত একটি সামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা এইভাবে অগস্ত্য সাজিয়ে বসেছেন। বাস্তবিক চমৎকার তাঁর ব্যবস্থাপনা। দণ্ডকারণ্যের এক বিশাল এলাকা জুড়ে এমনই ছিল তাঁর সুশৃঙ্খল সামরিক ঘাঁটি। এমন এক সামরিক প্রশাসককে সমীহ না ক'রে কারো কি উপায় ছিল? রাম তাই বলেছেন, অগস্ত্যের এলাকায় দেব ব্রাহ্মণরা নির্ভয়। তাঁর নামের প্রভাব যতদূর বিস্তীর্ণ, ততদূর কোনই বিপদের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ অগস্ত্য এলাকাভুক্ত অরণ্য প্রদেশ সুরক্ষিত। রাক্ষসেরা তার ত্রিসীমানায় প্রবেশ করার সাহস পায় না।

লক্ষণীয়, অগস্ত্য রামচন্দ্রকে কোনো আধ্যাত্মিক সাধনভজনের উপদেশ দেন নি। দিয়েছিলেন বাছা বাছা শক্তিশালী কিছু মারণাস্ত্র। সুতরাং মুনি শব্দ শুনলেই

মুনিবরকে ঈশ্বরের সাধক এবং অলৌকিক অদ্ভুতকর্মা পুরুষ বলে ধরে নেওয়ার পক্ষে কোন পৌরাণিক যুক্তি নেই।

নানা বিজ্ঞানে বুৎপত্তিশালী গৌরবর্ণ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই ঐতিহাসিক পুরুষ অগস্ত্যকে নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়ে গেছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণালব্ধ রচনাবলী থেকে অগস্ত্যর বিভিন্ন পরিচয় জানা যায়।[১]

তিনি জানিয়েছেন, অগস্ত্য কোনো এক ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না। 'অগস্তি' নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল সেকালে। সেই সম্প্রদায় থেকে যে একাধিক কীর্তিমান পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা সকলেই 'অগস্ত্য' অভিধা প্রাপ্ত হন।

প্রথম অগস্ত্য ছিলেন প্রায় খৃষ্টপূর্ব দশম শতকের মানুষ। ঋগেদে আর এক অগস্ত্যের নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন মিত্রাবরুণ ও উর্বশীর সন্তান। অন্য এক অগস্ত্যের পরিচয় আছে স্কন্দ পুরাণে। তিনি কাবেরী নদীসংলগ্ন কূর্গপ্রদেশে কুন্দগ জাতির দেশে যান। দ্রাবিড় দেশের অধিপতি ছিলেন তখন রাজা কাবের। অগস্ত্য কাবেরকন্যা কাবেরীকে বিবাহ ক'রে 'কুতমুনি' নামে সেখানেই থেকে যান। কূর্গদেশের প্রাচীন নাম, 'কুতক' থেকেই 'কুতমুনি' নামের উৎপত্তি। দক্ষিণীরা তাঁকে 'কুতকমুনি' নামেই অভিহিত করতেন। 'কুতমুনি' শব্দটি সংস্কৃত। 'কুত' বা 'কুণ্ডম' শব্দটির দক্ষিণী অর্থ, কুম্ভ। অগস্ত্যকে কুম্ভজাতক [আধুনিক বিজ্ঞানে টেস্টটিউব চাইল্ড] বলা হয়। বোঝা যায়, দক্ষিণীরাও অগস্ত্যের কুম্ভ থেকে জন্মের কাহিনীটি জানতেন। কুর্গের 'কুতক' নাম সম্ভবত অগস্ত্যর সম্মানেই হয়েছিল। কেননা তিনি তামিলদের মস্ত উপকার করেন। তামিলে অগস্ত্যর গুণপণার স্বীকৃতি আছে।

তামিল উপকথা থেকে জানা যায়, অগস্ত্য মস্ত এক পূর্তবিদ্ ইঞ্জিনীয়র ছিলেন। তিনি কাবেরী নদীর গতিপথ সম্পূর্ণ ভাবে উল্টে দেন। উপকথাটি জানায়, অগস্ত্য যখন কাবেরীকে বিবাহ করেন, কাবেরী নদী তখন সহ্য পর্বত বা সহ্যাদ্রি[২] থেকে অবতরণ ক'রে আরব সাগরে পতিত ছিল। এই সময় চোলরাজ কন্দমান কূর্গে বসবাস করতেন। তাঁরই অনুরোধ ও পৃষ্ঠপোষণায় অগস্ত্য কাবেরী নদীর প্রবাহপথ পরিবর্তন করিয়ে নদীখাত কাটিয়ে আনেন সহ্যাদ্রির পূর্বগাত্র দিয়ে।

১। Religions and Cultural Integration of India / Dr. S. K. Chatterjee.

২। বর্তমান পশ্চিমঘাট পর্বতের অন্তর্গত।

ফলে কাবেরী আরব সাগরে পতিত না হয়ে ভিন্নপথে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং নদীহীন চোলরাজ্যকে জলকষ্ট থেকে পরিত্রাণ করে। প্রসঙ্গত এইখানে গঙ্গার পরিবর্তিত ভাগীরথী ধারার কথা আবার স্মরণ করা যেতে পারে। সেকালে কেবল-মাত্র গঙ্গার প্রবাহপথই নয়, কাবেরীর ধারা এবং অন্যান্য পার্বত্যধারার পরিবর্তন, জলে বাঁধ বাঁধা, বিশেষ পার্বত্য সরোবর খনন প্রভৃতি কাজ হয়েছিল বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে। এ কাজ যে শুধু ইন্দ্র এবং বিজ্ঞানী আর্য মুনিরাই করে-ছিলেন এমন নয়, অনার্য প্রযুক্তিবিদরাও আশ্চর্য সব কাজ করে গেছেন। বিভিন্ন পুরাণে সে তথ্য লিখিত আছে।

আচার্য সুনীতিকুমারের মতে যে অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আর প্রত্যাবর্তন করেন নি, তিনি পরবৈদিক যুগের বুদ্ধ-সমসাময়িক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মানুষ।

বিভিন্ন অগস্ত্য সম্পর্কে আরও বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন যাদব রাজা বিদর্ভ এবং এক অগস্ত্য সর্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম ক'রে বিদর্ভ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্যটি ছিল আধুনিক বেরার-এর অন্তর্ভুক্ত। বিদর্ভরাজের মেয়ে লোপমুদ্রাকে অগস্ত্য বিবাহ করেন।[৩]

যা ইতিকথা, পুরাকথা, কথকরা তার ওপর অলৌকিকতার অলঙ্কার চাপিয়ে অবোধ ভাগবত শ্রোতার আসরে হাজির করেন। তাই দেখা যায় অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য অভিযানের পুরাকাহিনী পর্যবসিত হয় অলৌকিক রূপকথায়। সেখানে অগস্ত্যের অলৌকিক ক্ষমতার একটি উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই গল্পটিই সাধারণ্যে প্রচলিত। গল্পটি বলে, দাম্ভিক বিন্ধ্যপর্বত দাবি করে, সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করুক। এই বলে পর্বত তার মাথা আকাশে তুলে সূর্যালোক ঢেকে দেয়। সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখে দেবতারা অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। অগস্ত্য খবর পেয়ে ছুটে এলেন কাশী থেকে। তিনি বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। তাঁকে দেখে বিন্ধ্যপর্বত যেই মাথা নত করেছে অমনি গুরু অগস্ত্য তাকে আদেশ দিলেন, বিন্ধ্য! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এভাবেই থাকো। বেচারী বিন্ধ্য আর মাথা তুলতে পারলো না, কেন না গুরু অগস্ত্যও আর প্রত্যাবর্তন করলেন না!

এভাবেই কথকতার আসরে পৌরাণিক গল্পগাভি সর্বত্র অলৌকিক বৃক্ষে আরোহণ করেছে। পুরাকথকের কোনই অসুবিধা ছিল না এসব ছাইপাঁশ গল্প সাজিয়ে ইতরজনের মধ্যে প্রচার করার। দেবতা বরুণের গোশালায় বহু

৩। India in Vadic Age / Dr. P. L. Vargava.

অলৌকিক গরু আছে। তাদের খুর নেই হয়ত, বানরের মতো দিব্যি গাছে চড়তে পারে তারা। মূর্খ কথক ঠাকুরকে এমনি সব অলৌকিক গল্পগরু দিয়ে সেকালের বুদ্ধিমান দেবতা-ব্রাহ্মণে আদেশ করেছেন, এদের গাছে চড়াও এবং 'গোগণ'-সদৃশ শ্রোতামণ্ডলীকে ঐ গল্পগরুর হাম্বারব শোনাও, শুনে তারাও 'হাম্বারব' ছাড়বে, উদ্দেশ্যসাধন হবে শোষক সমজের। আর তাই যুগে যুগে গল্পের গরু গাছে চড়ল এবং 'গোগণ'-সদৃশ প্রজারা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের সেই আষাঢ়ে গল্পগুলি 'ভোজন' করলেন। ভাগবতে এজন্যই নারদ ও ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলছেন, হে কৃষ্ণ! সাধারণ মানুষ গোগণতুল্য। গরুকে যেমন নাকে দড়ি দিয়ে ঘানিতে ঘোরানো হয়, তেমনি ধর্মরজ্জু দিয়ে মানবগরুদের বেঁধে তুমি শাসন করবে। এজন্যই তোমাকে দেবতারা 'গোবিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন।[৪]

ওপরের গল্পের ইতিকথা দুর্বোধ্য নয়। বিদর্ভরাজের সঙ্গে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে অগস্ত্য এসে রাক্ষস-দৈত্যাদি অধিকৃত দক্ষিণী জনপদে ব্রাহ্মণ্যপ্রতাপ প্রতিষ্ঠা করেন। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদেশে গর্বোদ্ধত আসুর আধিপত্য ফলত খর্বিত হয়। সেই আসুরগর্বকেই বিন্ধ্যপর্বতের উদ্ধত মস্তক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অসুররা গাড়োয়াল হিমালয়স্থ দেবভূমি (যার নাম ছিল স্বর্গলোক) অধিকারে সর্বদা প্রযত্নশীল ছিলেন। সূর্য এক দেবতা। বিন্ধ্য যখন দাবি করেন, সূর্য তাঁকেও প্রদক্ষিণ করুক, তখন বুঝতে হয়, তার অর্থ, অসুররা চেয়েছিলেন দেবতারা তাঁদের প্রতাপের কাছে অবনত হোন। এই ভাবেই গল্পগরু গাছে চড়েছে এবং আমরা তাকে সেই কল্পবৃক্ষ থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করি নি।

যাই হোক, বহু অগস্ত্যের মধ্যে আমরা গ্রন্থকার অগস্ত্য, তামিল ব্যাকরণ-প্রণেতা অগস্ত্য, শাস্ত্রবিদ্, যন্ত্রবিদ্, পূর্তবিদ্যাবিদ্, সমরদক্ষ অগস্ত্যকে জানলাম। এক অগস্ত্য বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হন। অপরজন ছিলেন শৈব। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে শিবের অবতার ভট্টারক গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার-কল্পে আর এক অগস্ত্য সাগরপথে ইন্দোচীন, কাম্বোডিয়া, জাভা প্রভৃতি দেশে যাত্রা করেন। অগস্ত্য প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অগস্ত্য-সংহিতা, অগস্ত্যগীতা, সকলাধি-কারিকা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

রামায়ণে অগস্ত্যের আশ্রমটি ছিল গোদাবরী নদীতীরে নাসিক থেকে মাইল

৪। লেখকের যদুবংশ [ব্রজপর্ব] গ্রন্থ পৃঃ ৯৮। সেখানে পৌরাণিক তথ্যসূত্র প/ ৯-এ শ্রীমদ্ভাগবত-এর তথ্য দ্র / নাথ পাবলিশিং।

চব্বিশ দূরে অবস্থিত। কথিত আছে, এখানেই রাম লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকাকর্তন করলে নাম হয়, নাসিক। শূর্পণখার নাসিকাকর্তনের গল্পটিও অবশ্য একটি রূপক কাহিনী, মানীর অবমাননাকে অঙ্গহানি বা মৃত্যুতুল্য বলে গণ্য করা হত সেকালে।

শূর্পণখা রাক্ষসী সুন্দরী

রাবণভগিনী শূর্পণখা সুন্দরী ছিলেন কিনা আর্যপুরাণে সে তত্ত্ব আলোচিত হয় নি। লক্ষ্মণ তাকে 'রক্তোৎপলবর্ণে' বলে সম্বোধন করেছেন। এ হেন বিশেষণ কারও কুরূপতা প্রমাণ করে না। পঞ্চবটী থেকে শূর্পণখাকে বিদায় দেওয়ার সময় রাম লক্ষ্মণকে বলেছেন, শূর্পণখাকে 'বিরূপ করিয়া দাও।' কুরূপাকে কেউ বিরূপ করার প্রয়োজন বোধ করে না। রামচন্দ্রের আদেশটি তাই যথার্থ বোঝা কঠিন।

শূর্পণখা কাহিনীতে মূল গল্পটিই দুর্বোধ্য। অর্থাৎ তার নাসাকর্ণচ্ছেদনের গল্পটি যে সত্য, পরবর্তী সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাও জানা যায় না। তবে তাকে 'বিরূপ' করে রামচন্দ্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন এমন একটি ধারণায় উপনীত হতে অসুবিধা হয় না যদি পরবর্তী পর্যায়ে শূর্পণখার গল্পটি বিশ্লেষণ ক'রে যে কাহিনীসূত্র পাচ্ছি, সেটিই যুক্তিসম্মত যথার্থ ঘটনা ব'লে স্বীকৃতি পায়। বিশ্লেষণে শূর্পণখা কাহিনীটি এইরকম হয়ে থাকতে পারে :

একটু চোখ চেয়ে তাকালেই বোঝা যায় শূর্পণখার গল্পটি আগাগোড় সাজানো, যুক্তিপ্রমাণহীন সে গল্প আদ্যন্ত কাব্যিকছায় নির্মিত। বলা হয়েছে, শূর্পণখা একাকিনী পঞ্চবটীর বাসনিবাসে উপস্থিত হ'য়ে রাম লক্ষ্মণের কাছে কামলালসাপূর্ণ অভিলাষ ব্যক্ত করেন। রামকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, তুমি কামী হয়ে আমাকে ভোগ করো, আমি তোমার প্রতি কামমোহিত হয়েছি। অমনি লক্ষ্মণকে রাম তার নাক-কান কেটে ছেড়ে দিতে বললেন।

অদ্ভুত আর অসম্ভব ব্যাপার। শূর্পণখা রাক্ষসী হতে পারেন। কিন্তু আমরা তো জানি, রাক্ষস মানেই কোনো অদ্ভুত প্রাণী নয়। আর্যরা যদি একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠী, তবে রাক্ষস, দৈত্য, নাগ, বানর, ভল্লুক, কুকুর নামীয় তৎকালীন মানব-গোষ্ঠীগুলিও ছিল বিভিন্ন ভারতীয় জাতিবিশেষ এবং মানুষ ছাড়া তারা মনুষ্যেতর অপর কোনো জীব ছিলেন না। কুকুর জাতি তো ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণের জ্ঞাতিগোষ্ঠী যদুবংশের এক শাখা। ভল্লুক জাতির মেয়ে জাম্ববতীকে কৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন।

তাঁদের মিলনজাত পুত্র সাম্ব। কে স্বীকার করবেন কৃষ্ণ এক ভাল্লুকীর সঙ্গে সহবাস করতেন কিংবা কুকুরকে চাচা খুড়ো মামা ভাই বলে মানতেন?

নাগজাতির কিছু কিছু শাখা দেবমিত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেসব নাগ-প্রধানদের অন্যতম বাসুকী, শেষনাগ প্রমুখ। অনেক নাগকন্যা দেবতাদের প্রমোদ-সভার নর্তকী এবং স্বর্গলোকে স্বৈরেশ্যা ছিলেন।

রাবণ শূর্পণখারা ব্রাহ্মণ সন্তানই ছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁরা ছিলেন বিশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালী-কন্যা নিকষার সন্তান। রাক্ষসজাতির প্রথম পুরুষের জন্মও তো এক প্রাচীন ব্রহ্মার ঔরসে। প্রাচীন, কেননা এই ব্রহ্মার পর যুগে যুগে অনেকানেক অর্বাচীন ব্রহ্মারও আবির্ভাব ঘটেছে।[১]

কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে, শূর্পণখা এমন কোনো ছেলেভুলোনো গল্পের 'হাঁউ-মাউ-খাউ মানুষের-গন্ধ-পাউ' রাক্ষসী ছিলেন না, নাক কান কেটে ছেড়ে দিলেও যার পক্ষে রুধিরাক্ত মুখে বিকট চিৎকার করতে করতে পঞ্চবটী থেকে বনপথে জনস্থানে দৌড়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারত। পথের দূরত্বও তো কম ছিল না। নাক কান থেকে অনর্গল রক্তপাত ঘটলে পথেই মানুষী শূর্পণখার মৃত্যু হ'তো। তাঁর পক্ষে খরদূষণের সভায় গিয়ে সবিস্তারে রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে খরদূষণকে পঞ্চবটী আক্রমণে উত্তেজিত করার সুযোগও হ'তো না। তাছাড়া দেবশত্রু-শিবির জনস্থান থেকে সীমান্তের কড়া প্রহরা এড়িয়ে শূর্পণখা দেবশিবির পঞ্চবটী বা আধুনিক নাসিকে প্রবেশ করেন কি ভাবে? কবি বা ভক্ত বলবেন,কেন,ঐ বিকটাকৃতি রাক্ষসী তো মায়াবিনী স্বেচ্ছারূপিণী। সে ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য-অবয়ব হয়ে সীমান্তের বাধা টপকে তার উদগ্র কাম মেটাতে পঞ্চবটীতে উড়ে আসতে পারতো। যাঁরা গল্পের গরুর ল্যাজ ধরে কল্পগল্পবৃক্ষে আরোহণে পটু তাঁরা এমন একটি গল্পে সহজবিশ্বাসী হতে পারেন। যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক এইসব গালগল্পে আস্থা রাখবেন কী করে? আর শূর্পণখা জনস্থানে ব'সে রাম লক্ষ্মণের রূপে মুগ্ধই বা হলেন কী ক'রে যে অতদূর কামুকা হয়ে উড়ে যাবেন। রাক্ষসী কি দূর বিভুঁইয়ে বসেও যৌবনের গন্ধ পায়?

১। অগস্ত্যর মতো ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, বিষ্ণু, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ নেতা, যেমন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রাদি এবং মনু বেদব্যাস, এঁরা সবাই বিশিষ্ট পদাধিকারী। অভিধা বা টাইটল্ ডেসিগনেশনটিই এঁদের নাম হিসেবে কীর্তিত। তাই এঁদের বিভিন্ন যুগেই বর্তমান দেখা যায়, যেমন পোপ, শঙ্করাচার্য, দলাইলামা প্রভৃতি সব যুগেই বর্তমান।

আসলে যুবা পুরুষের গন্ধ পেয়ে মত্ত কুরঙ্গীর মতো ছুটে যাওয়া আর যার ক্ষেত্রেই সম্ভব হোক, শূর্পণখার যা ইতিহাস, তাতে তাঁর মতো একনিষ্ঠ প্রেমিকার পক্ষে অমন বিসদৃশ আচরণ একেবারেই সম্ভব ছিল না। তিনি আর্যা কুন্তী, তুলসী, অহল্যাদের মতো পরপুরুষে আসক্ত, ব্যভিচারিণী ছিলেন না। ছিলেন নিহত স্বামীর প্রতি চিরঅনুরক্তা। শূর্পণখার পৌরাণিক কাহিনী জানায়, স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বর মৃত্যুর পর রাবণ বহু চেষ্টা ক'রেও ভগ্নী শূর্পণখার বিবাহ দিতে পারেন নি। খরদূষণ শূর্পণখাকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরেছেন, কিন্তু কোনো পুরুষকেই মনে ধরে নি সেই নারীর। স্বামী তাঁর স্মৃতিতে অক্ষয় অম্লান ছিলেন আমরণ।

এমন এক একনিষ্ঠার চরিত্র হনন ক'রে একমাত্র বিভিন্ন নোংরা যৌন আবেদন-পূর্ণ রচনার কথকতাতেই শূর্পণখা চরিত্রটি কুশ্রী কামুকী চরিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। এই গল্প তৈরীর উদ্দেশ্য ছিল রামচন্দ্রের মহান মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা এবং শূর্পণখার সঙ্গে দেবতাদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসটি কথাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা। গল্পটি চমৎকারই খেলতে পারতো যদি কৌতুকের আতিশয্যে কথকমশাই শূর্পণখার নাসিকাকর্ণ কেটে না নিতেন।

শূর্পণখার নাককান কাটার গল্পটি অবাস্তব রূপকথায় পর্যবসিত হওয়ায় তা সন্দেহ উদ্রেক করল বলেই না এই গল্পের সূত্র ধরে শূর্পণখার খোঁজখবর নিতে হ'ল। না হলে কে আর এক রাক্ষসীকে নিয়ে মাথা ঘামাতো। অবশ্য শূর্পণখাকীর্তিটি দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ সম্প্রসারণের ইতিহাসে একটি সামান্য ব্যাপার নয়। বরং বলা যেতে পারে, রামায়ণ কাহিনীর এও এক স্তম্ভবিশেষ। শূর্পণখার প্ররোচনাতেই খরদূষণ অপ্রস্তুত অবস্থায় রাক্ষসদুর্গ ত্যাগ ক'রে পঞ্চবটী আক্রমণে বার হ'লে পথমধ্যে দেবতারা অতর্কিত আক্রমণে রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করেন আকাশ থেকে উল্কাপাত ঘটিয়ে [যাকে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ বলে অনায়াসেই ব্যাখ্যা করা যায়]। আবার শূর্পণখার প্ররোচনাতেই রাবণ শেষ পর্যন্ত সীতাহরণে রাজি হন। এই দুটি ব্যাপারই দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার দুটি পরিকল্পনাকে সফল করে তোলে। জনস্থানের ছিট মহলটি দেবতাদের অধিকারভুক্ত হওয়ায় রামচন্দ্রের বাহিনীর পক্ষে বিনাবাধায় ঋষ্যমূক পর্বতে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে অপেক্ষমাণ সুগ্রীব হনুমানদের নেতৃত্বাধীন বানরবাহিনীর সঙ্গে দেববাহিনীর সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর সেই বিশাল বাহিনী নিয়ে রাম ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূলে উপনীত হয়েছেন। কোনো রাক্ষসসেনার বাধা আর তাঁর গতিরোধ করার জন্য জনস্থান আগলে থাকে নি। তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছল শূর্পণখার চক্রান্তে।

চক্রান্তই বলব, কারণ শূর্পণখা সকলের অলক্ষে, দেবশিবির পঞ্চবটীতে গিয়ে কী ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। তবে, দেখা যাচ্ছে, শূর্পণখা মুক্ত হয়ে আবার জনস্থানে যান এবং খরদূষণকে তাদের দুর্গ থেকে বার করে নিয়ে দেবতাদের অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখীন ক'রে দেবতাদেরই সাহায্য করেন। শূর্পণখার এহেন কর্ম সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না। তাঁর নাককান কাটার গল্পটি ওপরের যুক্তিতর্কের আলোকে বাতিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন একটিই, রাবণভগিনী শূর্পণখা কেন হঠাৎ দেবতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাবণ ও রাক্ষসদের সর্বনাশ করবেন। স্বজাতির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার নেপথ্য কারণ কি ?

আগেই বলেছি, শূর্পণখা তাঁর মৃত স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বকে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রাবণের একান্ত প্রয়াস সত্বেও তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। তাঁর মনে জ্বলছিল স্বামী হারানোর জন্য ক্ষুব্ধ তুষানল। সেই আগুনেই তিনি রাবণের লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছারখার করতে চেয়েছেন ও সেজন্যই তাঁর পক্ষে দেবশিবিরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার ছিল না। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা আরও ঘটেছে। বোধহয় সেসব ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের কথা এখানে পুনর্লিখনের প্রয়োজন নেই।

স্বামীহত্যার জন্য শূর্পণখা মনে মনে রাবণকে দায়ী করেছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন রাবণের কাছে সেই মন খুলে ধরতে পারেন নি। মনের আগুন মনেই চাপা ছিল তার এবং তিনি ছিলেন সুযোগের প্রতীক্ষায়। দেবতারা পঞ্চবটীতে এসে পড়ায় বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। দেবতাদের সাজিয়ে-দেওয়া একটি অবমাননার গল্প তৈরি ক'রে প্রথমেই জনস্থানটি দেবতাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা সফল হ'লে শূর্পণখা লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে উত্তেজিত ক'রে পঞ্চবটীতে পাঠান সীতাহরণের জন্য। এই সীতাহরণ ব্যাপারটিও ছিল স্বয়ং ব্রহ্মার পরিকল্পনা। যথাস্থানে সে আলোচনা করা হয়েছে।

রাবণ শূর্পণখার শ্বশুরালয় কালকেয় রাক্ষসজাতির দেশ আক্রমণ করেন তাঁর দিগ্বিজয়পর্বে। যুদ্ধে শূর্পণখাস্বামী বিদ্যুৎজিহ্বর ভাই নিহত হ'লে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন রাবণভগ্নিপতি বিদ্যুৎজিহ্ব স্বয়ং এবং তিনি সে যুদ্ধে রাবণের হাতে নিহত হ'ন। রাবণভগ্নী শূর্পণখাকে কালকেয় পুরী থেকে লঙ্কায় আনেন ও তাঁর পুনর্বিবাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামী-অনুরাগিনী শূর্পণখা দ্বিতীয় বিবাহ না করে দীর্ঘ মর্মযাতনায় কালাতিপাত করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর

পক্ষে রাবণ ও রাবণানুরাগী রাক্ষস সমাজকে ধ্বংস করার বাসনা জাগে বলেই আমার মনে হয়। শূর্পণখার পক্ষে রাবণ ও খরদূষণকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে স্বাভাবিক বোধগম্য অন্য কারণ থাকতে পারে না। তাঁর মতো স্বামী-অনুরাগিণীর পক্ষে কামুকী হয়ে পঞ্চবটী ছুটে যাওয়ার গল্পটি তো সর্বাংশেই অবিশ্বাস্য এবং পরিত্যাজ্য।

রাবণের বিরুদ্ধে এই সময় রাক্ষস জাতির মধ্যে একটি বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর উত্থান ঘটছিল। তারা রাবণের জায়গায় বিভীষণকে রাজা ক'রে রাবণের পতন চাইছিল। মনে হয়, শূর্পণখাও এই রাবণবিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তাঁর প্ররোচনায় রাবণ পঞ্চবটীতে গিয়ে ছদ্মবেশিনী সীতারূপিণী বেদবতীকে লঙ্কায় নিয়ে আসার পর লঙ্কায় রাবণবিরোধী ষড়যন্ত্র আরও গভীর হ'য়ে দানা বাঁধে এবং বিভীষণ লঙ্কা ত্যাগ করে দেবশিবিরে গিয়ে যোগ দেন। ঘটনাবলী পরপর চমৎকারভাবে সাজানো। এই ঘটনাবলীর আলোকে তাই রামায়ণে উক্ত শূর্পণখার সাজানো গল্পটি মিথ্যা বলেই প্রতিপন্ন হয় এবং পণ্ডিত সমাজকে অনুমিতিটির বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে অনুরোধ জানানোর সাহস পেয়ে যাই আমি।

অতঃপর তাঁরাই বলবেন, বস্তুত কোন ঘটনাটি বাস্তবসম্মত হ'য়ে থাকতে পারে।

দেবতাদের জনস্থান অধিকার

জনস্থানের ছিটমহলটি অধিকারের বাসনায় দেবতারা নানা রকম প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। অপরাজেয় খররাক্ষসকে ঐ মুলুক থেকে সরাতে না পারলে দেবমিত্র সুগ্রীব হনুমানদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনা এবং স্থলপথে বিনাবাধায় ভারতের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছে লঙ্কা অধিকারের আয়োজন সুসম্পন্ন করায় অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু জনস্থান আক্রমণ করে রাক্ষসসেনাকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে নিশ্চয় কোনো অসুবিধা ছিল। সেজন্য অন্য উপায়ের সন্ধানে ছিলেন তাঁরা। এমন অবস্থায় রাক্ষস কুল থেকে তাঁরা ভাঙিয়ে নিলেন স্বয়ং রাবণভগিনী শূর্পণখা এবং এক পদস্থ সেনাপ্রধান, অকম্পনকে।

শূর্পণখাকে রাম লক্ষ্মণ অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রচারের আড়ালে শূর্পণখাকে দেবতারা পাঠালেন খররাক্ষসকে উত্তেজিত ক'রে পঞ্চবটীর পথে আকর্ষণ করে আনার জন্য। একাজে সহজেই সফল হলেন শূর্পণখা। তিনিই পথ

দেখিয়ে খরসেনাকে দেবশিবিরের শক্ত ঘাঁটির দিকে নিয়ে গেলেন। খরের সভায় গিয়ে এমনই হৈচৈ বাধিয়ে দিলেন যাতে উত্তেজিত খররাক্ষস যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লেন অপ্রস্তুত অবস্থায়।

পথে নেমে এক বিপদ। রাক্ষসরা দেখলেন, দেবতারা আগেই খবর পেয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। পথের মাঝেই খরসেনাকে স্থল এবং আকাশপথ থেকে হঠাৎ আক্রমণ করেছেন তাঁরা। সেনাপতি খররাক্ষস সরল বিশ্বাসে ভগিনী শূর্পণখার অনুসরণ করেছিলেন। ভাবতেও পারেন নি, দেবতারা আগেই স্থলে জলে আক্রমণ চালাবেন। কেউ নিশ্চয় দেবশিবিরে আগেই খবর দিয়ে দেন। শূর্পণখা তড়িঘড়ি তাঁকে তাঁর শিবির বা দুর্গ থেকে বার করে এনেছেন। সন্দেহ অমূলক নয়, যদি বলি, শূর্পণখাই খরের অভিযানের সংবাদ আগেই দেবশিবিরে পাঠিয়েছিলেন।

রাবণকে উত্তেজিত ক'রে সীতাহরণে ঐ শূর্পণখা এবং অকম্পনই রাজি করান। সীতাহরণও ঘটেছিল চতুর রাজনীতিক ব্রহ্মার পরিকল্পনায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনস্থান অধিকার এবং ছায়াসীতাকে লঙ্কায় প্রেরণ, ব্রহ্মার এই দুটি পরিকল্পনা সফল করার ক্ষেত্রে শূর্পণখা ও অকম্পন বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই জনস্থান অধিকারের যুদ্ধে খরসেনা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলেও শূর্পণখা এবং অকম্পন দিব্যি দেবশিবির থেকে ছাড়া পেয়ে নির্বিঘ্নে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেখানে গিয়ে প্রথমে অকম্পন ও পরে শূর্পণখা রাবণকে পরামর্শ দিয়ে সীতাহরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চবটীতে প্রেরণ করেছেন। অকম্পন ও শূর্পণখার সঙ্গে হয়ত বিশ্বাসঘাতক রাক্ষসবাহিনীর আরো কিছু সদস্য থেকে থাকবেন, তবে তাঁদের কথা মহাকবি আমাদের জানান নি!

যাইহোক, সীতাহরণ পর্বে আমার অনুমিতিটি পুনরায় খুঁতিয়ে দেখব, এখন খরসেনার পতন সম্পর্কে বাল্মীকি রামায়ণের তথ্যাদির প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক।

রামায়ণের সংবাদ

"ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় বিমানে আরোহণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন।" আকাশ থেকেই "দেবগণ…রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।" তাঁরা যে কেবলমাত্র দর্শক ছিলেন না, যুদ্ধ করেছেন, একথা স্পষ্ট না বললেও যুদ্ধের বর্ণনায় তা দিব্যি বোঝা গেছে।

দেবতারা তাঁদের বিমান থেকে কী ধরনের অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে খরের সেনাবাহিনী ধ্বংস করছিলেন, ঘটনার পরবর্তীকালে রচিত রামায়ণকার তা জানতেন না। তাঁর বুদ্ধির অগম্য সেই অস্ত্রাদির তিনি আপন মনোমত বর্ণনা করেছেন বলেই আকাশপথ থেকে নিক্ষিপ্ত দৈবাস্ত্রগুলি আমাদের কাছে রূপকথার গল্প হয়ে উঠেছে। রামায়ণের সে গল্পটির কিঞ্চিৎ বোধগম্য অংশ এই রকম :

"বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। দিবসে খদ্যোততুল্য [জোনাকী পোকার মতো] তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল।...বিনা বাতে মেঘবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের [পক্ষী বিশেষের] অস্ফুট শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত এবং বনপর্বতময়ী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল।" তারকা স্খলনকে গোলা নিক্ষেপ, মেঘবর্ণ ধূলিজালকে বোমাবিস্ফোরণের পরের অবস্থা বুঝি। তারই ফলে ক্ষুভিত বায়ু ও পশুপক্ষীদের আর্ত চিৎকার খুবই স্বাভাবিক। ঘটনাটির বাস্তব রূপ এমনই হয়ে থাকতে পারে।

আধুনিক যুদ্ধে শত্রুর পদাতিক বাহিনীর ওপর প্রতিপক্ষের বৈমানিক তো এ ধরনের আক্রমণই পরিচালনা করেন। অনুরূপ আক্রমণের উল্লেখ রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থে বার বার পাওয়া গেছে। পৌরাণিক বিবরণসমৃদ্ধ বাইবেল গ্রন্থেও আকাশপথ থেকে মিশ্রীয় সেনাবাহিনীর ওপর সদাপ্রভুর আক্রমণের বর্ণনা আছে। সে বর্ণনাও অনুরূপ আকাশযুদ্ধেরই বর্ণনা। সেকালে আকাশযুদ্ধ অপরিচিত অলৌকিক ঘটনা ছিল না। দেবতাদের যেমন, দেববিরোধী অ-সুর সম্প্রদায়েরও তেমনি ছিল বিমান। বিমানধ্বংসী কামানও হয়ত ছিল, তবে তার বহুল বর্ণনা পাওয়া যায় না। এখানে খর যে ভাবে এই আকাশযুদ্ধের মোকাবিলা করবেন বলে আপন সেনাবাহিনীকে আশ্বস্ত করেছেন, তাতে মনে হয়, খরের দখলে বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রও ছিল। সাধারণভাবে পাঠ করলে সেকালের অস্ত্রাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরী করা অসুবিধাজনক হয়। কারণ অস্ত্রমাত্রকেই পুরাণকাররা 'শরাসন' 'শরকার্মুক' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছেন। হয়ত পুরাণকার যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন অস্ত্রমাত্রই 'শর' শব্দের দ্বারা অভিহিত হ'ত; অথবা পুরাণকাররা নিজের চোখে কখনো কোনো আকাশযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন নি। পুরাণ রচনার বহু শতক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার তাঁরা সংকলক মাত্র। তাঁদের কাছে সঠিক বর্ণনা প্রত্যাশিত নয়। যেমন শুনেছেন, বাল্মীকি তেমনি লিখেছেন।

আমরা দেখছি, আকাশ থেকে দেবতারা আক্রমণ করলেও খররাক্ষস সে আক্রমণকে কোনো অলৌকিক দৈবী ক্রিয়া ব'লে গণ্য করেন নি। পুরাণকার

আমাদের সামনে যেমন রূপকথাই সাজিয়ে ধরুন, দৈবীপ্রতাপের যত কুহেলী আবরণেই অবগুণ্ঠিত করে থাকুন তাঁর দেবমাহাত্ম্য প্রচারক রচনাবলী, প্রতিপক্ষের রাক্ষস সেনাপতির প্রতিক্রিয়া কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ছিল।

মহাকবি জানিয়েছেন, "খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া হাস্যমুখে রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চারিদিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত…কিন্তু আমি ইহা লক্ষ্যই করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ণ শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব।"

খর যখন বলেন, তিনি তীক্ষ্ণ শরে আকাশ থেকে তারকাপাত ঘটাবেন, তখনই আমাদের আধুনিক বিমানবিধ্বংসী কামানের কথা মনে পড়ে যায়। দেববিমান থেকে তারকাপাত অর্থে গোলা নিক্ষেপ এবং আকাশ থেকে সেই তারকা খরকর্তৃক নামিয়ে আনার অর্থ বিমানবিধ্বংসী কামান দেগে বিমান ফেলে দেওয়া বুঝি। খরের কাছে বিমানযুদ্ধ মোকাবিলা করার মতো অস্ত্র যে ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তিনি অবিচলিতভাবে আকাশপথ থেকে দেবতাদের আক্রমণ প্রতিহত করে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করেছেন এবং রামের শিবির আক্রমণে অগ্রসর হয়েছেন।

শিবিরের দেহলিতে বেরিয়ে এসে দূরদিগন্তে আকাশযুদ্ধ এবং দেবতাদের বিমানবহর প্রত্যক্ষ ক'রে লক্ষ্মণকে রাম বলেছেন, "লক্ষ্মণ! দেখো, এক্ষণে নিশাচরগণের [রাক্ষসদের] বিনাশার্থ সর্বসংহারক উৎপাত উত্থিত হইয়াছে।…এক্ষণে আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত। অতঃপর নিঃসন্দেহে একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে।…তুমি শরকার্মুক গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত…গিরিগুহা আশ্রয় কর।"

চমৎকার! রামচন্দ্র সাক্ষাৎ অবতার। অথচ তিনি শিবিরের দোরগোড়ায় শত্রু এসে উপস্থিত না হ'লে জানতেও পারেন না, কে আসছেন আক্রমণ করতে। জানেন শুধু দণ্ডকারণ্যে নিশাচর রাক্ষসরা আছেন এবং যে কোনো সময় তারা জনস্থানের ছিটমহল থেকে পঞ্চবটী অবরোধ করতে পারে। রাম কিন্তু জানেন না, রাবণভ্রাতা খর এগিয়ে আসছেন সসৈন্যে। জানার দরকারই বা কী। দেবতাদের বিমানগুলিকে আকাশে উড়তে দেখে রাম আশ্বস্ত হয়েছেন, বুঝেছেন পঞ্চবটী রক্ষার ভার যে দেবতাদের, তাঁরা সজাগই আছেন। সুতরাং বিপদের আসন্ন কোনো সম্ভাবনা নেই। অধিকতর আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান দেবতাদের হাতে রাক্ষসদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই লক্ষ্মণকে রাম বলেন, "আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণের প্রাণসংশয় উপস্থিত।" বলেন, এবার একটা জবরদস্ত লড়াই হবে বটে। এবং যদি একটি "ঘোরতর সংগ্রাম" ঘটেই, তাতেই বা কি, লড়বেন তো দেবতারা, রামচন্দ্র

শোভা মাত্র। তাঁকে তো বস্তুত লড়তে হবে না। কেবলমাত্র দেখাতে হবে, যেন তিনিই যুদ্ধটা জয় করলেন। আর এইসব ফন্দিফিকিরের বন্দোবস্তের কথাও নিশ্চয় তাঁর জানা আছে। তাই আপাতত তিনি দর্শকের ভূমিকায়। লক্ষ্মণকে বলছেন, গুহায় আশ্রয় নিতে। এটাই আকাশযুদ্ধ চলাকালীন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। যাঁরা লড়বেন না, আকাশযুদ্ধের সময় তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় হ'ল, ভূগর্ভস্থ ট্রেঞ্চ। পাহাড়ে এই ট্রেঞ্চের অভাব নেই। প্রকৃতসৃষ্ট পাথুরে গুহাই উৎকৃষ্ট আশ্রয়।

রাম যদি যুদ্ধ করতেন তবে লক্ষ্মণ হতেন তাঁর সহায়। রামকে ফেলে গিরিগুহায় আশ্রয় নিতে তিনি কখনই রাজি হতেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবাদ, বক্তৃতা কোনটাই না করে লক্ষ্মণ যে ছুটলেন মাথার ওপর বোমাবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে, তাতেই বোঝা গেল, রামচন্দ্রের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই আলোচ্য যুদ্ধে। তবু ব্রিফলেস ব্যারিস্টারের মতো রামচন্দ্র গায়ে বর্ম চাপালেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমাহাত্ম্যকীর্তনকারী কবি বললেন, রামকে প্রস্তুত দেখে বিমানস্থ দেবতারা বললেন, দেখ, রাক্ষসরা চতুর্দশ সহস্র আর রাম একাকী। শুনে আমরাও 'জয় রাম জয় রাম' বলে কেঁদে ভাসালাম। কিন্তু তখন আমাদের মনেও পড়ল না, রামচন্দ্রের অনুগামী হয়ে পঞ্চবটীতে কত সহস্র দেবসেনা এসে ছাউনী গেড়েছেন। ভরদ্বাজ রামকে ক হাজার সেনা দিয়েছিলেন? অগস্ত্য অদূরের দেবঘাঁটিতে বসে কী করছেন? আকাশে উড্ডীন দেবতারা কি নিচে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা দেখার জন্য অতঃপর উল্কাপাত ও খরসেনা নিধন বন্ধ ক'রে আকাশমার্গে তাঁদের বিমানগুলিকে সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে রাখবেন? চোখ কান মুহূর্তের জন্য বন্ধ রেখে পুরাণকারের চাতুর্যপূর্ণ কথকতা শুনলেই বিপদ। গাদাগুচ্ছের মিথ্যাস্তুতি দিয়ে তিনি আসল ঘটনাবলী নেপথ্যে চালান ক'রে ঠিক আমাদের বোকা বানিয়ে দেবেন। ভারি চতুর ছিলেন বটে আর্য সম্প্রসারণবাদীরা।

আকাশযুদ্ধের বর্ণনাটি মহাকবি যথাযথ উপস্থিত করতে পারেন নি। তিনি তো আর সে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্র যে কী জিনিস কবির পক্ষে তা জানার কথাও নয়। অথচ একটি ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণনা না করলে রামমাহাত্ম্য পরিস্ফুটিত হয় কী ক'রে। সুতরাং কবি অপ্রস্তুত পরীক্ষার্থীর মতো যুদ্ধের বর্ণনা করে শ্লোকের পর শ্লোক সাজিয়ে জানালেন, খুব যুদ্ধ হ'ল, দারুণ কাটাকাটি রক্তারক্তি বাণ ছোঁড়াছুঁড়ি চলতে লাগল, একটা দেখবার মতো ভীষণ ব্যাপারই ঘটল। মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও বিস্মিত হলেন রামচন্দ্রের বীরত্বে। শুনে শ্রোতৃকুল তারস্বরে রোদন করতে করতে নিশ্চয় রামের জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন,

এখনো জয়ধ্বনির রীতিই প্রচলিত আছে।

কিন্তু দুনিয়ায় আমাদের মতো কিছু পাপীও তো থাকে, তারা গল্পের গরুকে মাঠেই চরতে দেখতে চায়, গাছে চড়লে প্রতিবাদ করে। আমরা কবির শ্লোকরাজি বাছাই ক'রে দু-একটি সংগ্রহ করেছি। এখানে সেই ইতস্তত ছড়ানো অসাবধানী উক্তি উদ্ধার করে দেখি যুদ্ধটা রামচন্দ্র কীভাবে লড়েছিলেন।

এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে : "রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া···দেখিলেন, খরের সৈন্যগণ উপস্থিত···।" তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং "নিতান্ত দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন"। অর্থাৎ অবস্থা দেখেই রামচন্দ্র গা ঢাকা দিলেন।

বলা হয়েছে, শত্রুপক্ষের অস্ত্রবর্ষণে রাম সমাচ্ছন্ন হলেন। কিন্তু যিনি সমরক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়েছেন তিনি শরজালে সমাচ্ছন্ন হন কী করে—এই লজিক আমাদের মনঃপুত হ'ল না। কেননা একটু পরেই আমরা কবিকে বলতে শুনলাম, "রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, (রাক্ষসসেনারা) ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন"।[১]

যিনি অদৃশ্য, যিনি কখন শরগ্রহণ, কখনই বা মোচন করেন তা-ই যখন কেউ দেখার সুযোগ পান না, তখন আমরা অবশ্যই বলব, রাম ছিলেন এ যুদ্ধে দেবসৈন্যের ব্যূহের আড়ালে সমর শিক্ষার্থীর মতো। তাই তাঁকে দেখা যায় নি · দুর্গের অভ্যন্তর থেকে তিনিও যে কামান দাগেন নি তা নয়, তবে কোনো ঝুঁকি নেন নি নিশ্চয়। এটাই রামের জীবনে প্রথম এক মহাসমর এবং তা রাক্ষসসেনাদের সঙ্গে, যাঁদের সমরকৌশল সম্পর্কে রাম ছিলেন অনভিজ্ঞ। এজন্য বিবেচক দেবতারা রামকে এই যুদ্ধে আড়ালে থেকে মহাসমরের মহড়া দিয়ে গিয়েছেন। মহাভারতে এভাবেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে বিরাট নগরে অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্রচালনার শিক্ষা হয়। সে তত্ত্বের আলোচনা করেছি আমার 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' বইটিতে।

বর্ণনাক্রম লক্ষ্য করলে আবার এটাও মনে হয় যে, একক যুদ্ধে রাম সৈনাপত্য করেছেন। একক যুদ্ধ মানে, দুর্গের বহির্দেশে রাক্ষসসৈন্য বিনাশের পর ভিড় যখন কমেছে, তখন রাম রাক্ষস সেনাপতিদের সঙ্গে পালা করে যুদ্ধ করেছেন। বলাই বাহুল্য, রামের সহায়তাকারীর অভাব ছিল না। এখানে আমাদের অনুসন্ধেয় ব্যাপার ছিল, রাম কোনো অলৌকিক যুদ্ধ করেছেন কিনা। কিন্তু দেবতাদের

---

১ অরণ্যকাণ্ড/২২-২৬ স/বা. রা/অনু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য/ভারবি দ্রঃ।

জবানীতে কবি বারবার রামের ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রচারের প্রয়াস পেলেও ঘটনা-বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম, যা রটেছে, এক্ষেত্রে তার কিছু ও ঘটে নি।

অরণ্যকাণ্ডের একোনত্রিংশ সর্গে[২] রাম প্রথম নিজ মুখে স্বীকার করলেন যে, এই যুদ্ধে দেবতারা উপস্থিত এবং তাঁরাই রামচন্দ্রের রাজা। তাঁদের আদেশ শিরোধার্য ক'রে রাম এসেছেন দণ্ডকারণ্যে। তাঁর আগমন কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রঘটিত নয়। প্রাসঙ্গিক অংশটির পাঠ এই রকম :

রাম খরকে বললেন, "রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষণ্ডিদিগের দণ্ডবিধানার্থ এই স্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার স্বর্ণখচিত শর···তোর দেহ বিদারণ পূর্বক···পতিত হইবে।"

খর বিনষ্ট হলে নেপথ্যের দেবজাতীয় যোদ্ধারা আত্মপ্রকাশ করলেন। "অগস্ত্যাদি ঋষি ও রাজর্ষিগণ এসে রামকে সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন, বৎস! সুররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে তোমাকে এই স্থানে আনিয়াছিলেন।···অতঃপর আমরা দণ্ডকারণ্যে নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণ করিব।"

ইতিপূর্বে আমরা যে সব যুক্তি প্রমাণ তথ্য সন্নিবিষ্ট করে পরিশ্রম সহকারে বলেছি, রামের দণ্ডকারণ্য যাত্রার নেপথ্য উদ্দেশ্য দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধি, এখন সেই নেপথ্য ষড়যন্ত্রটিই স্বীকৃতি লাভ করল। অগস্ত্য প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর তথাকথিত 'ধার্মিক সাধুদে'র বক্তব্যে। আমরা বুঝলাম, এই তথাকথিত যুদ্ধবাজ সাধুদের ধর্মাচরণ এবং তপঃসাধনার প্রকৃত অর্থ। ধর্মাচরণ মানে বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক আর্য শাসনব্যবস্থা পত্তনের জন্য কাজ করা। আর তপঃসাধনা মানে মালা-জপা, নাঙ্গা হয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কিংবা কাঁটাঝোপের ওপর শুয়ে বসে দুর্জ্ঞেয় কোনো শক্তির সাধনা করা নয়; তার অর্থ, দেবতাদের সামরিক ঘাঁটি আগলে নির্জনে পাহারায় বসে থাকা। কাজে সফল হ'লে পদোন্নতি। আশ্রমকে যারা পর্ণকুটীর মাত্র জানি, তারা জীবনেও পুরাণ পাঠ করি নি বলেই এতোবড় একটা বিভ্রান্তির মধ্যে হাজার হাজার বছর বাস করছি। স্পষ্টতই দেখা গেল, এক একটি আশ্রম এক একটি লাল কেল্লা। মারণাস্ত্র আর সৈন্যসামন্তের আখড়া সেগুলি। দেখলাম, দেবতারা রাজ্যলাভের বাসনায় চুপিসাড়ে এক ঘাঁটি থেকে অপর ঘাঁটিতে ঘুরে বেড়ান। বুঝলাম, দেবতা ও রামের ভাবমূর্তি গড়ার জন্য দশরথ কৈকেয়ীকে

২। বা. রা / অনু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য / ভারবি।

অকারণ কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হয়। স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, রামের পাদুকা মাথায় ক'রে অযোধ্যা আগলে বসে থাকতে হয় ভরতকে দীর্ঘ চোদ্দ বছর। লক্ষ্মণ ক্রীতদাসের মতো রাম-জানকীর সেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতি-বাহিত করেন। শূর্পণখা কৌশলে খরদূষণকে জনস্থানের বাইরে আনলে দেববাহিনী অতর্কিত আক্রমণে নিহত করেন সেই অপরাজেয় রাক্ষস বীরদের।

সীতাহরণ পর্ব

খররাক্ষসের দুর্ভেদ্য দুর্গ জনস্থান শূর্পণখার কৃতিত্বে দেবতাদের হস্তগত হ'ল। শূর্পণখা দেবতাদের হয়ে একটা মস্ত বড় কাজ ক'রে দিলেন। তাই দেখা গেল, খর-সেনাকে পথ দেখিয়ে পঞ্চবটীতে আনলেও দেবতারা শূর্পণখার কোনো ক্ষতি করলেন না। তিনি দিব্যি সশরীরে ফিরে গেলেন লঙ্কায়। দেবতাদের এই দাক্ষিণ্য আবারও প্রমাণ করছে যে, সাজানো গল্পে যাই বলা হয়ে থাক, পঞ্চবটীতে ইতিপূর্বে কেউ তার নাককান কাটে নি। শূর্পণখা বিশেষ অভিসন্ধি নিয়ে খরদূষণকে উত্তেজিত করতে জনস্থানে যান একটি অবমাননার গল্প তৈরী ক'রে। হয়ত দেবতারাই সে গল্পটি তাকে শিখিয়ে পাঠান। গল্পটি যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় এজন্য শূর্পণখা হয়ত নিজমুখে কিছু আঁচড় ও ক্ষতচিহ্ন সাজিয়ে গেছলেন। গুপ্তচর ও ষড়যন্ত্রীরা এমনভাবে হামেশাই ক্ষত সৃষ্টি ক'রে থাকেন।

একা শূর্পণখাই নন, তাঁর সঙ্গে মুক্তি পেয়ে আর এক রাক্ষসও লঙ্কায় যাওয়ার ছাড়পত্র পান। তিনিও দেবতাদের শক্ত সামরিক ঘাঁটি থেকে নির্বিঘ্নে সীমান্ত পার হয়ে লঙ্কায় ফিরেছেন। কেমন ক'রে তাঁরা সাগর পার হলেন বাল্মীকি তারও কোনো প্রতিবেদন রেখে যান নি। বিমানে অথবা জলযানে ছাড়া সাগর পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ব্রাহ্মণ্যপুরাণে রাক্ষসদের মায়াবী মায়াবিনী বলা হ'লেও সাধারণ মানুষ রাক্ষসরা সাধারণই ছিলেন। হয়ত আদিবাসীদের মতো নানারকম রূপসজ্জা-তাঁরা করতেন, তাই ব'লে কোনোরকম ভানুমতীর খেল দেখানোর মন্ত্র তাঁদের জানা ছিল না। খররাক্ষস এবং তাঁর রাজত্ব বেঁচে থাকলে সাগর পারাপারের জন্য জলযান বা বিমানের অভাব হ'তো না শূর্পণখা বা অকম্পনের। কিন্তু খরদূষণের মৃত্যু এবং জনস্থানের পতনে রাক্ষসেরা সেইসব যানের মালিকানা ছিল। তত্রাচ এই দুজন যখন লঙ্কায় যেতে

পেরেছেন তখন সহজ সিদ্ধান্তটি এই হয় যে, তাঁরা সাগর পার হয়েছিলেন দেবতাদেরই সাহায্যে। আত্মবিশ্বাসী এবং স্বজাতিস্নেহমুগ্ধ রাবণের মনে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয় নি। বাস্তবিক আশ্চর্যেরই কথা।

বাল্মীকি রামায়ণের একত্রিংশ সর্গে বলা হয়েছে, "ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটিমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। যে জনস্থান পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহুকষ্টে এখানে আইলাম।"

যে দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হ'ল সে 'বহুকষ্টে' সেখানে উপস্থিত হয়েছে এই মিথ্যাভাষণটি লক্ষণীয়। মাঝে উদ্বেল সমুদ্র থাকায় দ্রুতবেগে তার পক্ষে উপস্থিত হওয়াই বা সম্ভব হ'ল কী করে দেবতাদের সাহায্য ব্যতীত? রাবণ বা তাঁর সভাসদরা এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা অকম্পনের কাছে চেয়েছিলেন কিনা এবং চেয়ে থাকলে তার উত্তরে অকম্পন আরও কোনো সাজানো গল্প নিবেদন করেছিলেন কিনা আর্যপুরাণ রামায়ণে তার উল্লেখ প্রাপ্তব্য নয়। সেজন্য সেসব বাস্তব কথা আলোচিতও হয় নি।

দেখা গেল, রাবণ খুব হম্বিতম্বি করার পর অকম্পনকে জিজ্ঞেস করলেন, "অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে জনস্থানে আসিয়াছে?"

তখন অকম্পন অনর্গল কণ্ঠে এক ঝুড় মিথ্যে গড়গড় করে আউড়ে গেল। রামের ঐশ্বরিক ক্ষমতার বানানো গল্প সবিস্তারে রিপোর্ট ক'রে রাজসম্মুখে একটা ডাহা মিথ্যে খুব জোর দিয়েই বলল, "উহার [রামের] সহিত যে সুরগণ [দেবতারা] আইসে নাই ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

অকম্পন না হয় মিথ্যুক। কিন্তু বাল্মীকি বিমানারূঢ় যুদ্ধোন্মত্ত দেবতার কথা নিজেই লিখে কী হিসেবে একটি মিথ্যা প্রতিবেদন হাজির ক'রে অকম্পনের বক্তব্য সমর্থন করেছেন? অকম্পনের দেওয়া মিথ্যা বিবরণটি তাই তো মনে হয়, তাকে শিখিয়ে পাঠানো হয় দেবশিবির থেকেই। দেবতারা রামের সঙ্গে নেই, এই আশ্বাস দিয়ে অকম্পন রাবণকে পরামর্শ দিলো, রাবণ যেন রামকে কোনরকমে "মোহিত" ক'রে সীতাকে অপহরণ করেন। কেননা রামের যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাতে তিনি একাই রাক্ষসবংশ ধ্বংস করে দিতে পারেন। সম্মুখ সমরে এই রামকে পরাস্ত করা অসম্ভব। অকম্পনের তাই পরামর্শ, কোন উপায়ে রামকে ভুলিয়ে রাবণ যদি সীতাকে ধরে আনতে পারেন পঞ্চবটী থেকে তাহলে সীতার বিরহেই রামচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করবেন দুঃখে যন্ত্রণায়।

স্পষ্ট সুপরিকল্পিত একটি ফাঁদ পাতা হলো। হয়ত মারীচকে স্বর্ণমৃগ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দেবতারা অকম্পনের মাধ্যমে প্রদান করেন। তা না হলে হঠাৎ রাবণ এমন একটি উদ্ভট উপায় কেনই বা অবলম্বন করবেন। উপায়ের কি অভাব ছিল। সমস্ত ঘটনাই সন্দেহজনক। অথচ রাবণ বুঝলেন না তিনি কোন্ ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন।

যে কালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ দেবতা সকলেই একাধিক নারী ভোগ করতেন, যে যুগে নারীর মূল্য প্রসূত পুত্রের দ্বারা নির্ণিত হ'তো, সেই সময় অকম্পন এমন একটি অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে অপ্রত্যাশিত দুঃসাহসের সঙ্গে রাবণের কাছে তা নিবেদন করলে রাবণও নির্বিচারে রামনিধনের এই সহজ পন্থায় আস্থাশীল হলেন—এমন রাজনৈতিক মূর্খতা অকল্পনীয়। তবু সেটাই ঘটনা এবং রাবণ একটি আছিলা অবলম্বন করে সীতা অধিকারের স্বপ্নে বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বসলেন। রাবণ কারো পরামর্শে কান দিতেন না, কোনো মন্ত্রীও তাঁকে কোনো সৎ পরামর্শ দিতো না। তিনি পরদিন সকালেই একটি বিমানে চেপে সাগর পার হয়ে দণ্ডকারণ্যে তাড়কাতনয় মারীচের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাড়কার মৃত্যুর পর পিতৃ-রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে জনস্থানের নিকটবর্তী রাক্ষস-রক্ষিত এক অরণ্যে মারীচ আত্মগোপন করে ছিলেন। মারীচের এই আশ্রয়কেও মহাকবি 'আশ্রম' ব'লে উল্লেখ করেন, যার অর্থ, আশ্রম বললে বাসাশ্রয়কেই বুঝতে হয়।

রাবণ মারীচকে বললেন, "মারীচ! রাম যুদ্ধে **রক্ষকের সহিত** ['রক্ষক' শব্দটি লক্ষণীয়] রাক্ষসগণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্যাকে হরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা কর।"

মারীচ বললেন, কাজটি মোটেও মঙ্গলজনক হবে না। সীতাহরণের পরামর্শ যেই দিয়ে থাকুক, সে রাক্ষস জাতির ক্ষতিরই কারণ সৃষ্টি করতে চায়। রাবণের বরং উচিত, অকারণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করা। সীতাহরণের পরামর্শ রাবণশত্রুর গভীর চক্রান্তই সূচিত করছে।

দেখা যাচ্ছে, সীতাহরণের মতো একটি ব্যাপার শোনামাত্র মারীচ বুঝেছেন, এই ঘটনার পরামর্শদাতা একটি গভীর চক্রান্তের দোসর, সে রাক্ষস জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয়।

রাবণ প্রথম বার মারীচের সদুপদেশ মান্য করে লঙ্কায় ফিরে গেলেন। সীতা-হরণের চক্রান্ত নিষ্ফল হয় দেখে তখন ছুটে এলেন দ্বিতীয় চক্রান্তকারিণী শূর্পণখা। শূর্পণখা ইতিপূর্বে খরদূষণকে দেবসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়ে বিনষ্ট করেছেন।

অতঃপর তিনি দেখা দিলেন খোদ লঙ্কার অমঙ্গল স্বরূপ। আশ্চর্য, তাঁরও পরামর্শ, রাবণ সীতাহরণ করুন। সুতরাং সীতাহরণের পেছনে যে বস্তুতই একটি রহস্য ছিল অতঃপর তা বুঝতে আর অসুবিধা হয় না।

তিনি রূঢ় ভাষায় রাবণকে ভৎর্সনা করে বললেন, জনস্থানের রাক্ষসজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরেও কোন্ লজ্জায় রাক্ষস-রক্ষক রাবণ নিশ্চেষ্ট বসে আছেন? জাতির প্রতি তাঁর কি কোনো কর্তব্যই নেই? রাবণকে তিরস্কার করার সময় শত্রু পক্ষীয় রামের প্রশংসা করে শূর্পণখা বলেছেন, রাম এক অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। তিনি শরমোচন করেন কি না তাই কেউ জানতে পারে না। রামস্তুতির পর শূর্পণখার কণ্ঠে "শোনা গেছে সীতার সৌন্দর্যবর্ণনা, যেমন সীতার নেত্র আকর্ণ আয়ত। মুখ পূর্ণ-চন্দ্র সদৃশ এবং বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা এবং সুরূপা। উহার কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড় এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। ···এইরূপ নারী আমি পৃথিবীতে আর কখনও দেখি নাই।" শূর্পণখা বলেছেন, "রাবণ! সেই সুশীলা তোমারই যোগ্য···আমি তোমারই জন্য উহাকে আনিবার উদ্‌যোগে ছিলাম··" [এই কথাটিও মিথ্যা]।

শূর্পণখার পরামর্শ ছিল, অমন সুন্দরী নারী একমাত্র রাবণেরই ভোগ্যা হতে পারে। শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাবণের উচিত সীতাকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে আসা।

কথায় বলি, 'বোকা রাম' অথবা 'রাম পাঁঠা'। আসলে কিন্তু বলা উচিত, বোকা রাবণ বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাহীন লঙ্কাধিপতি। ইনি মারীচের পরামর্শ গ্রহণ করে সীতাহরণে ক্ষান্তি দেন আবার পরমুহূর্তেই শূর্পণখার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ছোটেন দণ্ডকারণ্যে মারীচের আশ্রমে। এবারেও মারীচ অসম্মত হয়েছেন। সীতাহরণ রাক্ষসকুলের বিনাশের কারণ হবে, দূরদর্শী মারীচ তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শূর্পণখার মুখে অনিন্দ্যসুন্দরী সীতার সংবাদ পেয়ে সীতা অধিকারের জন্য অধৈর্য হয়েছেন রাবণ। সেকালের নিরিখে রাবণের এই উত্তেজনা অবশ্য কোনো বিকার নয়। তখন রাজারাজড়া দেবপ্রধানরা নারীহরণ ও পরনারী ভোগ করা বীরত্ব বলেই গণ্য করতেন। দেবরাজ ইন্দ্রের এমন নষ্টামির খবর আছে যুগে যুগে। অর্থাৎ যখন যিনি ইন্দ্র হয়েছেন তিনিই পরস্ত্রী ও পরনারী ভোগ করেছেন সুযোগ পেলেই। ব্রাহ্মণ নেতারাও পরস্ত্রী ভোগে ইতস্তত করেননি। কৃষ্ণ নরকাসুরের হারেম থেকে যে ষোল হাজার রমণীকে আপন প্রমোদ নিকেতনে এনে ভোগ করেন, তাঁরা কারো জায়া, কারো পত্নী, কারো বাগদত্তা, কারো

জননী ছিলেন! রাজারা একটি নারী অধিকারের জন্ত যুদ্ধ বাধিয়ে নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ প্রজার মৃত্যু ও মহতী সর্বনাশের কারণ সৃষ্টি করেছেন। সেই ট্রাডিশন চলে এসেছিল নবাবী আমল পর্যন্ত। সুতরাং সীতা অধিকারের জন্ত রাবণের বাসনাকে আলাদা করে কোনো পাপকর্ম বলা যায় না।

কিন্তু রাবণের ভেবে দেখা উচিত ছিল মারীচের পরামর্শ। মারীচ বলেছিলেন, সীতাহরণের পরামর্শ যে দিয়েছে সে বন্ধুবেশী প্রতারক শত্রু। সে রাক্ষস জাতির পতন চায়। দামি মন্ত্রণা। কথাটি মনে ধরে নি রাবণের। মারীচকে ভালো কথায় রাজি করাতে না পেরে সীতাহরণে তার সাহায্য না পেলে মারীচের শোচনীয় পরিণাম হবে বলে রাবণ শাসিয়েছেন। নিরুপায় মারীচ অবশেষে রাজি হয়েছেন স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশ ধারণ করে রামাশ্রয় থেকে সীতাহরণের ষড়যন্ত্রে সামিল হতে।

কিছু লোক ভালো ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে। মারীচ পারতেন। কিন্তু একটি মানুষ-বহুরূপী স্বর্ণমৃগ সেজে বনজঙ্গলে হুপহাপ করে লম্ফঝম্ফ করবে আর তাই দেখে সীতারাম সেই স্বর্ণমৃগটি লাভ করার জন্য একটা নাটক সাজিয়ে বসবেন, এই অবাস্তব ঘটনাটি রামায়ণে, আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় দরের আষাঢ়ে রূপকথা, যার ব্যাখ্যা অন্যান্য রূপক কাহিনীগুলি অপেক্ষা কঠিন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে এক বহুরূপী বাঘ সেজে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়েছিল। নাটক বেশিক্ষণ চললে বহুরূপী গুলি খেয়ে ইহধাম ত্যাগ করতেও পারত মারীচের মতো। কিন্তু বহুক্ষণ চলে নি সে পর্ব। মারীচও অবশ্য স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে আশ্রম সান্নিধ্যে বারদুই লাফ দিয়েই অরণ্যে অদৃশ্য হয়েছিল। তত্রাচ এই উদ্ভট ধরনের অবাস্তব হরিণটিকে পাওয়ার জন্য সীতা বায়না ধরলেন। অস্বাভাবিক বায়না। রামের মতো এক প্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্রের স্বর্ণমৃগের পেছনে ধাওয়া করাও অস্বাভাবিক। তবু রামসীতা যেন ইচ্ছে করেই বোকা সেজে স্বর্ণমৃগ লাভের খেলায় গা ভাসিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা যুক্তিবাদী লক্ষ্মণের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মতো বলেছিলেন, "আমার বোধ হয় মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। ...জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব। ইহা যে রাক্ষসী মায়া [রূপসজ্জা] তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।"

সংশয় কারোরই থাকার কথা নয়। কেন যে রামসীতার দুর্বুদ্ধি হল, কথা বরং তা-ই নিয়েই উঠতে পারে। আশ্চর্য হয়ে দেখি, লক্ষ্মণের কথায় ইচ্ছে করেই সীতা-রাম কান দিলেন না। তাঁরা যেন পণ করেছেন, যে-খেলা শুরু হয়েছে সেটি খেলতেই হবে। অথচ লক্ষ্মণ বুঝতে পারছেন মারীচ স্বর্ণমৃগ সেজে একটি বুদ্ধবোধ রূপকথার

সৃষ্টি করেছে তবে কি বুঝতে হবে, মৃগচর্ম গায়ে জড়ালেও মারীচকে চেনা যাচ্ছিল ? ঘটনা তা-ই হলে রাম তার পিছু ধাওয়া করলেন কেন ? লক্ষ্মণ সীতার পাহারায় আছেন, সীতার তা অসহ্য লাগল কেন ? কেনই বা তিনি লক্ষ্মণকে অশ্রাব্য কটুবাক্য বলে তাড়িয়ে দিলেন তাঁর সান্নিধ্য থেকে ? পূর্বাপর এই ঘটনাগুলি যেন রাবণের পক্ষে সহজে সীতাহরণ করার পথই পরিষ্কার করে দিল। সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, "তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার [রামচন্দ্রের] মৃত্যু কামনা করিতেছ।" সীতা যদি প্রকৃতপক্ষে জনকপালিতা রাজপুত্রী জানকী হতেন, তবে এমন নির্লজ্জ উক্তি তাঁর মুখে শোনা যেতো না। আমরা অবশ্য জেনে গেছি, ব্রহ্মার পরিকল্পনায় সীতা বদল হয়ে গেছে। দেবদূত অগ্নি নিয়ে গেছেন জানকীকে। যিনি এখন লক্ষ্মণকে কুবাক্য বলছেন, তিনি দেবলোকের স্বর্বেশ্যা নারীগুপ্তচর বেদবতী, যাঁর উদ্দেশ্য রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় গিয়ে ওঠা এবং সেখানে ব'সে দেবস্বার্থে চক্রান্তের জাল বিস্তার করা।

এ পর্যন্ত ঘটনা পৌরাণিক তথ্য প্রমাণের আলোকেই [পূর্বোল্লিখিত] শুধু বোধগম্য। বোঝা যাচ্ছে, সীতারাম জানেন, মারীচ স্বর্ণমৃগ সেজে আসবে ; এবং রাবণ আসবে তার পিছু পিছু। ষড়যন্ত্রের জাল বিছানোই আছে, পতঙ্গের মতো সেই জালে এসে রাবণ ও মারীচ ধরা দেবেই এবং দিলে কী করতে হবে তা-ও রামসীতাকে দেবশিবির জানিয়ে রেখেছেন। সেজন্যই লক্ষ্মণের উপদেশ ও পাহারাদারি কোনোটাই গ্রাহ্য হয় নি।

কিন্তু মারীচের ছদ্মবেশ ধারণের কথা দেবরক্ষিত রামশিবিরে আসে কী করে ? তবে কি অকম্পন শূর্পণখাই সে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন ? ঘটনার গতিপ্রকৃতি তো এমনই ইঙ্গিত রেখে যাচ্ছে। রাবণ এ ধরনের পরামর্শ না পেলে সীতহরণের জন্য এমন একটি উদ্ভট উপায়ই বা অবলম্বন করবেন কেন ? এটা কি কোনো যুক্তিসিদ্ধ বোধগম্য ব্যাপার ? রাবণ বাহুবলে ঢের যুদ্ধ জয় করলেও নিতান্তই সরল প্রকৃতির বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। একজন রাজার পক্ষে এই সরলতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা মূর্খতারই নামান্তর। রাবণের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় যুদ্ধ কাণ্ডেও ঢের পাওয়া যাবে। এমন এক মহামূর্খ এতোকাল কী ভাবে দেবত্রাসের কারণ সৃষ্টি করেছিলেন সেটাই বরং আশ্চর্য। মনে হয়, রাবণের সহায়ক যতকাল ছিলেন অনার্য দেবতা শিবপশুপতি, ততকালই রাবণ ছিলেন অপরাজেয়। সম্প্রতি শিউজী দেবতাদের পক্ষে যোগদান করেন মহাদেব ও মহেশ্বর খেতাবে ভূষিত হয়ে। রাবণ তখনই হারিয়েছেন তাঁর একমাত্র রক্ষক। তাই হতশ্রী রাবণের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

[লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'দেবায়তন হিমালয়'-এ শিবের দক্ষযজ্ঞকাণ্ড ও আর্য দেবতাদের মৈত্রী চুক্তি আলোচিত হয়েছে]

যাইহোক, নির্বুদ্ধি রাবণ অকম্পন ও শূর্পণখার পরামর্শে মারীচকে নিয়ে সীতাহরণে এসেছেন। দেবতারা একবার মারীচকে হত্যা করার সুযোগ হারিয়েছিলেন। মারীচ তারকারাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে আসেন দক্ষিণ দেশে। এখন সেই মারীচও দেবতাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে রাবণের নির্বুদ্ধিতায়। এবার আর মারীচ বধে তাঁদের বেগ পেতে হয় নি। এক ঢিলে দুটি মস্ত মতলব ব্রহ্মা সাধন করে নিলেন সীতাহরণ পর্বে।

বেদবতীকে রাবণালয়ে প্রেরণ দেবতাদেরই উদ্দেশ্য। সুতরাং লক্ষ্মণকে সরিয়ে দিয়ে রাবণকে সাদরে বরণ করে নিলেন বেদবতী সীতা।

লক্ষ্মণ বিমর্ষমুখে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তস্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করেন লঙ্কাধীশ রাবণ। শ্মশ্রুগুম্ফ আচ্ছাদিত-মুখ জটাচীরধারী সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকুঞ্জে আবির্ভূত হ'ন ব'লে আমাদের যে গল্প শোনানো হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণে তেমন কোনো কাহিনী নেই। কবি বলেছেন, "উহার পরিধানে শ্লক্ষ্ণ কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা" ছিল। অর্থাৎ ছিল "পরিব্রাজকে"র পোশাক। এই রাবণ সীতার পাশে দাওয়ায় বসে বেশ আয়াস ক'রে রসিয়ে রসিয়ে বেদবতী সীতার দেহসৌন্দর্যের প্রশংসা শুরু করেন। বলেন,

> বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরপমৌ।
> এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সংপ্রগল্ভিতৌ॥
> পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলপমৌ।
> মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তৌ পয়োধরৌ॥

বাংলা অনুবাদ: "তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল, উরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয় উচ্চসংশ্লিষ্ট বর্তুল, কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত"...[২]

বেদবতী স্বৈরিণী। ক্ষণপূর্বেই তিনি লক্ষ্মণকে নিজের দেহের ইঙ্গিত ক'রে বিদায় করেছেন। তাঁর হাঁকডাকে মনে হয়েছে, মস্ত বড় মাপের সতী বুঝি রামবিরহে কাতরোক্তি করছেন। এখন দেখা যাচ্ছে, এঁর সতীত্বের বাগাড়ম্বর ছলনামাত্র। রামচন্দ্রের জন্যেও ইনি কিছুমাত্র বিচলিত নন। এখন দিব্বি একাকিনী দাওয়ায় বসে

২ অনু বা. রা. / হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য / ভারবি।

অপরিচিত পরপুরুষের মুখে আপন যৌনাঙ্গের সবিস্তার ব্যাখ্যা শুনছেন হাস্যালাপ করতে করতে। জমিয়ে গল্প শুরু হয়েছে দুজনে। বেদবতী রাবণকে শোনাচ্ছেন মিথিলাপর্ব থেকে দণ্ডকারণ্যপর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার। তাঁর মুখ থেকে রামের বয়সও জানা গেল, —পঁচিশ বছর। সীতা নিজে এই সময় অষ্টাদশী। নিজের পরিচয় দিয়ে ছায়াসীতা এবার রাবণের পরিচয় জানতে চাইলেন। রাবণকে কখনো মিথ্যাভাষণ দিতে শোনা যায় নি। এখানেও তিনি তাঁর সত্য পরিচয় গোপন করেন নি। নিজেকে লঙ্কার অধিপতি ব'লেই বর্ণনা করে সীতার পাণি প্রার্থনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চমক। কঠোর কটুভাষ নিক্ষেপ ক'রে রাবণকে উত্তেজিত করেছেন দেবলোকে শিক্ষিতা নারীগুপ্তচর। এবং এইখানে তিনি পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছেন আমাদের কাছে। আমরা বুঝেছি, তিনি ভদ্র রাজকন্যা জানকী হ'লে রাবণের পরিচয় পাওয়া মাত্র ভয়ে মূর্ছা যেতেন, কারণ রাবণের কথা আগেই সীতা জানতেন শূর্পণখার পদার্পণ সময় থেকে। সুতরাং বর্তমান সীতা বস্তুত রাজপুত্রী, হ'লে শত্রুপক্ষীয় বীরপুরুষকে গালিগালাজ করার সাহস পেতেন না। বহুনিন্দিত রাবণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর ওপর বলাৎকার করতে পারেন বলেও সীতার পক্ষে ব্যাধতাড়িতা হরিণীর অবস্থা প্রাপ্তিই ছিল প্রত্যাশিত। এর অন্যথা হ'তে দেখে নারীগুপ্তচর স্বর্বেশ্যা বেদবতীকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া তখন সীতার বয়স মাত্র আঠারো। সুতরাং জানকী সীতার পক্ষে রাবণের সঙ্গে রসালাপ ও রাবণকে কটুবাক্য বলা মোটেই সম্ভব ছিল না।

নাটকের অন্য পর্বটিও লক্ষণীয়। রাবণ জানতেন রামচন্দ্র দেবরক্ষিত। দেবসেনা তাঁর আবাস সব সময় কঠোরভাবে পাহারা দিয়ে রেখেছে। আমরাও অনুল্লিখিত এই দেবসেনার অস্তিত্ব আগেই আবিষ্কার করেছি। কিন্তু পঞ্চবটীতে এসে দেখলেন, অকম্পনের কথাই ঠিক। কোথাও দেবসেনার অস্তিত্ব নেই। বোঝা যাচ্ছে, তাঁকে সহজে সীতাহরণের সুযোগ দেওয়ার জন্য দেবসেনাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রাবণের পরিচয় পাওয়ার পর বেদবতীর তরফ থেকে সামান্য বাধা দানের চেষ্টা হয়েছিল মৌখিকভাবে। এটুকু অভিনয় তাঁকে করতে হয় রাজনৈতিক কারণেই। চেঁচামিচি না করলে পাছে রাবণের মনে সন্দেহ জাগে সীতার আচরণ সম্পর্কে, পাছে তিনি ভাবেন এতো সহজেই সীতা তাঁর করায়ত্ত হন কী করে, তাই সীতার ছদ্মবেশে বেদবতী একটু নাটক করেছেন।

একটি খণ্ডযুদ্ধ অবশ্য পথে কিছু গোলোযোগের সৃষ্টি করে। দশরথবন্ধু জটায়ু তাঁর স্বনামীয় বিমানে চেপে রাবণকে বাধা দিয়ে পরাস্ত হন। জটায়ু দেবতাদের

অভিসন্ধির কথা জানলে অকারণে বেঘোরে নিজের প্রাণটা হারিয়ে বসতেন না। ব্রহ্মার পরিকল্পনাটি তাঁর অজ্ঞাত ছিল।

এতোক্ষণ অনেকবার ব্রহ্মার পরিকল্পনায় সীতাহরণ ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে পৌরাণিক তথ্যসূত্রটি এইবার উল্লেখ করব। জটায়ু পরাস্ত হ'লে রাবণ যখন ছদ্মবেশিনী সীতাকে নিয়ে চলে গেলেন, তখন মহাকবি অকস্মাৎ একটি বিস্ময়কর শ্লোক যোজনা ক'রে নেপথ্যের কূট চক্রান্তের একটি নিঃসঙ্গ হদিশ রেখে গেলেন। লিখলেন, "পিতামহ ব্রহ্মা···জানকীর পরাভব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, **এক্ষণে বুঝিবা আমরা কৃতকার্য হইলাম**। তৎকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ **রাবণবধ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবনপূর্বক সন্তোষ লাভ করিলেন**, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন।"

পরিষ্কার নেপথ্য ষড়যন্ত্র। জানা গেল, কেবলমাত্র দেবসেনা সরিয়ে নেওয়াই নয়, সীতাহরণ শেষ পর্যন্ত হয় কি না হয়, তাই দেখতে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ নেতাদের সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে অবস্থান করছিলেন। রাবণ ছদ্মবেশিনী সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন দেখেও তাঁকে উদ্ধার না করে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ঐ দেবনেতারা বললেন,—খেলা জমেছে, সীতাহরণও পরিকল্পনামাফিক সুষ্ঠুভাবেই হয়ে গেল। অতএব আমরা কৃতকার্য হলাম। এখন পরিকল্পনা অনুসারে [যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত] রাবণবধ কার্যটি অপেক্ষায় রইল। ভারি সুসংবাদ, ভারি সন্তোষজনক খেলা জমে উঠেছে। সব ঠিক হ্যায়।

জটায়ু কবন্ধ সংবাদ

সীতাহরণের পর রাজনৈতিক অভিনয় শুরু করলেন রামচন্দ্র। এই নিপুণ অভিনেতা কেবলমাত্র লক্ষ্মণের কাছ থেকে দেব-উদ্দেশ্য গোপন করার জন্যই শুরু করলেন বিলাপব্যথিত বক্তৃতা। দণ্ডকারণ্যের পথে পথে হতাশাখিন্ন রাম-কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকল। রামবিলাপের মধ্যে রামের তীব্র যৌনকামনার পরিচয় পেয়ে আমরা অবশ্য স্তম্ভিত হলাম। ভগবান রামচন্দ্রকে বলতে শুনলাম, "যাহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল···হে মরুবক! জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়···তাল! প্রেয়সীর

স্তনযুগল সুপক্ক তাল ফলের তুল্য, যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক তো কৃপা করিয়া বল '…হা! জানকীর নাসিকা কি সুদৃশ্য,দন্ত কি সুন্দর এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। …(লক্ষ্মণ) ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না।…রাক্ষসেরা যখন জানকীকে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠী ভীত হইয়া আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন অস্পষ্ট স্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার বর্তুলস্তনযুগল সতত রমণীয় হরিচন্দন রাগে রঞ্জিত থাকিত,এক্ষণে শোণিত পঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে।…"

কাব্য হিসেবে রামায়ণের এই অংশের উৎকর্ষ-বিচার আমাদের কর্তব্য নয়। আমরা বলব, অলোচ্য অংশ রামচন্দ্রের জগদীশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। যে রামচন্দ্র এমন দেহবাদী, যাঁর আহার প্রচুর পরিমাণ মৃগমাংস, যিনি সর্বদাই লক্ষ্মণ নামক পরিচারকবর্গের দ্বারা সেবিত না হলে এবং স্ত্রীসংসর্গে বঞ্চিত হলে অরণ্যে প্রবাস যাপন করতে অক্ষম, যিনি মনে করেন, সেই কঠোর দিনযাপন করতে হলে তাঁর পক্ষে প্রাণধারণ আর সম্ভবপর হবে না, তাঁর মতো সামান্য মনুষ্যপুত্রের মধ্যে মহৎ ঈশ্বরত্ব আরোপিত হলে তার্কিকের কাছে স্বভাবতই তা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বরং লক্ষ্মণের মধ্যে অধিকতর পুরুষকার লক্ষ্য ক'রে রামচন্দ্রকে তুলনায় তাঁর ক্ষুদ্র ও দুর্বলচেতা মনে হয়। অথচ আত্মশ্লাঘাপ্রিয় রাম অসার আস্ফালনে খুবই উচ্চনাদী। বলেন, "লক্ষ্মণ! আমি রোষাবিষ্ট হইয়াছি, জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কেহই নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাকেও আজ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।"

ভালো কথা। রামচন্দ্রের এতোবড় প্রলয়ঙ্কর বীরত্বের পরিচয় কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত পাই নি, রাম-জীবনীর মধ্যেও যে তা প্রাপ্য নয়, রামায়ণ শেষে তাও জানা যায়। তবু এই আতিশয্য ভক্তজনকে মুগ্ধ করে—এমন নির্বোধ ভক্তিমাত্র সম্বল নারীপুরুষের সামনে রাম ও রামায়ণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা বৃথা শ্রমমাত্র। তবু, তাঁদের বলব, কেবলমাত্র ঘটনার পরম্পরাটুকু লক্ষ্য করে যান, পরিশেষে আপনার বিচার-বুদ্ধিই আপনাকে একটি মতামত গঠনে সাহায্য করবে।

দেখা যাক, রামচন্দ্র সীতা হারিয়ে জগৎব্যাপী কী প্রলয়কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম। তিনি বললেন, "আজ আমি নভোমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব; সূর্য ও অগ্নির জ্যোতি নষ্ট করিয়া সমুদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিব; গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া ফেলিব; তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন ও মহাসমুদ্রকেও এককালে নির্মূল করিব।"

বাপ রে বাপ! এতো সাঙ্ঘাতিক প্রতিজ্ঞা! অপহৃতা সীতার অপহরণকারীর খোঁজই যিনি দিব্যচক্ষে অথবা সাধারণ ভেল্কিবাজ চালপড়া, কুলোপড়া, নখদর্পণ দর্শানেওয়ালার ক্ষমতাবলেও বার করতে পারলেন না এতোটা সময়ে, তিনি গ্রহ-নক্ষত্র চন্দ্রসূর্য, গিরিসমুদ্র, প্রস্রবণ নদীতে মহাবিপ্লব আনয়ন করবেন!! বস্তুত, মহাশক্তিমান পরমেশ্বর ভিন্ন এসব কাজ আর কে-ই-বা করতে পারেন। তবে পরমেশ্বর থেকে এমত অপকর্মের সম্ভাবনা কখনই নেই। কারণ, কোনো এক রমণীর বিরহে জগৎস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করতেন না। যিনি তেমন কিছু করার আস্ফালন করেন তাঁর মতো উন্মাদের দ্বারা কোনো বড় সৃষ্টি যেমন অসম্ভব, তেমনিই তা ধ্বংস করার আস্ফালনও বাতুলতা মাত্র। তাঁকে পরমেশ্বরের পবিত্র আসনে বসালে সেটা মোটেই পবিত্র কর্ম হয় না।

রামচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা যে নিতান্তই অসার এবং বাতুলের প্রলাপমাত্র এটা সম্যক বুঝে লক্ষ্মণ মৃদু বিরক্তি সহকারে এই প্রথম রামকে বলেছিলেন, "শত্রুবধে যত্নবান হউন। সর্বসংহার আবশ্যক কি; যে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন[১]"।

লক্ষ্মণের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে রামচন্দ্র চুপ ক'রে গেছেন। হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন, লক্ষ্মণকে যতটা 'গবেট' বলে তিনি মনে করেন, আসলে দ্বিতীয় দাশরথি ততদূর নির্বোধ নয়। রামের অভিনয়াতিশয্য তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে। লক্ষ্মণ নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটাতে ক্রমশই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছেন। স্বর্ণমৃগরূপী মারীচের পেছনে ধাওয়া করা নিতান্তই ছেলেমানুষী ছিল। অথচ কেন তা বুঝতে চান নি রামচন্দ্র, এ ঘটনাটিও প্রথম লক্ষ্মণকে বিস্মিত করে। কেনই বা সীতা লক্ষ্মণকে সরিয়ে দিয়েছেন আশ্রম থেকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, কেনই বা সে সময় কোনো দেবপ্রহরী দ্বারদেশে প্রহরারত ছিল না, সীতার অদর্শনে রাম অমন যাত্রাদলের রাজার মতো বিলাপ ও আস্ফালন ক'রে কেনই বা বৃথা কালক্ষেপ করছেন যখন সীতার অপহরণকারীর খোঁজ করাই একমাত্র কর্তব্য—কেন, কেন, কেন?—ইত্যাকার প্রশ্নে মনে মনে জর্জরিত লক্ষ্মণ বিহ্বল হয়েছেন। রাচন্দ্রের অভিনয় অধিককাল আর সহ্য করতে পারেন নি, মনের কথা প্রকাশ করে ফেলেছেন।

যাইহোক, বলছিলাম সীতাহরণের পর রামের বিলাপ নিছক অভিনয় বলেই মনে হয়েছে আমাদেরও। সীতার প্রেমে যে ইনি পাগল ছিলেন, তাঁর বিলাপোক্তিতে তেমন উন্মাদনার পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায় না। স্ত্রীসংসর্গ-বঞ্চিত হওয়ায় যে

[১] বা. রা / অরণ্য—৬৬ স / অনু: হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য / ভারবি।

রামচন্দ্র মনোকষ্ট ও দেহযাতনা ভোগ করছিলেন রামবিলাপে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

রামের বিলাপোক্তিতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে সীতা রাক্ষস জাতির দ্বারা আকাশপথে অপহৃত হয়েছেন। এটাই রামচন্দ্রের অনুমান। জানি না কোন্ বিশেষ মন্ত্রবলে রাম এমন একটি অনুমিতি খাড়া করেছিলেন। সন্দেহ হয়, সীতা অপহৃত হবেন এটা যেমন দেবতাদের মাধ্যমে রামচন্দ্র ও সীতা আগেই জেনেছিলেন, তেমনি সীতা-অপহরণের প্রত্যক্ষদর্শী দেবপ্রহরীরা সীতা কীভাবে অপহৃতা হয়েছেন সে তথ্যও লক্ষ্মণের অগোচরে রামকে জানিয়েছিলেন। সেজন্যই রাম বলেছেন, সীতার যে স্তনযুগল হরিচন্দন রাগে রঞ্জিত থাকত, অতঃপর তাই হয়ত রাক্ষস-নখদন্তের আঘাতে শোণিতলিপ্ত হয়েছে।

বেশ, ভালো কথা। তুমি যখন জেনেইছ সীতার কী ঘটেছে, তখন তালতমাল গিরিনদী ব্যাঘ্রমৃগী দেখে সীতার কথা জিজ্ঞেস করে শোকসাগর উদ্বেলিত না করে বরং ধাওয়া কর না কেন অপহরণকারীর পেছনে। কিন্তু তেমন উদ্যোগী হ'তে তো দেখা যাচ্ছে না রামকে। লক্ষ্মণ সেজন্য বিরক্ত হয়ে বলেছেন, মিথ্যা বাগাড়ম্বরে ফল কি ? সবসংহারের প্রতিজ্ঞা কেন ? আসল শত্রুর মোকাবিলা শুরু করুন না ! সেটাই তো বর্তমান কর্তব্য।

রামচন্দ্রের কালক্ষেপ করার একটাই কারণ থাকতে পারে, হয়ত পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে তখনও তিনি দেবশিবিরের কোনো নির্দেশ পান নি। নিজে তাঁর পক্ষে কিছুই তো করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি বনবাসে এসেছেন দেবতার নির্দেশে। কে তাঁর মিত্র কেই বা শত্রু, রাম তা নিজেই জানের না। জানেন না কোন্ পথে কোথায় তাঁকে অগ্রসর হ'তে হবে, কোথায়ই বা পথের শেষ। অতএব তাঁকে অপেক্ষায় থাকতে হয়। অসুবিধে হ'ত না যদি লক্ষ্মণের কাছে দেব-অভিসন্ধির কথা স্পষ্টত জানানো থাকত। কিন্তু বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন লক্ষ্মণকে বিশ্বাস করেন না দেবতা ও ব্রাহ্মণরা। সম্ভবত সেজন্যই লক্ষ্মণকে রামের অবর্তমানে অযোধ্যায় রাখা হয় নি। দেবসেনা পরিবৃত রামচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনেই লক্ষ্মণকে রাখা হয়েছে। লক্ষ্মণের সাহস ও বীরত্বের প্রতি দেবশিবিরের আস্থা আছে, কিন্তু লক্ষ্মণকে যে ইচ্ছেমত দেবদাস বানানো সম্ভব নয় এটাও তাঁরা জানতেন। সেজন্য যে কাজ ভরতকে দেওয়া যায় তা লক্ষ্মণকে দেওয়া হয় নি। রামের পরে লক্ষ্মণেরই ছিল অযোধ্যার সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকার। ধর্মাধর্মের ধোঁয়াশা সৃষ্টি ক'রে লক্ষ্মণের সিংহাসন লাভ সুদূরপরাহত ক'রে দিয়েছেন ব্রাহ্মণ নেতৃবর্গ। এখন রামচন্দ্রকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা ভিন্ন লক্ষ্মণের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। তিনি

দেবতাদের হাতে কার্যত বন্দী।

লক্ষ্মণের বিরক্তি লক্ষ্য করে রাম বুঝেছেন বিলাপের আতিশয্য প্রদর্শনের দ্বারা বুদ্ধিমান লক্ষ্মণকে আদৌ অভিভূত করা যায় নি, যাবেও না। তাই, এর পরেই, রামচন্দ্র উন্মাদের অভিনয় ত্যাগ ক'রে ক্রৌঞ্চারণ্যের দিকে সদলে যাত্রা করেছেন। পথে মিলেছে জটায়ুর সাক্ষাৎ। জটায়ুর ভগ্ন আকাশরথটি রাবণের সঙ্গে আকাশ-যুদ্ধের সাক্ষ্যস্বরূপ তখনও পড়ে ছিল। মুমূর্ষু জটায়ু সীতাহরণ বৃত্তান্ত বলেছেন।

জটায়ু যে মানুষ ছাড়া পাখী নয়, অতঃপর হয়ত পাঠক তা নিজেই বুঝবেন। জটায়ু মানুষ দেবতা অরুণের ঔরসে শ্যেনী বা মহাশ্বেতা নাম্নী মহিলার গর্ভজাত। তাঁর বড় ভায়ের নাম, সম্পাতি। ইনিও উত্তম বিমান চালক ছিলেন।

জটায়ুকে যথোচিত সৎকার ক'রে রামচন্দ্র গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। অরণ্য প্রদেশটি ক্রৌঞ্চারণ্য নামে খ্যাত। ক্রৌঞ্চারণ্য থেকে পূর্বে ক্রোশ তিনেক গেলেই মতঙ্গ মুনির আশ্রম। আশ্রমটিকে "ভীষণ" বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। এই বিশেষণের একটিই অর্থ হতে পারে : মতঙ্গের ঘাঁটি ছিল বেশ শক্ত ও সুরক্ষিত।

রামচন্দ্রকে অবশ্য গন্তব্যস্থল পর্যন্ত হাঁটাপথে যেতে হয় নি। এক বিকটাকার চলমান বস্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে বিরাধ রাক্ষসের মতোই খেলাচ্ছলে রামবাহিনীকে ভীতি প্রদর্শন করে লক্ষ্মণকে তার যান্ত্রিক হাতে তুলে নিয়ে ভয় দেখায়। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বলেন এবং নিজে প্রস্তুত হন আত্মোৎসর্গের জন্য।

কিন্তু এই সময় হঠাৎ দেখলাম রামচন্দ্র দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণকে বললেন, "বীর! অকারণ ভীত হইও না।" বিস্মিত হলাম রামের এহেন সাহসে। বিপদে রাম যদি বা হতাশ হয়ে পড়েন, লক্ষ্মণকে কখনো ধৈর্যচ্যুত হ'তে দেখি না। তবে এক্ষেত্রে এমন বৈপরীত্যের কারণ কী?

বিরাধ-রাক্ষস-পর্বেও দেখেছি, লক্ষ্মণ যখন বিরাধকে আক্রমণে উদ্যত, রাম তখন তাকে নিবারণ ক'রে বলেছেন, ব্যস্ত হয়ো না, এই রাক্ষস আমাদের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, তবে কি রাম আগেই জানতেন যে বিশেষ এক নির্মোকের আড়ালে কোনো দেবপ্রহরী তাঁদের পথপ্রদর্শন করার জন্য বনপথে অপেক্ষা করছে। সেই প্রহরীর চেহারা কেমন, সম্ভবত তাও তাঁর জানা ছিল। সেজন্য দিব্যি নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলেছেন, বাধা দিও না, এই রাক্ষস আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। এক্ষেত্রেও রাম ভয় পান নি।

কবন্ধের রূপ বর্ণনা করে কবি লিখেছেন, বস্তুটির "বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমাত্র চক্ষু।" ঐ চক্ষুটি আবার "অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে।" বস্তুটি দিব্বি এগিয়ে আসছে এবং দুটি যান্ত্রিক বাহু প্রসারিত করে রাম লক্ষ্মণকে ধরার চেষ্টা করছে। এই বস্তুটিকে কবি তৎক্ষণাৎ রাক্ষস নামে এক কিম্ভূত প্রাণী বানিয়ে দিলেন। দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা করলে তাকে তো আর মানুষ বলা যায় না, তাই পুরাণকাররা দেবশত্রুদের মনুষ্যেতর জানওয়ার বলে সর্বদাই উল্লেখ করে গেছেন। বিরাধকেও প্রাথমিক পরিচয়ে রাক্ষস বলা হয়েছিল, পরে বলা হ'ল স্বর্গ (হিমালয়) চ্যুত দেবতা। কবন্ধও তাই।

রামচন্দ্র কবন্ধের আসল পরিচয় আগেই জানতেন। দেবতাদের সংবাদবাহকই নিশ্চয় তাঁকে সেকথা জানিয়ে গেছে। আমরা তো দেখেছি, রাম এক একটি দেবঘাঁটিতে উপস্থিত হওয়ার আগে রামের আগমনের সংবাদ সেখানে পৌঁছে গেছে। দেখেছি, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র রামের আগে পরবর্তী দেবঘাঁটিতে গিয়ে দুর্গ-রক্ষকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছেন এবং রাম লক্ষ্মণকে দেখে চুপিসাড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং যদি অনুমান করা হয় যে রাম গোপন সংবাদ পেয়েই অগ্রসর হতেন, তবে সে অনুমানও বে-ঠিক হবে না। রাম যতক্ষণ নির্দেশ পান নি ততক্ষণ সীতার জন্য বিলাপ করে কালক্ষয় করেছিলেন। নেপথ্যের নির্দেশ পাওয়ামাত্র আবার অগ্রসর হয়েছেন এবং সেজন্যই অদৃষ্টপূর্ব কবন্ধরূপী যন্ত্রটিকে দেখেও কিছুমাত্র বিস্মিত হন নি।

কবন্ধ যে রাক্ষসজাতীয় জীব নয় তা তার স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট। সে বলেছে, "লক্ষ্মণ! আমি শ্রী নামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। এক্ষণে তোমরা আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে ঘটিয়াছে।" "ইন্দ্রই আমার যোজন প্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তীক্ষ্ণদর্শন মুখ সংযোজিত করিয়াছিলেন।"

দনু ইন্দ্র-নির্মিত বা ইন্দ্র-প্রদত্ত সেই যান্ত্রিক খোলসের মধ্যে বসে যন্ত্রটিকে চালনা করছে। যন্ত্র চলছে রেল ইঞ্জিনের মতো অগ্নিধুমে। তাই যন্ত্রের পেটের কাছে 'অগ্নিশিখার ন্যায়' চক্ষু 'জ্বলিতেছিল'। সাঁজোয়া গাড়ির মুণ্ড থাকে না। সে গাড়ি কবন্ধই হয়। এবং তার বক্ষপট ও দেহ বিস্তৃত থাকে, কারণ সেই খোলের মধ্যে চালকের আসন থাকে। এই যন্ত্রের দুই দিকে ক্রেণের মতো দুটি প্রলম্ব বাহু ছিল যা আক্রমণ করতে পারত এবং আক্রান্ত হলে সেই নলের সাহায্যে শত্রুপক্ষের প্রতি বিস্ফোরক বস্তুও নিক্ষেপ করতে পারত।

কবন্ধ বিরাধযানের মতোই আর একটি যানবিশেষ।

কবন্ধ 'ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ' করে রাম লক্ষ্মণকে স্বাগত জানিয়েছিল। এরপর কবন্ধ নামক যন্ত্রটিকে রামবাহিনী নষ্ট করে ফেলেছেন এবং কবন্ধ-চালক দনুর নির্দেশে সেটিকে কবর দিয়ে [সম্ভবত শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে রাখার জন্য] নিশ্চিন্ত হয়েছেন। দনুর ডিউটি শেষ। সে তার আকাশরথে আরোহণ করে হিমালয়ে চলে গেল। যাবার আগে রামকে জানালো, অতঃপর তোমার কার্যসিদ্ধির উপায় হ'ল, "কোনো বিপন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর"। এটি দেবশিবিরের সাধারণ রাজনৈতিক চাল। দেবতারা বিপন্ন রাজ্যচ্যুত লোক খুঁজে তাকে দলে টানতেন। শত্রুপক্ষে এভাবেই তারা বিশ্বাসঘাতক তৈরী ক'রে শত্রুর ঘর ভাঙতেন।

রামকে কী বলতে হবে তাও ইন্দ্র দনুকে শিখিয়ে গেছেন বলেই দনু বলল, "সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরাজার ক্ষেত্রজ ও সূর্যের ঔরস পুত্র" অর্থাৎ বানর জাতির বংশধর মনুষ্য পুত্র [মানুষ মার্তণ্ডমুনিই যে সূর্য খেতাব লাভ করেন এ তথ্য সংগ্রহ করে আমি 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি]। দনু আরও সংবাদ দিল, "ইন্দ্রতনয় বালী উঁহার ভ্রাতা।" ঐ বালী···তাঁহাকে (সুগ্রীবকে) দূরীভূত করিয়াছেন।···এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্তী ঋষ্যমূক পর্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন।··· সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় হইবেন।···তুমি আজ সত্বর এই স্থান হইতে যাও।···বালীর সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা।"

বোঝা যায়, দেবতারা ইতিমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজনৈতিক কুটিলাবর্তের খবর রেখেছেন। বিতাড়িত সুগ্রীবের সঙ্গে তাদের মৈত্রীচুক্তিও হয়ে গেছে। সুগ্রীবকে সামনে রেখে এখন বালীর রাজ্যটি হস্তগত করে স্থানীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে তারা লঙ্কা অভিযানে প্রস্তুত। সমস্ত ব্যাপারই আগেভাগে তৈরী।

বালীনিধনপর্ব

দনু ওরফে কবন্ধ-নির্দেশিত পথে রাম লক্ষ্মণ যাত্রা করলেন। অপূর্ব শোভাময়ী পার্বত্য প্রদেশ।

ঋষ্যমূক থেকে বঙ্কিম বিভঙ্গে খরস্রোতা পম্পানদী ঝরঝর ধারায় নেমে এসে মিলিত হচ্ছে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে। দৃশ্যটি বিরহী রামের মন জানকীর স্মৃতিতে আচ্ছন্ন

করেছে। শুরু করেছেন তিনি কামবেপথু বিলাপ। বলছেন, হে লক্ষ্মণ! "আমি কামার্ত।...সীতা ব্যতীত বাস করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন।...এক্ষণে যদি আমি পম্পাতটে তাঁহার [সীতার] সহবাসে কালক্ষেপ করি তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাই না।" শুনে বিরক্ত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠকে তিরস্কার ক'রে বলেন, "আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পরিত্যাগ করুন।" [বা.রা./ কিষ্কিন্ধ্যা ১স]

ভগবান রামচন্দ্রের কামুকতায় লক্ষ্মণ বিরক্ত। আর আমরা তাঁর স্বার্থপরতায় চমৎকৃত। দেখ, স্বার্থপর রাম আপন কামুকতায় এমনই বিভোর যে, ভুলে যান অনুজ লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা। রাম তবু অরণ্যপথে জানকীর সঙ্গে বহু দিবস-রজনী সম্ভোগের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ? তাঁর স্ত্রীসংসর্গবঞ্চিত দীর্ঘ আরণ্যক জীবনের দুঃখ রামচন্দ্রকে কি একবারও স্পর্শমাত্র করে না? এমন স্বার্থপর কামুককে জগদীশ্বর জ্ঞানে পূজা প্রণাম করা কি সহজ ব্যাপার? যাঁরা রাম ও রাম-রাজত্বের প্রশংসা ক'রে রামধুন গেয়ে আসছেন, তাঁরা বোধহয় রামকীর্তি প্রকৃত রামায়ণ পাঠ করে কোনদিন সেসব তথ্য জানার চেষ্টা করেন নি। শুনেছেন রামকথা মতলবী কথকমুখে। দেখেছেন তা যাত্রা, পালা, চলচ্চিত্র, টি. ভি. সিরিয়ালে। তাই স্বার্থপর কামুক রামচন্দ্রের কীর্তিকলাপ তাঁদের বিরক্ত করে না।

রামচন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে সরযূ নদীতে প্রাণবিসর্জন দিয়ে মুক্তি লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি 'মরিয়া বাঁচিয়াছেন', কারণ কোনো রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণরা কার্যসিদ্ধির পর অযোধ্যা ছারখার করে দেন যদুবংশ ধ্বংসের পূর্ব নজির তৈরী ক'রে। বাল্মীকির বিবরণে তাই লেখা হয়েছে, "অযোধ্যা পুরী বহু বৎসর জনশূন্য ছিল"।[১]

ভগবান রামচন্দ্র ভগবান কৃষ্ণের মতোই পারেন নি তাঁর স্বজাতি রক্ষা করতে। আর্য তপস্বীর যাদুদণ্ড যখন দেখা দিয়েছিল রাজদণ্ড রূপে, তখন সংশোধনের আর সময় ছিল না। ইতিহাসের এই পাঠ বাসুদেব কৃষ্ণ ও বিদুর-যুধিষ্ঠিরকে লোভ সম্বরণ করতে শিক্ষা দিলে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ স্বজনবাসী হত্যা ক'রে তাঁরা পুনরায় একটি রামায়ণিক ভুল করতেন না। দুঃখের বিষয়, ক্ষণিক লাভালাভের জঘন্য লালসায় ভারতবাসী যুগে যুগে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ক'রে এসেছে। প্রায়শ্চিত্তের তাই আর শেষ নেই। কালে কালে ভারতবর্ষে কত অযোধ্যা ছারখার হ'লো,

১ বা. রা. / উত্তরকাণ্ড, একাদশাধিকশততম সর্গ / ভারবি।

কত যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল ও যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে কে তার হিসেব রাখে!

লক্ষ্মণের তিরস্কারে অবশ্য কিছুটা কাজ হয়েছিল। রামচন্দ্র উত্তরীয়ের খুঁটে তাঁর পদ্মপলাশ নেত্রদ্বয় মার্জনা ক'রে ঋষ্যমূক পর্বতসন্ধানে সদলবলে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

এই পর্বতে তখন তাঁর অনুগত সেনাদল নিয়ে অজ্ঞাতবাস করছিলেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর ভাই সুগ্রীব। হনুমানকে করেছিলেন মহামন্ত্রী। যদি বালীকে হত্যা করে কখনো কিষ্কিন্ধ্যার রাজত্বটি তাঁর হস্তগত হয়, তবে মহামন্ত্রীর আসনে হনুমানকেই বসাবেন সুগ্রীব। এজন্য হনুমান তাঁকে আগলে রাখেন। বালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে হনুমান সুগ্রীবের প্রধান সহায়।

রাম লক্ষ্মণ সদলবলে ঋষ্যমূক পর্বতে আরোহণ করছেন, দূতমুখে এই খবর পেয়ে সুগ্রীব তাঁর সভাসদ্‌বর্গকে নিয়ে জরুরী বৈঠকে বসলেন। সুগ্রীব অথবা তাঁর রক্ষী ও অনুচররা রাম লক্ষ্মণকে পাহাড়ে উঠে আসতে দেখে ভাবলেন, হয়ত বা কিষ্কিন্ধ্যা-পতি মহারাজ বালী দেশত্যাগী সুগ্রীববাহিনীর খবর পেয়ে সেনাসামন্ত পাঠিয়েছেন বিশ্বাসঘাতকদের নিহত অথবা বন্দী ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সুগ্রীব ছিলেন দক্ষ সেনাদলে সুরক্ষিত। তাই শুধু রামলক্ষ্মণকে আসতে দেখলে তাঁর এবং তাঁর রক্ষীবাহিনীর মনে ত্রাস সঞ্চারের কোনো কারণ দেখা দিত না। ঋষ্যমূক পর্বতে স্থানীয়রা বত কেউই তো উঠছে নামছে। সামান্য দুই ব্যক্তির আগমনে মিটিং করবেন কেন রাজপুত্র? সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, রাম অরক্ষিত ভাবে আসেন নি। সঙ্গে ছিল তাঁরও উল্লেখযোগ্য রক্ষীবাহিনী। ইতিপূর্বে ভরত যখন সসৈন্যে রামদর্শনে যান, তখনও লক্ষ্মণের আস্ফালন বিচার ক'রে রামরক্ষীবাহিনীর অস্তিত্বের কথা বলছি। আমাদের সন্দেহ নিশ্চয় অমূলক ছিল না। রামচন্দ্রের অলৌকিক ভাবমূর্তি গড়ার মানসে সর্বত্রই রামায়ণকার রামসেনার অস্তিত্ব গোপন ক'রে গেছেন। এখানেও প্রকৃত ঘটনা গায়েব করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাল্মীকির এই প্রয়াস তকাকীত মনে হয় না। বাল্মীকি বলছেন, "...সুগ্রীব...রাম ও লক্ষ্মণকে [দূর থেকে] দর্শন করিলেন এবং ত্রাসান্বিত ...হইলেন।...তদীয় অমাত্যগণ...রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বালিপ্রেরিত বোধ করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।" তাঁরা রাম-লক্ষ্মণকে "উত্তমাস্ত্রধারী"রূপেই দেখেছিলেন। বনচারী সন্ন্যাসী রূপে রামলক্ষ্মণ অরণ্যে বিচরণ করছিলেন না।[২]

২। বঙ্গবাসী সং, ১৩০৮ / ১ম-৩য় সর্গ

যাইহোক, অনেক যুক্তি-ভাবনার পর হনুমান "বানররূপ' অর্থাৎ লাঙ্গুলশোভা সংযুক্ত পোশাক পরিহার ক'রে তাপসের বেশে রামলক্ষ্মণের অভিপ্রায় জানার জন্য একাকী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে রামলক্ষ্মণের পরিচয় জানতে চাইলেন। রাম চমৎকৃত হলেন হনুমানের সুসংস্কৃত সম্ভাষণে। লক্ষ্মণকে বললেন, এই মহাত্মাকে ঋগ্-যজু-সামবেদজ্ঞ এবং ব্যাকরণ সহ বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব'লে মনে হচ্ছে। হনুমানও খুশি হলেন দাশরথিদ্বয়ের সাক্ষাতে। উভয়পক্ষ পরস্পরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অগ্নিপ্রদক্ষিণ ক'রে একটি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করলেন। শর্ত হলো, সীতার অন্বেষণে এবং রাবণবধে সুগ্রীব সসৈন্যে রামকে সাহায্য করবেন। রাম বালী বধ করে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিষ্কিন্ধায় সুগ্রীব প্রতিষ্ঠিত হ'লে দক্ষিণদেশ যখন দেবানুগত শক্তিতে পরিণত হবে তখন লঙ্কা বিজয়ে সৈন্যসামন্ত সহ কিষ্কিন্ধ্যার বিভিন্ন সাহায্য পাবেন রাম।

রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সেনাবাহিনী ঋষ্যমূক পর্বত থেকে কিষ্কিন্ধ্যার পথে যাত্রা করলো। আধুনিক মহীশূরের উত্তরে পম্পা নদীর কাছে ছিল বালীর সমৃদ্ধশালী রাজত্ব। কিষ্কিন্ধ্যার বর্ণনা ক'রে সুগ্রীব বলেছেন, বালীনগরী কিষ্কিন্ধ্যা ছিল "স্বর্ণখচিত, যন্ত্রপূর্ণ বানরসঙ্কুল ও ধ্বজশোভিত।"

বানর জাতি যে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার জানতেন এই পরিচিতি তারই সাক্ষ্য। নগরী ছিল স্বর্ণশোভিত এবং বানররা যন্ত্রের বহুল ব্যবহারে ছিলেন পারদর্শী। সমুদ্রবন্ধন করতে রামসহায়ক বানরসেনারা যন্ত্রের ব্যবহার করেন এবং তাঁরাই কুম্ভকর্ণ নামক যন্ত্রমানবটিকে ধ্বংস করেন।

প্রথম যুদ্ধে বালীর কাছে পরাস্ত হয়ে সুগ্রীব পালিয়ে যান। ইচ্ছে করলে বালী তাঁকে তখনই বধ করতে পারতেন, কিন্তু কনিষ্ঠকে করুণা প্রদর্শন ক'রে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন। দ্বিতীয়বার বালী-সুগ্রীব-যুদ্ধের সময় অরণ্যের আড়াল থেকে শস্ত্রাঘাত করে বালীকে ধরাশায়ী করেন রামচন্দ্র। রাম যে অন্যায় যুদ্ধে এভাবে আক্রমণ করতে পারেন, অনার্য বালী আপন পূর্বপুরুষের নীতিবোধ দিয়ে বিচার করে তা কখনই বিশ্বাস করেন নি। অনার্য অথবা না-আর্য জাতির মধ্যে যদি নীতিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি না থাকত তবে বহু সম্মুখ যুদ্ধেই নীতিহীন দেবতারা পরাস্ত হতেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণরা ছলে বলে কৌশলে ভূমি গ্রাসের নীতি গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁদের ধর্মীয় ব্যাখ্যাটিও চমৎকার, তাঁরা বলেন, দেবতার স্বার্থে যে কোনো চরম গর্হিত কাজও ধর্ম। দেবস্বার্থ রক্ষার্থে

কোনো অন্যায়ই অধর্ম নয়।

সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে বালীপ্রিয়া সুন্দরী তারা স্বামীকে প্রচ্ছন্ন বিপদের কথা জানিয়ে বলেন, পুত্র অঙ্গদের কাছে তিনি শুনেছেন, সুগ্রীব ইন্দ্ররক্ষিত রামচন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ক'রে বালীর রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছেন। রাম সুগ্রীবকে সাহায্য করবেন। সুতরাং যুদ্ধে রামলক্ষ্মণেরও মোকাবিলা করতে হবে বালীকে। যার মানে যুদ্ধটি হবে প্রকৃতপক্ষে একটি দেবাসুর যুদ্ধ। বালীর উচিত যুদ্ধ না করে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা। কিন্তু তারার নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত না করে বালী বলেছিলেন, "রাম ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। পাপকর্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে ?" রামের পক্ষে কোনো অঘোষিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয় বলেই বালীর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস।

বানরাধিপতির সেই বিশ্বাসের কোনো মূল্যই দিলেন না রামচন্দ্র। সম্মুখযুদ্ধে সুগ্রীবকে এগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে প্রচ্ছন্নভাবে বালীকে আঘাত করলেন তিনি। সেকালে এধরনের যুদ্ধ ছিল কাপুরুষতারই নামান্তর। অবশ্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রই যেখানে এই ধরনের কাপুরুষতাপূর্ণ যুদ্ধেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জয়লাভ ক'রে আর্য উপনিবেশের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন, ইন্দ্রদাস উপেন্দ্র রাম সেখানে বিশেষ কোনো অপরাধ করেন নি। কৃষ্ণের শিশুপালবধ, পাণ্ডবদের জরাসন্ধ কাচক দুর্যোধন নিধন প্রভৃতি অধর্মীয় বা অন্যায় যুদ্ধ। আর্য পুরাণে সেই অন্যায় যোদ্ধাদেরই জয় জয় রব করা হয়েছে। বিজয়ী পক্ষের দ্বারা ইতিহাসের বিকৃতি এ ভাবে আগেও ঘটছে, আজও ঘটছে।

বালীর কাছে দ্বিতীয়বার সুগ্রীবের পরাজয় আসন্ন দেখে সুগ্রীবের ইঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন রাম বালীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন।

বাল্মীকি স্বয়ং এই ঘটনার বর্ণনা করতে ব'সে অকপট প্রশংসা করার সুযোগ না পেলেও বালীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে লিখেছেন, "স্বর্ণালঙ্কারশোভিত বালী দেহ প্রসারণ পূর্বক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে কিষ্কিন্ধ্যা শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। ...ঐ সময় তিনি নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত; যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ...বালী ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহু মানপূর্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।"

বালীর ব্যক্তিত্বের কাছে অন্যায়কারী রামলক্ষ্মণ যে কত ক্ষুদ্র কত নগণ্য কবি তা স্পষ্টত না বলে কেবলমাত্র দশরথতনয়দের দীন তস্করোপম হাবভাব চিত্রিত ক'রে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফলে বালী চরিত্রের মহিমাও পূর্ণ প্রকটিত হয়েছে। রামকে দেখে বালী যা বলেছিলেন কবি তারও উদ্ধৃতি দিয়ে পরোক্ষে বালীর সঙ্গত বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

মুমূর্ষু বালী বললেন, "রাম!···আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল?···আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না, কিন্তু বুঝিলাম, তুমি অতি দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী ও অধার্মিক। তুমি ধর্মের আবরণ ধারণ পূর্বক তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দুরাচার ও পাপিষ্ঠ, কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ।···আমি তোমার কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না।···আমি একান্তই নির্দোষ।···যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে, তবে অদ্যই আমার হস্তে তোমায় মৃত্যুমুখ দেখিতে হইত। ···তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূর্বে জানকীর আনয়নার্থ আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম।"

রাম যদি প্রকৃত সত্য ও নীতি-পরায়ণ পুরুষ হ'তেন তবে বালীর তিরস্কারে তাঁকে আমরা লজ্জায় নতশির এবং অনুতাপে দগ্ধ হ'তে দেখতাম। কিন্তু ভগবান রামচন্দ্রের শিক্ষা ভূমিগ্রাসী শোষক ব্রাহ্মণনেতা ও দেবতাদের কাছে, তাই কৃত অপরাধেরও ইনি একটি অদ্ভুত ধর্মসঙ্গত ব্যাখ্যা হাজির করলেন যা আজও জগজ্জনের প্রশংসা অর্জন করতে পারে নি। বালীবধের কলঙ্ক অবতার রামচন্দ্রের অঙ্গ থেকে কোনো পুরাণকারই মুছে দিতে পারেন নি।

রাম বললেন, "এই শৈলকাননপূর্ণ ভূভাগ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগপক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ডপুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে···রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।···সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা ···আমরা স্বধর্মনিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তোমা হইতে রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।"

রামচন্দ্রের বক্তৃতা ও বাতুলের প্রলাপে কোনো প্রভেদ নেই। কিষ্কিন্ধ্যা কবে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের অধিকৃত রাজা হ'ল. কি ভাবেই বা ভরত হয়ে গেলেন পৃথ্বীশ্বর,

তা রাম এবং তাঁর প্রভু দেবতারাই জানেন। রামায়ণ পাঠকরা ইক্ষ্বাকুদের কোশলরাজ বলেই শুনে এসেছেন। কিন্তু কোন্ কোশল? কাশীর উত্তরে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সরযূ নদী সন্নিহিত সমগ্র অঞ্চলটিই কি ছিল ইক্ষ্বাকুদের রাজত্ব? না। ঐ একরত্তি ভূমিও ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর কোশল কৌশল্যার পিতৃরাজ্য, দক্ষিণ কোশল দশরথের, মাঝে সরযূ। ইক্ষ্বাকুর পিতা মনু নির্মাণ করেন অযোধ্যা নগরী। অযোধ্যা দক্ষিণ কোশলের রাজধানী। আয়তন, দৈর্ঘ্যে আটচল্লিশ ও প্রস্থে আট ক্রোশ মাত্র। সেকালে অযোধ্যা বিশেষভাবে সুরক্ষিত নগরী। চারিদিকে প্রাচীর, পরিখা এবং দুর্গের দ্বারা বেষ্টিত। সুরক্ষিত, নাম তাই, অযোধ্যা। প্রবাদ, অযোধ্যার 'জনম স্থান' অঞ্চলটিই রামচন্দ্রের জন্মভূমি। এখানের 'ত্রেতাক ঠাকুর' নামক অঞ্চলে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

এমন একমুঠো এক রাজত্বের অধীশ্বর রামচন্দ্র যখন ভরতের নামে নিজেকে পৃথ্বীপতি ব'লে ঘোষণা করলেন তখন বিস্মিত হলাম। সর্বনাশ, ভগবান কি ভুল বলতে পারেন? অসম্ভব। রামচন্দ্র দুর্গপ্রাকার-বেষ্টিত কোশলরাজ্যটিকেই হয়ত বা পৃথিবী বলে জানতেন, অতঃপর ভারতপথিক রামচন্দ্র বহু দেশ নদনদী ও অরণ্য পর্বত পরিক্রমা এবং দর্শন ক'রে পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমাকে উত্তর-দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা পর্যন্ত বিস্তারিত বুঝেছিলেন। তবে কিষ্কিন্ধ্যা তখনও রামচন্দ্রের দখলে আসে নি। অন্যায় যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালী তখন মৃত্যু-শয্যায়। অথচ রাম বললেন, কিষ্কিন্ধ্যা ইক্ষ্বাকুদের রাজ্য এবং তাই এখানের মানুষ-জানোয়ারের ধনপ্রাণ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি তিনি যেমন খুশি তেমনি দণ্ড পুরস্কারের বিধান দিতে পারেন। এরকমটাই দেবতা এবং তাঁদের ধ্বজাধারীদের অদ্ভুত বিধান ছিল। তাঁরা যুক্তি তর্কের ধার ধারতেন না।

রামচন্দ্র এমনই এক স্বেচ্ছাচারী ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীকে। রাম বললেন, "আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন-বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি এবং তজ্জন্য শোকও করি না।...রাজা, দেবতা মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ।"

রাম দোষী কি নির্দোষ সে বিচার জগজ্জনে করবেন। আমরা রামের কুলধর্মের স্বরূপ বুঝলাম। বুঝলেন মুমূর্ষ বালীও, যাঁকে রামচন্দ্র 'বীর' অভিধায় সম্বোধন ক'রেও বলেছেন, "তুমি শাখামৃগ—বানর, যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি

তোমাকে বধ করিয়াছি।" চমৎকার যুক্তি। রামচন্দ্রের অদ্ভুত যুক্তিহীন বক্তব্য শুনে বালী বুঝলেন, এ মানুষের সঙ্গে তর্ক বৃথা। ইনি নিজের যুক্তিকেই সত্য এবং ধর্ম বলে জানেন, এঁর কাছে সত্য ও ধর্মের অপর ব্যাখ্যা ও যুক্তি অসার। বিচক্ষণ বালী তাই নিজের কথা প্রত্যাহার করে নিলেন পুত্র অঙ্গদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বললেন, "রাম! তুমিই উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া (অর্থাৎ পরাজিত হইয়া) কিরূপে তোমার কথার প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদবশতঃ তোমায় যে-সমস্ত অসঙ্গতি ও অপ্রিয় কহিয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই" (অর্থাৎ সে দোষ ক্ষমা কর!)।

কেন তিনি এইভাবে আত্মসমর্পণ করলেন? অতঃপর সে কথাই শুনলাম মৃত্যু-পথযাত্রী অসহায় বালীর মুখে। বললেন, "রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, তারার নিমিত্তও শোকাকুল হই নাই এবং বান্ধবগণের জন্যও কিছুমাত্র ভাবি না। এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদশোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে।··· সে বালক, আজও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই···এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

এক মহাপ্রাণ অনার্য বীর পুরুষের করুণ জীবনট্র্যাজেডির অপূর্ব লেখচিত্র পেলাম আমরা। কেবলমাত্র সৎ-ভাবনা, বিশ্বাস এবং ন্যায়যুদ্ধের বলি হলেন কিষ্কিন্ধ্যাপতি, আর্য পুরাণে যাঁকে শাখামৃগ রূপে ব্যঙ্গ করলেন এমন এক মনুষ্য যার সৎসাহস হয় নি বালীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার এবং যে মানুষ ছিলেন দেবজাতির শক্তিতেই বলীয়ান, নিজস্ব বিক্রমে নয়।

বালী বললেন, "তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাহার অবমাননা না করে।" মৃত্যুকালে সুগ্রীব-ভীতিও গ্রাস করেছিল বালীকে।

রাম মুখে যাই বলুন, মনে মনে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। রাম-চরিত্রে যে ন্যায়বান মানুষটির মাঝে-মধ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে, তিনি খাঁটি ভারতীয় নীতিধর্মের ন্যায়ান্যায় বোধ জন্মাবধি অর্জন করেছিলেন। দেবতা ও স্বার্থলোলুপ ব্রাহ্মণদের শিক্ষা সেই ক্ষত্রিয় নীতিবোধকে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দেয় নি। এখানে দশরথপুত্র ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রকে তাই বলতে শুনি, "অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে আমার নিকট তদ্রূপই হইবে এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখনো অনাদর করিবেন না।" রামের আশ্বাসবাক্য শুনে বালী সকৃতজ্ঞভাবে রামের প্রতি কটূক্তি (উচিত কথা) করার জন্য ক্ষমা চাইলেন।

ওদিকে কপটযুদ্ধে পরাস্ত বালীর সংবাদ পেয়ে তারা প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে ঘটনাস্থলে আসছিলেন। পথে বানরসেনাদের পশ্চাদপসরণ করতে দেখে তিরস্কার করলেন। বালীর অনুগত সেনারা বললেন, "রাজমহিষি! আমাদের বোধ হয়, এ স্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হনুমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে।...উহারা অত্যন্ত লুব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।"

বানরজাতি বালীকে ভালোবাসতেন। সুগ্রীব হনুমান প্রমুখ কিছু ক্ষমতালোভী মন্ত্রী সান্ত্রী নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ত্যাগ ক'রে পলায়ন করেন। সুগ্রীব-সহচরেরা বানর জাতির চক্ষে বিষয়লুব্ধ রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। এই 'মহাত্মারা' (যেমন পাণ্ডবরা) স্বজাতির চোখে মোটেও আদর্শ পুরুষ ছিলেন না। হবেনই বা কেন? রাজলোভে যাঁরা পরদেশীকে প্রভু বানিয়ে স্বজাতিকে দাসে পরিণত করে, তাদের স্বদেশে আপন সমকালে কেউ কি আদরণীয় ব'লে গণ্য করবেন? পাণ্ডবদের এবং কৃষ্ণকে অশ্রদ্ধা করেন এমন কর্ণ-দুর্যোধন-পূজক জাতি এখনও বর্তমান আছেন উত্তরকাশী এবং হিমালয়বাহিনী তমসা নদীর তটভূমি গাড়ওয়াল হিমালয়ে[২]। কর্ণ দুর্যোধনের অনুরাগীরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বিতাড়িত হয়ে যমদ্বার হিমালয়ের পথে (হর-কি-দুন অঞ্চলে) সম্ভবত পালিয়ে যান। তাঁরা কর্ণ দুর্যোধনের বিভিন্ন মন্দির গড়ে তাঁদেরই দেবতা বানিয়ে তাঁদের মূর্তি আজও ভক্তিভরে পুজো ক'রে যাচ্ছেন। কংস হত্যার নেপথ্য ষড়যন্ত্রের কাহিনীটি ঐ আদ্য পুরাণ থেকে উদ্ধার ক'রে উপন্যাস আকারে (সঙ্গে পৌরাণিক প্রাসঙ্গিক তথ্যশ্লোকের উদ্ধৃতি এবং একটি প্রবন্ধ সহ) পরিবেশন করেছি উৎসুক পাঠকজনের জ্ঞাতার্থে।[৩] এখানে বলি, রুদ্র প্রয়াগের পথে পার্বত্য শ্রীনগর। সেখানে অলকানন্দা-মন্দাকিনী এই দুই হিমকন্যা উচ্ছলা নদীর মিলিত ধারার কোল ঘেঁষে আজও বর্তমান আছে কংস রাজার মন্দির। সেখানে কংসকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁদের প্রিয় রাজপুরুষকে এভাবেই দেবতা বানিয়ে পুজো করেছেন এককালে। ধর্ম, অবতার ও ধর্মগ্রন্থ এক এক মনুষ্য-গোষ্ঠীর দ্বারা তদীয় স্বার্থসাধক যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্র সকল জাগতিক দোষের ঊর্ধ্বে, আর্য ভাববাদী এই আপ্তবাক্যে বিশ্বস্ত থাকতেই হবে, এমন ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে থাকার মধ্যে তাই কোনও যুক্তি

২। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির', নাথ পাবলিশিং ২য় সং দ্রঃ।

৩। লেখকের 'যদুবংশ, ব্রজপর্ব', নাথ পাবলিশিং দ্রঃ।

নেই। শাস্ত্রকাররাই বলেছেন, 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিনির্ণয়। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।' অন্ধভাবে যুক্তিহীন ধর্মপালনে ধর্মেরই হানি হয়।

"চন্দ্রাননা তারা …মাতঙ্গতুল্য বালীকে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন", বললেন, "ভীমবিক্রম বীর!…দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধনরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার ও সুখী। …জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের (সুগ্রীব) নিকট ইনি কিরূপ অবস্থায় থাকিবেন।" অতঃপর দুঃখে ক্ষোভে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে সর্বসমক্ষে সুন্দরী তারা বললেন, "তোমাকে বধ করিয়া রামের একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব, তোমার কামনা পূর্ণ হোক। তুমি রুমাকে পাইবে।…এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সর্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী আছেন, তুমি ইহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।"

"তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপবাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দিকে বেষ্টনপূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিল।"

উপরোক্ত সুভাষণ দাতা রাজা এবং সুভাষিণী রাণীরা বানর বানরীই বটে; কোনো আর্য ব্রাহ্মণদের মুখে কিন্তু এমন সুনম্র অথচ ব্যঙ্গবিদ্ধ ভাষণ শোনা যায় না। তাদের স্ত্রী পুরুষেরা যৌনইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল ভাষণেই অভ্যস্ত। তাঁরা নারীর বর্ণনা নিতম্ব এবং স্তনের প্রকাশ্য প্রশংসা ছাড়া করতে পারেন না এবং প্রকাশ্যেই তাঁদের নরনারীরা পরস্পরের কাছে নির্লজ্জভাবে রতিসুখ প্রার্থনা করেন। তাঁরা প্রায়শই রূঢ়ভাষী। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিবিধ প্রসঙ্গে আর্য পুরাণগুলি স্ফীত কলেবর। তাঁরা এককালে ভারতবর্ষব্যাপী এক অরাজক রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, যা বীভৎস ফ্যাসী নৃশংসতা থেকে কিছুমাত্র কম ভয়াবহ ছিল না। বিজিত জাতির প্রতি তাঁরা যে ব্যবহার করেছেন, কোনো অ-আর্য নরপতিকে কখনো কোনো পরাজিত জাতির প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে শোনা যায় নি। সে বিবরণ আর্য ভাববাদী ইতিহাসকারগণও রেখে যাওয়ার সুযোগ পান নি।

বানরপ্রধান বিদ্বান বেদজ্ঞ হনুমান বললেন, "রাজমহিষি! এই বীর (বালী) নীতিনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে রাজকার্য করিয়াছেন এবং সাম দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন।...এক্ষণে সুগ্রীব অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ইহাদিগকে (কপিগণকে) নিয়োগ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন করুন।...তারা! তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর। ইহাকে রাজসিংহাসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই সুখী হইবে।"

প্রত্যুত্তরে তারা বললেন, "আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না, এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। কপিরাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভুতা আছে, সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে ইহারই অধিকার।"

বস্তুত চমৎকার এই তারা চরিত্র। অপূর্ব তার ব্যক্তিত্ব। অননুকরণীয় তাঁর দৃঢ়চিত্ততা এবং ভাষণপ্রদানের ক্ষমতা। একই বাক্যে পারিবারিক সংস্কার, রাজধর্ম এবং বিভীষণ সুগ্রীবের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ বিচ্ছুরিত হয়েছে। স্বামীর প্রতি অনুরক্তিতে তিনি সহমরণে যাত্রাই শ্রেয়জ্ঞান করেছেন। তারার সঙ্গে আনকন্যা কুন্তী দেবীর এখানেই মস্তবড় চারিত্রিক তফাত। তারা স্বামীর সঙ্গে সহমরণ শ্রেয়জ্ঞান করেন তাঁর প্রেম ও প্রীতিবশত। তাঁর শ্বশুরালয়ের কেউ তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেন নি; এটা তার নিজেরই প্রস্তাব। অন্যদিকে হাস্তিনাপুরের রাজ্যটি হস্তগত করার অভিপ্রায়ে পাণ্ডুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে দ্রুত হস্তিনাপুরে ছুটে যান পাণ্ডবমাতা কুন্তী। এঁর বিষয়াকাঙ্ক্ষা এমনই প্রবল ছিল যে ইনি কেবলমাত্র নিজের কলঙ্ক ঢাকা দেওয়ার জন্য এবং রাজ্যলাভ বাসনায় আপনার কুমারী অবস্থায় জাত প্রথম পুত্র কর্ণকে পরিত্যাগ করেন। কুন্তীর নিষ্ঠুরতায় মহাপ্রাণ কর্ণ আজীবন নানান লাঞ্ছনা অবমাননা সহ্য করতে বাধ্য হন। কুন্তী তা জেনেও নীরব থাকেন।[8]

মৃত্যুর পূর্বে বালী দীন কণ্ঠে সুগ্রীবকে বলেছিলেন, সুগ্রীব অঙ্গদকে তোমারই রক্ষণাবেক্ষণে রেখে গেলাম, তুমি তাকে আমারই মতো স্নেহের চোখে দেখো!

পুত্র অঙ্গদকে মৃত্যুর প্রাঙ্‌মুহূর্তে বালী বলে গেলেন, "বৎস! এক্ষণে দেশকাল বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া... সুগ্রীবের একান্ত বশংবদ হইয়া থাকিবে।...সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব কদাচ

৪। লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' ২য় খং দ্রঃ।

তোমায় সমাদর করিবেন না।...সুগ্রীবের সহিত অতি-প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের। মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।"

বানরের কণ্ঠে এ কী উপদেশ শুনি? এ যে দুনিয়ার বিচক্ষণতম রাজনীতিকের উপদেশ। বালী জানতেন, ক্ষমতায় বসে সুগ্রীব অঙ্গদের প্রতি কতটা কঠোর হবেন। তারা জানতেন, অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করার কথাটি 'কথার কথা' মাত্র। অঙ্গদকে রাজ্য পাইয়ে দেওয়ার জন্য সুগ্রীব হনুমান সমগ্র বানর জাতিকে আর্য প্রভুদের দাস-এ পরিণত করেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য, দেশ বিক্রী ক'রে দিয়ে ক্ষমতা-লাভ। সুতরাং তারার বিদ্রূপে ঘৃণা ও ভর্ৎসনা প্রকটিত হয়েছে। বালী দেশকাল অবস্থা বিবেচনা করে অঙ্গদের প্রতি স্নেহবশত নিজেকে দীন প্রার্থীর পর্যায়ে অবনত করতেও দ্বিধা করেন নি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। নিজের জন্য হ'লে কখনই তিনি এই দীনতা প্রকাশ করিতেন না। দুর্যোধনের মতোই দৃপ্ত কণ্ঠে বলে যেতেন, বিশ্বাসঘাতক জাতিদ্রোহী কৌন্তেয়গণ! তোমরা এই শ্মশানভূমির ওপর নরক গুলজার ক'রে শকুনের মহোৎসব করো, আমি আমার স্বকৃত পুণ্যে অবশ্যই স্বর্গে যাব। তোমাদের হিমালয় স্বর্গে নয়, পরমেশ্বরের পরমধামে।

বালীর ধীরে ধীরে মৃত্যু, মৃত্যুর সময় তারার বিভিন্ন কথা, অঙ্গদকে অভিবাদন করতে বলা ইত্যাদি প্রতিটি চিত্রই মহাকবি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে মনপ্রাণ দিয়ে চিত্রিত করেছেন। এমন মর্মস্পর্শী দৃশ্য মহাকাব্যের অন্যত্র খুব সুলভ নয়। আদি-কবি বড় যত্নে এই মৃত্যুদৃশ্য এঁকেছেন। ফলত মনে হয়, আর্য রক্তচক্ষু অনার্যদের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় যস্ত প্রতিবন্ধকতা করলেও কবি ও পুরাণকাররা যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই স্বাধীন রচনায় তাঁদের কলম শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য রচনা করে পরম প্রীতি লাভ করেছে। এবং সেভাবেই কবি ও পুরাণকারগণ অসত্য ভাষণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্যও অনুরূপ যত্নের সঙ্গে অঙ্কিত।

সুগ্রীব দোসর

দেশসুদ্ধ সকলকে বালীর জন্য হাহাকার করতে দেখে সুগ্রীবও অভিভূত হয়েছিলেন। সেই অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর মুখে যে স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হয়, তাতেই জানা গেল, বালী কোনো অধর্ম করেন নি, রাজ্যলোভে সুগ্রীবই হনুমান-জাম্ব-

বানরদের নিয়ে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। দেবতারা এমনই ষড়যন্ত্রী খুঁজে বেড়ান। তাঁদের সাহায্যে তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করেছেন।

সুগ্রীবের স্বীকারোক্তিটি এইভাবে বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে: বালীর শবদেহের সামনে নতজানু সুগ্রীব কাতরকণ্ঠে স্বদোষ স্বীকার করে বললেন, "আমি পূর্বে অপমানিত হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতৃবধ আমার অভিমতই ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি।...ঐ ধীমান্ [বালী] আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও, আমি তোমায় বধ করিব না", বলিতে কি, একথা ইহারই অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম।...আমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মের কর্ম করিয়াছি, সুতরাং প্রজাগণের নিকট সম্মানলাভ আর আমার উচিত হয় না।...আমি লোকনিন্দিত পরমার্থনাশক জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি।...দুঃসহ পাপসংসর্গে [রাম-হনুমান-দেবতাদের সংসর্গে?] আমা হইতে পুণ্য দূর হইল। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণ-ধারণ বিড়ম্বনামাত্র..."

রাম সুগ্রীবের কাছে যে গল্প শুনেছিলেন, গল্পটিতে এমন সুস্পষ্টভাবে ষড়-যন্ত্রের স্বীকারোক্তি ছিল না। তবু রামের বোঝা উচিত ছিল, রাজ্যলোভী সুগ্রীব কত নীচ ও কপট। কিন্তু সব বুঝেও রাম জাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সুগ্রীব হনুমান বিভীষণদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি ক'রে দেবতাদের আদেশে এবং আপন উন্নতির লক্ষ্য সামনে রেখে একটির পর একটি পাপানুষ্ঠানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। এটা যে তিনি না বুঝে করেছেন এমনও নয়, কিন্তু একবার দেবতায় ধরলে কারো আর পরিত্রাণ নেই। তাকে দেবশিবিরের অমোঘ আদেশ পালন ক'রে যেতেই হবে। তবু সুগ্রীবের স্বীকারোক্তি শুনে রাম "বিমনা হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পে পূর্ণ হইল। তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া শোকনিমগ্না সজলনয়না তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।" অর্থাৎ রাম নিজেও অনুতাপে মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিলেন।

শোকবিহ্বলা তারা রামকে বললেন, "...তুমি যে বাণে বালীকে বধ করিলে তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ইহার নিকটস্থ হইব।..."

লক্ষ্মণ দেখলেন পাপের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, এখন অন্তত শেষ কর্তব্যটি যথা-যোগ্য ভাবে পালন করা উচিত। তাই সুগ্রীবকে প্রলাপ বিলাপ মড়াকান্না থামিয়ে করণীয় কর্তব্যের অনুষ্ঠানে যত্ন নিতে আদেশ ক'রে বললেন, "তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর অগ্নিসংস্কার কর।"

"তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালীকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসনভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া বাহকগণকে বলিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকূলে গিয়া আর্যর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভূরি পরিমাণ রত্নবৃষ্টি করত শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাক।..."

কতবার বলব, রামায়ণের এইসব প্রতিবেদন বানর নামক একটি মনুষ্য জাতির কথাই বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তবু এক আশ্চর্য হঠকারী মহা-মূর্খতার ভূত গল্পে নাটকে চলচ্চিত্রে তাদের চতুষ্পদই সাজিয়ে রাখলো!

দেখছি, বালীবিহনে নিরাশ্রয় এক জনসমুদ্র সজল নয়নে তাঁদের প্রিয় রাজার শবদেহ অনুসরণ করে চলেছে। কিষ্কিন্ধ্যার আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হয়েছে হাহা-কার আর হতাশায়। "উহাদের ক্রন্দনশব্দে বনপর্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।"

বাল্মীকি বানরপতি বালীর প্রেতকার্যাদি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অঙ্গদ সরোদনে সুগ্রীবের সহায়তায় পিতাকে চিতায় শায়িত করলেন এবং যথাবিধি অগ্নিদান করে চিতা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর অঙ্গদ সুগ্রীব তারা ও অন্যান্য বানরগণ তর্পণ ক'রে বালীর প্রেতকার্য সমাপন করলেন।" [অনু : রাজশেখর বসু]

বালীর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল বিধিসম্মত হিন্দুমতে। রামচন্দ্র তখন সুগ্রীবকে চুক্তিমত কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অভিষেক ক'রে বালীর অন্তিম প্রার্থনা স্মরণ ক'রে অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার জন্য সুগ্রীবকে আদেশ দিলেন। ঠিক হ'ল, বর্ষা ঋতুর জন্য পরবর্তী চার মাস কোনো যুদ্ধ বা অভিযান সম্ভব হবে না। ইত্যবসরে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করবেন। রাম লক্ষ্মণ থাকবেন প্রস্রবণগিরি নামক পর্বতে। কার্তিক মাস পড়লে রাবণবধের আয়োজন শুরু করা হবে।

কিষ্কিন্ধ্যার সন্নিকটেই ছিল প্রস্রবণগিরি। উৎসব মুখরিত কিষ্কিন্ধ্যার গীতবাদ্য-ধ্বনি এই পর্বত থেকে শোনা যেত। সুতরাং রাম-সুগ্রীব যোগাযোগেরও ছিল সহজ ব্যবস্থা।

বর্ষা চলে গেল। আকাশ ঝকঝকে নীলবর্ণ উত্তরীয়ে গা মুড়েছে। সাদা মেঘের ভেলায় চেপে শরৎ এসে গেছে প্রস্রবণগিরির মাথার ওপর। অথচ সুগ্রীবের তরফে কোনো উদ্যোগ নেই। ক্ষুব্ধ রাম লক্ষ্মণকে বললেন :

এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া।
ত্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্॥

সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। ওদিকে সময় বহে যাচ্ছে। কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব নৃত্যগীত সুরা নারী নিয়ে উন্মত্ত। বালীর চারিত্রগুণের কণাপ্রমাণ অধিকারীও সে নয়। রাম তাই লক্ষ্মণকে ব'লে দিলেন, তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে ঐ কামার্তকে বলবে, সমরে রাম বালীকেই শুধু সংহার করেছেন ; তুমি যদি সত্যপালনে পরাঙ্‌মুখ হও, তবে তিনি তোমাকে সবান্ধবে হনন করবেন।

কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরজাতির নগর ও রাজপ্রাসাদ ছিল বৈভবপূর্ণ এবং সুসমৃদ্ধ। কিষ্কিন্ধ্যা নগরে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ চমৎকৃত হলেন। দেখলেন, "সুপ্রশস্ত রত্নময় ও রমণীয় হর্ম্য ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নির্মিত ও অত্যুচ্চ।···কামরূপী বানরেরা দিব্যমালা ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ। রাজপথ গঙ্গাজলে সিক্ত···" দেখলেন, বানরপ্রধানদের অট্টালিকাসমূহ "মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ধনধান্যে পূর্ণ।···তন্মধ্যে সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন"।

সুগ্রীবের প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে অধিকতর বিস্মিত হলেন রামানুজ। স্ফটিকনির্মিত সুদৃশ্য প্রাকারে পরিবেষ্টিত সেই প্রাসাদ "যান ও আসনে সজ্জিত"। তিনি পর পর সাতটি "কক্ষা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃপুর সুরক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহাতে ইতস্তত আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন··· সদ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবন গর্বিতা রমণীগণ উজ্জ্বলবেশে বিরাজ করিতেছে···"

লক্ষ্মণ অবাক বিস্মিত। অযোধ্যায় বা মিথিলায় এমন দৃশ্য তিনি হয়ত দেখেন নি। আমরা ততোধিক বিস্মিত, অরণ্যে কিংবা বারানসী হরিদ্বার হৃষিকেশে অথবা চিড়িয়াখানায় কোথাও-ই এমন বানরসভ্যতা দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। নিতান্তই দুর্ভাগ্য বটে। কেন না আরও কত বিদ্বান সেই রূপকথার বানরপুরী স্বচক্ষে দেখেছেন বলেই না বারবার বই লিখে, যাত্রাপালা নাটক চলচ্চিত্র টি.ভি.সিরিয়াল বানিয়ে তা আমাদের দেখাচ্ছেন। রামচন্দ্রের পাশে রোমশ একটি ভাল্লুককে বসিয়ে, গদাঘাড়ে একটি দ্বিপদ লাঙ্গুলধারী হনুমান আমদানি ক'রে জনশিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। হায়, মহাজনরা এত করছেন, তবু বাল্মীকি রামায়ণে বানরবানরী খুঁজে বার করতে পারলাম না আমি। আমার সব পরিশ্রমই বৃথা গেল বুঝি!

লক্ষ্মণ এসেছেন শুনে ভয়ে সুগ্রীব তাঁর সঙ্গে আগে দেখা না করে পাঠিয়ে দিলেন অনুপমা সুন্দরী বালিপত্নী তারাকে, বর্তমানে যাঁকে রাজক্ষমতাবলে ভোগ করছেন কামান্ধ সুগ্রীব।

সুনম্র সুভদ্র ভাষণে তারা সুপটু। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, "কামাসক্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্মাধর্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! কপিরাজ (সুগ্রীব) কামের বশে নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন, এক্ষণে তাঁহার লজ্জাসরম আর কিছুই নাই ...তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশীল তাপসেরাও মোহবশত কামের বশীভূত হইয়া থাকেন..."

তারা প্রথমেই সুগ্রীবের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। সুগ্রীবের প্রতি তিনি যে পেমাসক্ত নন, তাঁর শাসনাধীন, তারা তাঁর এই মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং লক্ষ্মণ তাঁকে কিছুই বলতে পারলেন না। কিন্তু আরক্তনেত্র মদ্যপ ও মদালসাগণ পরিবৃত সুগ্রীবকে দেখে সক্রোধে বললেন, সুগ্রীব! "তুমি অতি দুরাত্মা, সেই মহাত্মা [রামচন্দ্র] কৃপা করিয়া তোমায় কপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি সেই উপকার বিস্মৃত হও, তবে...নিহত হইয়া তোমায় বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

ভীত সুগ্রীবের আদেশে শেষ পর্যন্ত বানর যূথপতিরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বানর সেনা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। রামকে সুগ্রীব বললেন, "সখে! এই সকল কপিপ্রবর পৃথিবীর যাবতীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলসকল স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্তমান। দেবতা ও গন্ধর্বগণের ঔরসে উহাদিগের জন্ম হইয়াছে।...উহারা নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে।...এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।" [কোট চিহ্নিত বাক্যসকল বাল্মীকি রামায়ণ-এর অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত]

সীতা অন্বেষণ পর্ব

সীতার অন্বেষণে নাকি ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে বানর সেনাপতিদের পাঠিয়েছিলেন সুগ্রীব। উত্তর পশ্চিম ও পূব দিক থেকে সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন মাস খানেক অনুসন্ধানের পরই। প্রত্যাবর্তন করেন নি শুধু হনুমান জাম্ববান ও অঙ্গদের নেতৃত্বে প্রেরিত দক্ষিণ দিকের অনুসন্ধানী বাহিনী। তাঁদের ফিরতে সমুচিত বিলম্বই ঘটেছিল। সমুচিত বলছি এই কারণে যে, দক্ষিণ দিকেই তো সীতার অন্বেষণ বস্তুত করণীয়। রাবণের লঙ্কাপুরী ভারতবর্ষের দক্ষিণে,

এটা রাক্ষস জাতির প্রতিবেশী বানর জাতির জানারই কথা। বানর জাতিও দক্ষিণী জাতি। খরদূষণ, মারীচ প্রমুখ রাক্ষস জাতীয় রাজপুরুষেরা দক্ষিণদেশীয় দণ্ডকারণ্যে বসবাস করতেন। অতএব রাক্ষসদের পিতৃভূমি লঙ্কার অবস্থান সুগ্রীবের অবিদিত থাকার কথা নয় তাছাড়া সুগ্রীব-ভ্রাতা বালীর কাছে রাবণ একসময় পরাস্ত ও বন্দী হন। রাবণ, সুতরাং সুগ্রীবের অপরিচিত তো নন-ই বরং তাঁর সম্পর্কে সুগ্রীব সম্ভবত দেবতাদের চেয়ে কিছু কম জানতেন না। দেবতারাও ভালোভাবেই জানতেন লঙ্কার অবস্থান। রাবণ-ভ্রাতা কুবের একসময় লঙ্কার শাসনকর্তা ছিলেন। দেবশিবিরে যোগ দিয়ে তিনি দেবতাদের দ্বারা লোকপাল পদে নিযুক্ত হন। দেবতারা তাঁর মাধ্যমেই লঙ্কার হৃদিশ জানতেন। তত্রাচ সুগ্রীব কেন সীতার অন্বেষণে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব পশ্চিম প্রান্তে বানর বাহিনী প্রেরণ করবেন গুচ্ছের অর্থ ও সময়ের অপচয় ক'রে? সীতা কোথায় গেলেন এই নিয়ে রামচন্দ্র হা হুতাশ করতে পারেন। কেননা তিনি পথ চলেন অন্ধের মতো। দেবতারা তাঁকে হাত ধরে যে পথে নিয়ে যান সেটাই তাঁর পথ। শুনেছেন তিনি, রাবণ নামে জনৈক অপরাজেয় রাক্ষস নৃপতি আছেন। তবে সেই রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রের শত্রু কি না তা দেবতায় না বলে-দিলে রামের সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা থাকার কথাই ছিল না। রাবণের সঙ্গে অযোধ্যার কোনো শত্রুতা তৈরী হয় নি। রাম তাঁর নামও শোনেন নি কোনোদিন, তাই লঙ্কা কোথায় তা জানবেন কেমন ক'রে। তাছাড়া রামের কোনো ভূগোল শিক্ষাও তো ছিল না। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলা পর্যন্ত গিয়ে উত্তর ভারতের কিছু পথ-পরিচয় তিনি জেনেছিলেন। দেবপ্রহরীদ্বারা পথ-প্রদর্শিত রাম অতঃপর ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভূখণ্ড সম্পর্কেও কিছু কিঞ্চিৎ জ্ঞানাহরণ করেছেন মাত্র। বাকি ভারতবর্ষ তাঁর অজ্ঞাত। এমন কি ভারতের বাইরেও আছে জলস্থল নদী প্রস্রবণগিরি, এটাও তিনি জানেন না। তাই সুগ্রীবের মুখে সমগ্র ভারতবর্ষের পথপরিচয় শুনে বিস্মিত হয়ে রাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "সখে! বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?" এ প্রশ্নে প্রমাণিত হয়, পৃথিবী বলতে রামচন্দ্র তখন সবেমাত্র ভারতবর্ষকে জানতে শিখেছেন। বাকি পৃথিবীর অস্তিত্বও অবতারের অজ্ঞাত।

সুগ্রীব প্রেরিত অনুসন্ধানী দল উত্তর পশ্চিম পূর্ব ভারত থেকে ফিরে এলে জানা গেল ঐ তিন দিকের কোথাও লঙ্কার অস্তিত্ব ছিল না। ভারতের দক্ষিণ দিক ছেড়ে তাই যাঁরা লঙ্কার অনুসন্ধান অন্য কোনো দিকে করেছেন, করছেন বা করবেন, তাঁদের ব্যর্থ হতেই হবে। কেননা দাক্ষিণাত্যে আর্য প্রতাপ সম্প্রসারণের

ইতিবৃত্ত রামায়ণে লঙ্কার অবস্থিতি দক্ষিণ সমুদ্রের পরপারে বলেই জানানো হয়েছে তৎকালীয় পুরাণ উপেক্ষা করে তৎকালীন রাক্ষস জাতির পিতৃভূমি লঙ্কার অন্যতর অবস্থান কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আজও যদি এমত অনুসন্ধান বাতুলতা হয়, তবে স্বয়ং সুগ্রীব কেন অনুসন্ধানী পাঠাবেন দক্ষিণ ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাই সঙ্গতভাবেই এটা মনে করা যেতে পারে যে সুগ্রীব একমাত্র হনুমান ও অঙ্গদের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিকেই সীতার অনুসন্ধানে লোক পাঠান। অপর তিন দিকে অনুসন্ধানী দল প্রেরণের গল্পটি পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং সে বিবরণটি সেকারণেই পরিত্যাজ্য

রামচন্দ্র উত্তম শ্রোতা সুগ্রীবের কাছে তিন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণের পাঠ গ্রহণ করতে বসলে সুগ্রীব হয়ত ভারতের একটি কথামানচিত্র বর্ণনা করেন। পরবর্তী কোনো কবি বাল্মীকি রামায়ণে সেই ভৌগোলিক বিবরণটি নিয়ে নোতুন গল্প গড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সে যাইহোক, ব্যাপারটি গুরুতর তর্ক মীমাংসার বিষয় নয়। আমরা এখানে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য সংকেতটি পাই, তা হ'ল সুগ্রীবের ভূগোলজ্ঞান দেখে বস্তুত রামের জিজ্ঞাসা, সুগ্রীব কেমন ক'রে ভারতবর্ষের দশদিশি এমন নখদর্পণে দেখতে পান ?

উত্তরে সুগ্রীব শোনালেন যে-গল্প, সেটি বালীর মৃত্যু এবং কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসন অধিকারের আগে তিনি রামচন্দ্রকে বলেন নি, পাছে তিনি যে তাঁর পাত্রমিত্র সহ বালীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করায় বালী তাকে নির্বাসিত করেন, সেই তত্ত্বটি ফাঁস হয়ে যায়। এখন তার অভিষেক হয়ে গেছে, চুক্তিও হয়ে গেছে রামচন্দ্রের মাধ্যমে দেবশিবিরের সঙ্গে আর বালীও বেঁচে নেই, সুতরাং স্বকৃত অপরাধ স্বীকারে বৈষয়িক ক্ষতি নেই। সেজন্য সুগ্রীব অকপটে অতীতের ঘটনা বলেছেন। অন্যপক্ষে স্বদোষ স্বীকার না করলে না-আর্য জাতির সন্তানরা স্বস্তি পেতেন না। তাদের চারিত্রগুণ ছিল দেবতা ও আর্য ব্রাহ্মণদের বিপরীত। মিথ্যাচার আর্য আগ্রাসীদের শিরো-অঙ্গের অলঙ্কার এবং সদাচার না আর্য রাজনৈতিক দুর্বলতা।

সুগ্রীব কেমন ক'রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, আনুপূর্বিক সেই কথা তিনি রামকে শোনালেন এই ভাবে। বললেন :

মহিষ জাতির অধিপতি দানব দুন্দুভির সঙ্গে যেবার বালীর যুদ্ধ হয়, সেবার পরাস্ত ও পলায়মান দুন্দুভির অনুসরণ ক'রে বালীর সঙ্গে সুগ্রীব এক প্রশস্ত গুহামুখে আসেন। দুন্দুভির পশ্চাদ্ধাবন ক'রে গুহায় প্রবেশের সময় বালী সুগ্রীবকে

গুহাদ্বারে অপেক্ষায় রেখে যান। কিছুকাল বালীর প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে সুগ্রীব বালী নিহত হয়েছেন মনে ক'রে গুহাদ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি রাজা হয়ে বসেন। তারপর কোনোক্রমে গুহাদ্বার উন্মুক্ত ক'রে বালী প্রত্যাবর্তন করেন ও সুগ্রীবকে নির্বাসিত করেন। বালী সুগ্রীবের গল্পটি বিশ্বাস করেন নি। রাজ্যলোভে সুগ্রীব ইচ্ছে ক'রেই বালীকে গুহায় আটক করে পালিয়ে আসেন ব'লেই বালীর ধারণা হয়। বলাই বাহুল্য, বালী সঠিক ধারণাই করেছিলেন। কারণ সুগ্রীব একা নির্বাসনে যান নি, সঙ্গে হনুমান জাম্ববান এবং সুগ্রীব অনুরাগী একটি বাহিনীও ছিল, যারা শেষ পর্যন্ত দেবতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং রামের দ্বারা অতর্কিত আক্রমণে বালীবধ করে রাজ্য হাতিয়ে নেন। এসবই সুগ্রীবের বহুকালের দুরভিসন্ধি। স্নেহান্ধ বালী সুগ্রীবকে বধ না করে একটি চরম রাজনৈতিক ভুল ক'রেছিলেন যার জন্য তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

একই ভুল করেছেন রাবণও। বিশ্বাসঘাতক বিভীষণকে তিনি বন্দী না ক'রে সদলবলে লঙ্কা ত্যাগের সুযোগ দিয়েছিলেন। বিভীষণ পত্নী সুরমার ওপরও নজরদারি রাখেন নি। ফলে বিভীষণ ও তদীয় পত্নীর প্ররোচনায় রাবণবিরোধী যে বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান ঘটে লঙ্কায়, রাবণের পরাজয় কামনায় দেবপক্ষে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বালী, রাবণের মতো ভুল কংস জরাসন্ধরাও করেছেন। বিদুরের চক্রান্ত বুঝেও ধৃতরাষ্ট্র সময়মত তা দমনের চেষ্টা না করে দুর্যোধনের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলেন। কংস খুল্লতাত ভগ্নী দেবকীর প্রতি স্নেহান্ধতাবশত দেবকী ও বসুদেবের গভীর চক্রান্ত সম্পর্কে কখনো সচেতন হন নি। এই সুযোগে কংসের প্রধান সভাসদ বসুদেব তলে তলে বিষ্ণুদেবতার সঙ্গে চক্রান্ত করে কংসের চরিত্র হনন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র সফল করেন। হরিবংশ পুরাণের দীর্ঘ কাহিনী জানায়, বসুদেব-দেবকীকে কংস কোনদিনই বন্দী ক'রে রাখেন নি। বসুদেব নিজেই একটির পর একটি শিশুকে দেবকীর সন্তান ব'লে পরিচয় দিয়ে কংসের হাতে তুলে দেন শিশুহত্যাপাপে কংসকে কলঙ্কিত করে তাঁর অতুল জনপ্রিয়তা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। জানা যায়, কংসের দ্বারা যে শিশুগুলিকে হত্যা করানো হয় তাদের কেউই দেবকী বসুদেবের সন্তান ছিল না। বিষ্ণু তাদের নিয়ে আসেন হিরণ্যকশিপুর ভাই কালনেমীর কাছ থেকে। এই তথ্যাবলী গোটা গোটা সংস্কৃত শ্লোকে হরিবংশ পুরাণে লিখিত আছে। প্রতিটি শব্দ উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা করেছি আমার 'যদুবংশ / ব্রজপর্ব' বইটিতে।

আর্য পুরাণের প্রকৃত পুরাবৃত্ত বহুকালব্যাপী বিকৃতির ফলে পরবর্তীকালে

দুর্বোধ্য রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে যা আজ পর্যন্ত ধর্মকাহিনী নামে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে মতলবিরা প্রকৃত ইতিহাসের অপলাপ করে আসছেন।

বানরগণের সত্যাগ্রহ

অঙ্গদের নেতৃত্বে সুগ্রীব যে বানর বাহিনীকে দক্ষিণাপথে সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তারা বনপর্বত নদনদী গহন অরণ্যানী অতিক্রম ক'রে ক্রমে দক্ষিণ সমুদ্রোপকুলের দিকে এগিয়ে চললেন। এক সময় পথশ্রান্ত হয়ে অঙ্গদের দল এক দুর্গম অরণ্যে যাত্রা-বিরতি ঘটালে অঙ্গদ তাদের বললেন, "এক্ষণে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতি কঠোর। আইস, আমরা দুঃখক্লেশ তুচ্ছ করিয়া এখনও এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি।...সুগ্রীব উগ্রস্বভাব...সুতরাং তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করিতে হইবে।"

অঙ্গদের কথায় সুগ্রীব-শাসনের একটি দিক মহাকবি ঐভাবে তুলে ধরেছেন। সুগ্রীব রাজা হয়ে রাজ্যব্যাপী আতঙ্কের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গদ বলছেন, রামের শাসন তো ভয়াবহ বটেই, সঙ্গে আছেন সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ সুগ্রীব দোসর। তাই, হে সেনাগণ, বিশ্রামের সুযোগ নেই। সুগ্রীবের উগ্র স্বভাব ও কঠোর শাসন এবং রামের কথা স্মরণে রেখে, যদি প্রাণ রক্ষা করতে চাও, তবে অক্লান্তভাবে এই দুর্গম অরণ্য খুঁজে দেখো। অন্য উপায় নেই।

পরদেশীয় সাহায্যে প্রাপ্ত সিংহাসনের মালিক চরিত্রগতভাবে নষ্ট মানুষই হয়। তার রাজত্বও হয় অপশাসনে জর্জরিত। মীরজাফর-শাসিত বাংলার ইতিহাসে একদিন অনুরূপ অরাজক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেবতাদের হাত থেকে যুধিষ্ঠির একদিন এমনই অরাজক রাজ্য প্রাপ্ত হন, যে রাজ্যে ব্রাহ্মণদের উৎপাত ও লোভ প্রজাসাধারণের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়। পুতুল রাজা যুধিষ্ঠির যখন দেখলেন তিনি নামমাত্র শাসক, শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন ব্রাহ্মণ নেতৃবর্গ, তখন হতাশায় ক্ষোভে মর্মযাতনায় কাতর হয়ে তিনি জননী কুন্তীকে রাজ্যলোভে মহা সর্বনাশ আহ্বান ক'রে আনার জন্য দোষারোপ করেন এবং সিংহাসনচ্যুত অন্ধ ও বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামী হয়ে তাঁরই সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে দেবতারা উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে এক গভীর রাত্রে যুধিষ্ঠিরের অগোচরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে [যিনি বিশ্বাস-

সে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। তাহার আর ধর্ম কে ?...আমি শত্রুপুত্র, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয় প্রাণে রাখিবে না।...সেই নিষ্ঠুর রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার নিমিত্ত উপাংশু বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। সুতরাং প্রায়োপ-বেশনই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা...অনুজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি...কিষ্কিন্ধ্যায় কথনই যাইব না।"

তখন "বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে...এবং বালীর প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।"

হনুমানের কথায় কাজ হ'লো না। বানর সেনারা অঙ্গদের নেতৃত্বে তুমুল কোলাহল শুরু করল এবং সেখানেই থেকে যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

হনুমানজীর সুগ্রীব-স্তাবকতা সত্ত্বেও বানরদের সংকল্পে কোনো তারতম্য ঘটল না। বানরজাতি বালীপুত্রকেই অধিকতর স্নেহের চোখে দেখে। ঘটনা অতঃপর কোন্ বিদ্রোহী খাতে গড়াতো কে জানে। নিতান্তই আকস্মিক ভাবে এই সময় জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতি বানরদের কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে উপস্থিত হ'লে বানররা শান্ত হলেন। জানা গেল, একবার জটায়ু এবং সম্পাতির সঙ্গে দেবতাদের বিরোধ বাধে। দুই বৈমানিক যখন ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে হিমালয়ের স্বর্গলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন আকাশপথে সূর্যের আক্রমণে সম্পাতির বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্পাতি বিন্ধ্যগিরিতে[১] অবতরণ করতে বাধ্য হ'ন। তদবধি তিনি এখানেই থেকে গেছেন।

সম্পাতি জানালেন, দক্ষিণ সমুদ্রের পরপারে রাবণের লঙ্কাপুরী। সেখানেই অনুসন্ধান করতে হবে সীতার।

সম্পাতি বললেন, "শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটি দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। ...বিশ্বকর্মা তথায় লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি স্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রক্তবর্ণ।...লঙ্কা চতুর্দিকে সাগরবেষ্টিত।...তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও।"

১। বিন্ধ্য বা বিন্ধ্যাচল—রামায়ণোক্ত এই পর্বতের অবস্থিতি দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে।

সম্পাতির কাছে লঙ্কার খোঁজ না পেলে অঙ্গদের নেতৃত্বে বানর-বিদ্রোহ কতদূর গড়াতো তা হনুমানও আঁচ করতে পারেন নি। তবে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। সেজন্য আগেই বলেছেন, অঙ্গদ তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েও হনুমান জাম্ববানদের সুগ্রীব-আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। অঙ্গদকে শান্ত করার জন্য বলেছিলেন, সুগ্রীব থেকে অঙ্গদের কোনো আশঙ্কা নেই। তবু অঙ্গদকে শান্ত করা যেতো না মাঝে সম্পাতির আগমন না ঘটলে। আর অঙ্গদ যদি তাঁর অনুগত বানরসেনা নিয়ে রাবণ পক্ষে যোগ দিতেন, তাহলে যুদ্ধের ফলাফলও হয়ত পাল্টে যেতো। বয়সে নিতান্ত তরুণ হলেও অঙ্গদ যেভাবে লড়েছেন লঙ্কার যুদ্ধ, তাতে আশঙ্কা অমূলক নয়, তাঁকে হারালে রামবাহিনীর একটি মস্তবড় স্তম্ভই পড়তো ভেঙে। রাম সুগ্রীবের সৌভাগ্য, তেমন কোনো বিপর্যয় ঘটে নি। অঙ্গদের নির্দেশে হনুমান সাগর লঙ্ঘন ক'রে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হলেন। কেমন ক'রে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করলেন এখন সেটাই আলোচ্য। বাল্মীকি সে ঘটনার বর্ণনা রেখে গেছেন এই ভাবে :

"ঐ মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দেহ অতিপ্রমাণ। তিনি করচরণে পর্বতকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন।"

দুর্বোধ্য এই বর্ণনাটির পাঠ যদি এইভাবে পুনর্লিখিত হয় : হনুমান সমুদ্র-লঙ্ঘনে প্রস্তুত হয়ে একটি বৃহদাকার স্বতন্ত্র শরীর ধারণ করলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর দেহ অপেক্ষা অনেক বড় আর একটি দেহে অথবা খোলসের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই দেহটি করচরণের অথবা চার চরণের ওপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ছিল। দেহটিকে যদি একটি উড়ন্ত যান কল্পনা করা যায়, তবে তার চারটি চরণ বলতে চারটি চাকা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পরবর্তী বর্ণনা : "গিরিবর মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পুষ্পসকল পতিত হইতে লাগিল।...বিশাল শিলা স্খলিত হইতে লাগিল।..."

হনুমান এক দক্ষিণী দেবতার ঔরসে মানবী গর্ভে জাত সাধারণ মানবপুত্র। তিনি অমিত বলশালী হ'তে পারেন। তবু, ডন দেওয়ার ভঙ্গিতে হামা দিয়ে মহেন্দ্র পর্বতে কসরৎ দেখালে তাঁর দেহভারে পর্বত বিচলিত হবে, শিলা খসে

পড়বে, এমন কি গাছের পত্রপুষ্প বৃন্তচ্যুত হয়ে উড়ে যাবে, এমন শেকল-ছেঁড়া কল্পনা করা যায় না। বরং ভাবা যেতে পারে, যেইমাত্র সেই উড়ন্ত যানের খোলসে বসে যানটিকে হনুমান স্টার্ট বা চালু করলেন, অমনি যানটির কম্পনে, শব্দে ও তার ঘূর্ণ্য পাখার তাড়নায় পর্বতের আলগা শিলা খসে পড়ল এবং ঘূর্ণ্যমান বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হয়ে ঝরে পড়ল বৃন্তচ্যুত থেকে পত্রপল্লব ও ফুলের পাপড়ি।

যানটির কম্পন এবং শব্দ বা গর্জনের কথাও আছে রামায়ণে। যেমন, "ঐ প্রদীপ্ত পাবকতুল্য মহাবল ঘনঘন কম্পিত হইতেছেন এবং সর্বাঙ্গের রোম স্পন্দন পূর্বক জলদগম্ভীর রবে গর্জন করিতেছেন।" কেবলমাত্র শব্দের কথাই নয়। আরও স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে, সেই দেহটির কম্পনে 'জলদগম্ভীর' অর্থাৎ মেঘ-গর্জনের মতো শব্দ হচ্ছিল। একটি এয়ারোপ্লেন বা হেলিকপ্টারের এঞ্জিন চালু করা হলে মেঘগর্জনের মতোই শব্দ হয়। সেকালের ভারতীয় অ-ভারতীয় সকল পুরাণেই উড়ন্ত রথের শব্দকে 'জলদগম্ভীর গর্জন' করতে, মেঘগর্জনের মতো ডাক ছাড়তে শোনা গেছে বলে কাব্যিক বর্ণনা আছে। সুতরাং গর্জনের প্রহেলিকাটিও পরিষ্কার বোধগম্য। হনুমানের দেহ প্রদীপ্ত পাবকতুল্য হতে পারে না। উড়ন্ত যান হ'লে অবশ্যই সে যানে বৈদ্যুতিক আলো এবং অগ্নিধূম নিঃসরণজনিত পাবক বা অগ্নির বিচ্ছুরণ মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এই বর্ণনা পুনরায় উচ্চারিত হয়েছে এইভাবে, "তাহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অনলবৎ প্রকাশিত হইতেছে।" —হনুমানের চোখ যে জ্বলতো, এ সংবাদ মহাকাব্যের আর কোথাও নেই। অতএব এই বর্ণনা, মহাবীরের অক্ষিদ্বয়ের বর্ণনা নয়, উড়ন্ত যানের আলোরই বর্ণনা। যানটির পাখা ঘুরতে শুরু করলে বায়ু সঞ্চালিত হয়—এই তথ্যটি মহাকবির ভাষায় হ'য়ে গেছে,—"উহার কক্ষান্তরাগত বায়ু জলদবৎ গম্ভীর রবে গর্জন করিতেছে।"

বাল্মীকির বর্ণনায় হনুমান ধীরে ধীরে স্পষ্টত একটি বিমানের আকৃতিই গ্রহণ করছেন, যখন বলা হচ্ছে : হনুমানের "কটিতট লোহিত, সুতরাং পর্বত যেমন গলিত ধাতু দ্বারা শোভা পায়, তিনিও সেইরূপ শোভিত হইলেন।"—বেশ বোঝা যাচ্ছে, কবি এখানে অন্য কোনো হনুমানের বর্ণনা করছেন যার কটিতট ধাতুনির্মিত এবং বর্ণ লোহিত। বলাই বাহুল্য, হনুমান লোহিতবরণ ধাতুনির্মিত কোনো ধাতব পুতুল ছিলেন না, এটিও হনুমান-বিমানেরই বর্ণনা। সেই ধাতব উড়ন্ত যানটির বর্ণ ছিল লাল।

বিমানের রূপ আরও স্পষ্টতা পেয়েছে যখন কবি বললেন, "লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত, উহা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।" এবং "হনুমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে

প্রসারিত।”—তখন বোঝা গেল, বিমানের শেষ প্রান্তে যে একটি ত্রিভুজাকৃতি পাখনা উচ্ছ্রিত থাকে কবি সেই পাখনার কথাই বলছেন। বিমানটি তার দুই দিকে দুটি বাহুসদৃশ পাখায় ভর দিয়ে 'অম্বরতলে' বা আকাশে ভাসছিল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে, যদি উচ্চতা সামান্য হয়, তবে বিমানের “ছায়া সমুদ্রবক্ষে” প্রতিভাত হবেই। কবি হনুমান-বিমানের ছায়ার কথাও বলেছেন। এতেক বর্ণনার পরেও কবির মনে হয়েছে যেন শ্রুত বর্ণনায় তিনি যথার্থ লিপিরূপ আঁকতে পারছেন না। তাই আরও স্পষ্ট করে লিখলেন, সেই উড়ন্ত হনুমান “…আকাশে সপক্ষ পর্বতবৎ যাইতেছেন…একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহির্ভাগে… শোভিত হইলেন।” হায়, এই কথা আগে বললেই তো হ'তো। এ তো স্পষ্ট বিমানেরই বর্ণনা। একটি বিমানকে সপক্ষ উড়তেই দেখি এবং কখনো তা মেঘের আড়ালে কখনো বা বাইরে দেখা যায়। সেকালে যেহেতু স্বর্গ বা দেবতাদের শিবির ছিল গন্ধমাদন অথবা কেদার-বদ্রি-চৌখাম্বা অঞ্চলের গাড়ওয়াল হিমালয়ে সীমারেখাঙ্কিত, তাই তৎকালীন পুরাণ মহাকাব্যে যে কোনো মহৎ ও বিস্ময়কর বিষয়কেই কবি ও কথকরা পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেজন্য উড়ন্ত ধাতবযান আমাদের চোখে একটি গঙ্গাফড়িং-এর মতো লাগলেও, কবিকল্পনায় তা হয়েছে পর্বতবৎ। তবে তার উড়ন্ত রূপে তৎসত্ত্বেও কোনো গোলমাল নেই। সেই উড়ন্ত যানের ছায়া যথার্থই জলে শোভা পেয়েছিল।

এইবার বিমান চালক হনুমানের চোখ দিয়ে একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক, সেখানেও সঠিকভাবে বৈমানিকদৃশ্যাবলী ধরা পড়েছে কি না। দেখা যাচ্ছে, সে বর্ণনাও নিখুঁত। বিমানযাত্রী যেভাবে উড়তে উড়তে অপস্রয়মাণ নিম্নস্থ দৃশ্যাবলী দেখেন, হনুমানও সেভাবেই দেখেছেন লঙ্কাকে ক্রমশ নিকটবর্তী হ'তে। বাল্মীকি লিখেছেন :

লঙ্কার নিকটবর্তী হয়ে তিনি দেখলেন, “অদূরে পরপার।…শত যোজনের অন্তে বনশ্রেণী…এবং গতি প্রসঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয় পর্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তত্রত্য বৃক্ষলতা এবং নদী সমূহের সঙ্গমস্থান দেখিতে পাইলেন।” অর্থাৎ বিমানের গতির সঙ্গে পৃথিবীর চলচ্ছবি দ্রুত নোতুন দৃশ্য সাজিয়ে ধরতে লাগল।

হনুমান বুঝলেন, গন্তব্যস্থল সমাগত, এবার তাঁকে অবতরণ করতে হবে। কিন্তু সোজা লঙ্কায় গিয়ে পরদেশী চরের বিমানাবতরণ মোটেই কাজের কথা নয়। এজন্য তিনি অরণ্যময় একটি গুপ্ত স্থান বেছে নিয়ে বিমানটিকে সেখানেই নামালেন।

বিমানাবতরণ প্রসঙ্গটি বেশ স্পষ্টভাবেই বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে, হনুমান তাঁর পূর্ব রূপ ধারণ করে পুনরায় খর্বাকার হলেন। অর্থাৎ তিনি বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন। বিমানের আকার বৃহৎ। এখন তিনি আবার নিজের খর্বাকার আকৃতি ধারণ করলেন।

"সাগরতীরে লম্ব পর্বত। উহার শিখরসকল রমণীয়; তথায় কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। হনুমান স্ববিক্রমে ঐ ভুজঙ্গ (তরঙ্গ ?) সঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া লম্ব পর্বতে পতিত হইলেন। মৃগ পক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল [খুবই স্বাভাবিক, বিমান বা হেলিকপ্টার অবতরণ করলে জীবগণের মধ্যে একটু হুড়োহুড়ি পড়বে বৈকি] হনুমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দেখিতে পাইলেন।"

লম্ব পর্বতেরই আর এক নাম ত্রিকূট হতে পারে। লম্ব পর্বতের একাংশ ত্রিকূট নামেই হয়ত পরিচিত ছিল এবং "তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত" ছিল।

ত্রিকূট পর্বতে লঙ্কাপুরীর অস্তিত্ব, একথা জানিয়ে কবি কি রাবণের রাজপুরীর নামটিকেই শুধু লঙ্কা ব'লে চিহ্নিত করছেন? তিনি বলেছেন, পর্বতময় দ্বীপে ঐ স্বর্ণলঙ্কা অবস্থিত ছিল। সেই দ্বীপের নাম ছিল 'লম্ব' বা 'ত্রিকূট'। তাহলে কী বুঝব? লঙ্কা নামে কোনো দ্বীপ ছিল না? লঙ্কা শুধু রাজপ্রাসাদের নাম? তাই যদি হয়, তাহলে তো লঙ্কা দ্বীপের অবস্থিতি নিয়ে তর্ক করার আর অবকাশই থাকে না। যে দ্বীপের নাম লম্ব অথবা ত্রিকূট, সে দ্বীপ হয়ত আজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত।

'সুন্দর কাণ্ডে'র দ্বিতীয় সর্গে বাল্মীকি লঙ্কার সমৃদ্ধি বর্ণনা করে বলেছেন, "হনুমান একটি মধ্যপথ আশ্রয়পূর্বক লঙ্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ।...তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর...স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়া পর্বত এবং শোভনতম উদ্যান।"

এ সবই সমৃদ্ধ রাক্ষস সভ্যতার বর্ণনা। সেকালে নাগ অসুর দানব রাক্ষস বানর ভল্লুক প্রমুখ প্রাগার্য আদি ভারতীয় জাতিগুলির সভ্যতা বহুলাংশেই আর্য সভ্যতা থেকে উন্নততর ছিল।[১]

১। "পাঞ্জাবেই আর্য-প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু... পাঞ্জাব থেকে আমরা যতই দূরে যাই, ততই শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের সংখ্যা বেশি পরিমাণে দেখি।...

হনুমান চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে "রাবণরক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।" দেখলেন, "মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত।...ঐ পুরী অতিশয় রমণীয়। উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত। অত্যুচ্চ সুধা ধবল গৃহ (হোয়াইট-ওয়াশ করা?) এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে।...দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পুরী বহু প্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন।...ঐ নগরী পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয় যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে।"

ভারি সুন্দর বাস্তব বর্ণনা। বস্তুতপক্ষে শৈলশহরকে দূর থেকে মেঘরাজ্যে ভাসমান বলেই মনে হয়।

বিশ্বকর্মা না-আর্য জাতির সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আর্য দেবায়তনে মহাস্রষ্টা দেবতার আসন অলঙ্কৃত করেন এবং আর্যরা তাঁর পরিচয় আর্য-রূপেই প্রচার করতে থাকেন। কথিত আছে, ময়দানব ছিলেন বিশ্বকর্মারই ছেলে। এবং ময় যে অনার্য স্থপতি ছিলেন এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ কম। ময় ছিলেন দানব জাতির রাজা এবং দক্ষিণী সুন্দরী হেমার স্বামী। হেমা পালিত কন্যা মন্দোদরী রাবণভার্যা, তিনি লঙ্কার অধীশ্বরী তার মানে ময়দানব ছিলেন রাবণের শ্বশুর। ময়ও পিতা বিশ্বকর্মার মত বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর বইটি 'ময়মত' নামে পরিচিত। বিশ্বকর্মা 'স্থাপত্য বেদ' নামক একটি উপবেদের রচয়িতা। বিশ্বকর্মার আর এক ছেলে ছিলেন, বানর যূথপতি নল। পৌরাণিক কথায় বিশ্বকর্মাকেও বানর জাতীয় বলা হয়েছে।

লঙ্কার উত্তর দ্বার ছিল সুরক্ষিত। গৃহগুলি বহুতল ও গগনস্পর্শী। পুরী "নিতান্ত দুর্গম"। দেখে শুনে হনুমানের ধারণা হ'ল, এই লঙ্কা অবরোধ করে জয় করা সহজ ব্যাপার নয়। হনুমান বুঝলেন, অমন সুরক্ষিত পুরীতে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সন্ধ্যার সময় সাবধানে গা ঢাকা দিয়ে লঙ্কাপুরীর উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন, মেঘাকার লম্ব পর্বতে প্রতিষ্ঠিত লঙ্কার "পথ সকল প্রশস্ত।

"অলংকরণের মনোহারিত্বের জন্য ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের যে খ্যাতি আছে, তা উত্তর ভারতেই সবচেয়ে দুর্বল এবং দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে সবল। তক্ষশিলায় খননকার্যের ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে গ্রীকদের আসবার আগে পাঞ্জাব (আর্য বসতি) অঞ্চলে কোনো শিল্প বা ভাস্কর্যধারা ছিল না।"—সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান / অতুল সুর / বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা / জিজ্ঞাসা।

সর্বত্র প্রাসাদ, স্বর্ণস্তম্ভ ও স্বর্ণজাল ; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা 'অষ্টতল গৃহ ;···স্থানে স্থানে কনকময় তোরণ।" নগরী সুপরিস্কৃত। উচ্চশির সভা-গৃহ লঙ্কার সমৃদ্ধি ঘোষণা করছে। দীপালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। সেই দীপা-লোকিত নগরী দর্শনে হনুমানের মনে হয়েছে, লঙ্কা যেন বিমল জ্যোৎস্নায় স্নান করছে। জ্যোৎস্নালোকিত পুরীর বর্ণনায় সন্দেহ হয়, সেই নগর স্নিগ্ধ আলোক-মালায় শোভিত ছিল। সে আলো কি বৈদ্যুতিক আলো ? যে রাবণের ছিল উড়ন্ত পুষ্পক রথ, যে মেঘনাদ ছিলেন আকাশযুদ্ধে প্রখ্যাত, তাঁদের রাজ্যে বিদ্যুতের ব্যবহার অকল্পনীয় নয়। হনুমান রাক্ষসপুরীর ঘরে ঘরে বেদমন্ত্র পাঠ শুনেছেন।

রাবণের নিজস্ব হর্ম্যের বর্ণনাও চমৎকার। সেখানে সমৃদ্ধির চূড়ান্ত দর্শনে চমৎ-কৃত হনুমানের মনে হয়েছে, সেই প্রাসাদ তুলনাহীন, জগতে তা উপমাবিহীন। রাবণের প্রাসাদে একাধিক অদ্ভুত বস্তুও পবনপুত্রের নজরে আসে। এক, পুষ্পকরথ। দুই, মদালসা কামিনীগণের নেশাগ্রস্ত রূপ। তিন, চামর বীজনকারিণী কিঙ্করী, যারা আসলে ছিল "**যন্ত্রনির্মিত পুত্তলিকা**"।

হনুমান দেখলেন, "**যন্ত্রনির্মিত পুত্তলিকা**" সারারাত প্রকাণ্ড প্রমোদগৃহে ঘুমন্ত রাজা দশানন এবং তাঁর নর্মসহচরীদের বাতাস ক'রে যাচ্ছে! আমরা বিদ্যুৎচালিত পাখার নিচে আরাম ভোগ করি। রোবট কিঙ্করীরা ভিন্নমূর্তিতে বিদ্যুৎচালিত পাখা বা ফ্যানেরই কাজ করছে। দেখা যাচ্ছে, সমৃদ্ধিশালী রাবণের বৈদ্যুতিক পাখা সুন্দরী রমণীর মূর্তিতে নির্মিত ছিল। আগেই বলেছি, রাবণের লঙ্কায় নিশ্চিতভাবেই ছিল বিদ্যুতের ব্যবহার, যে জন্য জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবীর মতো স্বর্ণলঙ্কাকে উদ্ভাসিত দেখেছিলেন হনুমান এবং বিস্মিত হয়েছিলেন সেই প্রদীপ্ত লঙ্কা সন্দর্শনে।

রাবণের প্রমোদগৃহের বর্ণনার সঙ্গে অত্যাধুনিক মাদকবটিকা-সেবী গুপ্ত আখড়ার বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে যুগে আর্য অনার্যের মধ্যে, হিমালয় স্বর্গে বা সমতল মর্ত্য ভারতে, অবাধ যৌনাচারের অনেক বর্ণনাই পুরাণ পাতায় দেখতে পাই। রাবণের প্রমোদ গৃহে গোপনে প্রবেশ করে হনুমান যে দৃশ্য দেখেন তাও অবাধ যৌনাচারের বিকৃত রূপ বলেই মনে হয়।

হনুমান দেখেন, রাবণের শয়নগৃহে "বহুসংখ্য সুরূপা রমণী···শয়ন করিয়া আছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। উহারা ক্রীড়া কৌতুকে বিরত হইয়া প্রাণভরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

"···পান প্রমোদে উহাদের কেশপাশ আলুলিত ও অলঙ্কার শ্লথ হইয়াছে।

সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন। ...কেহ বলয়মণ্ডিত ভুজলতা এবং রমণীয় বসন উপধান করিয়া শয়ান; একজন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে, আর একজন আবার উহার বাহুমূলে আশ্রয় লইয়াছে, একজন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর একজন আবার উহার স্তনমণ্ডলের উপর নিদ্রিত। এইরূপ সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আশ্রয়পূর্বক ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহসংস্পর্শে সুখী। ...উহারা ভুজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত...উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বসনভূষণের আর কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না।" (সুন্দরকাণ্ড / ৯ম সর্গ)

এ চিত্রটি কি নারী সমকামিতার, পুরনারীদের প্রমোদকলার বিবরণ? সমৃদ্ধির শিখরে উপনীত হওয়ার পর এ ধরনের বিকৃতি দেখা দিতেই পারে। দেখা দিয়েছে বর্তমান যুগেও।

যন্ত্রমানবীদের অবিশ্রাম 'চামর বীজন' শোভিত একটি বহুমূল্যবান পর্যঙ্কে রাবণ শায়িত ছিলেন। তাঁর "বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল। পরিধানে স্বর্ণখচিত বস্ত্র, অঙ্গে বিবিধ রত্নালঙ্কার এবং সর্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে চর্চিত। তিনি কামরূপী ও সুরূপ।" হনুমান তাঁর দশমুণ্ড দর্শন করেন নি, কারণ রাবণ কস্মিনকালেও আক্ষরিক অর্থে দশানন ছিলেন না।

দশানন নামটি মর্যাদাসূচক অভিধামাত্র। যেমন দেবতাদের তিনদিকের আধিপত্যসূচক অভিধা, ত্রিনয়ন। যেমন, সর্গ [কেবলমাত্র গাড়ওয়াল হিমালয় ভুক্ত অঞ্চল], মর্ত্য, অর্থাৎ সমতল ভূখণ্ড এবং অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশপথের অধিকার। চার বেদে সুপণ্ডিত ব্রহ্মার খেতাব তাই চতুর্মুখ। মহেশ শিবপশুপতি কভু পঞ্চানন, কখনো বা ত্রিমুণ্ডধারী। ইন্দ্র সহস্রচক্ষু ইত্যাদি। যাত্রাদলের অধিকারী, পটশিল্পী, গাল্পিকে মিলে নির্বিচারে এসবের আক্ষরিক অর্থটাই বুঝেছেন।

অশোকবনে হনুমান

সীতার খোঁজে রাবণের অশোকবনে গিয়ে হাজির হলেন হনুমান। সীতাকে খুঁজেও পেলেন। কিন্তু সীতার দর্শনমাত্র তাঁর চোখ থেকে রাক্ষসসুন্দরীদের চেহারা মুছে গেল। তিনি দেখলেন, একমাত্র সুন্দরী সীতাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে ভয়াল ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য চেহারার সব রাক্ষসী।

রাবণের প্রমোদকক্ষে হনুমানের চোখ যে-সুন্দরীদের দেখেছিল, কবিরিচ্ছায়

সেই চোখে পরিয়ে দেওয়া হ'লো মন্ত্রপূত চশমা। সুন্দরীরা উবে গেলেন। পুরাণকার তৈরী করলেন, পেটে চোখ, নখদন্ত-ধারিণী, মনুষ্যরক্তপিপাসু কল্পিত রাক্ষসী-মূর্তি। এমনটি বলা না হলে ভক্তজন রাক্ষসসভ্যতাকে আর্যসভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাববে কেন? যাইহোক, রাক্ষসী প্রহরীদের অগোচরে প্রচ্ছন্ন থেকে বাকি রাতটুকু অশোকবনেই কাটিয়ে দিলেন হনুমান।

ধীরে ধীরে শর্বরীর অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এলো। সেখানে দাঁড়িয়েই হনুমান শুনলেন, "বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল" রাক্ষসেরা উষাকালীন বেদগান শুরু করেছেন আর সেই মন্ত্রধ্বনিতে লঙ্কার প্রাকার উদ্যান গম্বুজ পবিত্র হয়ে উঠেছে। উদীয়মান সূর্যের নরম স্নিগ্ধ আলোকঝর্ণা চুরচুর হয়ে ঝরে পড়ছে শিশিরসিক্ত অশোকবনের বীথিকায়।

নিশাবসানে অশোকবন অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠল। পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয়ের মতো অশোকবনে কন্দর্পকান্তি রাক্ষসরাজ রাবণ প্রবেশ করলেন। রাজা আসছেন উপযুক্ত সমারোহ সহকারে, সঙ্গে আসছেন "বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী" রাক্ষসী।

রাবণের অনেক নিন্দা আমরা শুনেছি, কিন্তু অশোকবনে হনুমান তাঁকে যেমন দেখলেন এবং তাঁর যে সুভদ্র উক্তি শ্রবণ করলেন তা রামায়ণেই বর্ণিত আছে [২০ সর্গ / সুন্দরকাণ্ড / বা. রা. / হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত] হনুমানের সেই প্রতিবেদনটি পাঠ করলে রাবণের ভদ্রতা লম্পট ইন্দ্র এমন কি রামলক্ষ্মণের নারীর প্রতি আচরণ [শূর্পণখা ও অন্যান্য] তুলনায় শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলেই প্রতীয়মান হয়।

সীতার সন্নিকটে এসে রাবণ বলেছেন, "তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে…[কিন্তু]…বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর।…পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু বলিতে কি, তুমি অনিচ্ছুক, আমি এইজন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি না।…তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুমাত্র ভীত হইও না।"

অতঃপর রাবণ যে ভাষায় সীতার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়; কোনো আর্য অথবা তাঁদের বশ্যতাস্বীকারকারী ব্রাহ্মণনেতা —এঁদের কারো মুখেই এমন ভাষা শোনা যায় নি। তাঁরা নারীর স্তুতি করেছেন কেবলমাত্র তাঁদের স্তন ও নিতম্বের প্রশংসা করে। কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণকে সীতা-বন্দনা করতে শুনলাম অপূর্ব কাব্যিক ভাষায়। রাবণ বললেন, "তুমি একটি স্ত্রীরত্ন, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিও না…তোমার এই যৌবনশ্রী সুন্দর। জন্মিয়া অল্পে অল্পে অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীস্রোতের ন্যায়, একবার

গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয় রূপস্রষ্টা বিধাতা তোমাকে নির্মাণপূর্বক স্বকার্যে বিরত হইয়াছেন, এই জন্যই জগতে তোমার এই রূপের আর উপমা দৃষ্ট হয় না।" তুলনায় রামচন্দ্র-মুখে সীতার রূপবর্ণনা যেমনি অসংস্কৃত তেমনি লালসাপূর্ণ।

শিখাধারী ব্রাহ্মণরা পরবর্তীকালে যে গল্প গেয়েছেন, যে গল্প আমাদের গুরুজনেরা মেনে নিয়েছেন, সে-সব গল্পে বলা হয়, সীতার দৈবী তেজে ধর্ষক দুষ্ট রাবণ দেবী জানকীর ধারকাছে এগোতে সাহস পেতেন না। মিথ্যা সেই গল্প যে মহাকবি বাল্মীকির প্রতিবেদন নয়, উপরের চমৎকার উদ্ধৃতিটুকুই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

রাবণের ঐ স্তুতিবাক্যের উত্তরে সীতা কঠিন ভাষায় অশ্রাব্য গালিগালাজ ক'রে রাবণকে আঘাত হানলেন। প্রত্যুত্তরে রাবণ শান্ত ধৈর্য সহকারে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে যতদূর সমাদর করিয়াছি তুমি সেই পরিমাণেই আমার অপমান করিয়াছ।...তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু কামই আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য।"

পরস্ত্রীগমনের দোষ প্রদর্শন ক'রে সীতা প্রলম্ব বক্তৃতা করেছেন। এ সব কাজ দূষণীয় তো বটেই, কিন্তু সীতা যে দেবজন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দেবতারা আপন স্বার্থে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্বিচার ধর্ষণ ও পরস্ত্রীগমনকে ধর্মানুগ আচরণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের দুষ্কার্যের ইতিহাস পুরাণপৃষ্ঠায় পর্বতপ্রমাণ। সম্প্রতি রামচন্দ্র স্বস্বার্থে সুগ্রীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী তারা সুন্দরীর দেহযৌবন ভোগ করার ছাড়পত্র দিয়েছেন। সুতরাং দেবজনগোষ্ঠীর মুখে রাক্ষসরাজ রাবণের আচরণ সম্পর্কে একটিও নীতিবাক্য উচ্চারণ করা শোভা পায় না। নেহাত ব্রাহ্মণরাই সেকালের বিজয়ীপক্ষ তাই তাঁদের দোষ-গুণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। আমরা সীতার বক্তৃতায় আদৌ কোনো গুরুত্ব আরোপ করতে রাজি নই। রাবণকেও দোষী ভাবতে পারি না, কারণ যে দেশে যে কালে যেমন প্রথা, রাবণ তদনুসারেই কাজ করেছেন। বরং তিনি প্রশংসাই এই কারণেই যে, একাকিনী কোনো সত্যবতীকে (অনার্য ধীবরকন্যা) নদীবক্ষে পেয়ে মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতা পরাশর মুনি যেভাবে বলাৎকার করেছিলেন এবং যা ধর্মসংগত আচরণরূপে মান্য হয়ে এসেছে, রাবণ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্তও সীতার প্রতি তেমন কোনো নীচ আচরণ করতে পারেন নি। রাক্ষসরাজ বস্তুতই ধার্মিক ছিলেন যথা অর্থে।

অশোকবনে রাবণের সেবাদাসীরূপে যে সব দেবগন্ধর্ব রমণীরা ছিলেন, এই সময় তাঁরা ইসারায় সীতাকে আশ্বস্ত করেছেন, যার ফলে সীতা বুঝেছেন, রাবণালয়ে একটি গোষ্ঠী সক্রিয় আছে সময়কালে যাদের সাহায্য দেবতারা তথা রামচন্দ্র পাবেন। সুতরাং বেদবতী সীতা তখন দ্বিগুণ উৎসাহে রাবণকে অভিশাপ দিতে শুরু করলেন।

আমাদের অনুমান সত্য প্রমাণিত করার জন্যই বোধহয় অশোককানন থেকে রাবণ প্রস্থান করার কিছু পরেই ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী এসে প্রবেশ করল। প্রহরারত রাক্ষসীদের ভয় দেখানোর মতলবে সে বলল, রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে, যুদ্ধে রাবণ দৈবী শক্তিসম্পন্ন রামচন্দ্রের কাছে পরাস্ত হয়েছেন। লঙ্কা ছারখার হয়েছে। তোমরা প্রাণে বাঁচতে চাও তো পালাও। না হলে তোমাদের দুর্দশার একশেষ হবে। সঙ্গে সঙ্গে সীতা ওরফে বেদবতী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীত সেই রাক্ষসীদের স্বদলভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বললেন, "ত্রিজটে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যদি সত্য হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।"

বাস্তবিক এমন উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারিণী না হ'লে দেবতারা কি বেদবতীকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠাতেন? শত্রুকে বিপক্ষ দলে টানার কূটনৈতিক কৌশল তাঁর ভালোভাবেই জানা ছিল।

হনুমান অশোকবনে সীতার সঙ্গে দেখা করলে সীতা বলেছিলেন, "রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দিষ্ট করিয়াছে [অর্থাৎ সীতাকে মনঃস্থির করার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে] তদনুসারে এইটি দশম মাস। সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন...ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্বজ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লঙ্কাপুরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস বাস করেন।...তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।" তিনিও সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাবণকে উপদেশ দিয়েছেন।

বেদবতী যে গুপ্তচর হিসেবে রাবণ পরিবারে বেশ ভালোরকম একটি জাল বিস্তার ক'রে বসেছেন, তাঁর কথাই তার প্রমাণ। বেদবতী এসেই বিভীষণ এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যা সহ ত্রিজটাদের মতো রাক্ষসকন্যাদের সঙ্গে গভীর গোপন চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছেন। রাবণের সভায় কী ঘটছে, লঙ্কায় কোন্ কোন্ নেতা রাবণ বিরোধী বিভীষণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, বেদবতী অশোককাননে ব'সে সে সমস্ত খবরই সংগ্রহ করেছেন আর রাবণের কাছে মনঃস্থির করার জন্য সময় বাড়িয়ে নিচ্ছেন

যাতে বিভীষণের পক্ষে লঙ্কার বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী গুছিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় এবং রাবণ নিশ্চিন্ত থাকেন সীতার মত-পরিবর্তনের আশায়।

রাজনীতিজ্ঞানহীন সরলবিশ্বাসী রাবণকে খবর দেওয়ার জন্য এমন উপযুক্ত গুপ্তচরবাহিনী নেই। তাঁর পতন সামলাবে কে? মথুরাপতি কংস তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এই খেদই উচ্চারণ করে বলেছিলেন, তাঁকে সাবধান করার জন্য তাঁর কোনো বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিল না, কংসের সহজ পতনের সেটাই কারণ [লেখকের 'যদুবংশ ব্রজপর্ব' এ তথ্যসূত্র দ্রঃ]। রাবণ অকম্পন শূর্পণখার চাতুরী ধরতে পারেন নি। আমল দেন নি মারীচের সৎ পরামর্শে। খোঁজ রাখেন নি বিভীষণ সরমা কন্যা ত্রিজটা অবিন্ধ্যরা তলে তলে তাঁর বিরুদ্ধে বেদবতীর সঙ্গে কোন্ চক্রান্তে লিপ্ত আছে। কেবলমাত্র বাহুবলে আস্থাশীল রাজনীতি-অন্ধ এমন রাবণ, অতএব হেরেই বসে আছেন। বিভীষণের লোভ লঙ্কার সিংহাসন ও পাটমহিষী মন্দোদরীর ওপর। তিনি যে দুটিই ভোগ করবেন তাতে আর সন্দেহ কি। তিনি জানেন, রাম বা আর্যব্রাহ্মণদের দাসত্ব স্বীকার করলে সুগ্রীবের মত তিনিও তাদের সাহায্যে জ্যেষ্ঠের ভার্যা এবং সিংহাসন দখল করে ভোগে সুখে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন, তাতে যদি স্বজাতি নির্বংশ হয়, যদি ব্রাহ্মণ সাম্রাজ্যবাদীরা লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় দিক, বিভীষণের নিজের ভোগসুখে তো বাধা পড়বে না। অতএব কে করে স্বদেশ স্বজনের চিন্তা। গদি ও ক্ষমতা পেলে বিভীষণরা দেশকে টুকরো টুকরো ক'রে বিলিয়ে দিতে পারে। ধর্মাধর্ম, জননী জন্মভূমির প্রতি দরদ তো নাটক মাত্র, স্বার্থপূরণই লক্ষ্য। প্রচার দরকার শুধু যে রাবণ বেদবতীর প্রণয়ভিক্ষু। প্রচার দরকার, সেটা মস্ত অধর্ম। সুগ্রীব বিভীষণ ভ্রাতৃবধূর প্রতি-কামাসক্ত, প্রচার দরকার এঁরা ধার্মিক, কেননা এদের সাহায্যে আর্য সম্প্রসারণবাদীরা দাক্ষিণাত্য গ্রাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বেদবতীর কাছে বিদায় নেওয়ার সময় হনুমান বললেন, অশোকবনে তাঁর সীতাদর্শন হয়েছে একথা রাম বিশ্বাস করবেন কেন? কোনো একটি অভিজ্ঞান যে দরকার।

তখন বেদবতী বললেন, হনুমান যেন রামকে গিয়ে একটি ঘটনা স্মরণ করতে বলেন। ঐ ঘটনা একমাত্র রাম বেদবতীই জানেন।

ঘটনাটি এখানে উদ্ধৃত না হলেই ভালো হ'ত, কিন্তু বেদবতী যে জানকী সীতার বদলী, এই ঘটনাটি তার অপর এক প্রমাণ হওয়ায় সংক্ষেপে সে কথা বলতেই হ'লো। গল্পটি এই রকম:

সীতাহরণের আগে রাম বেদবতী কিছুকাল একসঙ্গে ছিলেন। তখন রাম মন্দাকিনীতে স্নান সেরে "আর্দ্র দেহে বেদবতীর কোলে শুয়ে বিশ্রম্ভালাপ করতেন। সুখী রামচন্দ্র একদিন যখন তদবস্থায় রয়েছেন, তখন কাকের বেশে [মারীচ যেমন মৃগবেশে] সেখানে এক কামুকের আবির্ভাব ঘটে। বেদবতী ক্রীড়াচ্ছলে সেই কামুককে বিতাড়িত করার খেলা খেলছিলেন। কামুকের নড়ার লক্ষণ নেই। তখন, বেদবতীর গল্প, "আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছি। ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে...ইত্যবসরে [রাম বেদবতীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে] উপহাস" [করেন। অর্থাৎ বেদবতীর সঙ্গে হাস্যকৌতুক করেন]। পরে ঘুমিয়ে পড়েন। বেদবতীরও তন্দ্রা এসে গেছল, তবে এই সময় কামুক ফিরে এসে বেদবতীকে অধিকার করে। তখন, বেদবতী বলছেন, "আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পুনর্বার আমার সন্নিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল। তুমি [রাম] উত্থিত হইলে এবং...কহিলে, বল, কে তোমার স্তনমধ্য এইরূপ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল ?..."

কে এই কাক ? রামচন্দ্র এদিক ওদিক তাকিয়ে কাক-পালকধারী যে পুরুষটিকে দেখলেন, বেদবতীর তিনি অপরিচিত নন, কারণ বেদবতী হিমালয়-স্বর্গের স্বর্বেশ্যা, আর কামুক পুরুষটি হলেন, বেদবতী প্রদত্ত পরিচয় অনুসারে, "সে ইন্দ্রের পুত্র, গতি-বেগে বায়ুর তুল্য" [অর্থাৎ বিমানে যাতায়াত ক'রে]। এই পরিচয় দিয়ে বেদবতী জানালেন, রাম তাকে ইন্দ্রপুত্র জেনে যথোচিত সৎকার করে মুক্তি দেন।[১]

রামচন্দ্র গোপনে এক স্বর্বেশ্যার সঙ্গে শোওয়া বসা করতেন জেনেশুনেই। আবার বেদবতী লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে তিরস্কার ক'রে পরিত্যাগও করেন! রামলীলা বাসুদেব কৃষ্ণের লীলার মতোই চমৎকার। বাসুদেব খেলাচ্ছলে এভাবেই নখরাঘাতে গোপবালাদের স্তনমধ্য বিদীর্ণ করে দিতেন। তাই নিয়ে কত কাব্যকথা রচিত হয়েছে ভাগবতপ্রেমীদের শোনানোর জন্য। তা, যে যেমন ধার্মিক, তাকে তেমন ধর্মকথাই আকর্ষণ করুক, এ নিয়ে আমাদের কোনো তর্ক নেই। আমরা আবার দেখিয়ে দিলাম, বেদবতী ও জানকী সীতায় চরিত্রগত প্রচুর প্রভেদ ছিল। ইন্দ্রপুত্র স্বর্গে বেদবতীর বিরহে অধৈর্য হয়ে আকাশরথে চেপে ছুটে এসেছিলেন। ইনি জানকী সীতা হলে নিশ্চয় কাকবেশী অথবা জুলপীধারী ইন্দ্রপুত্রের আগমন ঘটত না, আর যদিও ঘটতো তাহলেও জানকী কখনো পরপুরুষ হনুমানের

১। বা. রা / অষ্টাত্রিংশ সর্গ / সুন্দরকাণ্ড / ভারবি। ব্রাকেট আমার।

কাছে ঐ রকম গোপন লজ্জার ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারতেন না। বস্তুত, কত রঙ্গে ভরা দেখি আর্ষ পুরাণ! কখনো তা রহস্য গল্প, কখনো রূপকথা, কখনো বা নিছক কামুক কামুকীর অশ্রাব্য কাহিনী।

বেদবতী হনুমানকে একটি আঙটিও দিয়েছিলেন অভিজ্ঞানস্বরূপ।

হনুমানের লঙ্কাদাহন

সুন্দর কাণ্ডের ৪১ থেকে ৪৮ সর্গে হনুমানের দৈবীপ্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করেছেন হনুমান-পূজক কোনো সম্প্রদায়। তাঁরা হনুমান-পরাক্রমের একটি লম্বা কাহিনী ঠেসে দিলেন অতগুলি সর্গের মধ্যে অসংলগ্ন কতগুলি অবিশ্বাস্য যুদ্ধকাহিনী তৈরী ক'রে। বলা হ'ল, মহাবীর নাকি একাই স্বর্ণলঙ্কা যথেচ্ছভাবে ছারখার করলেন, বধ করলেন অসংখ্য রাক্ষস সেনা ও একাধিক সেনাপতি, দগ্ধ করলেন লঙ্কার প্রাসাদ প্রাকার চৈত্য তোরণ। লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, শুধু রামের দৈবী-প্রতাপে আগুনের শিখা এগুতে পারল না সীতার আশপাশে।

ঐ আষাঢ়ে উপন্যাসের মধ্যেই কিন্তু সমান্তরালভাবে বাল্মীকি-রচিত প্রকৃত ঘটনার সূত্রটিও থেকে গেছে। ঘটনাপরম্পরাক্রমে সেই কাহিনীসূত্রটি সাজিয়ে নিলে দেখা যায়, অলৌকিক কোনো ব্যাপারই আসলে ঘটে নি। মহাবীরের পক্ষে যতটুকু স্বাভাবিক বীরত্ব-প্রকাশ সম্ভব ছিল, ঠিক ততটুকুই ঘটেছিল। বাস্তব ইতিবৃত্তটি যখন মূল পাঠেই আনুপূর্বিক পাওয়া যাচ্ছে, তখন অবাস্তব হনুমানস্তুতি পরিত্যাগ ক'রে তারই আলোচনা করা যাক।

রাবণের সভায় কয়েকজন রাক্ষসী কিঙ্করী এসে খবর দিল, অশোকবনে সীতার সঙ্গে এক বানরজাতীয় পালোয়ানকে কথাবার্তা বলতে দেখে সীতার পরিচারিকা সেই পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সীতা তার পরিচয় দেন নি। কিঙ্করীদের ধারণা, লোকটি নিশ্চয় দেবরাজ ইন্দ্র অথবা রামচন্দ্রের

শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে কয়েকজন পরিচারককে পাঠান হনুমানকে বেঁধে আনার জন্য। পালোয়ান হনুমান সামান্য দুজন রাক্ষস দাসকে অনায়াসেই পরাস্ত করেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কয়েকজন সহচর নিয়ে হনুমানকে শণ ও বল্কলের দড়ি দিয়ে বেঁধে আনেন। বদ্ধ অবস্থায় অসহায় হনুমানকে বেশ কিছু চড়চাপড় ও পদাঘাত সহ্য

করতে হয়। অবশ্য এখানেও ব্রহ্মাবাদীরা গল্প গড়েছেন।

হনুমান রামানুচর তাঁর এহেন পরাজয় ব্রাহ্মণ কথকের মনোপুত হবে কেন? তিনি বললেন, ইন্দ্রজিৎ প্রযুক্ত অস্ত্রটি ব্রহ্মাস্ত্র তাই ক্ষমতা থাকলেও ব্রহ্মার সম্মানে হনুমান স্বেচ্ছায় সেই বন্ধদশা গ্রহণ করলেন। এমন হাস্যকর গল্প হজম করাও শক্ত। সামান্য শণ বল্কলের দড়ি যদি ব্রহ্মাস্ত্র হয় তবে ব্রহ্মাজীর ক্ষমতায় আর শ্রদ্ধা থাকে না। তাছাড়া দেবপক্ষীয় কেউ পরাস্ত হলেই কি স্বীকার করতে হবে বিপক্ষীয় শত্রুর হাতে ছিল ব্রহ্মাস্ত্র এবং সদাশয় ব্রহ্মাজী শত্রুমিত্র বিচার না করে ভারতবর্ষের সকল বাপপুরুষকেই দরাজ হাতে ব্রহ্মাস্ত্র বিলি করতেন ও অমরত্ব দান করতেন। তারপর চোদ্দ বছর ধরে ধর্মীয় অধর্মীয় যে কোনো উপায়ে তাঁরই বরে বলীয়ান শত্রুর বিনষ্টির জন্য চক্রান্ত করতেন গন্ধমাদন পর্বতের একমুঠো এক স্বর্গলোকে ব'সে! ব্রহ্মাকে নিয়েই যত গণ্ডগোল রামায়ণ মহাভারত পুরাণে। কারণ পুরাণ গ্রন্থগুলি ব্রহ্মাবাদীদের হস্তামর্শনের ফলেই ফুলে ফেঁপে ঢোল তৈরী হয়েছে। পুরাণ পাঠকের উচিত ব্রহ্মাস্তুতি শোনামাত্র দুই কানে তুলো গোঁজা। কেননা শুনলেই বিপদ। অবধারিত ভাবে দেখা যাবে, ঐখানে ইতিবৃত্ত গায়েব হয়েছে আর শেকড় গজিয়ে সেথা গল্পের আগাছা জন্ম নিয়েছে।

যাইহোক, ব্রহ্মাস্ত্র শণ বল্কলের দড়ি বেঁধে রাক্ষসরা মহাবীরকে টানতে টানতে রাবণের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

ক্রোধান্ধ রাবণ বললেন, লোকটা রাজদ্রোহীর মতো ব্যবহার করেছে। তার উৎপাতে অশোকবনের কিছু দামি গাছপালা নষ্ট হয়েছে এবং সে রাক্ষসপুরীতে প্রবেশ ক'রে রাক্ষস কিঙ্করদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে [মারপিটে] প্রবৃত্ত হয়েছে। অতএব দূত হলেও সে বধ্য, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল।

হনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের রূপ ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিপদ দেখে একটু চালাকি করলেন। করজোড়ে বললেন, আপনাকে দর্শন করাই আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। যাতে সেই অভিলাষ পূর্ণ হয় সেজন্যই অশোকবনে ভাঙচুর ক'রে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে আপনার কাছে নীত হয়েছি। দূত হিসেবেও আমার কিছু নিবেদন আছে।

অবশ্য ব্রহ্মাবাদী তো বটেই ব্রহ্মানিযুক্ত বাল্মীকিরও উপায় ছিল না রামপক্ষীয় বানরপ্রধানের মুখে রাবণের উদ্দেশ্যে এমন সুভদ্র বচন বসানোর। তাই হনুমানকে রাজসভায় অপ্রত্যাশিত পরুষবাক্য উচ্চারণ করতেই শোনা যায়। রাক্ষসরাজকে তিনি 'তুমি' বলে সম্বোধন ক'রে রামচন্দ্রের বার্তা এমন ভাষায় উপস্থাপিত করেন,

যেন রামের আদেশ পাঠ করছেন।

বলা বাহুল্য, ঘটনার প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে ঐ মনগড়া ভাষণ তাঁর পক্ষে তদবস্থায় দেওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, আমি তাঁর মুখে প্রত্যাশিত ভদ্রভাষণই বসালাম। আশা করি, এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বানরপ্রধানের রাক্ষসরাজকে সম্ভাষণ করা সম্ভব ছিল না।

হনুমানের ধড় থেকে মাথাটি সেদিন নেমে যেত, যদি না সরল রাবণকে চতুর ভাষণে প্রভাবিত করতেন ছদ্মবেশী রামানুচর বিভীষণ।

ইনি বললেন, দূত অবধ্য, তাকে হত্যা করলে রাবণের মতো এক বীরপুরুষের অপযশ হবে। তাছাড়া হনুমান মরে গেলে দুই স্পর্ধিত তরুণ রামলক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে কে? রাবণই বা যুদ্ধের সুযোগ পাবেন কী ক'রে! সঙ্গে সঙ্গে রাবণ তাঁর মত পরিবর্তন করে বললেন, সাধু! যথার্থ বিবেচনা প্রসূত মন্ত্রণা দিয়েছে বিভীষণ। রামদূত বানরজাতি। লেজই এদের প্রিয় ভূষণ [বললেন না লেজটি তার শরীরের বিশেষ অংশ]। সুতরাং ওর ঐ লাঙ্গুলভূষণটিতে আগুন ধরিয়ে ওকে রাজপথ পরিক্রমা করাও। সেটাই ওর চরম শাস্তি হবে।

রাবণের আদেশ শুনে ধূর্ত হনুমান ও বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ নিশ্চয় মুখ টিপে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন আর ভেবেছিলেন, মহামূর্খ রাবণের বিনাশ ঠেকাবে কে? ব্রহ্মাজীর অভিধানে এই সব ক্ষমাটমার আদর্শ নেই। বালী হত্যা করে কেমন চমৎকার ধর্মকথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন রামচন্দ্র! অন্যদিকে সীতা গুপ্তচরের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেছে জেনেও রাবণ সীতার কোনো শাস্তি দিলেন না, কিন্তু এটাই যদি ঘটতো দেবতাদের সংরক্ষিত অঞ্চলে তবে ঐ সীতাকে তখনই এক কোপে কেটে ফেলতেন ইন্দ্র বিষ্ণুরা। রাবণ, বৃদ্ধ হয়েও নিতান্ত শিশু। তার রাজ্যত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়াই উচিত।

যাই হোক, গল্পটি বোঝা গেল। বোঝা গেল, হনুমান কোনো রাক্ষসসেনা বধ করেন নি, করলে রাবণ কেবলমাত্র সামান্য কিছু উৎপাতের উল্লেখ করতেন না। বিভীষণও পারতেন না হনুমানের পক্ষ সমর্থন করতে। রাবণের একাধিক সেনাপতি এমন কি জনৈক অক্ষ নামক পুত্রকে হনুমান হত্যা করেছিলেন বলে যে গল্প ফাঁদা হয়েছে, দেখা গেল, তা সর্বৈব মিথ্যা। সে গল্প 'হনুমান চল্লিশা' প্রচারকগণের পূর্বপুরুষ দ্বারা লিখিত।

পরবর্তী গল্প হনুমান কর্তৃক লঙ্কাদাহন আর একটি মূর্খ রচিত উপন্যাস। অতঃপর সেই গল্পটি খুঁটিয়ে দেখা যাক, কী তার নেপথ্য রহস্য।

রাবণের আদেশে হনুমানের লাঙ্গুলভূষণে অগ্নি সংযোগ করে তাকে রাজপথে ঘুরিয়ে মজা করা হ'ল। গুপ্তচরের সাজা দেখতে নাগরিকরা ভিড় করল। একেবারে ছি ছি কাণ্ড। ভগবান হনুমানের দুর্দশা। সহ্য হবে কেন 'হনুমান-চল্লিশা' স্তুতিকারকদের। তাঁরা তৎক্ষণাৎ গল্প সাজিয়ে তাও গুঁজে দিলেন মহাকাব্যের গর্ভে। বলা হ'ল, "রামের প্রভাবে" "পুচ্ছাগ্রে অগ্নিস্পর্শ" হনুমানের "শিশিরবৎ শীতল বোধ হইল"। হনুমান লেজটি ইতস্তত নাড়িয়ে আশপাশে কিছু আগুন ধরিয়ে দিলেন। গোলমাল বেধে গেল তাতেই। দর্শকরা তো বটেই, পাহারাদারও ছিটকে ছিটকে সরে পড়ল। কেননা বলা হয়েছে, "ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই।" অর্থাৎ হনুমান একাকী পরিত্যক্ত হয়েছেন। পালোয়ানরা বন্ধনমুক্তির কৌশল জানেন। পেশী সঙ্কোচন করে দেহবন্ধন খুলে ফেলা যায়, এমন কি ফাঁসিতে লটকে দেওয়া পালোয়ানও একই কৌশলে দড়ির ফাঁস ঠেকিয়ে রাখতে পারে। হনুমানও ঐ অবস্থায় পেশীসঙ্কোচন করেই সম্ভবত রজ্জুবন্ধন খুলে ফেললেন।

এরপরেই সেই রোমহর্ষক কাণ্ড। দেখা গেল হনুমান বাস্তবিক বানরের মতো লঙ্কার প্রাসাদচূড়াগুলিতে লাফিয়ে ঘুরছেন আর মহানন্দে ঘরে ঘরে এবং রাক্ষস-প্রধানদের অট্টালিকাসমূহে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। তাঁকে নিবারণ করার মতো সেদেশে না আছে কোনো পুলিস সেপাই সামরিক বাহিনী বা সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ বাহিনী। অতএব যা হবার তাই হ'ল। সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই। কত যে রাক্ষস মরল তার কোনো লেখাজোখা নেই। যেন রাক্ষসদের অন্য নাম পাঁঠা এবং রামভক্তদের অনুমান, তারা রামপাঁঠা। তাই হনুমান তাদের খুশিমত লেজে-মুড়ো কাটেন ও হনন করেন।

কিন্তু দুনিয়ার সবাই তো রামপাঁঠা নয়। তাই আমাদের প্রশ্ন, লঙ্কা যদি পুড়েই গেল, তবে সেই দগ্ধাবশিষ্ট নগরের অধিপতি যথাপূর্বং সভা বসিয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন কা ক'রে? রাবণের পরবর্তী সভায় লঙ্কা দাহনের কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হল না, বিভীষণকে জবাবদিহি করতে হ'ল না, সীতা তিরস্কৃত হলেন না। লঙ্কা যেমন নিস্তরঙ্গ, নিরুদ্বেগ ছিল তেমনিই রইল। চতুঃপঞ্চাশ সর্গ জুড়ে হাজার হাজার নরনারী শিশু পোড়ালেন হনুমান এমন কি রাজপ্রাসাদটিও পুড়িয়ে দিলেন, একমাত্র সীতা বসে রইলেন অগ্নির স্পর্শ বাঁচিয়ে [কেন? সীতার কি দুবার অগ্নি পরীক্ষা হয়েছিল?]। এতো কাণ্ড হ'ল, তবু দগ্ধ লঙ্কায় রাবণ বা রাক্ষসগণের পুনর্বাসনের কোনো প্রসঙ্গ উত্থিত হ'ল না কোনোদিন?

সব প্রশ্ন ছেড়ে দিলে যে শেষ প্রশ্নটি পড়ে থাকে তারই বা জবাব কে দেবে?

প্রশ্ন, একা হনুমানই যদি পারেন রাজপ্রাসাদ সহ সমস্ত লঙ্কা পুড়িয়ে সোনার লঙ্কায় স্তূপ রাক্ষস রাক্ষসী ও রাক্ষস শিশুদের শবদেহ স্তূপাকার করে পালিয়ে যেতে, তবে সঙ্গে কেন নিয়ে যান না সীতাকে, কেনই বা রামকে যুদ্ধে আসতে হয় সেতু বেঁধে ? লঙ্কাদাহন একটা ঘটনা হয়ে থাকলে রাবণের সভায় রাজপুরুষরা সকলেই দিব্যি সুস্থ ও স্বাভাবিক রইলেন কী করে ? সব প্রাসাদ এবং রাজপ্রাসাদও তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছল ?

ছাইভস্ম এই গল্পই কিন্তু যুগে যুগে কালে কালে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী হয়ে জনগণের ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষুধা পূর্ণ করেছে। আজও অবিরাম চলেছে সেই একই মিথ্যার বেসাতি।

"হে রাম !" এ তোমার কেমনতর কুশিক্ষা, হে ! আজও যে আমরা রামধুন গাইছি করতালি দিয়ে।

"হে রাম !"

তুমি বস্তুতই অব • র বটে, হে !...

আসল গল্প, বন্ধনমুক্তির পর চট করে সীতার সঙ্গে আর একবার দেখা করে হনুমান তাঁর বিমানটিতে ফিরে গেছলেন, কেন না, রাবণ তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। হনুমানের বিমানটি লুকোনো ছিল "লঙ্কার উপান্তে অরিষ্ট...পর্বতে।" সেখানে বিমানটি তিনি চালু করলেন। বিমানের এঞ্জিন চালু হলে আগের মতোই তা পুষ্পপল্লব ওড়ালো, কম্পনে পাথর খসে পড়ল। অতঃপর বিমান যেভাবে ওড়ে আগের মতো তারই পুনশ্চ সঠিক বর্ণনা পাওয়া গেল।

"তিনি [অর্থাৎ হনুমান-বিমানটি]...কখন মেঘের আড়ালে কখন বা বাহিরে অবস্থান করিতেছেন।...তিনি একবার দৃশ্য আবার অদৃশ্য...লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর [অর্থাৎ বিমানের আওয়াজ] মেঘগম্ভীর...চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন।...সমুদ্রের তীরস্থ পর্বত দূর হইতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল।...হনুমান বন্ধু সমাগমের উল্লাসে [অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণ উপকূলে ক্রমশ পৌঁছে] উৎফুল্ল হইয়া তীরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।"

গমনে আগমনে একই রকম ওড়ার বর্ণনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে হনুমান কোনো উড়ন্ত যানে চেপে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন।

এবার সমাগত বিমানের শব্দ শুনে ভারত উপকূলে অপেক্ষারত অঙ্গদ-বাহিনীর একটি কথাচিত্র এঁকেছেন মহাকবি : "বানরগণ...দূর হইতে বায়ু ক্ষুভিত মেঘের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় উঁহার [বিমানটির]...সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই

শব্দ শুনিবামাত্র সকলেই উহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল।" [সপ্তপঞ্চাশ সর্গ / সুন্দরকাণ্ড / অনু-হেমচন্দ্র / ব্রাকেট আমার]

বিমানটি অবতরণ করলে জিজ্ঞাসু বানরেরা গোলাকারে ঘিরে বসলেন বৈমানিক হনুমানকে এবং শুনলেন তাঁর কীর্তিকাহিনী। জানকীর খোঁজ পাওয়া গেছে। সুতরাং ভীত বানরেরা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে চলল সুগ্রীবকে সংবাদ দিতে। আনন্দের আতিশয্যে পথিমধ্যে তারা বালীর পৈতৃক মধুবনে ইচ্ছেমত ফলাহার করে বিজয়োল্লাসও করেছিল।

যুদ্ধযাত্রা

হনুমানের কাছে লঙ্কার খবর পেয়ে যুদ্ধের আয়োজন করতে হুকুম দিলেন রাম। সেনানায়ক নীলকে [জাতি, বানর] বলা হ'ল অগ্রবর্তী পদাতিক বাহিনী পরিচালনা করতে। নির্দেশ, যাত্রাপথ পরীক্ষা ক'রে পশ্চাদগামী সেনাবাহিনীকে সবুজ সঙ্কেত জানাবেন তিনি। যে পথে ফলমূল, পানীয় এবং জলের প্রাচুর্য, বিশাল বাহিনী নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সেটিই আদর্শপথ। লক্ষ্য রাখতে হবে, শত্রুর গুপ্তচর খাদ্য পানীয় যেন দূষিত করার সুযোগ না পায়।

রামের আদেশে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সমুদ্রতীরে স্কন্ধাবার [সৈন্য শিবির] স্থাপন করলেন। সৈন্যদলকে তিন ভাগে ভাগ করা হ'ল। সেনাপতি নীলও স্কন্ধাবার স্থাপন করেছেন সমুদ্রতটে। যুদ্ধের আয়োজন পরিদর্শনের পর উপোসী রামচন্দ্রের দেহমন আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। তিনি অপর সকলের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে আপন সুখ-অসুখের চিন্তায় বিভোর। ক্ষোভ প্রকাশ করে অনুজ লক্ষ্মণকে বলছেন, "কবে আমি তাহার [সীতা বা বেদবতীর] রক্তোষ্ঠ চারুদর্শন মুখকমল কিঞ্চিত উন্নত করিয়া উৎফুল্ল মনে চুম্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবৎ বর্তুল স্তনযুগল ঈষৎ কম্পিত করিয়া আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিবেন।..."

হা ঈশ্বর! এমনই এক ক্ষুধার্ত পুরুষ রাবণ অপেক্ষা গুণবান এবং তামাম ভারতবাসীর ভগবান ব'লে কথিত! আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, সর্বত্যাগী নফর লক্ষ্মণকে যখন রাম তাঁর বিচলিত অবস্থার কথা জানাতেন তখন কি লক্ষ্মণের মনে কোনো আকাঙ্ক্ষারই উদয় হ'ত না? তরুণ লক্ষ্মণ কি ছিলেন স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষা-বর্জিত এক অস্বাভাবিক পুরুষ?

ওদিকে যুদ্ধাভিযানে প্রস্তুত হচ্ছিলেন রাক্ষস রাজাধিরাজ রাবণও। রামচন্দ্রের সঙ্গে আর্য রাবণের চারিত্রিক তফাত এই যে, রাজা হ'লেও রাবণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। একতরফা হুকুম প্রচার করেন না। পাত্রমিত্র সভাসদ সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পরামর্শের জন্য।

রাবণের এই সভায় কুম্ভকর্ণও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ভাষণ দেন। কুম্ভকর্ণ সম্পর্কে আগেই আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। রোবট কুম্ভকর্ণটি যে রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণ নন এ তর্ক সেখানে রেখে বলেছিলাম, কুম্ভকর্ণের নামাঙ্কিত যন্ত্রযানটির পরিচালক ছিলেন রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। তর্কটি স্বয়ং বাল্মীকির সমর্থন লাভ করল। তিনি জানালেন, রাবণের সভায় কুম্ভকর্ণও ছিলেন অন্যতম বক্তা। অর্থাৎ এই কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন না। কুম্ভকর্ণ বলেছেন, সভাসদবর্গের পরামর্শ গ্রহণ না করেই রাবণ সীতাহরণ করেছেন। অতএব তাই নিয়ে বৃথা বাগাড়ম্বর নিষ্ফল। তবে ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তখন তিনি অবশ্যই শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এটিই উপযুক্ত কথা। রাজত্ব ও রাজরাণীকে লাভ করার জন্য সুগ্রীব বিভীষণের মতো স্বজাতিদ্রোহ ঘৃণ্য অপরাধ।

বিশ্বাসঘাতক বললেন, "কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, কুম্ভনিকুম্ভ ও অতিকায়, ইহারা সম্মুখে রামের কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না।"

ইন্দ্রজিৎ দুর্যোধনের মতোই স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ। দেবতাদের কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী নন। যুদ্ধে দেবতারা তাঁর শরক্ষেপে কী ভাবে মুড়িমুড়কির মতো গ্রাসে গ্রাসে নিঃশেষিত হয়েছে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইন্দ্রজিতের আছে। ইন্দ্রজিৎ এই কথা সহ্য করতে পারলেন না, বললেন, "কনিষ্ঠ তাত! আপনি ভয়শীলের ন্যায় অকারণ এ কী কহিতেছেন?...আমাদের বংশে বল ও বীর্য, তেজ ও ধৈর্য কেবল আপনারই নাই।"

উত্তরে বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে 'দুরাত্মন', 'মূর্খ', 'অবিনয়ী' ও 'উগ্রপ্রকৃতি' বলে গালিগালাজ করলেন।

বিভীষণের উগ্র আচরণে সভাসদরা বিস্ময়ে মূক। রাবণ অনেক সহ্য করেছেন এই জ্ঞাতিদ্রোহীকে। অতঃপর তিনি রুষ্ট হয়ে বললেন, "মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচ উচিত নহে।...জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই। একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রধান... জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতাপূর্ণ এবং

ইহারা ভয়ানক পদার্থ।" এই কথা বলে কনিষ্ঠকে বললেন, আমার উন্নতি সম্ভবত তোমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। বললেন, "রে কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্! যদি অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।"

রাবণ যদি বস্তুতই বিভীষণের প্রাণদণ্ড দিতেন, রাক্ষসজাতি তাহলে ঢের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারতো। কিন্তু ভায়ের প্রতি অসীম স্নেহবশতঃ তিনি তা পারেন নি। ফলে রাক্ষসকুলে এক মীরজাফরকে তিনি গোকুলে বাড়তে দিয়েছিলেন। ভুল করেছিলেন বালীর মতোই।

বিভীষণ তাঁর চারজন সহযোগীর সঙ্গে লঙ্কা ত্যাগ ক'রে চললেন বহুঈপ্সিত রামসংসর্গে যোগদান করতে। আশা, রাবণবধ এবং মন্দোদরী সহ লঙ্কার সিংহাসন লাভ। বিভীষণের এতাদৃশ আচরণ সত্ত্বেও রাবণ তাঁকে বন্ধ করার অথবা বধ করার আদেশ দিলেন না। বিভীষণের গুপ্তচরবাহিনীকে সযত্নে রেখে দিলেন নাশ-কর্তামূলক কাজকর্ম করার সুযোগ দিয়ে। একবার খোঁজও করলেন না লঙ্কা দুর্গের ভিতে বিভীষণ কোথায় কোথায় ফাট ধরিয়ে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্র রাবণরা এভাবেই নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ক্রয় করেছেন বেহিসেবী খরচ ক'রে। [১৬শ সর্গ, যুদ্ধকাণ্ড বা. রা., ভারবি]

বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ

তথাকথিত মহাত্মা বিভীষণ "যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্ত-মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন।...বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিভীষণের সঙ্গে চারিটি অনুচর,...উহাদের অঙ্গে বর্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া" তাঁদের শত্রুর চর বলেই গণ্য করলেন।

ওদিকে সমুদ্রতীর থেকে ক্রমশ সুগ্রীব-হনুমানাদির নিকটে এসে অন্তরীক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে ভাসমান যান থেকে বিভীষণ জানালেন, তিনি রাবণভ্রাতা। লঙ্কা ত্যাগ করে রামচন্দ্রের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন।

জ্ঞানী বৃদ্ধ বানর রাজনীতিকরা বিভীষণের আগমন নিয়ে বাগবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হলেন। অনেকের বক্তব্য, লোকটা ছদ্মবেশী গুপ্তচর। এসেছে রামসেনানীর সংবাদ সংগ্রহ করতে, সুতরাং এর থেকে সাবধান হওয়া উচিত। একমাত্র হনুমানই

জানতেন বিভীষণের স্বরূপ। রামকে তিনি বললেন,"বিভীষণ তোমার যুদ্ধচেষ্টা,রাবণের বৃথা বলগর্ব,বালীবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন।...তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়।"

সুগ্রীব নিজেকে চেনেন। তিনি নিজে যা করেছেন তা যে মহাপাপ এ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেলাম এক অদ্ভুত কথা, যাকে বলে 'ভূতের মুখে রাম নাম'। সুগ্রীব বললেন, "যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, সে দোষী কি নির্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনো উচিত নয়। সে যে সঙ্কটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?"

সব শুনে রাম বললেন, এমন লোকই তো আমাদের দরকার হে। বিভীষণ "রাজ্যলাভার্থী, স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য।... তাঁহাকে সংগ্রহ করা সঙ্গত হইতেছে। সখে! সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।"

ভরতের মতো ভাই সত্যিই বিরল। কিন্তু রামকথার নেপথ্যে যে সব ঘটনাবলী আমরা এ পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম তাতে কি এটাও মানা যায় যে রামের মতো পুত্র দুর্লভ? ঘটনাবলী জানাচ্ছে, রামচন্দ্র দেবতাদের চাপে পড়ে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির বাসনায় দাক্ষিণাত্যবিজয়ে বার হয়েছিলেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর বনবাস গল্পকথা মাত্র। আর সুগ্রীব? এই ভদ্রলোকের স্বার্থই পরমার্থ। রাম তার অকারণ প্রশংসা করলেন মাত্র। সুগ্রীবের সঙ্গে বিভীষণ চরিত্রের উনিশবিশ তফাত নেই। রাম সেটা ভালোমতই জানেন।

রামচন্দ্রের নির্দেশে অবশ্য সব তর্কের অবসান হ'লো। বিভীষণই হলেন রামের অন্যতম 'পরম ধার্মিক' পার্শ্বচর। তাঁকে সমাদরে আহ্বান জানানো হ'ল। তখন বিভীষণ "চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন।" 'গগনতল হইতে অবতীর্ণ' হওয়ার সংবাদে এখানে বিভীষণ-অধিকৃত একটি বিমানের উল্লেখ পাওয়া গেলো।

রাম-বিভীষণের গূঢ় ধর্মালাপ সাধারণ্যে অপ্রচারিত। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে এক টুকরো সংলাপ সকলের জ্ঞাতার্থে এখানে উদ্ধার করছি। ঐ সংলাপের মধ্যেই ধর্মের মহিমা ও গরিমা সুপরিস্ফুট হয়েছে। রাবণের সমরশক্তির সমস্ত গুপ্তসংবাদ নিবেদন ক'রে বিভীষণ রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমি রাক্ষসবধ ও লঙ্কাপরাভব

বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।" জ্ঞাতিদ্রোহী রাজ্যলোলুপ এই ঘৃণ্য পুরুষটিকে রাম সানন্দে "আলিঙ্গনপূর্বক প্রীত-মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।" দুই ধার্মিক সর্বজনপূজ্য অবতারের মৈত্রী স্থাপিত হ'লো বিশ্বাস-ঘাতকতা ও রাজ্যলোলুপতার ভিত্তিভূমির ওপর।

যন্ত্রযোগে সেতুবন্ধন

যুদ্ধকাণ্ডের একবিংশ সর্গে সমুদ্র নামক কোনো দক্ষিণদেশীয় ব্যক্তি রামকে সমুদ্রে সেতুবন্ধনের পরামর্শ দেন। আর্যপুরাণে সে ব্যক্তির পরিচয় লুপ্ত হয়েছে অলৌকি-কতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তাঁর ব্যক্তিত্ব লোপ করে তাঁকেই সমুদ্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বানর সেনাপতি নলের উল্লেখ করে বলেন, নল বিশ্বকর্মার[১] পুত্র এবং স্থাপত্য-বিদ্যায় পারদর্শী, তিনিই পারবেন সমুদ্রের বুকে সেতুবন্ধন করতে।

নলও "রামকে কহিলেন, বীর! সমুদ্র যথার্থই কহিয়াছেন।···আমি সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিব। বানরগণ আজই এই কার্যে আমায় সাহায্য করুন।"

আদেশমাত্র বানরসেনা কাজে লেগে গেলেন। জঙ্গল থেকে ভারি ভারি গাছের গুঁড়ি কেটে আনা হ'ল এবং নিকটবর্তী পর্বত থেকে "মহাবল বানরগণ হস্তিপ্রমাণ পাষাণ ও পর্বত সকল [প্রস্তর কড়ি] উৎপাটনপূর্বক **যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিলেন**।"

মহা কলরব সহকারে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হ'ল :

"···পাষাণ ও পর্বত বেগে যেমন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে এবং ঊর্ধ্ব হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নদিকে নামিতেছে। ফলত তৎকালে মহাসমুদ্র প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্বতে অত্যন্ত আলোড়িত হইতে লাগিল।···

১। বিশ্বকর্মা ছিলেন বানরজাতির কীর্তিমান পুরুষ, যন্ত্রবিদ এবং মহান স্থপতি। একটি মতে ময়দানব বিশ্বকর্মারই পুত্র। নল তাঁর ঔরসজাত সন্তান। ময় এবং নল দুজনেই পিতার বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। বিশ্বকর্মা রচিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাম, স্থাপত্য বেদ।

কেহ ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র[২] এবং কেহবা মানদণ্ড[৩] গ্রহণ করিল। অনেকে কেবল বৃক্ষশিলা বহিতে লাগিল। দানবাকার বানরগণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ [পাথর বিশেষ?] গ্রহণ পূর্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল।" [লক্ষণীয়, এখানে কোনো কাঠবিড়ালির গল্প নেই]

অবিশ্রান্ত কর্মতৎপরতার পর পাঁচদিনে সেতু নির্মাণ করে দিলেন বানর সেনাপতি নল। নল-নির্মিত সেতুবন্ধ দেখার জন্য দেবতারা হিমালয় থেকে উড়ে আসেন এবং চমৎকার সেই স্থাপত্য-কাজে পরম বিস্মিত হন।

এই ইতিবৃত্তটি থেকে আমরা নজর করার মতো দুটি বিষয় পেলাম। এক, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় তৎকালে বানরদের যে দক্ষতা ছিল তা দেবজাতীয় আর্য জাতির ছিল না। দুই, রাম আলোচ্য যুদ্ধে সম্পূর্ণতই ছিলেন পরনির্ভরশীল। বানর জাতি, ঘরশত্রু বিভীষণ এবং দেবতাদের সাহায্য ভিন্ন এই ক্ষত্রিয়পুত্রের আপন ক্ষমতায় কিছুই করার ছিল না।

সম্মুখ সমরে

ঘরের দুয়ারে শত্রু। যন্ত্রযোগে বাঁধা হয়ে গেছে লঙ্কা সেতু। সেতু পার হয়ে দেবসৈন্য আর বানরসেনারা এসে শিবির স্থাপন করেছেন লঙ্কা সংলগ্ন পার্বত্য দ্বীপে। রাবণ তখনও সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন তাঁর সেই প্রমোদভবনে। কেউ তাঁকে সতর্ক করে নি, কেউ বলে নি, মহারাজ! লঙ্কা এখন তোপের মুখে। উঠুন, জাগুন, রক্ষা করুন আপনার সোনার লঙ্কা! অদ্ভুত এক রাজ্যের রাজা দশদিক বিজয়ী দশানন। তাঁর একটি বিশ্বস্ত দক্ষ চরবাহিনী নেই, নেই কোনো সৎ মন্ত্রী। যে দু-একজনকে চর হিসেবে রামশিবিরে পাঠিয়েছিলেন, প্রত্যেকেই ব্যর্থ। ফিরে এসেছে তারা মুখে রামস্তুতি নিয়ে। শেষে ক্রুদ্ধ বিরক্ত রাবণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, সব অপদার্থ, "প্রভুর ভয়বিপদে কোনো অপ্রিয় বলা অনুজীবী ভৃত্যের অত্যন্ত অনুচিত।... আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল

২। মিস্ত্রিদের ওলনদড়ি।

৩। পলেস্তারা সমান করার লম্বা উশো!

আমার ভাগ্যবল।...তোদের কি মৃত্যুভয় নাই?...তোরা শত্রুর স্তুতিবাদক ও পাপিষ্ঠ।...তোরা মর, আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যা। তোরা বিস্তর উপকার করিয়াছিস, তজ্জন্যই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোরা কৃতঘ্ন ও নিঃস্নেহ..."

ক্ষমার প্রশ্রয়ে লঙ্কা হয়েছে অরাজক, আর রাবণ দুর্বলচিত্ত। গুপ্তচররা কী কারণে রামশিবির থেকে মগজধোলাই ক'রে ফিরছে রাজা হিসেবে সেটা অনুসন্ধান করাই ছিল রাবণের কর্তব্য। আধুনিক রীতিতে পুলিসী কায়দায় থার্ড ডিগ্রী প্রযুক্ত হলেই গোপন কথা ফাঁস হয়ে যেত। যা রাবণ বোঝেন নি, তা অরাজনীতিক আমরাও অনুমান করতে পারি। সন্দেহ হয়, লঙ্কার দূতকে পেলেই রাম-বিভীষণ তাদের প্রলোভনে উৎকোচে তুষ্ট ক'রে ফেরৎ পাঠাতেন, অথবা বেদবতী যেমন রাক্ষসীদের স্বদলভুক্ত করার জন্য বলেছিলেন, রাম লঙ্কা অধিকার করলে রাবণ-কিঙ্করীদের তিনি রক্ষা করবেন, পুরস্কৃতও করবেন, অনুমান হয়ত অমূলক হবে না, যদি মনে করা যায়, বিভীষণও অনুরূপভাবে রাবণানুচরদের প্রলুব্ধ করতেন। হয়ত তাদের বলা হ'তো, খুব শীঘ্রই রাবণের পতন ও বিভীষণের জয় হবে। তখন প্রাণে বেঁচে উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে, যদি তারা রামের অনুগামী হয়। হয়ত লঙ্কায় ফিরে শত্রুর পক্ষে প্রচার করার উপদেশও তাদের দেওয়া হতো। তারা জানতো রাবণের দুর্বলতা। সহজে কারও প্রাণদণ্ড দিতে পারেন না রাবণ। বিশেষত দেশবাসী ও প্রজাদের তিনি স্নেহ করেন। তাই তারা সাহস পেতো রাবণের সভায় এসে রামের স্তুতি করতে এবং সভাসদ্দের মনোবল ভেঙে দিতে। তারা তো দেখেছে, কতবড় অপরাধের পরও বিভীষণকে তার মিত্রবর্গ সহ দেশত্যাগ করার সুযোগ দিয়েছেন রাবণ। পুষেছেন সেই কালসর্পকে দুধেভাতে। বুদ্ধিমানে তাই এমন দুর্বল রাজার পক্ষ ত্যাগ করাই শ্রেয় গণ্য করেছিল এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সে গণনায় ভুল ছিল না।

ইন্দ্রজিৎ যতবড় বীরই হোন, বিচারবুদ্ধিতে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারীই ছিলেন। তাই পরাস্ত শত্রুকে বিনাশ না করে রণক্ষেত্রে আধমরা ফেলে রেখে এসেছেন। কথায় বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। রাবণ-রাবণি কিন্তু শত্রুকে জিইয়ে রেখে যুদ্ধশেষে ক্লান্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন। অহঙ্কার আর আস্ফালনই তাঁদের রাজনৈতিক বুদ্ধি নষ্ট ক'রে দিয়েছিল।

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রাথমিক যুদ্ধে জয়লাভ করেন বালীপুত্র তরুণ অঙ্গদ কিন্তু পরাস্ত হন রামলক্ষ্মণ। অঙ্গদের জয় পুরাণকারের মনোমত ঘটনা। কিন্তু যেই একই যুদ্ধে রামলক্ষ্মণকে ধরাশায়ী করলেন ইন্দ্রজিৎ, অমনি একটি শ্লোক লিখে

ঘোষণা করা হল, ইন্দ্রজিৎ 'পাপস্বভাব' কূটযোদ্ধা। বস্তুত মহা পাপিষ্ঠ না হলে কেউ ধনুকে টঙ্কার পড়ামাত্র "ক্ষণকালমধ্যে" অবতার রামচন্দ্র সহ অনুজ লক্ষ্মণকেও শরাঘাতে অজ্ঞান ও মুমূর্ষু ক'রে দিতে পারেন? এ ধরনের যুদ্ধ করা বস্তুত ইন্দ্রজিতের খুবই অন্যায় হয়েছে। ব্রাহ্মণরা সব সময় সর্বঅবস্থায় রামচন্দ্রকে জিতিয়ে দেন। ধার্মিকের সেটাই ধর্ম। ইন্দ্রজিৎ মহা পাপিষ্ঠ। তাই না যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র রাম ও লক্ষ্মণকে ধরাশায়ী করলেন। সুতরাং এতো বড় অনাচারের একটা বিহিত করতে হয়। বুদ্ধিমান কোনো পুরাণকার অথবা বাল্মীকি স্বয়ং-ই তার উপায় বার ক'রে ফেললেন। মূর্খ শ্রোতাদের ভক্তিভাব অবিচলিত রাখার মানসে চট ক'রে তাঁরা লিখে ফেললেন, "সে [ইন্দ্রজিৎ] ব্রহ্মার বরে গর্বিত" [যুদ্ধকাণ্ড ৪৪স]। এই বচনটি ব্রহ্মাবাদীদের দারুণ মনোমত হয়েছিল। একই কৌশলে তাঁরা মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বচনটির নির্বিচার ব্যবহার ক'রে গেছেন। শত্রুপক্ষের বীরত্ব কখনই মেনে নেওয়া যায় না। তাই ভক্তদের তাঁরা বিশ্বাস করতে বলেছেন, শত্রুমিত্র যে কেউ, বীর হ'লেই বুঝতে হবে, সেই বীরত্ব লাভ করেছে তারা ব্রহ্মার বরে। মিত্রপক্ষের কেউ বিনষ্ট হ'লে নিরুপায় বেচারীর পরাজয় ঘটেছে ব্রহ্মারই অভিশাপে। অর্থাৎ ব্রহ্মা একটি সুপক্ক কাঁঠালি কলা, সর্বঘটে সেটিকে স্থাপন ক'রে পুরাণকাররা পরিতুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের সুবিধে, কেউ কোনোদিন এসব উদ্ভট রচনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সুযোগ পান নি। এতোকাল ভারতবাসী বিশ্বাস করেছে, ব্রহ্মা অমর, বিভীষণ হনুমানরাও ব্রহ্মার বরে অমরত্ব পেয়েছেন। সুতরাং ভয় তো থাকবেই।

পুরাণ ঘেঁটে আমরা কিন্তু জেনে গেছি, ভারতবর্ষে ব্রহ্মা নামক দেবজাতীয় পুরুষটির আবির্ভাব ঘটে মাত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধসমসাময়িক কালে। তার আগে ব্রহ্মা নামক কোনো পুরুষের অস্তিত্ব ছিল না, ছিল 'ব্রহ্ম' বা 'পরমব্রহ্ম' নামক নির্গুণ এক সর্বময় শক্তির ভাবকল্পনা। আমরা জেনেছি, ব্রহ্মা খেতাব নিয়ে একাধিক পুরুষ ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এককালে। তিনিও জাগতিক নিয়মের অধীন জরামৃত্যুশীল। ক্রমশ ব্রহ্মা হঠে গেছেন এবং ব্রাহ্মণরা তাঁর পূজাপাঠও সীমিত ক'রে দিয়েছেন। ব্রহ্মার প্রভাব প্রতিপত্তি শোচনীয়ভাবে খর্বিত হয়েছে।[১] অতঃপর তিনি এখন ইতিহাস মাত্র। তাঁকে ভয় করার আর কোনো কারণ নেই। দেবমন্ত্রীর শাসন থেকে বহু হাত-ফেরত হয়ে ভারতবাসী আজ প্রধানমন্ত্রীর

১। লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির', ২য় সং দ্র।

শাসনাধীন। এখন ইতিহাস গদীনসীন প্রধানমন্ত্রীদেরই স্তুতি করবে। ব্রহ্মার ভূত ভারতবাসীর কাঁধ হালকা করে সরে পড়েছে। এখন প্রশ্ন করা যাবে, ব্রহ্মা কি কুম্ভকর্ণের মতো রোবট ছিলেন? তাঁরও কি আপনপর ভেদজ্ঞান ছিল না? শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামার জন্য মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি সেই শত্রুকেই বরদানে বলীয়ান করবেন? রাবণ ইন্দ্রজিৎরা যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণবর্জন করেছেন, ততক্ষণ ব্রহ্মাই তাঁদের আগলে রেখেছিলেন, এই অবিশ্বাস্য প্রস্তাবটি সুতরাং গ্রাহ্য করা যায় না। ইন্দ্রজিতের আক্রমণে রাম লক্ষ্মণের স্বাভাবিক পরাজয়ই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ফিরে যাই যুদ্ধক্ষেত্রে।

রুধিরাক্ত অজ্ঞান রাম লক্ষ্মণকে দেখে ইন্দ্রজিৎ মনে করলেন, দুই ক্ষত্রিয় বীরই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন, অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে আর বৃথা পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন। তিনি শত্রুর প্রকৃত অবস্থার খোঁজও করলেন না। মৃতপ্রায় রামলক্ষ্মণকে ঘিরে বিভীষণ সহ বানর যূথপতিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এই দুর্বল মুহূর্তটির সুযোগ নিলে ইন্দ্রজিৎ সেদিন রামের সেনাবাহকে তছনছ ক'রে দিতে পারতেন। সামরিক মূঢ়তা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং অনুমান-নির্ভর রাজনীতির জন্য সে সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে পারেন নি। রামলক্ষ্মণের মৃত্যু-সংবাদ শুনে রাবণও পরম নিশ্চিন্তে বিজয়োল্লাস শুরু করলেন। ওদিকে তখন বিভীষণ কাতর কণ্ঠে বলছেন, "হায়, আমি যাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ কামনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জীবনমৃত্যু, রাজ্যকামনা দূর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপরিহার সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।"

এদিকে রাম ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করে দেখলেন, লক্ষ্মণ মৃতপ্রায়। প্রথম সম্মুখ সমরেই দুই বীর চূড়ামণির ইন্তেকাল আসন্ন। তখন তিনি সাশ্রুনেত্রে বিলাপ ক'রে বললেন, হায়, আমার দ্বারা সীতা উদ্ধার সম্ভব হ'ল না। লক্ষ্মণকে হারিয়ে আমি আর কোনমুখে ভরতের কাছে ফিরে যাব! বিভীষণকেও রাক্ষসদের অধিরাজ করার প্রতিজ্ঞা অসফলই থেকে যাবে। ক্ষীণকণ্ঠে রাম সুগ্রীবকে বললেন, "সুগ্রীব! ...তুমি আমার মিত্র...এক্ষণে তোমার যতদূর সাধ্য করিলে কিন্তু তাহা আমারই ভাগ্যদোষে বিফল হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য করিয়াছ, এক্ষণে আমি কহিতেছি, যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।"

শরবিদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বললেন, "বৎস! আমি পূর্বকালে দেবাসুর সংগ্রাম দেখিয়াছি: ...সুরগুরু বৃহস্পতি...ঔষধিপ্রভাবে...পীড়িত হতজ্ঞান

ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিৎসা করিতেন।...ঐ ঔষধির নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী[২], উহা দেবনির্মিত ও পার্বত্য। উহা বানরগণের অপরিচিত নহে।"

সুষেণের পরামর্শমত হনুমানকে ভেষজ উদ্ভিদ বিশল্যকরণী আনতে পাঠানোর জন্য যখন রামশিবিরে পরামর্শ চলছে ঠিক তখনই বিষ্ণুবিমানের চালক গড়ুর সেখানে উপস্থিত হলেন। গড়ুরের পরিচর্যায় রাম লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। গড়ুর জানালেন, তিনি রামের সঙ্কট সংবাদ পাওয়ামাত্র তাঁর সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়েছেন। গড়ুর বিষ্ণুর বিমানচালক। বিশল্যকরণী তিনই এনেছিলেন, হনুমান আনেন নি।

এরপর যে যুদ্ধকথা বর্ণিত আছে তা পাঠ করার সময় মনে হয়, পাঠক আমি যেন কোনো সাবেকী যাত্রার আসরে বসে আছি। সাজঘর থেকে মাঝে মাঝে একের পর এক কুশীলব আসরে আসছেন এবং খুব কিছুক্ষণ ছুটোপাটি করে রাক্ষসপক্ষের এক এক সেনাপতি ধরাশায়ী হচ্ছেন। একজন মরলে, রাক্ষসপতি রাবণ অপরজনকে সমরাঙ্গনে আত্মদান করতে পাঠাচ্ছেন। এমন দফায় দফায় পতঙ্গের মতো মৃত্যুবরণ করতে আসার নজীর পৌরাণিক কথায় সবত্র সুলভ নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে রথী-মহারথীগণ একযোগেও লড়াই করেছেন। রাবণের রণনীতি ছিল অদ্ভুত। এক সেনাপতির মৃত্যুসংবাদ রাজপুরে এসে পৌছালে তবেই তিনি দ্বিতীয় জনকে পাঠাতেন, যেন যুদ্ধটা ক্রিকেট খেলা, একটি উইকেট পতনের পর অপেক্ষমাণ পরবর্তী খেলোয়াড়কে মাঠে নামতে হবে। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, রামসেনাপতিদের কারও মৃত্যুসংবাদ নেই, লড়ামাত্র খতম হয়ে গেছেন শুধু রাক্ষস সেনাপতিরা। রামপক্ষের সেনাপতিরা একযোগেই আক্রমণ করতেন শত্রুপক্ষকে।

রাবণ শিবির থেকে পর পর যাঁরা লড়ায়ে নামলেন ও আউট হয়ে গেলেন এবার তাঁদের কথা বলব। যুদ্ধের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কেন না যুদ্ধের বিবরণ

২। বিশল্যকরণী—এক ধরনের লতা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে গুলঞ্চলতা, অগ্নিশিখা বৃক্ষ, ত্রিপুটা, অজমোদা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে এই লতার প্রাপ্তিস্থান হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে ক্ষীরোদ সমুদ্রে দেবনির্মিত চন্দ্র ও দ্রোণ নামক দুটি পর্বতের নাম। পুরাণে গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণী পাওয়া যায় বলে উল্লেখ আছে। বিশল্য অর্থ, শল্যবিযুক্ত, করণী, শক্তিধারক ও শল্যক্ষত নিরাময়কারক ঔষধি।

পরবর্তী কালে লিখিত হয়েছে, তা সঞ্জয়দৃষ্ট সাক্ষাৎ ঘটনাবলীর মত প্রত্যক্ষ প্রতি-বেদন নয়।

ধূম্রাক্ষের পর এলেন ও আউট হলেন যাঁরা এবং বানরপক্ষে যাঁরা তাঁদের পতন ঘটালেন পর পর তাঁদের নামগুলি নিচে সাজিয়ে দিলাম।—রাক্ষস সেনাপতি ১) বজ্রদংষ্ট্র প্রবেশ এবং অঙ্গদের কাছে পরাভব ও বিনাশ। ২) রাক্ষস সেনাধ্যক্ষ প্রহস্ত সহ মহাবীর অকম্পনের রণস্থলে প্রবেশ ও হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু। নীলের হাতে পরাস্ত ও নিহত হলেন প্রহস্ত।

তখন রাবণ এলেন সম্মুখ সমরে। জমে উঠল রণক্ষেত্র। রাম লক্ষ্মণকে দূর থেকে রাবণ সহ তার পার্শ্বচরদের চিনিয়ে দিলেন বিভীষণ।

রাবণ একে একে বিমোহিত করলেন বানরবীর হনুমান, নীল প্রমুখকে। কিন্তু কারকেই তিনি হত্যা করলেন না। শত্রুর পতন দেখে সহাস্যে তাকে ছেড়ে দিয়ে অপর বানরবীরকে পরাস্ত করার আনন্দেই মশগুল হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে রাম উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করলে লক্ষ্মণ বললেন, আপনি থাকুন। আমিই যাচ্ছি। দশাননকে পরাস্ত করে ফিরে আসব। রাম তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, বেশ, তাহলে তুমিই যাও, তবে সাবধানে যুদ্ধ কোরো। অল্পক্ষণেই লক্ষ্মণ পরাস্ত এবং রাবণের হাতে বন্দী হলেন। হনুমান সসৈন্যে এগিয়ে এলেন লক্ষ্মণকে মুক্ত করতে আর লক্ষ্মণও মুক্তি পেয়ে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

রাবণের হাতে প্রচুর বানরসেনা নিহত হ'লে রাম হনুমানের কাঁধে [অর্থাৎ বিমানে] চেপে রণস্থলে উদিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাবণের শরাঘাতে হনুমান আহত হলেন। এ যুদ্ধ সেদিন অবশ্য অসমাপ্তই রইল। দুই নেতা ফিরে গেলেন আপনাপন শিবিরে।

রণক্ষেত্রে যন্ত্রদানব কুম্ভকর্ণ

ইতিপূর্বে রোবট প্রসঙ্গে যন্ত্রদানব কুম্ভকর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক, কুম্ভকর্ণের পতন কিভাবে ঘটেছিল। আগেই বলেছি কুম্ভকর্ণ ছিলেন এই যন্ত্রের চালক। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধের ঘটনাকে এইভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়।

আকাশপথে যুদ্ধরত হনুমান কুম্ভকর্ণ যন্ত্রটির ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করলে মানুষ কুম্ভকর্ণ আহত হন এবং তাঁরই নির্গলিত রুধিরধারার প্রসঙ্গ রামায়ণে কথিত হয়েছে। রাক্ষসবার কুম্ভকর্ণের অস্ত্রাঘাতে হনুমান ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। অঙ্গদও একবার মূর্ছিত হ'য়ে পড়েন সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের হাতে বন্দী হয়েছেন। শেষে বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ বানরদের দেখালেন যে যান্ত্রিক কুম্ভকর্ণের বানর রাক্ষস ভেদ-জ্ঞান নেই। সামনে যাকে পাচ্ছে যান্ত্রিক হাতে তাকেই নিষ্পিষ্ট করছে। অতএব বহুসংখ্য বানর একযোগে চতুর্দিক থেকে তাকে আক্রমণ ক'রে পর্যুদস্ত করুক। তখন প্রতিপক্ষের সর্বশক্তি কুম্ভকর্ণনিধনে প্রযুক্ত হ'ল। আশ্চর্যের কথা এই সময় রাক্ষসপক্ষের অন্য কোনো বীর কুম্ভকর্ণকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন না। অতএব তার পতনও অনিবার্য হ'লো।

পতন হ'লো কুম্ভকর্ণের, সেই সঙ্গে বিনষ্ট হলো রাক্ষসজাতির একটি বড় বল ভরসা। যে সাঁজোয়া গাড়ি দেবতাদেরও ছিল না, নিতান্ত অবহেলায় সেটিকে নষ্ট হয়ে যেতে দিলেন আত্মতৃপ্ত রাবণ।

রাবণের সাজঘরে তখনও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রণসাজে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষমাণ ছিলেন, রাবণপুত্র নরান্তক ও ত্রিশিরা, বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর ও মহাপার্শ্ব। আবার বাঁশি বাজল, আসরের বাদকরা বেহালায় ছড়ি টানলেন। পর্দার আড়াল ঠেলে রণপ্রদর্শন-ক্ষেত্রে বেরিয়ে এলেন রাক্ষস সেনারা। শুরু হ'ল তুমুল সংগ্রাম। এই যুদ্ধটিও লড়লেন তরুণবীর অঙ্গদ। রাম লক্ষ্মণ দর্শকমাত্র, যদিও সর্বকৃতিত্বের ষোল আনা অংশীদার। নরান্তক একটা দর্শনীয় লড়াই শেষে প্রাণ হারালেন অঙ্গদের অস্ত্রে। ত্রিশিরা নিহত হলেন হনুমানের হাতে। পুরো যুদ্ধটাই লড়ে দিলেন অঙ্গদ হনুমান আর সুগ্রীব। ভগবান রামচন্দ্র আড়ালে রইলেন। হঠাৎ দেখা গেল রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন রামানুজ লক্ষ্মণও। লড়ছেন তিনি রাবণপুত্র অতিকায়ের সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না। এই যখন অবস্থা তখন দেবতা বায়ুকে দেখা গেল লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে মিলিত হ'তে। বায়ুর নির্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে লক্ষ্মণ বধ করলেন অতিকায়কে। বিজয়তারকা চিহ্নটি লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে যুক্ত হ'লো। প্রশ্ন জাগে, এই জয়ের সম্মান কি একা শুধু লক্ষ্মণেরই প্রাপ্য? বোধ হয় অতটা জয়ধ্বনি লক্ষ্মণের জন্য রিজার্ভ রাখা যায় না, এর সিংহভাগের দাবি-দার দেবতা বায়ু।

রাবণের রণনীতি যদি শত্রুর শেষ না রাখার সম্বন্ধে দৃঢ় হ'ত তাহলে একা ইন্দ্রজিৎই পারতেন অবরুদ্ধ লঙ্কাকে নিঃশত্রু করতে। কিন্তু রাবণ তাঁর সেনাপতিদের

তেমন শিক্ষা দেন নি। অতিকায়ের মৃত্যুর পর রণাঙ্গনে একাকী ইন্দ্রজিৎ আবার অবির্ভূত হয়েছিলেন। রামপক্ষে রামলক্ষ্মণ সহ সকল বানরযূথপতিগণ একত্রেও তাঁকে ঠেকাতে পারেন নি। রামায়ণের প্রতিবেদন, "মহাবীর ইন্দ্রজিৎ...শর নিক্ষেপপূর্বক হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরী, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্যানন, জ্যোতির্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ নল ও কুমুদকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন।"

"অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন!" এই পর্বে রণক্ষেত্রের একটি অপূর্ব বর্ণনাও পাওয়া যায়।

রামপক্ষে রণক্ষেত্র শ্মশানমূর্তি ধারণ করল। নিহত বানর সেনার শবস্তূপে মেদিনী তখন সমাকীর্ণ। আহত ছিন্নাঙ্গ বানরদের আর্তরবে ঘোর রজনী ভয়াল ভয়ার্ত হয়েছে। শুধু জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন হনুমান। শবস্তূপ এড়িয়ে অন্ধকারের আবর্তে খুঁজে খুঁজে তিনি সন্ধান পেলেন বিভীষণের। বিভীষণ ও হনুমান সেই মহাশ্মশানে খুঁজতে লাগলেন স্বপক্ষীয় বীরদের।

শরাহত জাম্ববানকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা।

পরের চিত্রটি রামায়ণের হেমচন্দ্রকৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধার করি : ..."বিভীষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য! আপনি কি জীবিত আছেন?

"জাম্ববান অতিকষ্টে...কহিলেন, বিভীষণ! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমাকে চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, ...হনুমান ত জীবিত আছেন?

"বিভীষণ কহিলেন,...আর্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের কোন উল্লেখ না করিয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসিছেন?...

"জাম্ববান কহিলেন, (কারণ) যদি ঐ বীর জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জীবিত।"

পরে তিনি হনুমানকে বলিলেন, "তুমি বানর ও ভল্লুকগণকে প্রাণ দান কর। রাম ও লক্ষ্মণ মৃতকল্প [হায়, বিষ্ণুপুত্রদের কী দুর্গতি! বানরে তাঁদের প্রাণদানের ব্যবস্থা করছে!], এক্ষণে ইহাদিগের শল্য উদ্ধার কর। বৎস! তুমি...হিমাচলে যাও।...তথায় কৈলাস পর্বত দেখিতে পাইবে! [ঋষভগিরি ও কৈলাস] ঐ দুই পর্বতের মধ্যস্থলে সর্বৌষধিসম্পন্ন ঔষধি পর্বত আছে।...উহার শিখরে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চারিপ্রকার ঔষধ দেখিতে পাইবে।

…ঐ চারিটি ঔষধি শীঘ্র লইয়া আইস…"

জাম্ববান জানতেন, একমাত্র হনুমানই হিমালয় থেকে ওষুধ আনতে সক্ষম। তাই তিনি বলেছিলেন, হনুমান বেঁচে থাকলেই মরণাপন্ন বানর ভল্লুক এবং ভগবান রামলক্ষ্মণ বেঁচে যাবেন। জানা গেল, ঋষভ ও কৈলাসের মধ্যবর্তী পর্বত থেকে ঐ চার জাতির ঔষধি নিয়ে আসেন হনুমান।

কিন্তু ঋষভ পর্বতের এক চাবড়া মাটিকেই পুরাণকার বানিয়ে দিলেন পুরো একটি গন্ধমাদন পর্বত। বলা হ'ল হাতে গন্ধমাদন নিয়ে হনুমান সাঁতরে চলে এলেন। গন্ধমাদন উৎপাটনের মতোই আর এক আষাঢে গপ্পো, কৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্ধন পর্বত ধারণ। 'হরিবংশ' পুরাণে উল্লেখ আছে যে, গোবর্ধন পর্বতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি গুহা সৃষ্টি করেন দেবতারা। গুহার ঢালু কিনারে হাত রেখে বাসুদেব দাঁড়িয়েছিলেন। তাকেই বলা হয়েছে, গোবর্ধন-ধারণ। যদুবংশ [ব্রজপর্ব] বইটিতে পর্বত বিদারণের বর্ণনাটি উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছি, কিভাবে বাসুদেবের ভাগবত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হরিবংশ পুরাণের বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য গায়েব করে পুরাণকার কৃষ্ণের অলৌকিক কীর্তি বিষয়ক অপর এক নব-উপন্যাস রচনা করেছেন।

রামচন্দ্র ও সুগ্রীব মহাবীরের তৎপরতায় সুস্থ হওয়া মাত্রই বানর সেনাদের হুকুম দিলেন ঘুমন্ত লঙ্কা নগরী চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ঘরে ঘরে অগ্নি সংযোগ করো, পুড়িয়ে মারো আবালবৃদ্ধবনিতাকে। দেখতে দেখতে নিদ্রিত লঙ্কায় অতর্কিত অগ্নিদাহন শুরু হয়ে গেল। রাম যুদ্ধের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করলেন এই-ভাবে। রাবণের প্রশাসনিক চরম ব্যর্থতার এটি আর এক সাক্ষ্য। তাঁর পুরী রক্ষার জন্য কোনো প্রহরীই কি জেগে ছিলেন না? নাকি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিভীষণের মতোই বানরসেনাকে খুলে দিয়েছিলেন নগরদ্বারগুলি?

সুগ্রীব বড় নির্মম ও কঠোর শাসক। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কোনো বানর সেনা যুদ্ধ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। ওদিকে রাবণ তাঁর বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের এবং বিভীষণেরও, অপরাধ ক্ষমা করে বল্লেন, তোরা এককালে বহু উপকার করেছিস, তাই তোদের বধ করলাম না। যা প্রাণ নিয়ে আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা। ফলে তাঁর শোচনীয় পরাজয় হল।

পরবর্তী যুদ্ধও লড়লেন অঙ্গদ, দ্বিবিদ, সুগ্রীব, হনুমান। রামচন্দ্র যে একে-বারেই অকর্মণ্য নন সম্ভবত এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য তিনি খর রাক্ষসের তরুণ পুত্র মকরাক্ষকে বধ করেছিলেন, অবশ্য আষ্টেপৃষ্ঠে দেববাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত

অবস্থায়। কিন্তু যেই মাত্র পর্দা ঠেলে আবার এলেন ইন্দ্রজিৎ, অমনি "মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন।"

মায়াসীতা বধ

ইতিমধ্যে একটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে গেল। ইন্দ্রজিতের বিমান ফিরে এলো রণক্ষেত্রে। দেখা গেল বিমানে চাপিয়ে ইন্দ্রজিত রোরুদ্দমানা সীতাকে নিয়ে এসেছেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁকে খড়্গাঘাত করছেন। চোখের সামনে সীতার মৃত্যু দেখে রামপক্ষ ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তখন সেইটুকু মজা করে এবং শত্রু নিধন না করেই ফিরে গেলেন ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রজিতের বিমানে সীতার বিনাশ লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, "আর্য!…ধর্ম আপনাকে অনর্থ-পরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং ধর্মনামে সুখসাধক কোন একটি পদার্থ নাই।…ধর্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত, অসংকল্প ও স্বকর্তব্যজ্ঞানে অক্ষম।…ধর্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর ও কার্য সাধনে অসমর্থ, উহা দুর্বল, কার্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়।…আমার মতে সেই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কখনও উচিত হয় না।…সর্ব প্রযত্নে ধর্মের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া আপনি পৌরুষকে আশ্রয় করুন।"

মনে রাখতে হবে লক্ষ্মণ বা দুর্যোধনাদি তৎকালীয় রাজন্যবর্গ যাকে ধর্ম বলে জানতেন এবং যে ধর্মের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে ধর্মের অর্থ ছিল ভিন্ন। 'ধর্ম' বলতে তখন কোনো আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরচিন্তা, সৎকর্ম ও মহান ভাব বোঝাতো না। 'ধর্ম'-এর অর্থ ছিল ধারণ করা ও 'বেঁধে রাখা'।

লক্ষ্মণের কথা শুনে হা হা করে দৌড়ে এলেন বিভীষণ। তাঁর অভীষ্ট পূরণ হয় নি। লঙ্কার সিংহাসন এখনো নাগালের বাইরে। এ সময় যদি যুদ্ধ থেমে যায় তো এই জাতিদ্রোহীর সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বিভীষণ বললেন, "রাবণের অভিপ্রায় আমি সম্পূর্ণই জানি। সে কখনও তাঁহাকে [সীতাকে] বধ করিবে না।"

খুব সত্য কথা। যে রাবণ বিশ্বাসঘাতক বিভীষণকে এবং অন্যান্য কুতঘ্নকেও স্নেহবশত প্রাণদণ্ড না দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁর মতো মানুষ কখনই স্ত্রীহত্যা

করতে পারেন না, এটা রাজ্যলোভী বিভীষণ ভালোই জানতেন। যদিও রামকে ভায়ের সেই গুণের কথা না বলে বললেন, রাবণ পশুটা সীতার প্রেমে পড়েছে! সে তাঁকে মারতে পারে না। বিভীষণ যে কতবড় শয়তান কুচক্রী, এই উক্তি তারই আর এক জলন্ত প্রমাণ।

তিনিই রামকে বললেন, "ইন্দ্রজিৎ যাহাকে বিনাশ…করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা।"

আগেই বলেছি, সে যুগে রোবটের অসম্ভাব ছিল না, রাবণের ছিল চামরবিজন-কারিণী রোবটকিঙ্করী। হোমারের কাব্যেও মায়াময়ী যন্ত্রমানবীর সংবাদ আছে। তাই বিভীষণ জনতেন, রাক্ষস-বিজ্ঞানীরা এমনই একটি মায়াসীতা প্রস্তুত ক'রে ইন্দ্রজিতের বিমানে তুলে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রজিৎ তাকেই দেখিয়ে গেছেন। ফিরে যাওয়ার সময় ইন্দ্রজিৎ ভাবেন নি যে বিভীষণ সেই যন্ত্রমানবীর বিষয় শত্রুর কাছে ফাঁস ক'রে দিতে পারে।

বিভীষণ রামকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আজ আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।" আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব। তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর।"

রাম দেখলেন, ভালো প্রস্তাব। নিজে কোনো ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না তাঁকে। সেবাদাস লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দিলেই সমস্যা চুকে গেল। সুতরাং হৃষ্টমনে তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন, "বৎস! তুমি মহাবীর হনুমান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানর সৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দুরাত্মাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ…তোমার অনুগমন করিবেন।"

নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিৎ নিধন

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারিজন অমাত্যের সহিত এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।…লক্ষ্মণ…ব্রহ্মার নির্দেশক্রমে…বিভীষণ অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত" নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হলেন।

বিভিন্ন বানর যূথপতিগণের নেতৃত্বে পর্বে পর্বে ভাগ হয়ে নিকুম্ভিলা অবরোধ করেছেন লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিৎ তখনও অকুস্থলে এসে উপস্থিত হন নি। রাবণ সেই

অবরোধের কোনো সংবাদও পান নি। ঘরের দুয়ারে শত্রুর সেনা। ওদিকে প্রাসাদে রাবণ পরিতৃপ্ত। না, ভাবা যায় না এমন নিশ্চিন্ত রাজপরিবারের কথা।

তখন "বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিতকর কার্যসাধক বাক্যে কহিলেন, বীর! ঐ যে অদূরে মেঘশ্যামল রাক্ষস সৈন্য দেখিতেছ, তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উহাদের যুদ্ধ প্রবর্তনা করিয়া দেও। তুমি উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে যত্নবান হও। উহারা ছিন্নভিন্ন হইলে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে।...বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর।"

যথার্থ খুল্লতাতের কীর্তি। শয়তানের শেষ রাখতে নেই, এই অমোঘ সত্যটি না বুঝে বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের অন্তিম মুহূর্ত সমাগত হয়ে এলো।

রাক্ষস সৈন্য বিপদগ্রস্ত এই সংবাদ শুনে রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন তরুণ ইন্দ্রজিৎ।

"ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, "রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস।...বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া কিরূপে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্মদ্রোহী! সৌহার্দ্য, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্যাকার্যের নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।...পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নিগুর্ণও হয় তাহা হইলে ঐ নিগুর্ণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া পরপক্ষ আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়।"

ইন্দ্রজিতের মতো তরুণ রাজপুরুষের এই দেশপ্রেম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার কথা আর সেই কাজটি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করে গেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিভীষণ বললেন, যে, "পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রী দূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদগণের সর্বদাই শঙ্কা হয়, সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে।...বৎস! রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই কারণ। তুমি পূর্বে যে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ।"

কথায় বলে শয়তানের ছলের অভাব হয় না। বিভীষণেরও হয় নি। কিন্তু আমরা জানি, লঙ্কা ত্যাগের নেপথ্যে বিভীষণের ছিল রাজা হওয়ার ও পরস্ত্রী ভোগের ঘৃণ্য বাসনা।

লক্ষ্মণ হনুমান-বিমানে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর উড্ডীন ছিলেন। তাঁকে

চারিপাশে আগলে রেখেছিল দেবসেনাপতিরা। এ তথ্য পরে প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দ্রজিৎও বিমানারূঢ়। রামায়ণের প্রতিবেদন, "উঁহারা অন্তরীক্ষগত [আকাশমার্গে] দুইটি গ্রহের ন্যায়…ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।" বানর-ভল্লুক যূথপতিদের সঙ্গে এবার চার অমাত্য সহ বিভীষণও যুদ্ধে নেমে পড়লেন। অর্থাৎ যেন অভিমন্যু বধ পর্ব শুরু হ'ল। বিভীষণ ডাক দিয়েছেন, রাম ও দেবতার পক্ষে যে যেখানে আছ এসো, আজ ইন্দ্রজিৎ বধ করতেই হবে। একা ইন্দ্রজিৎ-ই এখন রাবণের একমাত্র ভরসা। এঁকে খতম করা গেলে নিঃসম্বল রাবণকে সবাই মিলে শেষ করে দেওয়া অসম্ভব হবে না। সে ডাকে লঙ্কার প্রচ্ছন্ন রাবণবিরোধী গোষ্ঠীও হয়ত সাড়া দিয়েছিল।

নিকুম্ভিলার যুদ্ধে বিভীষণই কর্তা, তিনি নির্দেশ দিলেন, "বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের সন্নিহিত [পার্শ্বরক্ষক] অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর।"

ওদিকে "ঋষিগণ, পিতৃগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং গন্ধর্ব প্রভৃতি লক্ষ্মণকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন"।[১]

একা ইন্দ্রজিৎ অসহায়ের মতো চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে যখন যুদ্ধ করছেন, না জানি তখন রাবণ প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনার জন্যই রাজপুরীতে অপেক্ষা করছিলেন কেন? কেন তিনিও সসৈন্যে পুত্রকে রক্ষা করতে আসেন নি! এই গূঢ়তত্ত্বের কোনো জবাব নেই রামায়ণকথায়। নিহত হলেন ইন্দ্রজিৎ। তাঁর মস্তক দেহচ্যুত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হ'ল লক্ষ্মণের ঐন্দ্রবাণে।[২]

বিজয়ভেরী বাজাতে বাজাতে যখন বিভীষণ ও লক্ষ্মণ সবান্ধবে প্রত্যাবর্তন করলেন, রাম গাত্রোত্থান করে বললেন, "ভাই লক্ষ্মণ! আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম। …যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল, তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম।…আজ আমি বিজয়ী।…লক্ষ্মণ তুমি আমার প্রভু, তোমার সাহায্যে অতঃপর সীতা ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না।" লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র প্রভু বলে স্বীকার করলেন। বড় অসহায় আমাদের এই জগদীশ্বরটি। নিজগুণে কিছুই অর্জন করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

১। বাল্মীকি রামায়ণ / রাজশেখর বসু অনূদিত।

২। লক্ষণীয়, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা মন্দিরে পূজারত অবস্থায় আক্রান্ত ও নিহত হন নি।

যুদ্ধস্থলে একাকী রাবণ

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণ এসে শেষ খেলাটি দেখাতে শুরু করলেন। প্রচুর বানর সেনা হতাহত হ'ল।

বাল্মীকি জানালেন এই যুদ্ধে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন বটে তবে কেউ তাঁকে যুদ্ধ করতে দেখে নি। ব্যাপারটি এই রকম :

শোনা গেল রামচন্দ্র প্রচণ্ড বিক্রমে রাক্ষস সেনা বিনষ্ট করছেন। কিন্তু "তৎকালে কেহ কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহারা এক একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে, আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে।" অর্থাৎ অনেক রামবেশী দেবসেনার মধ্যে আসল রাম আত্মগোপন করে আছেন, অথবা তিনি আদৌ সে সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নেই। খেলাটা মজার। এমন খেলা ব্রজপুরে গোপাল কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে খেলেছিলেন। কৃষ্ণবেশী অন্যান্য গোপ-বালকদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণ থিয়েটারী মেক-আপ নিয়ে [যদুবংশ / ব্রজপর্ব দ্রঃ]।

রামস্তুতির পর বাল্মীকি জানালেন, "রাম, সন্নিহিত সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, কহিলেন, দেখ আমার বা রুদ্রের এই পর্যন্তই অস্ত্রবল।" আরও জানালেন রণস্থল "কুপিত রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল।" অর্থাৎ স্বয়ং রুদ্রদেব শেষ যুদ্ধ লড়ে দিচ্ছেন। রামচন্দ্র শোভা মাত্র।

রাবণ যুদ্ধে এসেছেন। সঙ্গে তিন সেনাপতি। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ। এদের মধ্যে বিরূপাক্ষ ও মহোদর নিহত হলেন সুগ্রীবের শরে। অঙ্গদ হত্যা করলেন মহাপার্শ্বকে। বাকি রইলেন রাবণ। বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণ এক জোটে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণের শল্যাঘাতে লক্ষ্মণ মূর্ছা গেলেন। তখন শোনা গেল রামের স্বীকারোক্তি। সুষেণকে বললেন, লক্ষ্মণ পরাস্ত, "এক্ষণে আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এরূপ শক্তি নাই।" বিশল্যকরণী যোগে লক্ষ্মণকে সুস্থ করে তুললেন সুষেণ। সুস্থ হয়ে লক্ষ্মণ রামকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ক'রে বললেন, বৃথা ভয় শোক ত্যাগ করে পুরুষোচিত কর্মে উদ্বুদ্ধ হ'ন। এখন কি শোক তাপ করে শৈথিল্য প্রদর্শন করার সময়। কিন্তু যুধিষ্ঠির চরিত্রের মতো রামচন্দ্রও চান সবাই মিলে লড়াই করে তাঁকে রাজা বানিয়ে দিক। বিপদ সমাগত দেখলে পাণ্ডবপ্রধানের মতো তিনিও

বলেন, থাকগে যুদ্ধে কাজ নেই, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নই শ্রেয়।

রাম যখন ভয়কাতর, ঠিক তখনই ইন্দ্রবিমান এসে উপস্থিত। চালক মাতলি রামচন্দ্রকে বিমানে তুলে নিলেন। মাতলি রামকে বিভিন্ন ঐন্দ্রাস্ত্রও দিলেন। রামকে ঘিরে "বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি'রাও রণস্থলের ওপর অবস্থান করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন দাক্ষিণাত্যে আর্য উপ-নিবেশ স্থাপনের মহাস্থপতি অগস্ত্য। অগস্ত্য রামকে সূর্যদেবের স্তুতি করতে বললেন। সূর্যদেব এসে রামের রক্ষক স্বরূপ রণস্থলে দাঁড়িয়ে রামকে বললেন, রাম, এইবার নির্ভয়ে রাবণবধের প্রযত্ন গ্রহণ কর [সূর্যদেবতা ('ব্রাহ্মণ মার্তণ্ড মুনি) সম্পর্কে আলোচনা 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থে দ্রঃ]। ওদিকে রাবণ মাতলির বিমানটি আক্রমণ করতে মহাবেগে অগ্রসর হলেন।

বীরসিংহ বটে ইন্দ্রজিৎ পিতা রাক্ষসরাজ রাবণ। স্থলে ও অন্তরীক্ষে শরব্যূহে পরিবেষ্টিত হয়েও একাকী তিনি অমিতবিক্রমে লড়াই করছেন। বিমান থেকে দেবতারা রাক্ষস সেনার ওপর অনবরত গোলা বর্ষণ করছেন। রাবণের বিমান আক্রান্ত হচ্ছে একাধিক দেববিমানের দ্বারা।

"রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চতুর্দিকে দারুণ উৎপাতসকল প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ রাবণের রথে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।" রক্তবৃষ্টি কথাটি পরিষ্কার বোঝা না গেলেও জানা গেল রামচন্দ্র ধনুকের (যে কোনো অস্ত্রই 'ধনু' নামে অভিহিত হয়েছে রামায়ণ মহাভারত পুরাণে) ছিলায় টান দেওয়ার আগেই দেবতারা রাবণের বিমান ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছেন। ঐ ভিড়ের মধ্যে রামচন্দ্র হারিয়ে গেছেন। যদি বা কোথাও তিনি থেকে থাকেন তবে বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ইন্দ্র-বিমান রথের চালক মাতলিই তাঁকে পরিচালিত করেছেন। অথবা ইন্দ্র স্বয়ং ঐ বিমানে বসে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণটি পাঠ করলে ভগবান রামচন্দ্রকে নেহাত-ই অসহায় নাবালক বলে মনে হয়। বরং লক্ষ্মণ অনেক অনেক বেশি নির্ভীক তেজস্বী ত্যাগী কর্মঠ দৃঢ়চেতা এবং যোদ্ধা। যাঁরা "রাম ভজ, রাম ভজ" বলে হাতে তালি দেন তাঁদের বাল্মীকি রামায়ণের মূল অনুবাদ পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন।

বাল্মীকি বলেছেন, রণক্রীড়ায় রামচন্দ্রকে কর্তব্যবিমূঢ় দেখে মাতলি বললেন, "বীর! তুমি যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র (ব্রহ্মা প্রদত্ত অস্ত্র) পরিত্যাগ কর। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।"

বুঝলাম, কখন কোন্ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে রামচন্দ্র সে বিষয়েও অনভিজ্ঞ ছিলেন। দেবতারা যখন রাবণের পতন অনিবার্য করে আনলেন তখন রামকে রাবণবধের সম্পূর্ণ সম্মান দেওয়ার জন্যই অস্ত্র ত্যাগ করতে বলা হল। যুদ্ধবিশারদ অগস্ত্য অস্ত্রটি রামচন্দ্রকে দেন। অস্ত্রটি আগ্নেয় অস্ত্র। বর্ণনায় সেরকমই বোধ হয়,—যেমন, "উহা···স্বতেজ প্রদীপ্ত,···সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় করালদর্শন এবং বজ্রবৎ কঠোর ও ঘোর নাদী।" অস্ত্র প্রয়োগ মাত্র তার শব্দনিনাদে "পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল।" রাবণের বিমানটি চূর্ণ হ'ল। রাবণ "বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইলেন।" শুরু হয়ে গেল রামধুন গীতবাদ্য। "বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল।"

রাবণের মৃত্যু হ'লে কুচক্রী বিভীষণ সুগ্রীবের মতোই মড়াকান্না শুরু করে রাবণের উদ্দেশ্যে বললেন, আহা হা! "তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযুগল প্রসারণ পূর্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ। তোমার উজ্জ্বল রত্ন-কিরীট লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" অর্থাৎ রাজা হওয়ার আনন্দে হৃৎকম্পন শুরু হয়ে গেছে ধার্মিক বিভীষণের।

রাম রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঙ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ইহার মৃত্যু হইয়াছে।"

বিভীষণ সুযোগের অপব্যবহার কখনই করেন না। রাবণস্তুতি ছলে এবার তিনি রামস্তুতি শুরু করলেন। বললেন, "রাম! পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ করিলে।"

রাম বললেন, "মৃত্যু পর্যন্তই শত্রুতার অন্ত, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহার প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠান কর।"

রাবণের পতনে সমগ্র রাক্ষসজাতি শোকাকুল চিত্তে হাহাকার করতে লাগল। প্রিয় পত্নী মন্দোদরী রণস্থলে ছুটে এলেন পাগলিনীপ্রায়। মন্দোদরীর বিশ্বাস, রামের ছদ্মবেশে ইন্দ্রই মাতলি-বিমান থেকে রাবণবধ করেছেন। বললেন, "বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইরূপ অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিলেন।" বললেন, "বিষ্ণু [দেবনেতা নারায়ণ] মনুষ্যাকার ধারণ পূর্বক [ছদ্মবেশে] বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া···তোমাকে বধ করিয়াছেন।" রামের কৃতিত্ব অস্বীকৃত হ'ল।

অতঃপর মৃত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শোকাকুলা মন্দোদরী বললেন, "নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য। ইহার ভ্রূযুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি সুন্দর,...মদিরারসে নেত্রযুগল চঞ্চল হইলে ইহার যারপরনাই শ্রী হইত...! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন।" রাবণের দশমুণ্ডের উল্লেখ করা হয় নি। মন্দোদরী স্বামীর একটিমাত্র সুন্দর আননের কথাই বললেন।

এদিকে তোষামুদে রাজ্যলোভী বিভীষণ রামকে অধিকতরভাবে তোষণ করতে যত্নবান হয়ে উঠলেন। তাঁর আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত রাম তাঁর কথা রাখবেন তো। বসাবেন তো বিভীষণকে শ্মশানরাজ্যের অধীশ্বর ক'রে?

অতএব বিভীষণ বললেন, "রাম! যে ব্যক্তি পরস্ত্রী স্পর্শ পাতকী তাহার অগ্নি-সংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিষ্টকর ভ্রাতৃ-রূপী শত্রু। ...রাম! আমি ইহার দেহদাহে অসম্মত।" এই ভাষণপটু বিশ্বাস-ঘাতকটিই কিন্তু পরস্ত্রী মন্দোদরীর ওপর নজর ফেলে বসে আছে, স্বয়ং রামেরও তা অবিদিত নেই।

তোষামোদে ভগবানও খুশি হ'ন, রাম তো ছেলেমানুষ। বিভীষণের রাম-প্রীতিতে পরম পুলকিত হয়ে রাম বললেন, "রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনো প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য..." এই বলে তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্বোপকারী এবং ভক্ত।"

রামের আদেশে শেষ পর্যন্ত বিভীষণকেই রাবণের মুখাগ্নি করতে হয়েছিল। ধার্মিক বিভীষণের তাতে পাপ কি পুণ্যার্জন হয়েছিল জানি না, তবে তিনি রাজ্য ও রাজবধূ লাভ করেছিলেন বিনা যুদ্ধে। এবং দেবতারা বলেছিলেন, বিভীষণ যুগ যুগ জীও! বিভীষণের মৃত্যু নেই। দেশে দেশে কালে কালে বিভীষণরা জন্ম-গ্রহণ করবেই।

বেদবতীর প্রত্যাবর্তন ও অগ্নিপরীক্ষা

লঙ্কা অধিকারের পর অশোকবন থেকে সীতাকে আনার আগে সীতার কাছে দূত হিসেবে হনুমানকে প্রেরণ করেন রামচন্দ্র। হনুমান সীতার ওপর তর্জনকারিণী

রাক্ষসীদের শাস্তির কথা বললে সীতারূপিণী বেদবতী সাশ্রু নয়নে বলেছিলেন, রাবণ বর্তমানে রাজ আজ্ঞায় তাঁর কিঙ্করীরা তাদের কর্তব্য করেছে। তারা তো হুকুমের দাসী। স্বদোষে দুষ্টা নয়। সুতরাং তাদের ক্ষমা করাই কর্তব্য। এই কথা বলে তিনি নিজের অদৃষ্টদোষ সম্পর্কে যা জানালেন, তাতেই তাঁর গুপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হ'ল, যদিও হনুমান সে কথার কোনই তাৎপর্য বুঝলেন না।

সীতারূপিণী বেদবতী বলেছিলেন, "আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্বদুষ্কৃতি-নিবন্ধন এই-রূপ লাঞ্ছনা ভোগ সহিতেছি।...আমার এইটি দৈবী গতি। আমি পূর্বেই জানি যে, দশাবিপাকে আমায় এইরূপ সহিতে হইবে।" অর্থাৎ অসহায় আমি গুপ্তচর-বৃত্তিতে বাধ্য আছি। অত্যাচার সহ্য করাই আমার শিক্ষা।

অশোকবন থেকে বেদবতীকে যখন আনা হ'ল, তখন কোনো গূঢ় কারণে রাম জনচক্ষের অন্তরালে ধ্যানস্থ ছিলেন। প্রস্থান্তরের আলোচনায় দেখেছি, পুরাণকাররা বেতার সংযোগ ক্রিয়াকেও ধ্যান আখ্যা দিয়েছেন। জানি না রামচন্দ্র জনান্তিকে দেবশিবিরের সঙ্গে তখন বেতার মারফত কোনো আদেশ গ্রহণ করছিলেন কিনা, অথবা কোনো সংবাদবাহক-ঋষির পদার্পণ ঘটেছিল কিনা রামচন্দ্রের স্কন্ধাবারে। কিন্তু যে রাম সীতাবিরহে এতাবৎকাল অত্যন্ত কাতর ছিলেন, তথাকথিত ধ্যান পর্বের পর তিনি সভাস্থলে এলে তাঁর মধ্যে অকস্মাৎ এক বিরাট এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা গেল যা দেখে সভাস্থ সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিভীষণ যখন জনতাকে সরিয়ে সম্মানের সঙ্গে শিবিকাযোগে বেদবতী সীতাকে নিয়ে আসছিলেন তখন বিরক্ত রাম রূঢ় ভাষায় বিভীষণকে বললেন, "তুমি কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিয়া লোককে কষ্ট দেও? গৃহ বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়...চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অতএব তিনি (সীতা) শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। বিভীষণ একথায় 'সন্দিহান হইলেন' এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য ও দুঃখিত হলেন। রামের কথায় বিভীষণের মতো সন্দিহান আমরাও হলাম। রামের অকস্মাৎ এই পরিবর্তনের যথার্থ অর্থ কী? যেন অতি অল্প সময়ে রামচন্দ্র বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছেন। তাঁর মধ্যে আর সেই আগের হা-হুতাশ নেই। নেই সীতার প্রতি তিলমাত্র আকর্ষণ। বরং সর্বসমক্ষে সীতাকে তিনি চরিত্রদোষে দুষ্টা বলেই প্রচার করলেন! কী তার নিগূঢ়ার্থ?

বাল্মীকি এই পরিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে দেন নি বটে, কিন্তু একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত রেখে গেছেন। তা হ'ল, সীতাকে আনার অল্পকাল আগেই রামচন্দ্র নির্জন কক্ষে একাকী কোনো গূঢ় কারণে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। প্রশ্ন হ'ল, এই বিশেষ

সংবাদটি বাল্মীকির উল্লেখ করা অত প্রয়োজনীয় মনে হ'ল কেন ? তবে কি রামচন্দ্রের পরিবর্তনের মূল উৎস ঐ নির্জন কক্ষেই উৎসারিত হয়েছে ? বেদবতী সীতার প্রতি কী ব্যবহার করা হবে এ সম্পর্কে তিনি দেবশিবিরের কোনো নির্দেশ পেয়েছিলেন কি ? ঘটনার প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

রাম সর্বসমক্ষে সীতাকে বললেন, "ভদ্রে ! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম।...চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার **দৈববিহিত দোষ**।"

বললেন, "তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে।—তুমি যেদিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। ভদ্রে—তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে স্বরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া—বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।" লক্ষণীয় বেদবতীর সঙ্গে স্বামী সম্পর্ক অস্বীকার করার জন্য রাম বারবার তাঁকে কেবলমাত্র 'ভদ্রে' সম্বোধন করেছেন।

সীতারূপিণী নারী তখন নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার জন্য অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করতে বললেন রামচন্দ্রকে। এইখানে লক্ষণীয়, বেদবতীই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্নি পরীক্ষার আয়োজন করতে বলছেন। অর্থাৎ অনুষ্ঠিতব্য নাটক দেবতারা যেভাবে সাজিয়ে রেখেছেন তা রাম বেদবতী আগেই জানেন। তাঁরা নির্দেশমত অভিনয় করছেন। ঘটনাক্রমে সেটাই বোঝা যায়।

দেখা গেল, প্রস্তাবটি মেনে নিয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন। একটি চমকদার নাটক সবার সমক্ষে মঞ্চস্থ হ'তে শুরু হ'ল যার মাথামুণ্ডু নাটকের ঐ দুই প্রধান চরিত্র ছাড়া অপর কেউই বুঝলেন না। শুধু অবাক হয়ে শুনলেন, রাম জানকীকে বারম্বার 'ভদ্রে' বলে সম্বোধন করে প্রহেলিকাটি আরও প্রকট ক'রে তুলছেন।

অগ্নি প্রস্তুত, ইতাবসরে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিমানযোগে সেই যজ্ঞস্থলে (সভায়) উপস্থিত হলেন।

দেবতারা অবতরণ করেই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দিলেন নাটকটিকে। সবাই মিলে শুরু করলেন রামস্তুতি। বলা হ'ল, রামই ত্রিলোকের আদিকর্তা, তিনিই ভুবনেশ্বর গোলকপতি। এতএব এর পর রামপূজা ঘরে ঘরে চালু করে দিতে হবে, এটাই বিজয়ী দেবতাদের নির্দেশ।

রামচন্দ্র সকলকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবগণ ! আমি রাজা

দশরথের পুত্র রাম!" আমি নিজেকে মানুষ বলেই জানি। এখন অন্য রকম শুনছি। তাহলে আপনারাই বলুন, আমি কে, কী আমার স্বরূপ। অর্থাৎ দেবনির্দেশমত দেবগণের দ্বারা নিজের একটি ভাবমূর্তি গড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই দেবতাদের সাক্ষী ডাকলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা একটি প্রলম্ব সম্মানপত্র পাঠ করে অনর্গল যা বলে গেলেন তার নির্গলিতার্থ, রামচন্দ্র, তুমি মনুষ্যরূপী স্বয়ং জগদীশ্বর। তোমাতে যারা সর্ব-সমর্পিত থাকবে, ইহলোক ও পরকালে তাদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

এসব পৌরাণিক ছল-চাতুরীর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, তা হ'ল প্রচুর মিথ্যা গল্প রচনা করে শাসককে জগদীশ্বরের গদীতে সমাসীন করে যথেচ্ছ প্রশাসন কায়েম করা ও সেই সূত্রে প্রজাশোষণের অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ। যাইহোক, ধীরে ধীরে নাটিকার পর্দা উঠল। সীতা নাম্নী বেদবতী প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিমান অগ্নি অগ্নিকুণ্ডের পশ্চাৎভাগ থেকে জানকী সীতাকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন। নাটক ক্লাইমাক্সের তুঙ্গে পৌঁছালো এবং উপস্থিত জনতা এই ভোজবাজি দেখে বিমোহিত হলেন।

অগ্নিকুণ্ডের ম্যাজিক দেবতারা বহুক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন। দ্রুপদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞেও জ্বালানো হয়েছিল অগ্নিকুণ্ড। সে গল্প আগেই আলোচনা করেছি।

এখানেও সেই একই যাদু। যার ব্যাখ্যা এমনি হতে পারে: প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের পেছনে এসে নেমেছে দেবরথ। রথে ফিরে গেছেন অশোক বনে প্রেরিতা সীতারূপিণী বেদবতী, আর তখনই আসল সীতাকে নিয়ে হাজির হয়েছেন অগ্নি-দেবতা।

এখানে আবার লক্ষ্য করতে বলি, কবি যেন ইচ্ছে করেই একটি ইঙ্গিত রেখে গেলেন এই দেবচক্রান্তের। আসল সীতার আগমন সংবাদ দিয়ে তিনি বললেন, সেই জানকীর কেশকলাপ ছিল "কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত"। প্রত্যাবৃতা বেদবতীর নীলকেশ এবং জানকীর "কৃষ্ণ কেশকলাপে"র ইচ্ছাকৃত এই উল্লেখের দ্বারা মহাকবি দুই নারীর দুই পৃথক সত্তার ইঙ্গিত রেখে গেলেন।

অগ্নি সীতাকে নিয়ে প্রবেশ করেই সহাস্যে বললেন, "রাম, এই তোমার জানকী, ইনি নিষ্পাপ।...ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত (ছিলেন)। ইনি এতোদিন পরাধীন ছিলেন।...এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।"

না, রামচন্দ্র আর আপত্তি করবেন কেন। রাবণালয়ে যে আসল সীতাকে

পাঠানো হয় নি, প্রেরিত হয়েছিলেন দেবতাদের রক্ষিতা বেদবতী, এ খবর তো তিনি আগেই জানতেন। অশোককানন-প্রত্যাগতা বেদবতীকে তিনি পরনারী এবং দেবকার্যে নিযুক্তা স্ববেশ্যা জেনেই 'ভদ্রে' বলে সম্বোধন করেছেন।

সম্ভবত তাঁর প্রতি অগ্নিকুণ্ডের নাটকটি সাজানোর আদেশ দিল এবং বেদবতীর প্রতি নির্দেশ ছিল, কাজ হাঁসিলের পর প্রজ্জ্বলিত কুণ্ডের ধোঁয়ার আড়ালে তাঁকে প্রবেশ করতে হবে এবং সেইভাবে সীতা বদলাবদলি করে নেবেন দেবতারা।

"অগ্নিহোত্রগতোবহ্নিস্তং জ্ঞাত্বা রাবণোদ্যমম্।
আদায় সীতাং পাতালে স্বাহায়াং সন্নিবেশ্য চ॥ ২১.৫
তেনৈব রক্ষসা স্পৃষ্টাং পুরা বেদবতীং শুভাম্।
অগ্নৌ বিসৃষ্টদেহাং তাং সংহর্তুং রাবণং পুনঃ॥ ২২.৫
সীতায়া রূপসদৃশীং কৃত্বা চৈবংসসর্জ্জ হ।
সা রাবণহৃতা ভূত্বা লঙ্কায়াঞ্চ নিবেশিতা॥ ২৩.৫
হতে তু রাবণে পশ্চাৎ পুনরগ্নিং বিবেশ সা।[১]

বঙ্গার্থ: "অগ্নিহোত্রগত বহ্নি রাবণের উদ্যম দেখিয়া সীতাকে গ্রহণ পূর্বক পাতালে গমনকরত স্বাহাতে রক্ষিত করেন। পূর্বকালে রাক্ষসস্পৃষ্টা কন্যা শোভনা বেদবতী স্বীয় শরীর হুতাশনে [অগ্নির দ্বারা] রক্ষিত করিয়া সীতাসদৃশ রূপ ধারণ করিলে রাবণ সেই কন্যাকে অপহরণ করিল। অনন্তর তিনি অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাবণ নিহত হইলে আবারও তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেন।"[২] অগ্নিপ্রবেশ বলতে স্পষ্টতই এখানে অগ্নির দ্বারা নীত ও আনীত হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

রহস্যটি পরিষ্কার। অনেক নেপথ্য কথাই রামায়ণ যুগে বলা সম্ভব হয় নি, মহাকবি কেবলমাত্র দুই সীতার কেশকলাপ উল্লেখ ক'রে তাঁদের পৃথক সত্তার ইঙ্গিতমাত্র রেখেছিলেন। সেই নেপথ্য ইতিহাস উপযুক্ত সময়ে পরবর্তী পুরাণকার স্কন্দপুরাণে ফাঁস করে দিয়েছেন।

দেবতারা বড়ই চতুর প্রাণী। পৃথিবীর পুরাণভুক মানবসমাজকে তাঁরা পাপ-পুণ্য স্বর্গনরকের ভয়ে ভীত এবং ব্রাহ্মণদের কঠোর সহিংস্র শাসনের আওতায় গোবৎ জন্তুতে পরিণত ক'রে যান। দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যাহীন এক ধর্মতত্ত্বের রজ্জুতে

১। স্কন্দপুরাণম্, বিষ্ণুখণ্ড, ৫ম অ।

২। অনু—পঞ্চানন তর্করত্ন।

পাশবদ্ধ ক'রে সেই ভীত শঙ্কিত পদানত মনুষ্যসমাজকে তাঁরা যুগের পর যুগ পুরোহিতসমাজের দাসত্ব করতে বাধ্য করেন। এমনভাবেই দাসসৃষ্টির অপচেষ্টা আজও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা নতুন করে শুরু করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যাদব কৃষ্ণকে ফের পরমেশ্বর কৃষ্ণের গদিতে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে। 'যদুবংশ / ব্রজপর্ব' গ্রন্থে পরমেশ্বর মুরলীধারী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সঙ্গে জন্মমৃত্যু-যৌনকর্মকারী মানুষ ঐতিহাসিক কৃষ্ণের তফাতটুকু যথাসাধ্য ধর্মাধর্ম ব্যাখ্যার আলোকে আলোচনা করেছি।:সেখানে দেখিয়েছি, ইন্দ্র গোগণের (মানুষ-গরুর) শাসনকর্তা পদে কৃষ্ণকে অভিষেক করেছেন। আর সেই সুবাদে বাসুদেব কৃষ্ণের জুটেছিল দুটি খেতাব। গোগণের শাসক, 'গোবিন্দ' এবং ইন্দ্রের অধস্তন আধিকারিক, 'উপেন্দ্র' পদে তিনি নিযুক্ত হন।[৩] এভাবেই দেবস্বার্থ বা ধর্মরক্ষার্থে দেবতারা স্বর্গলোকের ধর্ম বা দেবস্বার্থ-রক্ষক যমরাজের অধস্তন আধিকারিকের পদটি প্রদান করেন স্বজাতিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের খেতাব হয় ধর্ম। রাজ্য প্রাপ্তির আগে কুরুবংশ ধ্বংসের অন্যতম কারিগর বিদুর 'ধর্ম' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 'ধর্ম' এমনই একটি "বহুরূপী ধারণা।"[৪]

গাড়োয়াল হিমালয়ে গঙ্গোত্রী যমুনোত্তরীর পশ্চিমে তমসা নদী প্রবাহিত হয়েছে হর-কি-দুন থেকে। ঐ পার্বত্য তমসার পথে পড়ে শৃঙ্গেরী গ্রাম। প্রচলিত জনশ্রুতি, শৃঙ্গেরী গ্রামে ছিল আর্য দেবায়তনের বিশ্বস্ত নেতা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির গুহা বা আশ্রম। জনশ্রুতি আরও বলে, লঙ্কাকাণ্ডের সময় দেবতারা সীতাকে এনে এখানেই রেখেছিলেন।

অগ্নি স্বয়ং বললেন, জনকের পালিতা কন্যা জানকী ছিলেন লঙ্কাকাণ্ডের সময়ে অন্তঃপুরে বন্দিনী। এই সময় তাঁর অপর কোনোও পুরুষ-সংসর্গ ঘটে নি। তিনি নিষ্পাপ ও রাম তাঁকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন। চতুর দেবতারা বেদবতীর কথা একেবারেই চেপে গেলেন জনসমক্ষে। যে নাটিকাটি এইমাত্র অভিনীত হ'ল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, জানকী সীতা যে নিষ্পাপ সেই কথাটি প্রমাণ করা।

৩। "গরু যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, জীবগণ তেমনি আপনার [ব্রহ্মার প্রতি দেবগণ] বেদবাক্যরূপ রজ্জুতে বাঁধা থেকে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের বিধি অনুসারে কাজ করছে।"—শ্রীমদ্ভাগবত/৩স্ক/১৫অ হরফ প্রকাশনী॥

৪। কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির।

এখোনে একটিই মাত্র প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে। প্রশ্ন হ'তে পারে জনক যে সীতাকে লাভ করেন, তিনিও যদি দেবজনপ্রেরিতা হয়ে থাকেন তবে প্রথমেই তো দেবতারা বেদবতীকে জনককন্যা বানিয়ে মিথিলায় পাঠাতে পারতেন। নীলকেশিনী কৃষ্ণকেশিনী এই দুই কন্যা নিয়ে খেলাটি ঘোরালো করার কী দরকার ছিল? এ প্রশ্নের জবাব আমাদের কেউ দিয়ে যান নি। জবাবটি আপন বুদ্ধিমত যুক্তি সাজিয়ে উদ্ধার করতে হবে।

রাবণবধের পরিকল্পনার সময় বেদবতীকে প্রেরণ করার কোনো প্রসঙ্গ না থাকারই কথা। জনস্থানে শূর্পণখা ঘটিত একটি ব্যাপার যে এক নয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে এবং তা দেবতাদের সুযোগ করে দেবে লঙ্কারাজ্যে কোনো স্বর্গীয় নারী গুপ্তচর প্রেরণের; ব্রহ্মার পরিকল্পনা দানা বাঁধার সময় তেমন সম্ভাবনা তো ছিল না। তাই বেদবতীকে প্রথম থেকেই জনকগৃহে পাঠানোরও প্রশ্ন দেখা দেয় নি। কিন্তু রামকে দাক্ষিণাত্যের গভীর অরণ্য অঞ্চলে দীর্ঘকালের জন্য নিয়োগ করতে হবে এমন একটি পরিকল্পনা প্রথম থেকেই ছিল। রামের সঙ্গে বনে জঙ্গলে কাটাতে পারেন এমন এক মহিলাকে পাঠানোর কথা তাই দেবমন্ত্রী ব্রহ্মাকে ভাবতে হয়েছে। জনকের স্কন্ধে তাঁরা সেজন্যই সীতাকে চাপিয়ে দেন। জনক দ্রুপদের মতো সন্তান চান নি, তবু দেবকন্যাকে পালন করতে হয়েছিল।

রামাবতার

প্রথমবার সীতা বদল হয়েছিল সকলের অলক্ষ্যে। এবার কিন্তু সীতাবদল হ'ল সবার সম্মুখে একটি প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ড সাজিয়ে। অগ্নিধূমের অন্তরাল থেকে দর্শকদের মোহিত করে দেবতারা মস্ত বড় বড় প্রাণী বার করতে পারতেন। একই ম্যাজিক দেখানো হয়েছিল দশরথের ও দ্রুপদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে।

বেদবতীর কাছে হয়ত আগেই নির্দেশ ছিল, লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে কোন্ নাটকটি তাঁকে অভিনয় করতে হবে। অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিতা এই স্বর্বেশ্যা সর্বসমক্ষে 'বারাঙ্গনা' প্রভৃতি গালিগালাজে জর্জরিতা হয়ে সাশ্রুনেত্রে ঐ কুণ্ডের মধ্যে [পশ্চাতে] অদৃশ্য হয়েছেন। সম্ভবত তারপর দেবতারা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন গন্ধমাদন পর্বতে।

অগ্নিধূমের আবরণীর আড়াল থেকে তখন জানকী সীতাকে নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছেন শ্মশ্রুগুম্ফাচ্ছাদিত ব্রাহ্মণ দেবদূত অগ্নি শ্বেতাবধারী দেহবান দেবতাটি। ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি জানকীকে রামচন্দ্রের হাতে।

বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ বিভীষণ হনুমানরা এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হলেও প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পান নি।

যে পুরাণকার যজ্ঞকুণ্ডের ম্যাজিকটিকে দেবতার মহিমারূপে প্রচার করলেন, এইখানে তিনিই আবার দুই ভিন্ন নারীর পরিচয়ও একই গল্পকথায় সাজিয়ে রেখে গেলেন। বেদবতীর চেহারা বর্ণনা করার সময় বলা হ'ল, বেদবতী ছিলেন, **নীল-কুঞ্চিতকেশা** [১১৬/স/যুদ্ধ/বা. রা.] অন্যদিকে জানকী অগ্নির হাত ধরে স্মিত-মুখে মঞ্চে প্রবেশ করলে জানানো হ'ল, "তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং **কেশ-কলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত** [১১৯, যুদ্ধ / বা. রা.] অতএব অস্পষ্ট রইল না ভিন্ন দুই নারীর উপস্থিতি।

রামচন্দ্র কোনো নাম ব্যবহার না ক'রে বেদবতীকে সম্বোধন করেছেন, "ভদ্রে" অর্থাৎ "মহোদয়া" বা "ম্যাডাম" বলে। রাম বিচক্ষণ পুরুষ। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দরী, রাবণ নিশ্চয়ই তোমার সতীত্ব নাশ করেছে। অতএব আমার মতো পবিত্র পুরুষ ও উচ্চবংশোদ্ভব তোমাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য। তুমি, স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বিভীষণ, কিম্বা এদের যে কারও অঙ্কশায়িনী হতে পার [১১৬ / স / যুদ্ধ / বা. রা.]।

রাম ধার্মিক বটে। ভায়েদের তিনি খুবই নিচু চোখে দেখেন। সেজন্যই বেদ-বতীকে তাঁদের পালঙ্কে অবাধে তুলে দিতে পারেন। ইন্দ্রপুত্র এসে ঐ বেদবতীরই 'স্তনমধ্য বিদীর্ণ' করলে রাম তা মেনে নেন, তিনিই আবার সতী অসতীর প্রশ্ন তোলেন!

ব্রাহ্মণের ভগবান কত যে লীলা জানেন সাধারণে তার অর্থ বোঝে না।

সীতা পরিবর্তন নাটকটি এভাবেই বেদবতী এবং রামের অভিনয়নৈপুণ্যে অনুষ্ঠিত হ'ল। ব্রহ্মা সহ দেবরাজ্যের বড় বড় দিকপাল দেবতারা সমবেত হলেন এই বিজয়োৎসবে। "**বিমানযোগে**" আগমন ক'রেই হঠাৎ সকলকে বিমূঢ় ক'রে ব্রহ্মা একটি প্রলম্ব বক্তৃতা শুরু করে দিলেন এইভাবে:

করজোড়ে রামস্তুতি ক'রে বললেন, রাম "তুমি ত্রিলোকের আদিকর্তা, কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই,"…"চন্দ্র সূর্য চক্ষু" তোমার। তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান।"

রাম বেদবতীকে প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ যে সূত্রে পেয়েছিলেন, সম্ভবত সেই সংবাদসূত্র তাঁকে আরও একটি নির্দেশ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, ব্রহ্মা এসেই

যখন তোমাকে পরমেশ্বর বানাবেন, তখন তুমি উচ্চস্বরে বলবে, "দেবগণ! আমি রাজা দশরথের পুত্র রাম। আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, আপনারা তাহাই বলুন।" যথাদিষ্ট রাম সেই শেখাবুলি জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন।

পুরাণকার নির্বুদ্ধি হলেও জানেন, ধর্মভীরু মানুষ তাঁর চেয়েও নির্বোধ। তাদের মনে মানুষ রামের পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠা দিতে হলে আগেই সব সন্দেহ ঘোচাতে হবে। তাই তাদের প্রশ্নটি স্বয়ং পরমেশ্বরের ঠোঁটে বসিয়ে দিয়ে দেবগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলে কাজ অনেকটা হাঁসিল হয়। এক সভা দেব্তা যদি বলেন, এই লোকটাই অজ্ঞেয় নিরাকার পরব্রহ্ম, তবে যাদের কিছুমাত্র প্রাণের ভয় সে [সেকালের প্রাণদণ্ডভীতি কালক্রমে পাপভীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে] আছে, তারা নীরবেই মেনে নেবে রামকে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের অধিকর্তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পরব্রহ্ম ব'লে। পরম ব্রহ্মের পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব যে কতবড়, মূর্খ জনতা, এমন কি রামলক্ষ্মণাদিরও তা জানা নেই। অতএব আর্য-অধিকৃত প্রদেশকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বললে এবং তাঁর মুষ্টিমেয় প্রজাবৃন্দকেই জগৎবাসী বলে প্রচার করলেই বা কে প্রশ্ন করবে, যদি রামই পরমেশ্বর, তবে রামরাজত্বের বহির্ভূত পৃথিবী ও জীবজগতের নিয়ন্তা কে? ব্রহ্মার সৌভাগ্য, এ হেন প্রশ্নের উত্থাপক কেউ বড় একটা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন না।

অতএব তিনি অনর্গল বলে গেলেন, রামচন্দ্র জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য, অক্ষয় সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম। তিনি খড়্গধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ, ত্রিলোকের আদিস্রষ্টা। অতঃপর উপসংহারে পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত ব্রহ্মাজী এই বলে ভাষণ শেষ করলেন, "তুমি যে কে, তাহাও কেউ জানে না।" [১১৮স / যুদ্ধকাণ্ড / বা. রা.]

বোঝা গেল, পরমেশ্বরের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, সভায় বক্তৃতা করে তাঁর সত্তা যার-তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনেক ধানাইপানাই করেও পরমেশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই ব্রহ্মাকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে ও অবশেষে স্বীকার করতে হয়েছে, পরমেশ্বর যে বস্তুত কে তা কেউ জানে না।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, মহাভারতের শান্তিপর্বে দেবতা শঙ্কর তৎকালীন ব্রহ্মা পদমর্যাদাধারী দেবমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন, যদি ব্রহ্মাই আদি পুরুষ, তবে সুমেরু পর্বতের বৈজয়ন্ত নামক পার্বত্য কুঠিতে বসে ব্রহ্মা কার পূজা আরাধনা ও ধ্যান করেন? উত্তরে দেবমন্ত্রী বলেন, "এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনিই সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে

উদ্ভূত…।"[১] নারদের প্রশ্নে বিষ্ণুও একই রকম উত্তর দিয়ে বলেন, "দেবর্ষে! এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনো ক্রমেই উচিত নহে।"[২]

বস্তুত, পরমেশ্বরতত্ত্বের সত্যাসত্য ফাঁস হয়ে গেলে ব্রাহ্মণ্য শাসনের ভিত্তিটাই যাবে ধ্বসে। তবু বিষ্ণু নারদকে ব্রহ্মার মতোই বলেছিলেন, আমরা তো আর পরমেশ্বর নই, পরমেশ্বর সেজে থাকি। যিনি মহাবিশ্বের পরম স্রষ্টা, লোকচক্ষের আড়ালে বসে আমরা তাঁরই আরাধনা করি।

করতেই হবে। যতই কেননা অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরমেশ্বরকে হঠিয়ে দেব ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য ব্রহ্মা বিষ্টুরা রাম কৃষ্ণাদিকে পরমেশ্বর বানিয়ে থাকুন, ব্রহ্মা বিষ্ণুর মনেও পাপের ভয় ছিল। পরলোক সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাঁদের আপনাপন অবস্থা কী হবে তাঁরাও তা জানতেন না। নচিকেতাকে যম তাই বলেছিলেন, মৃত্যুর পর কী, দেবতারাও তা জানেন না। পরব্রহ্মতত্ত্ব বা পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে ব্রহ্মা বিষ্ণুরাও সাধারণের মতোই অজ্ঞ। তাঁরা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের নানা শাখায় সুপণ্ডিত ছিলেন মাত্র। বিশেষত কূটচক্রান্ত এবং যে কোনো প্রকারে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুদ্ধনীতিতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী।

মহাভারত বা রামায়ণের আমলে গায়ের জোরেই দেবতারা অথবা ব্রাহ্মণগণ রাম ও বাসুদেব নামক দুই ক্ষত্রিয় রাজাকে পরমেশ্বর বলে ভারতবাসীর মাথার ওপর বসিয়ে দিয়ে পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষকে শোষণ ও শাসন করেছেন। আজও সেই জাতিগত শোষণের ট্র্যাডিশন অব্যাহত আছে।

কিন্তু এই গালগল্পের মধ্যে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ ঢুকে পড়লেন আবার কোন সুবাদে! বিষ্ণু অভিধাধারী দুই লড়িয়ে দেবতা রামায়ণ ও মহাভারত যুগে আপনাপন ঔরসে রাম ও কৃষ্ণের জন্ম দান করেন। অতএব রামচন্দ্র বিষ্ণুপুত্র হলেও স্বয়ং বিষ্ণু হ'তে পারেন না। আবার তাঁর সময়কালের বহু পুরুষ বা 'জেনেরেশান' পরে যে কৃষ্ণ তদানীন্তন বিষ্ণুপদাধিকারী দেবতার ঔরসে দেবকীর গর্ভে যদুবংশে বাসুদেব কৃষ্ণ নামে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ববর্তী রামচন্দ্র সেই কৃষ্ণের অংশবানই বা হন কোন্ যুক্তিতে?

বিষ্ণুপুরাণে সগরবংশ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, সগররাজা থেকে ভগীরথ পঞ্চম

১। লেখকের যদুবংশ / ব্রজপর্ব—প্রসঙ্গকথা দ্রঃ।

২। ঐ।

পুরুষ। আবার ভগীরথকে প্রথম পুরুষ ধরে গণনা করলে ভগীরথ বংশে দশরথ ১৯নং এবং রামচন্দ্র ২০নং পুরুষ। রামকে প্রথম পুরুষ ধরে গণনায় পাওয়া যাবে রামবংশে তেত্রিশতম বা ৩৩নং পুরুষ বৃহদ্বল-এর উল্লেখ। বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃহদ্বল ছিলেন অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সমসাময়িক। ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বধ করেন :

বৃহদ্বলঃ যোঽর্জুনতনেয়নাভিমন্যুনা ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত৩ ॥৪৮

বিষ্ণুপুরাণোক্ত পুরুষানুক্রম মান্য হলে রামায়ণ মহাভারতযুগের মধ্যগা সময়ের বিস্তৃতিও একই সঙ্গে মেনে নিতে হয়। মানতে হয়, চাতুর্বর্ণ্য বা জাতিভেদপ্রধান একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে গৌরবর্ণ আর্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কৃষ্ণবর্ণ আদি ভারতবাসীর সঙ্গে বহু শতাব্দী সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

বলা হয়েছে, "গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্তয়িতাঽভূৎ॥"[৪] অর্থাৎ গৃৎসমদের ছেলে রাজপুত্র শৌনকই চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্তন করেন।

এ তো এক সাংঘাতিক কথা। তাহলে কি গীতার বচনেও গলদ আছে? সেখানে জগদীশ্বর বাসুদেব সগর্বে বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ। যার মানে, গুণকর্মাদি ভাগ করে আমিই চারটি জাতির সৃষ্টি করেছি। গলদ যেটুকু আছে বলে সকল পণ্ডিতই একমত, তা হ'ল, গীতা গ্রন্থটি কোনো এক মুনির রচনা এবং গ্রন্থটি সুযোগ মতো মহাভারতের প্রসার্যমাণ বিশাল কলেবরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটি অবশ্যই বাসুদেব কৃষ্ণের ভাগবত উক্তি নয়। পুরাণকারদের চাতুর্য কোন্ পুরাণের গর্ভে কোন্ সত্যটি যে লুকিয়ে রেখেছে বা প্রকাশ করেছে তার বিবাচন খুবই দুরূহ ব্যাপার।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে রামায়ণ মহাভারতের কালকে প্রায় সমসাময়িক মনে করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের পাঠ সেই প্রতীতি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। কালব্যবধানকে ঠেলে দিচ্ছে ৩২ পুরুষ আগে এবং গীতার বক্তব্যে ধরে দিচ্ছে বিস্ময়কর গলদ। শৌনক পুরূরবার বংশে [পুরূরবাকে প্রথম পুরুষ ধরে] ৬ষ্ঠ পুরুষ। তার মানে, চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্তনা ও তার প্রচার ভারতযুদ্ধের ঢের আগের ঘটনা।

এই সব বিতর্ক গবেষকদের সমাধানের জন্যই তোলা থাক। আমি শুধু তর্কের সূত্রগুলি, যখন যেমন পেয়েছি, উল্লেখ করলাম গবেষণার সুবিধার্থে। বলাই বাহুল্য, গবেষকের দায়দায়িত্ব আমার নয়। কোনো ডি ফিল, ডি লিটের

৩। বিষ্ণুপুরাণ / চতুর্থাংশ / ৪র্থ অ / আর্যশাস্ত্র সং ক্রঃ

৪। বিষ্ণুপুরাণ / চতুর্থাংশ / ৮ম অ / আর্যশাস্ত্র সং।

দিকে চোখ রেখেও আমি কাহিনীসূত্র বিচারে বসি নি। আমার উদ্দেশ্য, কাহিনী সূত্রকে অর্থবহ ক'রে পুনর্গ্রন্থনা করা, যাতে অলৌকিক কথা কাব্যগুলির অলঙ্কার খসিয়ে মূল কাহিনীটির কাঠামো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রূপকথার গর্ভ থেকে সেইভাবে পুরাণকথাকে ঠেলে বার করতে পারলেই ইতিবৃত্তের সূত্রটি হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তখন কোন্ পুরাণের কোন্ কথাটি সত্য এবং গ্রাহ্য, কোন্‌টি পরিত্যাজ্য তা নিয়ে নবোদ্যমে গবেষণা চলতে পারে। গবেষণা এখানেই বন্ধ ক'রে কাহিনী সূত্রে ফিরে যাই।

ব্রহ্মা রামচন্দ্রকে পরমেশ্বর বানিয়ে দিলেন। রামরাজত্ব ভোগ করার আশা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। কারণ রামচন্দ্র যেইমাত্র পরমেশ্বর হলেন অমনি তাঁর সব দায়দায়িত্বেরও অবসান হলো। এখন তিনি মানুষের সব সমালোচনা, সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। তাঁর রাজত্বে যদি বল্গাহীন অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়নও হয়, পরমেশ্বর থাকবেন সকল দোষারোপের বাইরে। অত্যাচারিতও মেনে নেবে সব কিছু ভাগবতলীলা ভেবে।

ভারতবাসী এমনই এক ভগবৎ-ভীরু জাতি যে, ছায়াছবিতেও যদি কেউ রাম চরিত্রে দীর্ঘকাল অভিনয় করেন, তবে তাঁকেও তারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা প্রণাম নিবেদন করতে এই বিংশ শতাব্দীতেও প্রস্তুত। আজকের মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার বহু যুগান্ত শেষে বেড়েছে বই কমে নি, কিন্তু পাপপুণ্য ধর্মভীতির ক্ষেত্রে তার নাবালকত্ব সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগেই পড়ে আছে। অতএব রামচন্দ্রকে ব্রহ্মার হাত থেকে স্বয়ং 'ব্রহ্ম'রূপে পাওয়ার পর ভারতবর্ষ কোনো রামরাজত্বের ভালোমন্দ নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি। রামচন্দ্রও হৃষ্টমনে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

বিভীষণ এখন রামানুগ্রহে লঙ্কার অধিপতি। তিনি রাবণের পুষ্পকরথ চালক বৈমানিক পুষ্পককে হুকুম দিয়েছেন বিমান প্রস্তুত করতে। ঠিক হয়েছে, পরমেশ্বর পুষ্পক বিমানে চেপে অযোধ্যায় যাবেন। তাঁকে রওনা করিয়ে দিয়ে, আসুন, কটা ভারি কথা জেনে নিই। রামায়ণ ও রামাবতার বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে কয়েকজন ভারততাত্ত্বিক কয়েকটি মূল্যবান সূত্র পেয়েছেন। এই সুযোগে তাঁদের বক্তব্য শুনে নেওয়া যাক: রামায়ণে' যা-ই বলা থাক, রামচন্দ্রের অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডঃ এইচ সি রায়চৌধুরী বলেছেন, "The Rama Avatara is not referred to in any of the Gupta inscriptions, but is mentioned by Kalidasa (Ramabhi-

dhano Hari), who probably belonged to the Gupta age. The Rama cult however was still in its infancy. A Ramatirtha is mentioned in a Nasik cave inscription of the 2nd cent. A. D. But it is difficult to say whether it was named after the Raghava prince as the son of Jamadagni and the elder brother of Vasudeva bore the same name. Rama worship was certainly favoured by some of the early Tamil saints, notably Kulasekhara and Varahamihira in his Brihat Samhita refers to images of Rama, son of Dasaratha. But there is no clear evidence of a Ramaite sect before the age of Ramananda."[৫]

পণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তী 'The Murder of Vali' প্রবন্ধে লিখেছেন, একাদশ শতকের (এ. ডি. ১১) আগে অবতার রামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। অথচ কৃষ্ণাবতার পূজক বৈষ্ণব সম্প্রদায় তৎপূর্ববর্তী সময় থেকেই প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন। "Although almost from the beginning of the Christian era Rama began to be identified with the same divinity as Visnu is, he was not fully established as so before the eleventh century A.D. On the other hand, Krishna-based Vaisnava-sect had always been in eminence."[৬]

পণ্ডিত উপেন্দ্র নায়ক তাঁর "Impact of Ramayana on the Socio-Cultural Life of Orissa"[৭] প্রবন্ধে ঐ একাদশ শতকেরই উল্লেখ করে লিখেছেন, ঐ সময়কালকে রামাবতার প্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে গ্রাহ্য করা যেতে পারে। তিনি লেখেন: "...erudite scholars are unable to ascertain accurately the exact date of the incarnation of Sri Rama. Moreover, whereas innumerable temples have been built for the worship of 'Siva', 'Visnu', 'Durga' since time immemorial,

৫। Early Hist. of Vaishnava Sect / Dr. H. C. Roychowdhuri.
৬। The Ramayana in Eastern India / Ed. by A. K. Banerjee.
৭। ঐ

temples for worship of Rama are comparatively new, recently built···Ramkrishna Vandarkar opines that there was no Rama temple nor even the image of Rama before the 11th century A. D.···Madhabacarya, the spokesman of Bramha sect of Vaisnavism, had introduced the Rama worship in South India by bringing for the first time the idol of warrior Rama from Badrikasram.

Temples in Orissa built from the 6th century A. D. to the 15th century A. D. have beautiful paintings & excavations of Ramayanic episodes."

রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর বহু শতক পরে রামভক্তেরা তাঁকে অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গবেষণালব্ধ এই ঘটনার আলোকে বিচার করলে ব্রহ্মা ও দেবগণের দ্বারা রামস্তুতির রামায়ণিক বিবরণটিকে পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত রচনা ব'লেই গ্রহণ করতে হয়। এই প্রক্ষিপ্ত রচনাংশ রামকথার ইতিবৃত্তে একটি মস্ত বড় গোঁজামিল সৃষ্টি ক'রে রামায়ণের ঐতিহাসিকতাকে নষ্টকরেছে। আলোচ্য বিবরণের মধ্যে তাথ্যিক গোলমালগুলির প্রতি আমরা আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বলেছি, ১। যে ব্রহ্মা নিজেই জন্মমৃত্যু ও পরমেশ্বরের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ, রামচন্দ্রকে অক্ষয় অবিনশ্বর পরব্রহ্ম ব'লে ঘোষণা করার কোনো অধিকার তাঁর ছিল না। ২। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর পক্ষে কোনো জন্মেই জন্মান্তর সূবাদে রামচন্দ্র হওয়া সম্ভব নয়। এবং এটাও বলব যে আর যে কেউ-ই ব্রহ্মার অশ্রদ্ধেয় ভাষণ শুনে চুপ করে থাকুন, বিদ্রোহী যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী লক্ষ্মণ নিশ্চয় অমন একটি নাটক বস্তুত অভিনীত হ'তে দেখলে চুপচাপ তা মেনে নিতেন না, কিছু না কিছু মন্তব্য তিনি করতেন-ই।

এইসব কারণ বর্তমানে কাহিনী সূত্র আলোচনা করেও আমরা বলতে পারি, ব্রহ্মার রামস্তুতি একটি অবাস্তব গল্পকথা যা কোনো মতলবী পুরাণকার রামায়ণের মধ্যে ঠেসে রেখে গেছেন রামাবতার প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কালে।

রামকে সুতরাং, পরমেশ্বর ভাবার ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিই টিকছে না।

অর্বাচীন কালে তাঁর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা যে হয়েছিল এ তথ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু কোনো অবতারই স্বয়ং পরমেশ্বর, অথবা তাঁর আংশিক প্রতাপসম্পন্ন, কিম্বা অলৌকিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণকারী নন। এ বিষয়ে সব চেয়ে হালের ঘটনাও উল্লেখ

করেছি। দেখিয়েছি, স্বয়ং পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে যে দালাই লামাকে মানা হ'ত, বিপদ্‌কালে তিনি যে কত অসহায় তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অবতারের স্বরূপ বিপদকালেই উদ্ঘাটিত হয়। দেখা যায়, কোনো অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রাকৃতিক জাগতিক কোনো বিপদ থেকেই অন্যকে দূরে থাক, নিজেকেও রক্ষা করতে পারেন না অবতার। এর কারণ, যুগে যুগে ঈশ্বর কখনো অবতাররূপে পৃথিবীর বিশেষ কোনো ভূখণ্ডে অবতরণ করেন না। এক এক গোষ্ঠী মানুষ তার গোষ্ঠী-স্বার্থে মনোমত কারকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা দেন। যাঁকে অবতার বানানো হয়, তিনি, মনে করা হয়, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নানা গুণে ও অপগুণে শ্রেষ্ঠ। পুরো ব্যাপারটাই মানুষের তৈরী। বিশেষ উদ্দেশ্য তার মধ্যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে টেনে এনে পরমেশ্বরের মহান পবিত্র রূপেরই অবমাননা করে। কৃষ্ণ বা রামচন্দ্ররা কেউই পবিত্র নিরপরাধ ও নিষ্কলুষ ছিলেন না। আমরা পরমেশ্বরের ভাবমূর্তিকে কলুষলিপ্ত দেখতে চাই না। যাঁরা তা চান, তাঁরা হে রাম! হে বাসুদেব করুন। যাঁরা না চান, তাঁরা এক পরম শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সেই শক্তির যে কোনো ভাবমূর্তির মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করছেন। মনে হয়, পরমার্থ লাভের এর চেয়ে পবিত্র উপায় আর নেই।

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ রাজা ও রাজত্ব, রাজ্যজয় ও গণহত্যার ইতিবৃত্ত। এগুলির পাঠ সেভাবেই গ্রহণ করা নিরাপদ।

পুষ্পকবিমানে রামসীতা

"পুষ্পকরথ মহানাদে গমনমার্গে উত্থিত হইল। তখন রাম চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্বক চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে ঐ দেখ…ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্মানির্মিত লঙ্কাপুরী। ঐ দেখ…যুদ্ধভূমি।"

যাঁরা বিমানভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে হবে বস্তুত একটি বিমানে বসে বিমানের স্বচ্ছ গবাক্ষপথে রামের সঙ্গে তাঁরাও অপসৃয়মাণ পৃথিবীর রূপদর্শন করছেন। একটি বিমান যে দ্রুততায় ওড়ে, পৃথ্বীপৃষ্ঠ কিন্তু অনুরূপ দ্রুততায় অপসৃত হয় না, দেখা যায় দৃশ্যাবলী বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রাম সেভাবেই সীতাকে দেখাতে লাগলেন। আমরাও একই বিমানে যাত্রা করেছি। সুতরাং লঙ্কা থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পথে আমরাও চিত্রকূটের কুয়াশাবৃত পার্বত্য দ্বীপ ও সমুদ্র দর্শনের এবং দক্ষিণ থেকে

ক্রমশ উত্তর ভারতভ্রমণের দুর্লভ সুযোগটুকু পাব।

এখানে বলে রাখি, পুষ্পকে আরূঢ়া সীতা যদি অশোককাননে বন্দিনী বেদবতী হতেন তবে লঙ্কা-চিত্রকূটের সঙ্গে তাঁর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হত না, তিনি আগেই পরিচিত ছিলেন। রাম কিন্তু যতক্ষণ দ্বীপটি দৃষ্টিপথে ছিল, সীতাকে সে দ্বীপের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। দেখিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্র। বলেছেন, যুদ্ধে কে কোথায় কার সঙ্গে সম্মুখ সমরে জয়ী ও পরাজিত হয়েছিলেন তার গল্প। জনস্থানের ওপর বিমানটি এলে সীতাকে পূর্বঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই বিবরণও দুই বিভিন্ন সীতার অস্তিত্বের সাক্ষ্য। কেননা ঐ জনস্থান থেকেই অগ্নি জানকীকে নিয়ে চলে যান। সন্নিহিত অঞ্চলগুলি অতএব তাঁর পূর্বপরিচিত ছিল।

রাম বললেন, "ঐ যে সমুদ্রে একটি অবতরণ পথ দেখিতেছ, আমরা সমুদ্র পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ···লবণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নল নির্মিত ও অন্যের অসাধ্য। এই দেখ···মহাসমুদ্র···ঐ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক। এই দেখ সমুদ্রের উত্তর তীরবর্তী সেনানিবেশ। ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন।" বিমানও এগোচ্ছে, দৃশ্যও পাল্টে যাচ্ছে চলচ্ছবির মতো। সুন্দর বর্ণনা।

এরপর দৃশ্যপটে ফুটে উঠল কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। রাম দেখালেন কোথায় তিনি বালীবধ করেছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যায় পুষ্পক বিমানটি অবতরণ করল। সেখানে বানর-প্রধানদের প্রিয় মহিষীরা এবং সুন্দরী তারা বিমানে উঠলেন। বিমান পুনরায় আকাশে ভাসলো। দূরের ঋষ্যমূক পর্বত ক্ষণমাত্রে কাছে দেখা গেল। পুষ্পক সেই পর্বতের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রাম বললেন, তিনি ঐ পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হন। সঙ্গে সঙ্গে পম্পা নদী চোখে পড়তে সেটির প্রতি সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে শবরী ও কবন্ধের কথা বললেন। দেখা দিল মেঘের নিচে জনস্থানের মেঘনীল অরণ্য। রাম স্মরণ করিয়ে দিলেন পূর্ব ঘটনা। দেখালেন, তাঁদের পরিত্যক্ত আশ্রম শিবির। দেখতে দেখতে পৃথ্বীপৃষ্ঠে একের পর এক এগিয়ে এলো গোদাবরী নদী, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গের আস্তানা। দেখা দিল দক্ষিণ ভারতের চিত্রকূট পর্বত। কাছিয়ে এলো যমুনা। ভরদ্বাজের সুবৃহৎ আশ্রমপাদ এবং তারপরেই গৈরিক একটি বহুবঙ্কিম রেখার মতো পুণ্যসলিলা গঙ্গা।

রাম ক্রমশ উত্তেজিত। যে পথ বহু রাত বহু দিন ধরে অতিক্রম করেছেন তাঁরা রথে শকটে ও পদব্রজে, আজ নিমেষমাত্রে সেই ভূমানচিত্রের ওপর চক্রাকারে উড়ে চলেছেন ও মুহূর্তে মুহূর্তে পরিচিত স্থানগুলি চোখের সামনে যাতায়াত করছে।

দেখা দিচ্ছে শৃঙ্গবের পুর। আর তার পরেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত অযোধ্যা - পৃথ্বীপৃষ্ঠে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠছে।

রাম তর্জনী তুলে সোল্লাসে বলেন, ঐ, "ঐ দেখ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা। জানকি! তুমি পৌছিয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।"

"তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টমনে (বিমান থেকে) অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ পুরী সৌধধবল,…প্রশস্ত রাজপথশোভিত।"

পৌরাণিক গল্পকথাকাব্যে বিমানভ্রমণের এমন বাস্তব বর্ণনা বিরল। সেজন্যই ভ্রমণচিত্রটি প্রায় সর্বাংশে উদ্ধৃত করলাম। পড়ে মনে হয়, বাল্মীকিও যেন স্বয়ং ঐ বিমানে ছিলেন,তাছাড়া এমন পূর্বাপর নিখুঁত বর্ণনা সম্ভব নয়। অন্তত যিনি বিমানে ভ্রমণ না করেছেন তাঁর পক্ষে কল্পনার পাখা মেলে এই শব্দচিত্র অঙ্কন করাও অসম্ভব। **রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের এই বর্ণনাই পৌরাণিক বিমানের অস্তিত্বের একটি তর্কাতীত প্রমাণ।**

বিমানটিকে ভরদ্বাজ মুনির শিবির প্রাঙ্গণেও নামানো হয়েছিল। এসব বর্ণনায় আরও প্রমাণিত হয়, স্থানে স্থানে উত্তম বিমানাবতরণ ক্ষেত্র ছিল।

রাম হনুমানকে বললেন, তুমি আগে অযোধ্যায় গিয়ে ভরতকে আমার আগমনের সংবাদ দাও। আমার প্রতি বর্তমানে তাঁর কী মনোভাব তাও জেনে নিও (অর্থাৎ ভরতের প্রতি এখনও পূর্ণ বিশ্বাস নেই রামের। রাজ্যলাভের পর ভরত বদলে গিয়ে থাকতে পারেন। প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের মতো তাই বুদ্ধিমান হনুমানকে তিনি দূত হিসেবে পাঠালেন।) ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে অযোধ্যা আর মাত্র মাইল দুয়েক পথ। হনুমান আনায়াসেই অল্পসময়ে এই পথ অতিক্রম করেছেন।

ভরত সম্পর্কে রামের অবিশ্বাস রামের কুটিল মনেরই পরিচায়ক। ভরতের সততা সুপরীক্ষিত। তাছাড়া ভরত ছিলেন দেবশিবিরের নজরবন্দী। রামের রাজত্ব রক্ষা করা ব্যতীত তাঁর অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি বিদ্রোহী হলে, দেবশিবিরই তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। কেন না অযোধ্যার সিংহাসনে দেবতাদের প্রতিনিধি লঙ্কাকাণ্ডের আগেই মনোনীত ছিলেন, তিনি রামচন্দ্র। ভরত নিজেও জানতেন তিনি সাময়িকভাবে রামের রাজ্যরক্ষা করছেন। তাই এই রাজপুত্র স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করে অযোধ্যা থেকে ক্রোশখানেক দূরে ব'সে রামের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য চালাতেন। হনুমান সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। দেখলেন, ভরত কিছুমাত্র বিলাসিতার মধ্যে দিন যাপন করেন না। তাঁর স্বভাব বেশভূষা এবং

আচরণ সবই সাধু প্রকৃতির। রামের পুনরাগমন সংবাদে তিনি পুলকিত ও ভারমুক্ত বোধ করছেন। খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি হনুমানকে পুরস্কৃত করলেন এবং শত্রুঘ্নকে আদেশ দিলেন রামের অভ্যর্থনার জন্য সমুচিত রাজকীয় ব্যবস্থাদি করতে। হনুমান ফিরে গেলেন না। সম্ভবত বেতার (ওয়্যারলেস) সংযোগে তিনি রামচন্দ্রকে তাঁর সেই তথাকথিত ধ্যানকক্ষে অযোধ্যার যাবতীয় সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন।

যথাসময়ে পদব্রজে বানর সেনারা এবং পুষ্পক বিমানে স-মহিষী রথী-মহারথী যূথপতিগণ সহ রাম সীতা অযোধ্যার পুরদ্বারে এসে অবতরণ করলেন।

"বেগবান বিমান ভূ-পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন।"

কৃতাঞ্জলিপুটে ভরত বললেন, "আর্য! আপনি যে রাজ্য ন্যাস-স্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। আমি···সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।"

রাম সদলে বিমান থেকে অবতরণ করে বৈমানিককে বললেন, পুষ্পক! তুমি যক্ষরাজ কুবেরের কাছে প্রত্যাবর্তন কর। এই বলে তিনি কুবেরের বিমান তাঁকেই ফিরিয়ে দিলেন।

রামের রাজ্যাভিষেকের পর বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যায় এবং বিভীষণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন প্রচুর উপঢৌকোন নিয়ে। প্রজাশোষিত রাজকোষ অকাতরে বিলি-বণ্টিত হ'তে থাকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

আশার ছলনে ভুলি

বড় আশা করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। ভেবেছিলেন, মহাপ্রতাপে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবেন। রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এমনই প্রবল যে অযোধ্যা প্রবেশের আগে ভরতকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু গদীতে ব'সে দেখলেন, ভরত নয়, রাজ্যপাটের দখল নিয়ে বসেছেন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণরা। তাঁদের রাক্ষুসে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করাই অতঃপর রামচন্দ্রের একমাত্র কর্ম হবে।

রামরাজত্বে প্রজার অবস্থা কেমন হয়েছিল রামায়ণে তার কোনো যথার্থ চিত্র নেই। কতগুলি মুনিতে বানানো গালভরা শব্দ মাত্র আছে। মুনিরা বলে দিলেন,

"তাঁহার রাজ্যকালে কোনো স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই…ব্যাধিভয়ও নিবারিত ছিল। …জনপদ দস্যুভয়শূন্য…কাহারও অনর্থ ঘটিত না এবং বৃদ্ধদিগকে বালকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হইত না।…লোক সকল সহস্রজীবী ও বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক…ধর্মপরায়ণ ছিল।"

পুরাণকাররা যখন কোনো মিথ্যা নিবন্ধ বুদ্ধিদীপ্ত পুরাগ্রন্থে বয়ন করেছেন, তখন নিজের রচনাটি যে সেই উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থে উন্মাদের প্রলাপমাত্র হয়ে থাকবে একথা ভেবে দেখেন নি। কলমে যা এসেছে তাই লিখে গেছেন। বলা হয়েছে, রামরাজত্বে কেউ বিধবা হয় নি, শিশুমৃত্যু ঘটে নি, রোগশোকও ছিল না। মানুষ পরম সুখে যথেচ্ছ পুত্রকন্যার জন্ম দিয়েছে।

মুনিকথিত এই বিবরণীটি মানতে হলে, কেবলমাত্র অযোধ্যার জনসমুদ্রেই পৃথিবী প্লাবিত হওয়ার কথা। প্রক্ষিপ্ত গোঁজামিল-রচয়িতার এসব চিন্তা করার কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না।

হৃতদরিদ্র শোষিত প্রজারা চুরি ডাকাতি অবশ্য না-ও করে থাকতে পারে। আজও সেই প্রাচীন সৎ মানুষের উত্তরপুরুষরা হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত জনবিরল প্রদেশে বর্তমান আছেন, যাঁরা অনাহারে মারা গেলেও অপরের দ্রব্য স্পর্শ করেন না, কারও একফালি পরিত্যক্ত ন্যাকড়া না বলে গ্রহণ করে শীতপ্রধান দেশে নিজের অনাবৃত দেহ আবৃত করার প্রলোভন তাঁদের সততা নষ্ট করে না। আধুনিক নগর সভ্যতা সেই সততা বহুক্ষেত্রে নষ্ট করে দিচ্ছে, তবু ঐ সব মানুষের আজও অভাব নেই। রামরাজত্বে চুরিডাকাতি না থেকে থাকলে তার অর্থ রাজ্যের সুশাসন নয়, মানুষের সততা। প্রক্ষিপ্ত দুটি শ্লোক লিখে রামরাজত্বের জয়গান করা হলেই যুক্তিবিচারে তা মান্য হয় না।

রামরাজত্ব সম্পর্কে প্রকৃত বিবরণ একটিই আছে বাল্মীকি রামায়ণের শেষ সর্গে [১২৯ স]। বাল্মীকি জানিয়েছেন, "তিনি [রাম] দশ সহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্বক দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।" "অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান" করার কথা লিখে বিবরটিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন কবি। তারপরই আজানুলম্বিত বাহুর প্রশংসা করে রামের "পরমসুখে রাজ্যশাসন" করার কথা লেখা হয়েছে। মনে হয়, আদি কাব্যে মহাকবির রচিত এটুকু বর্ণনাই ছিল। অতঃপর পূর্বোল্লিখিত অসম্ভব একটি জরামৃত্যুহীন রাজ্যের কল্পিত চিত্র প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে যাগযজ্ঞই রাজাদের একমাত্র করণীয় কাজ ছিল। অবিরত

শোষণই যজ্ঞ, উৎসব এবং রাজাদের বিলাস মৃগয়াদির খরচ যোগান দিত। ভারত-বর্ষে এই ধরনের অত্যাচার এখনও চলে। জমিদার ভূ-স্বামীরা আদিবাসী, হরিজন, সম্প্রদায়কে শোষণ করে। মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশে গৌরকান্তিদের শোষণও ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা। রামরাজত্বে অথবা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজত্বেও অনুরূপ অবাধ শোষণ চলেছিল।

রাম বিদ্রোহ করেছিলেন কিনা বাল্মীকি রামায়ণে সে খবর নেই। তবে যে 'উত্তরকাণ্ড'টি বাল্মীকি রামায়ণে গায়েব হয়ে-যাওয়া তথ্যের বিবরণী সেখানে এমন কিছু ঘটনার ইঙ্গিত থেকে গেছে বলে অনুমান করলে হয়ত ভুল হবে না। যথাসময় সে প্রসঙ্গে আসছি।

বাল্মীকি রামায়ণে সীতার বাল্মীকি আশ্রমে দীর্ঘ অবস্থান, রামকর্তৃক লক্ষ্মণ পরিত্যাগ, পরে ভরত শত্রুঘ্নদের সঙ্গে আপন জীবন বিসর্জন এবং অযোধ্যায় সার্বিক ধ্বংসের কথা নেই। পণ্ডিতেরা বলেছেন, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সিংহাসন আরোহণের পর বাল্মীকি রামায়ণের সমাপ্তি ঘটেছে। অতঃপর উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত হয়েছে! সেখানে রামজন্মের পূর্ব-ঘটনাবলী, রাক্ষস ও বানরদের বিবরণ, বেদবতী ইত্যাদির কথা এবং পূর্বকালের কিছু দেবাসুর যুদ্ধের বিচ্ছিন্ন কাহিনী আছে। আছে রাম-কর্তৃক ভায়েদের বিভিন্ন রাজ্যজয়ে প্রেরণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে সেইসব বিজিত রাজ্য ভাগ করে দেওয়া,—ইত্যাকার ইতিহাস। কিন্তু রামায়ণে বিভক্ত উত্তরকাণ্ডের ৯৪ সর্গে রামপুত্র লবকুশ রামায়ণগান মাঝপথে থামিয়ে অকস্মাৎ বললেন, "ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। ইহার শ্লোক সংখ্যা চতুর্বিংশৎ সহস্র এবং উপাখ্যান একশত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচশত সর্গ ছয় কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড নিবদ্ধ আছে।"

শুধু যে লবকুশের মুখ দিয়েই বলানো হ'লো বাল্মীকি রামায়ণে উত্তরকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত তাই নয়, সীতার পাতাল প্রবেশের পর উত্তরকাণ্ডটি যখন সমাপ্তির মুখে, তখন এক ব্রহ্মা এসে জানালেন, রামের জন্ম থেকে সীতার পাতাল প্রবেশের পরও কিছু অংশ বাল্মীকি রচিত। সেটিই আদিকাব্য। এই কথা বলে, ব্রহ্মা বললেন, এখন সে কাব্যের শেষাংশ শ্রবণ কর। এই "শেষাংশের নাম উত্তরকাণ্ড।"[১] এই বক্তব্য মেনে নিলে প্রকৃত অর্থে 'উত্তরকাণ্ড' শুরু হয়েছে এই কাণ্ডের ৯৯ সর্গ থেকে। শেষ হয়েছে, ১১১ সর্গে। বাকি পূর্ববর্তী উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি বিরচিত

১। বা. রা. / হেমচন্দ্র অনু / ভারবি / ৯৮ সর্গ

ব'লে মানতে হয়।

এই সব কিছুই শোনানো হ'ল রামচন্দ্রকে। কিন্তু আমাদের পূর্ব আলোচনা স্মরণ করে যদি আচার্য সুনীতিকুমারের উক্তিই মান্য করি, তবে স্বীকার করতেই হবে উত্তরকাণ্ড কেন, বাল্মীকি রামায়ণই রামচন্দ্রের আমলে লিখিত হয় নি। লবকুশ চারণ কবি, পুরাণ গায়ক। তাঁরা বাল্মীকি রামায়ণকে বিশ্বাসযোগ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রামের রাজসভায় কাব্যটি গীত হয় বলে একটি বিভ্রান্তি প্রচার করে গেছেন।

এই অবধি তর্ক পরিষ্কার। বিভ্রান্তি রয়ে যায় তবুও। উত্তরকাণ্ডের অধিকাংশই বাল্মীকিরচিত বলা হ'লো কেন? এর মধ্যে আবার বিশেষ কোনো সত্য লুকিয়ে আছে, নাকি বিভ্রান্তিকর প্রচারের দ্বারা সত্যের অপলাপ ঘটেছে?

আবার বলব, প্রশ্নটি গবেষকদের বিচার্য, আমার নয়। আমি একটি সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি শুধু এবং সেই ভাবনায় বাধা নেই, যেমন:

কোনো বিশেষ রাজনৈতিক কারণে হয়ত ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ ভয়ে স্বয়ং বাল্মীকিই উত্তরকাণ্ডের বৃহদংশ রচনা করেও তা প্রকাশ না করে গুপ্ত রেখেছিলেন। তর্কটি মনে আসে এজন্য যে রামায়ণ যেন হঠাৎ-ই শেষ হয়ে গেছে। যদি রাম-জীবনের বহু যুগ পরে রামায়ণ রচনা করলেন বাল্মীকি, তবে সে রচনার আদি অংশ অর্থাৎ রাবণ জীবনী ইত্যাদি ও শেষাংশ রামের জীবনাবসান পর্বই বা তিনি লিখলেন না কেন? এমন তো হতে পারে বাল্মীকিই আদ্যন্ত রামকাহিনীর স্রষ্টা। তবে রাবণের জীবনবৃত্তান্ত ও রামের শেষ জীবনকথা সাধারণ্যে প্রচার হ'লে তা ব্রাহ্মণ সম্প্রসারণবাদীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেবে এই ভয়ে তৎকালীয় সেনসর বা বিবাচনে উত্তরকাণ্ডের ঐ অংশ ছেঁটে রাখা হয়?

রামজীবনের উত্তর ভাগ-এ প্রতি সর্গে প্রমাণ থেকে গেছে রাম সুখে তো নয়ই, নিরন্তর মর্মযাতানার মধ্য দিয়েই শেষের দিনগুলি [অর্থাৎ অযোধ্যার সিংহাসনে বসার পর] অতিবাহিত করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁকে শিখণ্ডী সাজিয়ে একটির পর একটি অন্যায় করে গেছেন। তাড়কা ও মারীচ বধ, জনস্থান থেকে রাক্ষসজাতির নিশ্চিহ্নকরণ, বালী বধ, বেদজ্ঞ 'ধার্মিক' [আধ্যাত্মিক অর্থে] রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করে লঙ্কায় নীচ বিভীষণের প্রতিষ্ঠা—এই সব জনঅপ্রিয় কাজ সম্প্রসারণবাদী দেবতা ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী রামকে সামনে রেখে করেছেন এবং বস্তুতপক্ষে রামচন্দ্র অতি সামান্য এক সমরবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও ঐ গুপ্ত কারণবশত তাঁকেই তাঁরা বানিয়েছেন বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ। ফলে

রাম হয়েছিলেন সকল অপবাদের ও অপ্রশংসার লক্ষ্য। ওদিকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে অবাধ লুণ্ঠনে পরিতৃপ্ত হয়েছেন নেপথ্যের পরিচালকরা নিজেদের নামাবলীতে কোনো নোংরা না লাগিয়েই।

বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ বারবার রামকে সচেতন করে বলতে চেয়েছিলেন, আপনি দৈবের দাসত্ব ত্যাগ করুন। কিন্তু ভোগী ও সুখী রাম দেবনারী ও মৈরেয় মধুতে গা ভাসিয়ে লক্ষ্মণের পরামর্শে কান দেন নি। ভেবেছিলেন অযোধ্যার সিংহাসনে বসেও দেবলোকের সুন্দরীদের ভোগ করে সুখে বিভীষণাদির মতো জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি' যে ফল তাঁর ভাগ্যে লভ্য হলো তা থেকে না তৈরী হ'ল উত্তেজক সুরা, না মিলল কোন মিষ্টি বেদবতী বা জানকী। তিক্ত বিষবৎ একটি ফলে কামড় দিয়ে বাকি জীবনটা চোখের জল ফেলে অবশেষে ব্রাহ্মণ নেতাদের হুকুমে তিনি সর্বসমক্ষে সরযূ নদীতে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন।

ব্রাহ্মণ চক্রান্ত যে কত নির্মম আর নিষ্ঠুর রামচরিত তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। অতঃপর সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কালরাত্রির কথায় আসি।

শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর

অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণের পর রামজীবনে ক্রমশ হতাশার অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করল জানকীকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগের ঘটনা থেকে।[১] কোনো সুস্পষ্ট কারণ নেই, হঠাৎ-ই দেখা গেল লক্ষ্মণকে ডেকে রাম বললেন, দেখো, সকলেই জানে জানকী নিষ্পাপ। স্বয়ং দেবতারাই এই কথা বলে তাঁকে আমার হাতে ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু আবার কথা উঠেছে, আবার সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে। সুতরাং তুমি কোনো প্রশ্ন তর্ক না তুলে তাঁকে বাল্মীকির আশ্রমে দিয়ে এসো। এটাই আদেশ।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত একেই বলে। আমরা তো বটেই, স্বয়ং লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের

১। মনে রাখতে হবে, এই বাল্মীকি রামচরিতকার আদিকবি নন। তিনি রামায়ণ রচনা করেন বহু যুগ অন্তে। সে তর্ক আচার্য সুনীতিকুমার যেমন উপস্থাপিত করেছেন, উদ্ধৃত করেছি। আলোচ্য বাল্মীকি রাম আমদের প্রচেতা-বংশীয় পুরুষ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

এ হেন আদেশে বিস্মিত হলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখছেন জানকীকে পরিত্যাগ করতে দুঃখযাতনায় কাতর রামচন্দ্র অশ্রু মোচন করছেন ও দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। অথচ তিনিই বলছেন, আমার আদেশ, জানকীকে দিয়ে এসো। তাছাড়া যে লোকাপবাদের কথা বলা হচ্ছে, তেমন প্রজা-অসন্তোষের খবরও তো কোথাও বলা হয় নি। ব্রাহ্মণশাসিত রামরাজত্বে প্রজাদের কী সাহস আছে শাসক সম্প্রদায়ের কর্মসিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলে ? তারা জানে, দেবতার শাসন নিষ্ঠুর। ক্ষমা নেই তার বিরুদ্ধে তিলমাত্র মাথা তুললে। জনৈক শূদ্র আত্মোন্নতির চেষ্টা করছে জানা মাত্র রাম তার মাথা কেটে নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের আদেশে [উ. কা. / ৭৬ সর্গ দ্র]। অতএব লক্ষ্মণ বুঝলেন, এসেছে আদেশ দেবলোক থেকে। সীতা বিসর্জন তাই অনিবার্য। রাম অসহায়।

সীতাকে রেখে ফিরে আসার সময় সারথি সুমন্ত্রকে লক্ষ্মণ বললেন, "দেখো, ...আমার বোধ হয় **এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈব নিবন্ধন**।" উত্তরে দশরথের মন্ত্রী ও সারথি খুব সাবধানে জানালেন, লক্ষ্মণের অনুমানই অভ্রান্ত। ঘটনাটির নেপথ্যে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কূটনৈতিক খেলা চলছে। সুমন্ত্র দেবতাদের পরবর্তী চক্রান্তের সংবাদও সংগ্রহ করেছেন। রামের দুঃখরাত্রি আসছে এবার দল বেঁধে। সীতা পরিত্যাগের মতো তাঁকে হয়ত ভায়েদেরও পরিত্যাগ করতে হবে।

সুমন্ত্র বার বার শঙ্কিতভাবে লক্ষ্মণকে বলে দিলেন, কোনো অবস্থাতেই লক্ষ্মণ যেন এইসব গোপনকথা অন্যকে না বলেন। [উ. কা. / বা. রা. / ৫০ সর্গ / ভারবি]

সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে দেবদুরভিসন্ধির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। সে কথায় ফাঁস হয়ে গেছে ব্রাহ্মণ্য চক্রান্ত। অতএব কোনো এক পুরাণকারকে এ বিষয়ে একটি শাপ-অভিশাপের গল্প গড়ে রামায়ণে গুঁজে দিতে হ'ল। গল্পটিতে বলা হয়েছে, সুরাসুর যুদ্ধের সময় দৈত্যরা দেবগণের উৎপীড়নে কাতর হয়ে মহর্ষি ভৃগুর পত্নীর কাছে আশ্রয় চান। তিনি তাঁদের আশ্রয় দিলে ক্রুদ্ধ "বিষ্ণু ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন।" ভৃগু রেগে গিয়ে বিষ্ণুকে অভিশপ্ত ক'রে বলেন, তোমাকেও এই পাপে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে সুদীর্ঘকাল পত্নীবিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। মুনির শাপ যাতে নিষ্ফল না হয় সেজন্য ভগবান বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু। তাই হবে। আর সেজন্যই তো তিনি রামচন্দ্রের রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হলেন ধরণীধামে [ঐ / ৫১ সর্গ]।

এই বোকাবোকা গল্পটি অনালোচ্য থাকাই উচিত। কিন্তু ভক্তের বিশাল

বিষ্ণু কর্তৃক স্বেচ্ছায় অভিশাপ গ্রহণের মতোই এক দুর্বোধ্য ব্যাপার। তাই বিচার করে গল্পটির সম্ভাব্যতা নির্ণয় করতে হয়।

প্রথমত, রামচন্দ্র দেবতা বিষ্ণুর ভূত বা ভূতপূর্ব বিষ্ণু নন। আমরা প্রমাণ করেছি, তিনি বিষ্ণুপদবিধারী এক দেবতার ঔরসজাত সন্তান। তাঁর জন্মের কারণও কোনো ভৃগুমুনির অভিশাপ নয়, রাবণবধের জন্যই রামের জন্ম। দ্বিতীয়ত, যে বিষ্ণু দেবস্বার্থে ব্রাহ্মণপত্নীর মাথা কাটেন, তেমন ব্যক্তিই আবার ভৃগুর অভিশাপ শিরোধার্য ক'রে আজীবন দুঃখবরণ করার জন্য অযোধ্যা ধামে অবতার হয়ে অবতরণ করবেন, এই অসম্ভব ঘটনাও অকল্পনীয়। বিশেষত কস্মিনকালে কোনো দেবতারই যখন পরমেশ্বরতুল্য অলৌকিক কর্ম করার সাধ্য ছিল না, তখন বিষ্ণু রামশরীর ধারণ করে অযোধ্যা এবং গাড়ওয়াল হিমালয়, একই সঙ্গে ভারতবর্ষের দুটি জায়গায় বর্তমান থাকবেন কি করে? তৃতীয়ত, এতো লোক থাকতে দুর্বাসাই বা পাটি পেড়ে বসে দশরথকে শোনাতে যাবেন কেন এই দুঃখময় রামজীবন কথা? দশরথ, দেখা গেছে, দেবব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। রামকে তিনি দেবতাদের থপ্পরে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হন। চতুর্থত, রাবণবধের পর অযোধ্যার সিংহাসনে রামকে বসিয়ে অযোধ্যা ইচ্ছেমত লুঠ করলে অবস্থার গতিপ্রকৃতি অনুসারে রামের শেষ শক্তি ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নকে যে নির্বাসন দিতে হবে তাই বা দশরথের আমলে দুর্বাসা জানবেন কী করে? পাঁচ নম্বর, সুমন্ত্রের মুখে নিজের ভবিষ্যৎ নির্বাসনের কথা শুনেও বিষ্ণুমাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই আষাঢ়ে গল্পটি রসিয়ে রসিয়ে হজম করার পর লক্ষ্মণ কী করে "অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ও সুমন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ" দিলেন? প্রক্ষিপ্ত গল্পের রচয়িতা এতগুলি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ইচ্ছেমত গল্প গুঁজে গেলেন ভক্তজনের যে বিশ্বাসে আস্থা রেখে, দুঃখের বিষয়, আমরা তেমন বিশ্বাসী নই। লক্ষ্মণের যে চরিত্র চিত্রিত দেখি, তাতে মনে হয়, তাঁর কাছে এমন একটি আষাঢ়ে গল্প বলা হ'লে তিনি সুমন্ত্রকে ছেড়ে কথা বলতেন না।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত যে, ভৃগুশাপের কোনো গল্প বলা হয় নি। সুমন্ত্রও দেবচক্রান্তের সংবাদ কোনো দশরথ-দুর্বাসা কথোপকথন থেকে আহরণ করেন নি। তিনি এই চক্রান্তের খবর খুবই সম্প্রতি পেয়েছেন। কিন্তু যেহেতু কার্যত রাম সহ তাঁরা সকলেই দেবব্রাহ্মণদের হাতে নজরবন্দী, তাই কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ারও আর সুযোগ নেই। এখন মৃত্যুর পরোয়ানাটির জন্য সকলকেই অপেক্ষা করতে হবে। সেটা যত পরে আসে ততই মঙ্গল। দেবতাদের সাংঘাতিক

চক্রান্ত জানার পরও তাই বুদ্ধিমানের মতো তা না জানার ভান করাই শ্রেয়স্কর। সুমন্ত্র সেই উপদেশই দিয়েছেন এবং লক্ষ্মণও তা বুঝে অনাগত ভয়ঙ্কর পরিণামের অপেক্ষায় রহে গেলেন। কারণ, দৈবাধীনতা স্বীকারের পরিণাম যে এমনই হবে তা লক্ষ্মণ আগেই আঁচ করে রামকে সাবধান করেছিলেন। রামচন্দ্র কামনিপুণা রসবতী দেবলক্ষ্মীদের দ্বারা মোহিত হয়ে সে সব পরামর্শে কান দেন নি। বলে-ছিলেন, অমন দেবনারী ভোগ করতে পেলে তিনি অযোধ্যা কেন, হিমালয় স্বর্গের প্রভুত্বও কামনা করেন না।

এ হেন ক্ষত্রিয় পুত্রের দুর্বলতা কোথায়, দেবতারা তা বিলক্ষণ জানতেন। এ সব মানুষকে তাঁরা ঐ দেবনারী দিয়েই বশ করতেন। যতকাল রামকে ব্যবহার করা দেবতাদের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল, ততকাল ঐ দেবনারীদের তাঁরা যোগান দিয়েছেন। বনপথে জানকী ও বেদবতী নানা রঙে ঢঙে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন রামকে। শেষ পর্যায়ে যখন যুদ্ধ মাথার ওপর, তখন দুই স্বনারীকেই তাঁরা রণক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ এইসব কামনিপুণা নারীরাই দেবতাদের মূলধন। এই মানবী-ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার ক'রে রামচন্দ্রের মতো বহু আত্মসুখপরায়ণ ভারতীয় রাজাকে মাতাল ক'রে তাঁরা আপন কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। ফলে রামের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন প্রজাসাধারণ। ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যেও অশ্রদ্ধার ভাব সুস্পষ্ট হয়েছে ক্রমশ। অতঃপর রামকে দেবনারী দিয়ে তুষ্ট রাখার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। সেই রমণীঅস্ত্র দেবতাদেরই ভোগ্যা। সুতরাং তাঁরা কেড়ে নিয়েছেন জানকী। কোন্ প্রয়োজনে জানকীকে বাল্মীকি আশ্রমে দীর্ঘ সময় সরিয়ে রাখা হলো মহাকবি তা জানান নি। রামেরও প্রশ্ন করার স্বাধীনতা ছিল না। তিনি আশায় ছিলেন, প্রয়োজন মিটলে আবার সীতাকে প্রত্যর্পণ করা হবে। কিন্তু পূর্ণ হয় নি সেই আশা। সীতাকে হিমালয় স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হলো দেবতাদের। তখন আবার একটি নাট্যমঞ্চ তৈরী করলেন তাঁরা।

আবার যজ্ঞ। রামের ওপর আদেশ, জনসমক্ষে অভিনয় করে তাঁকে বলতে হবে, সীতাকে তিনি পরীক্ষা না করে গ্রহণ করবেন না।

শুরু হ'লো যজ্ঞ। অযোধ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ব্রাহ্মণ নেতার সঙ্গে নাগরিকরাও উপস্থিত হলেন সেই অদ্ভুত বিচার দেখতে। সবাই জানেন, রাজার ইচ্ছায় জানকী বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন। এবার জানলেন, রাজাই পরীক্ষা নেবেন প্রত্যাবৃতা জানকীর দেহমনের পবিত্রতা সম্পর্কে। পুরো ব্যাপারটাই পাগলামী।

যদি রাজাই তাঁর রাণীকে বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণাশ্রমে গচ্ছিত রাখলেন, তবে মহিষীর পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্বও তো তাঁরই। এই নাটক কেন? কেন, তা রামচন্দ্রও জানেন না।

মহড়া মতো নাটক শুরু হ'লো। বাল্মীকি [ইনি আমাদের মহাকবি বাল্মীকি নন, তৎকালীয় জনৈক প্রচেতা বংশীয় দশম পুরুষ এঁর পরিচয়] সীতাকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেই তৈরী সংলাপ শুরু করলেন, পবিত্র স্বভাব এই তোমার জানকী আর এই দুই পুত্র। এদের গ্রহণ কর। আমি বলছি, জানকীর পবিত্রতায় কোনো সন্দেহ নেই।

দীর্ঘ বিরহের পর জানকীকে দেখে রাম সব ঘুলিয়ে ফেললেন। ভুলে গেলেন তিনি তাঁর মুখস্থ করা পুরো ডায়লগ বা সংলাপ। একবার শুষ্ক কণ্ঠে শুধু বললেন, লোকাপবাদ ভয় আমার প্রবল, তাই জানকীর বিশুদ্ধতার প্রমাণ, যেমন মহর্ষি বলেছেন, তেমন দরকার।

সর্বনাশ, এ যে পুরো ব্রাহ্মণ অভিসন্ধি ফাঁসিয়ে দেওয়ার মতো সংলাপ! রাম বলবেন, আমি সীতাকে পরীক্ষা না করে গ্রহণ করব না। যথার্থ রাজার মতো কথা। তা নয়, বলছেন, মহর্ষির বাক্যানুসারে সীতার পরীক্ষা প্রয়োজন। নাট্যমঞ্চে দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। দেখা গেল, ব্রহ্মা সহ দেবসেনারা নাট্যমঞ্চের দখল নিতে এগিয়ে আসছেন। যদি কোনো গোলমাল হয় হয়ত বা সেই আশঙ্কায়।

তখন দেবতাদের প্রতি "দৃষ্টিপাত পূর্বক" রাম করজোড়ে বারম্বার অনুনয় করে বলতে লাগলেন, "ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইঁহার প্রতি আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।" অর্থাৎ হে দেবগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণ প্রভুগণ! এবার দয়া করে সীতাকে ফিরিয়ে দিন।[২]

দেবতারা দেখলেন রামচন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শেখানো ডায়লগ উচ্চারণ না করে তিনি কেবল কাতর কণ্ঠে দেবরমণী সীতাকে কামনা করছেন। সমস্ত নাট্যায়োজনই মাঠে মারা যায়। তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি সীতাকে তুলে মঞ্চে ঢুকিয়ে দিলেন। প্রবেশমাত্র সীতা অনর্গল তিনবার সুস্পষ্ট ভাবে বললেন, যদি আমি একমাত্র রামের প্রতিই অনুরাগিণী থেকে থাকি তবে হে পৃথিবী, তুমি বিদীর্ণা হও, আমি পাতালপ্রবেশ করব।

২। উ. কা. / বা. রা. / ৫৬—৫৭ সর্গ / ভারবি

আশ্চর্য মাথা মুণ্ডহীন নাটক। রাম বলছেন, ওগো, সবাই শোনো, আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে, সীতার কোনো পরীক্ষার আর দরকার নেই। সেটা আমি চাইও নি, মহর্ষির আজ্ঞায় বলেছি মাত্র, কথার কথা, তোমরা সীতাকে ফিরিয়ে দাও!

তাঁর সেই কাতরোক্তি ডুবিয়ে দিয়ে সীতা চিৎকার করছেন, দেরী কেন, পৃথিবী বিদীর্ণা হও!

সভাস্থ সাধারণ যখন স্তম্ভিত তখন হড়হড় করে পৃথিবী বিদীর্ণ হলেন, সীতাও রথে চেপে নেমে গেলেন। সর্বসমক্ষে সাধ্বী সীতার পাতালপ্রবেশ ঘটল। আমাদেরও উদ্বেগের অবসান হলো। কেবল একটি প্রশ্ন, দেবতারা কি আধুনিক কায়দায় একটি নাট্যমঞ্চ আগেই প্রস্তুত রেখেছিলেন, যার সুইচ টিপলে দুই পাটাতন সরে গিয়ে দৈব-আসন সেই গহ্বর থেকে ওঠে নামে? এসব ব্যাপার সেকালে দৈব প্রহেলিকা ছিল, একালে হিন্দী ছায়াছবির সেটে হরদম দেখা যায়।

যাক, রামচন্দ্রের বায়না প্রভু ব্রাহ্মণরা আর রক্ষা করতে রাজি নন। তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন সভাস্থ লোকজনের মধ্যে রামকে উল্টোপাল্টা ডায়লগ বলতে শুনে। তাছাড়া এই প্রথম দেবতারা রামকে একটা বিদ্রোহও করতে দেখলেন। দেখলেন, যিনি আদেশ পালনে চির অভ্যস্ত, দেবনারীকে হারিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন। তাঁর বিকারগ্রস্ত দেহমন "ক্রোধে প্রকম্পিত" হচ্ছে।

তখন "ব্রহ্মা **ক্রোধমূর্ছিত** শোকাকুল রামকে কহিলেন, রাম! সন্তপ্ত হইও না, এক্ষণে···দেবগণের সহিত মন্ত্রণার কথা মনে করিয়া দেখ।"

অর্থাৎ, রামচন্দ্র! মুষড়ে পোড়ো না, বাপু। তোমাকে তো আগেই বলা হয়েছিল, সীতাকে নিয়ে কী খেলা হবে এই যজ্ঞে, সেই মন্ত্রণার কথা স্মরণ করে শান্ত হও। তারপর বোকাভোলানো স্তোকবাক্য উচ্চারণ ক'রে রামচন্দ্রের পিঠও থাবড়ে দিলেন ব্রহ্মা। বললেন, অপেক্ষা করো, "স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত তাঁহার (সীতার) সমাগম হইবে।"

ব্রহ্মা বস্তুতই ভক্তের ভগবান। দেহবান ভগবানরা ভক্তের সর্বস্ব ইহজীবনে গ্রহণ করেন। 'ভগ' মানে অংশ, 'বান' মানে অধিকারী। ভক্তের অংশ বা সম্পদের যিনি অধিকারী ও গ্রহণকারী তিনিই তো ভগবান। পরমেশ্বরের সঙ্গে ভগবানদের এখানেই আসমান-জমিন তফাত। পরমেশ্বর কিছুই গ্রহণ করেন না। অযাচিত দানে মহাবিশ্বকে পরিপূর্ণ করে রাখেন। কিন্তু ভগবানরা বচন, মন্ত্রণা, ভস্ম বা ছাই ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। ভক্তের কাছ থেকে যতটা পারেন হাতিয়ে নিয়ে বলেন, ইহলোকে এই যা দিলে, স্বর্গে গিয়ে তার সব ফেরত পাবে।

ভগবানই একমাত্র, যিনি কল্পিত স্বর্গের টিকিট যখন তখন কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে বার করে দিতে পারেন। পরমেশ্বর পারেন না। পারেন না, তার কারণ, তাঁর কোনো বিশেষ স্বর্গ বা স্বতন্ত্র তালুক নেই। তিনি সর্বময়। অণু পরমাণু, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম সবকিছুর মধ্যে সর্বত্র বর্তমান। স্বর্গ সাজিয়ে বসে থাকার তাঁর সময় বা সুযোগ নেই।

চালাক মানুষ তাই বিবেচক হওয়ার পরই পরমেশ্বরকে বাতিল ক'রে পরম ব্রহ্মকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ অবতার আর গুরু ভগবানের পুজো চালু করেছে। এতে বিশেষ এক শ্রেণীর ইহলৌকিক উন্নতি অবধারিত হয়। বাকি মনুষ্যের জন্য পরলোকের পারিতোষিক সাজানো থাকে। পরমেশ্বরকে হঠিয়ে দিয়ে এভাবেই ব্রহ্মারা দল বেঁধে ভগবানের বংশ বাড়িয়ে যাচ্ছেন। পরমেশ্বর আড়ালে বসে হয়ত হাসেন। কিন্তু কখনোই বলেন না, এই নির্বোধ সৃষ্টি আমাকে ভুলে গেল। তিনি খুশি হন, তাঁর সৃষ্টিমধ্য থেকে একটিও মাত্র খাঁটি রত্ন খুঁজে পেলে, যে তাঁর কথাই শুধু ভাবে।

যাইহোক, পরিত্যক্ত পরমেশ্বর আপন আনন্দে থাকুন, আমরা ভগবান ব্রহ্মার কোপে বিদ্ধ রামের শেষ অবস্থার কথা শুনি।

ব্রহ্মা বলে গেলেন, উত্তর কাণ্ডে সীতার পাতালপ্রবেশ পর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলী বাল্মীকির রচনা। পরবর্তী অংশের নাম, উত্তরকাণ্ড। সেই উত্তরকাণ্ডে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি সর্গে রামের শেষজীবনের কথা সন্নিবেশিত আছে।

সীতার শোক সময়গুণে ভুলে গেলেন রামচন্দ্র। মন দিলেন রাজকর্মে। রাজকার্য মানে চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। তিনি লবণ নামক এক দৈত্যরাজকে বধ করে আসার জন্য প্রথমে ভরতকে অনুরোধ করলেন। তারপর যখন দেখলেন যুদ্ধযাত্রায় শত্রুঘ্ন প্রস্তুত, তখন তাঁকেই পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন, লবণকে বধ করার একমাত্র উপায়, তাকে নিরস্ত্র অবস্থায় গুপ্তহত্যা করা। রাম জানতেন, এসব অন্যায় কাজ ভরতের দ্বারা সম্ভব নয়। শত্রুঘ্নই রাম চরিত্রের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁর আপত্তি নেই অন্যায় অধর্ম করায়। শত্রুঘ্নর ওপর দারুণ খুশি হয়ে ভরত ও লক্ষ্মণ বর্তমানে রামচন্দ্র তাকেই যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। একবার লক্ষ্মণকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করতে চেয়েছিলেন মধ্যমভ্রাতা ভরতকে বাদ দিয়ে। লক্ষ্মণ সে রাজ্য গ্রহণ করেন নি। কিন্তু শত্রুঘ্ন নির্বিবাদে খুশি হয়েই রাজমুকুট পরলেন। [উ. কা. / ৬৩ সর্গ]।

এরপর ভরত ও লক্ষ্মণকে ডেকে একদিন রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিপ্রায় প্রকাশ

করলে ভরত অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বজনবিনাশক এই পাপকর্মের অংশীদার হ'তে অস্বীকার করে এই প্রথম রামের অর্থাৎ নেপথ্য দৈবশক্তির অমোঘ আদেশ লঙ্ঘন করলেন। লক্ষ্মণও মৌন সমর্থন জানিয়ে ভরতের পক্ষ নিলেন।[৩] এই ব্যাপারে রাম তথা দেবতারা সচেতন হয়ে উঠলেন। বুঝলেন, যে-জন-অসন্তোষ অযোধ্যাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে, সেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা এখন রাজভ্রাতাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। খুবই আশঙ্কার কথা। সুতরাং যথাশীঘ্র এর প্রতিকার করতে হবে।

এরপরই হঠাৎ একদিন "অতিবলের দূত", এই পরিচয় দিয়ে জনৈক মুনিবেশী ব্রাহ্মণ এসে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "আমি সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার প্রেরিত। আমার নাম সর্বসংহারক কাল।...তোমার আয়ুকাল পূর্ণ হইয়াছে।" তবে যদি আরও কিছুকাল তোমার "প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে বাস কর।"[৪]...

রাম বুঝলেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড ব্রহ্মার কৃপায় আরও কিছুকাল স্থগিত থাকতে পারে এবং পৃথিবীতে থাকার জন্য তিনি একসটেনশনও পেতে পারেন যদি ব্রহ্মার আদেশ পালন করে যান নিঃশব্দে। এটা বুঝে রাম বললেন, "দেবগণের সকল কার্যে আমি ব্রহ্মার বশবর্তী"।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ এসে খবর দিলেন বাইরে দুর্বাসা অপেক্ষা করছেন। লক্ষ্মণ জানতেন, অতিবলের দূত যখন রামের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন তখন মন্ত্রণাকক্ষে যে কেউ প্রবেশ করবে রাম তার মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য থাকবেন, দেবদূত এই নির্দেশও জারি করে রেখেছেন। কিন্তু দুর্বাসাসম্প্রদায় অতি নিষ্ঠুর। এরা দেবলোকের অত্যাচারী মুনিবেশী সেনা [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্র]। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের নেতাকে অমান্য করার অর্থ সবংশে বিনষ্টি। তাই জেনেশুনেই লক্ষ্মণ যেন তাঁর বধ্যভূমিতে প্রবেশ করে দুর্বাসার আগমন সংবাদ দিলেন।

অতিবলের দূত চলে গেল ব্রহ্মার গুপ্ত আদেশ জানিয়ে। দুর্বাসা ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন বোধহয়। রাম জিজ্ঞেস করলেন, বলুন প্রভু আপনার জরুরী প্রয়োজন। দুর্বাসা বললেন, খুবই ক্ষুধার্ত, ভোজনের আয়োজন কর। রাম বুঝলেন, এও দেবলোকের অপকীর্তি। দুর্বাসা অতিবলের দূতের পিছু পিছু এসেছিল শয়তানি মতলবে। মতলব, লক্ষ্মণকে মন্ত্রণা কক্ষে পাঠিয়ে রামের প্রতিজ্ঞানুসারে তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা। দুর্বাসার ক্ষুধা বড় সাংঘাতিক, কেননা সময় বিশেষে দুর্বাসা নরমাংসভুক।

দুর্বাসা প্রস্থান করলে "দীনমনে অধোমুখে" রাম সমস্ত ব্যাপারটা "চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কালের বাক্যানুসারে বুঝিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিনাশ-

৩। উ. কা. / ৮৩ সর্গ / ভারবি —
৪। উ. কা. / ১০৩ থেকে ১০৭ সর্গ / ঐ

কাল উপস্থিত। ভাবিলেন, অতঃপর আর আমার কিছুই থাকিবে না।" [উ/১০৫ সর্গ]।

পরবর্তী সর্গে রাম মন্ত্রীবর্গ [সকলেই ব্রহ্মার অনুচর ব্রাহ্মণ নেতা] এবং বশিষ্ঠকে সব কথা জানালে বশিষ্ঠও বললেন, "রাজন্! তোমার ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষ্মণের নিহিত বিয়োগ আমি জানি। কাল অতিমাত্র প্রবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর।"

ব্রহ্মার হাইকমাণ্ড থেকে যে নির্দেশ আসে তা পালন করতেই হবে, কেননা এখন রামচন্দ্র সর্বহারা। ব্রহ্মাবাদী নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ্যচক্রান্তে বন্দী।

পরিত্যক্ত লক্ষ্মণের মৃত্যু হ'ল সরযূ নদীতীরে। দেবতারা সেই মৃত্যুযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পরিতুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। গোঁজামিল রচনাকার তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক জুড়ে দিয়ে বললেন, অহো কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ লক্ষ্মণ স্বর্গে চলে গেলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে তাই তো লক্ষ্মণের পুজো করছেন। এই গোঁজামিল গেঁথে দেবতার অপকীর্তি ঢাকা হ'লো।

ভরত শোকে দুঃখে জ্ঞান হারালেন। অসহায় অযোধ্যাবাসীও কাতর হলেন। এদের রামায়ণে "প্রকৃতিগণ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাম তাঁর ইন্তাকাল আসন্ন জেনে জীবনের অন্তিম ক্ষণে ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করতে চাইলেন। ভরত রাজি হলেন না।

তখন রাম কোশলে কুশকে ও উত্তর কোশলে লবকে রাজ্যে অভিষেক করলেন। এই লব কুশ ব্রাহ্মণ আশ্রমে সীতার বসবাসকালে জন্মগ্রহণ করে। কোনো প্রমাণ নেই, এরা বস্তুত রামচন্দ্রেরই দুই পুত্র কিনা। বরং সন্দেহ অমূলক হবে না যদি বলা যায়, ব্রহ্মার নির্দেশে বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে রাখার মধ্যে একটি গোপন অভিসন্ধি ছিল। লব কুশ হয়ত আসলে কোনো দেবতার সন্তান। সেজন্যই রাম বংশে খুবই মৃদুভাবে এই দুজনের নাম উচ্চারিত হয়েছে।

লবকুশ রইলেন। ব্রাহ্মণরাও রইলেন। অযোধ্যা থেকে বিতাড়িত হলেন শুধু রাম ভরত ও দশরথপুত্র অনুগামী ব্রাহ্মণ-শাসন-অস্বীকারকারী পৌরবর্গ।

এঁদের তাড়না করে সরযূ নদীতীরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সর্ববিনাশক ব্রহ্মার সঙ্গে একাধিক বিমানে চেপে দেবতা ও দেবসৈন্যরাও উপস্থিত ছিলেন। অযোধ্যাসুদ্ধ লোককে সলিল সমাধি দিতে হ'লে হিটলারি ব্যবস্থার দরকার। সম্ভবত সেদিন তেমনই এক মারণযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লক্ষ্মণ হত্যার পর অযোধ্যার শোষিত জনগণ এবং রাম ভরতও হয়ত ব্রাহ্মণ্য প্রতাপকে অস্বীকার করেন। ফলে মৃত্যু এবং দেব-ভাষায় স্বর্গ লাভ। এঁদের নাকি ব্রহ্মা 'সন্তানকলোক' নামক এক ভূতনগরে প্রেরণ করলেন।

গোঁজামিলের পুরাণকার এইখানে লিখেছেন, "ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইরূপে 'স্বর্গ' প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

আমাদের প্রশ্ন, ব্রহ্মা এতোসব লোক লোকান্তরে যথাইচ্ছা সবাইকে ডেসপ্যাচ করতেন কী ভাবে? পৃথিবীর সামান্য যে অংশে মহান হিমালয়, তারই মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশ গাড়োয়ালে তো ছিল ব্রহ্মার রাজত্ব স্বর্গলোক, বা ভৌম স্বর্গ। এর বাইরে তিনি তখন গোটা ভারত ও হিমালয়ই অধিকার করতে পারেন নি। এমন ব্যক্তি ইচ্ছেমত লোক লোকান্তরের অধিপতি সেজে বসেছেন শুধু প্রক্ষিপ্ত গোঁজামিল কাহিনীর সুবাদে। আমরা তাই ব্রহ্মার এহেন বিচিত্র ক্ষমতায় আস্থা রাখতে পারলাম না। দেখলাম, নিষ্ঠুর ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণরা রামচন্দ্রের দ্বারা নিজেদের কাজ হাঁসিল ক'রে হাসতে হাসতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে করতে "চল্ তোকে সগ্‌গে নিয়ে যাই" বলে নির্দ্বিধায় রামের সঙ্গে অযোধ্যাবাসীদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছেন ও নিশ্চিহ্ন করেছেন।

রামের অনুগমন করার জন্য শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বেশ কিছু বানর ভল্লুক ও রাক্ষস জাতীয় পুরুষ এসেছিলেন বলে খবর আছে। মনে হয়, এরা রামের পক্ষে যুদ্ধার্থী হয়েই আসেন। তাই এঁদেরও একই সঙ্গে খতম করা হয়।

চিরবিশ্বাসঘাতক বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান কিন্তু বিনষ্ট হ'ন নি। অথচ তাঁরাও এসেছিলেন রামের সঙ্গে বধ্যভূমি পর্যন্ত। সন্দেহ অমূলক হবে না, যদি অনুমান করা যায়, এঁরা দেবপক্ষে যোগ দেন।

গোঁজামিল লেখক পুরাণকার অবশ্য রামচন্দ্রের মুখেই বসিয়ে দিয়েছেন এক গুচ্ছের অবিশ্বাস্য বাণী। বলা হয়েছে, রাম নিজেই ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব এবং রামানুরাগী অযোধ্যাবাসী, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসজাতীয় পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ পারলৌকিক ব্যবস্থা করার জন্য ব্রহ্মার কাছে সুপারিশ করলে ব্রহ্মা তাদের 'সন্তানক' নামক সেই কল্পিত ভূতনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তখন সবান্ধবে রামচন্দ্র সরযূ নদীতে জীবন বিসর্জন দিলেন।

ভারি চমৎকার ব্যাপার। রাম যদিবা ব্রহ্মার আদেশে সরযূতে ডুবে মরতে পারেন, রাম অনুরাগী সবাই এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ অস্বীকারকারী সাধারণ অযোধ্যা-বাসীরাও কি শোভাযাত্রা করে সরযূতে ডুবে মরলেন বলে মেনে নিতে হবে? না, গোঁজামিল লেখক পুরাণকারের হাতের তালুতে গঞ্জিকাপূর্ণ কলিকাটি ধরাই থাক, প্রসাদলোভীরা তাঁকে ঘিরে ধূমপান করুন, আমরা বলব, মূল বাল্মীকির ইতিবৃত্তে এসবই আগাছা গল্প। এদের ছাঁটাই করতে হবে।

অন্য গল্পটি হল, রামচন্দ্রই বিভীষণ, জাম্ববান, হনুমানদের বললেন, থাক, তোমাদের এখন আর স্বর্গযাত্রায় কাজ নেই। তোমারা স্ব স্ব প্রজা পালন কর এবং বহু বহু কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকো।

ভারি আশ্চর্য কথা। সুগ্রীবও রামের অনুগামী হলেন, ওদিকে জাম্ববান ও হনুমান বিভীষণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই গঙ্গাযাত্রা দেখেও দুফোঁটা চোখের জল ফেললেন না। অথচ প্রচার হয়ে গেল, শ্রেষ্ঠ রামভক্ত কে? না, মহাবীর হনুমান,

আবার কে ?

প্রচার এভাবেই হয়। দেবতাও তৈরী হন এইভাবে।

কিন্তু সত্য যা তা পুরাণ পুঁথির পাতায় থেকে যায়। সেই সত্যটুকু এই রকম :

রামকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আগে [বলির নৈবেদ্যকে যেমন মন্ত্রশুদ্ধ করা হয় তেমনি ভাবে] কুলগুরু বশিষ্ঠ একটি মহাপ্রস্থানিক অনুষ্ঠান করে রামের অঙুলে কুশ বেঁধে দিলেন। তারপর সতীদাহের অনুরূপ ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে ব্রাহ্মণ নেতারা রামের দলবলকে সরযু নদীর দিকে নিয়ে চললেন। তাঁরা "পদব্রজে গমনকষ্ট স্বীকার পূর্বক মৌনী হইয়া" [যুদ্ধবন্দীর অবস্থায়] চললেন। বড় দীন এই যাত্রা। কোনো সমারোহ হ'ল না এতোবড় একটা স্বর্গযাত্রায় !

এইখানে মনে পড়ে যাচ্ছে, যুদ্ধবন্দী দুর্যোধনকেও ব্রাহ্মণরা ক্ষতবিক্ষত শরীরে পরিশ্রান্ত রুধিরাক্ত কলেবরে গদা কাঁধে কুরুক্ষেত্রের বধ্যভূমির দিকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলেন মহা উল্লাস কলরব করতে করতে। সে দৃশ্য দেখে সঞ্জয় সহ সকল ভারতবাসী সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। এমন সম্মান ও ভালোবাসা পান নি কিন্তু স্বজন হত্যাকারী বাসুদেব কৃষ্ণও। তাঁর মৃত্যুতে কেউ কোথাও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন নি।

দুর্যোধনের শিরে ভারত মাতার যে অশ্রুআশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল, রামচন্দ্রের ভাগ্যে সেটুকুও জুটলো না। অশ্রুবিসর্জন করেন এমন স্বজন তাঁর কেউ ছিলেন না। সেদিন দেবতারা একই সঙ্গে সমস্ত অযোধ্যাকে শ্মশানে পরিণত করেন।

তারই করুণ ভয়াল বিবরণ :—

"অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর জনশূন্য ছিল !"

রামায়ণের এই শেষ হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে তারপর কতকাল।
পরে লোকে ভুলে গেছে সেই ইতিবৃত্ত।

সমাপ্ত